অমৃতের পথে

বিংশ শতাব্দীর যুগসঙ্কটে আধুনিক সভ্যতার বাস্তব
বিশ্লেষণ ও শাশ্বত সমাজধর্ম্মের আলোকে
মানবমুক্তির পথের সন্ধান

সত্যসাধক ব্রহ্মচারী মুরলীধর
অধ্যক্ষ, মহাসত্য সাধনাশ্রম

পরিবেশক—
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

শুভ ৺বিজয়া দশমী, ১৩৬৭

মহাসত্য সাধনাশ্রম,

"শাশ্বত ভারত" প্রকাশন,

বাঁকুড়া, হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

ক্যালকাটা প্রিণ্টার্স ও অজন্তা প্রেস,

আসানসোল হইতে মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান :

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ;

"শাশ্বত ভারত" প্রকাশন, পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া ;

অধ্যাপক এম, ডি, সরকার, রবীন্দ্র নগর,

আসানসোল এবং বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট পুস্তকালয়

"এ যুগ মহাজাগরণের যুগ,

এ যুগ মহামিলনের যুগ,

এ যুগ মহাসমন্বয়ের যুগ

এ যুগ মহামুক্তির যুগ।"

—এ যুগের ঋষিবাণী।

নমো মহাসত্যায় শ্রীগুরবে পরমদেবায়।

উৎসর্গ পত্র।

'এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দতে।'

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

নিত্যভাবাশ্রিতা "মা"!

ব্রহ্মচর্য তোমার ইহলোকের আজীবনের একান্ত প্রিয় বস্তু ছিল। বাল্যকাল হইতে ইহার প্রেরণা ও পরিচালনা তোমার নিকট লাভ করিয়াছিলাম। কালে তাহাই ব্রহ্মচর্য-মহাসিদ্ধ শ্রীগুরুর কৃপাশ্রয়ে তীব্র বাধা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া পুষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। একমাত্র সন্তানকে স্বেচ্ছায় এভাবে আজীবন ব্রহ্মমুখী জীবন-সাধনার পথে আগাইয়া দিয়া তুমি আদ্যাশক্তি বিশ্বজননীর অংশরূপেই কাজ করিয়াছ। তোমার এ অভূতপূর্ব্ব ত্যাগ, চরিত্রবল ও ব্রহ্মনিষ্ঠা অনেকেরই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বিষয় হইয়া আছে।

এই পুস্তকের কিছু অংশ তুমি মর্ত্তালোকের স্থূলরূপ দেখিয়া গিয়াছ এবং ইহার নামটীও অনুমোদন করিয়া গিয়াছ। আজ সম্পূরিত ও যুগপ্রয়োজনে পরিবর্দ্ধিত 'অমৃতের পথে' গ্রন্থখানি অমৃতলোকের সূক্ষ্মরূপে তোমার হাতেই অর্পণ করিলাম, তুমি মহাসত্য-শ্রীগুরু-পরমদেবতার শ্রীচরণে ইহা নিবেদন করিয়া নিত্য-তৃপ্তি লাভ কর—আমরাও সেই নিত্যতৃপ্তিতে সংবর্দ্ধিত হই। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ইতি—

নিত্যলোকের "সন্তান"

ব্রহ্মচারী শ্রীমুরলীধর।

(অধ্যাপক শ্রীমুরলীধর সরকার)

সূচীপত্র

ভূমিকা।

স্বাধীন ভারতে অমৃতের সাধনা—শাশ্বত ধর্ম্ম—সম্প্রদায় ধর্ম্ম—শাশ্বত ধর্ম্মে বাস্তববাদ—ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—মনুষ্যত্বধর্ম্মী ভারতরাষ্ট্রে মনুষ্যত্বসাধনার অভাব—ইহার ঐতিহাসিক কারণ—জাতীয় চরিত্রসাধনা—গণতান্ত্রিক সমাজধর্ম্ম—শাশ্বত ধর্ম্ম ও 'হিন্দু'ধর্ম্ম—সর্ব্বধর্ম্মের বাস্তব সমন্বয়ের পথ—জাতীয় সমাজধর্ম্মের স্বরূপ—ত্রিবিধ কাম—জাতীয় ব্রহ্মচর্য—নূতন জীবনদর্শন—রাষ্ট্রসমর্থনের বিকল্প—যৌনকামের গুরুত্ব—ধনকাম ও প্রভুত্বকাম—গুরুতত্ত্বের একত্ব—জাতীয় জীবনধর্ম্মে মহামিলন।

প্রথম অধ্যায়
রাজনীতি ও অর্থনীতি।

এ যুগের মানুষ কি চায়—বর্ত্তমানের রাজনীতি ও অর্থনীতি—প্রাচীন ভারতে ব্যক্তি ও জাতির সমন্বয়—সত্যকার জাতীয় স্বাধীনতা—জনকল্যাণের স্বরূপ—যৌনকাম-ধনকাম-প্রভুত্বকাম—অস্বাভাবিক জীবনের রাজনীতি ও অর্থনীতি—প্রাচীন ভারতের সাম্যবাদ। .... পৃঃ ১-২৬।

[প্রাচীন ভারতের রাজনীতি-অর্থনীতি ও গণধর্ম্ম-সাম্যধর্ম্মের আলোচনা ....দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১০২-১২ ;

তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৮২-২১০, ২২০-২৫, ২৩২-৪২।

আধুনিক যুগের রাজনীতি-অর্থনীতির ও গণতন্ত্র-সাম্যবাদের

আলোচনা ....ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৫৯৬-৬০২, ৬৪২-৭৬।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব।

যৌনকাম কি 'স্বাভাবিক'?— জীবতত্ত্বের দৃষ্টিতে যৌন ভালবাসার নগণ্যতা—যৌনপ্রবৃত্তি দুর্ব্বার নয়—আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও মনীষীগণের মত -যৌনসংযম স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর নয়- ফ্রয়েডীয় কামতত্ত্বের ক্রটী—Repression বা অবদমনের স্বরূপ স্নায়ুমনোবিকার ও যৌগিক-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি—ফ্রয়েডের মত পরিবর্ত্তন—আধুনিক যৌনবিজ্ঞানে ধর্ম্মীয় দৃষ্টি—Sublimationএর স্বরূপ—যুগের চাহিদা ও ভারতের দায়িত্ব। ....পৃঃ ২৭-৬৬।

[কামরহস্য ও শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, আধ্যাত্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব ইত্যাদির, আলোচনা .... ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৪৩৯-৬৪২।]

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ ও সংস্কৃতি।

ভারতীয় সমাজনীতি ও সংস্কৃতির জাতীয় গুরুত্ব—ভারতীয় সমাজনীতির ভিত্তি মনুষ্যত্বসাধনা—ব্রহ্মমুখী জীবনসাধনার ঐক্য ও সংহতি—জাতীয় আচার্যবাদ—'বর্ণাশ্রম' ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভিতরের কথা—বাস্তবজীবনে মহামুক্ত কালচক্রের পুনরাবর্ত্তন—প্রাচীন সমাজধর্ম্মের একলক্ষ্যতা—জনজীবনে ব্রহ্মচর্য—স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ম্ম—সম্প্রদায়ধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্ম—ভারতের সমাজসাম্য—জাতীয় জীবন-

ধর্ম্মের মূল নীতি—সমগ্র সমাজই 'আশ্রম'—প্রাচীন ভারতে আনন্দ ও অধ্যাত্মমুখিতা। ....পৃঃ ৬৭-১১৮।

[প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের আলোচনা .... চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়।]

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যষ্টিশিক্ষা ও সমষ্টিসাধনা।

ব্রহ্মচর্যের জাতীয় সমাজসাধনা—**পরিবার** (Family)—প্রাচীন আদর্শে জাতীয় দায়িত্ব—সংযমের সম্ভাবনীয়তা—পশ্চিমের অবস্থা—যৌনকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সমাজবিরোধী অপরাধপ্রবণতা—নূতন জাতীয়তার ভিত্তি নূতন পরিবার—তারুণ্যের বিদ্রোহ—সতীত্বের স্বরূপ—জন্মদানের তপস্যা—জন্মনিরোধঃ সেযুগে ও এযুগে—বৈধব্যের সমস্যা—কুমারী-সমস্যা—প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা ও নারীমর্যাদা—পশ্চিমদেশের দুর্গতি ও দুর্ভোগ—বিবাহ-বিচ্ছেদ : সেযুগে ও এযুগে—**রাষ্ট্র** (State)—প্রাচীনযুগে রাষ্ট্রসেবা ও সমাজসেবার ধর্ম্ম—অর্থনৈতিক 'সংবিভাগ'—শোষণ-পীড়নের প্রতিকার—রাজধর্ম্ম ও ক্ষাত্রধর্ম্ম—গণচরিত্রের উন্নয়ন—**শিক্ষায়তন** (Academy)—সমাজ, রাষ্ট্র ও ছাত্র—প্রাচীন ছাত্রসমাজে জাতীয় সাধনা—আধুনিক 'নাগরিক'-গঠনের ফাঁকা কথা—নূতন ভারতের ছাত্রসমাজ—**সমাজ** (Society)—সমাজচেতনার স্বরূপ—পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র ও প্রাচ্যের সমাজ—প্রাচীন ভারতের সমাজবাদ—জাতিভেদের স্বরূপ ও প্রতিকার—প্রাচীন ভারতে চরিত্র ও আনন্দ। ....পৃঃ ১১৯-১৫৫।

পঞ্চম অধ্যায়

শাস্ত্র ও সাহিত্য।

শাস্ত্র ঃ—ব্রহ্মচর্য : বেদ ও উপনিষদে—রামায়ণ-মহাভারতে—মনুসংহিতায়—পুরাণে—ষড় দর্শনে—বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মে—গীতায়—মধ্যযুগীয় শৈব-বৈষ্ণব ধর্ম্মে—নাথপন্থায়—বীরশৈববাদে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে—মানবতাবাদী ভক্তিমার্গে—শিখধর্ম্মে—সুফীসম্প্রদায়ে—তন্ত্রসাধনায়—বজ্রযান ও সহজিয়ামার্গে—যোগমার্গী সংহিতায়—নবযুগের সংস্কারপন্থী ধর্ম্মমতে—আধুনিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে—খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য—ইস্‌লামে সংযমপবিত্রতা—'মানি' (Manichaean) ধর্ম্মমতে ব্রহ্মচর্য—প্রজ্ঞারহস্যবাদী (Gnostic) সম্প্রদায়ে—চীন-দেশীয় ধর্ম্মে সংযমসাধনা—মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় ধর্ম্মে যৌনসংযম—ইহুদী ধর্ম্মে সংযমপবিত্রতা—পারসিক (জরথুষ্ট্র) ধর্ম্মে সংযমসাধনা—আদিম জাতিদের ধর্মে—গ্রীক সংস্কৃতি ও গ্রীক দর্শনে সংযম-ব্রহ্মচর্যের আদর্শ—রোমান্ ধর্ম্মে—প্রাচীন জার্মাণ জাতীয় জীবনে।

সাহিত্য ঃ—বৈদিক সাহিত্যের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য—রামায়ণ-মহাভারতের যৌনপ্রণয়কাহিনীর বিচার—পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যে সংযমব্রহ্মচর্যের অব্যাহত ধারা—উত্তরযুগে ক্রমবর্দ্ধমান শৃঙ্গাররস-চর্চ্চা—মধ্যযুগীয় ধর্ম্মসাহিত্যে—মধ্যযুগীয় লৌকিক সাহিত্যে—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে—দ্বিতীয় যুগে—অত্যাধুনিক যুগে—রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মচর্য—পাশ্চাত্য সাহিত্যে যৌনসংযম—বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যনাটকে ও সাহিত্যে উৎকট যৌনজিজ্ঞাসা ও মোহভঙ্গের তীব্রতা—বিকৃত কামের চতুর শিল্পকৌশল—সাহিত্যে নূতন জীবনদর্শনের প্রয়োজনীয়তা। .... পৃঃ ২৪৫-৩৬৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কামরহস্য ও জীবনসাধনা।

যোগস্থ কামদর্শন—আরাম বা স্বস্তি-ইচ্ছার স্বরূপ—আত্মলয় ও আত্মবিলয়—অতিকাম ও সংযমের স্বরূপ—মনস্তত্ত্বের সমর্থন—ফ্রয়েডের 'মৃত্যুবৃত্তি' (Death Instinct)—উপনিষদে আদি-'মৃত্যু' —আত্মচেতনার রূপান্তর—সমাজবিরোধী (anti-social) চেতনা —চেতনার প্রকৃত স্বাভাবিকতা—সমাজতন্ত্র ও 'পাপ'—যৌনক্রিয়ার শরীরতত্ত্ব—শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বে 'মৃত্যুর খেলা'—পুংশুক্রকোষের উৎপত্তি ও স্ত্রীডিম্বকোষের সহিত সংযোগের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান—আধুনিক কামজীবন—Havelock Ellis ও বাৎস্যায়ন—ভ্রান্তি ও ভ্রান্তধারণা—মানুষ প্রাণী হইলেও জন্তু নয়—ব্রহ্মচর্য স্থূল শুক্র-সংযমমাত্র নয়—নারীর ব্রহ্মচর্যে শরীরতত্ত্ব—আয়ুর্ব্বেদে ব্রহ্মচর্য—'ঊর্দ্ধরেতাঃ'-তত্ত্বের শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—নাড়ী-চক্র-পদ্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতা—**নর ও নারীঃ**—সম্পর্কের দ্বৈধী-ভাব—সামঞ্জস্যের উপায়—'অব্রহ্ম'—নারী ও সুরা—কামসুখ 'negative' ও কৃত্রিম—মৃত্যুগর্ভ জীবনের ধারক কাম (Eros)—নরনারীর প্রেমসম্পর্কের নিজস্ব মূল্য—'ভালবাসা'র প্রকৃত অর্থ—প্রাণশক্তির সত্য ও কৃত্রিম তোষণ—আত্মায় আত্মসৃজন—অমর প্রেম—নিঃস্বার্থ ভালবাসা ধর্ম্মসাধনার বিশেষ সহায়—দাম্পত্য-জীবনের আলোচনা—স্বরূপ ও মূল্য—পাশ্চাত্য গবেষণা—সতীত্বের স্বরূপ ও বিকৃতি—বিবাহ-বিচ্ছেদের মৌলিক ব্যর্থতা—'জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক'—বিবাহবিচ্ছেদ ও রোমান্টিক বিবাহ—পাশ্চাত্যে প্রতিক্রিয়া—**আত্মতত্ত্ব ঃ** মাতৃকেন্দ্রিক কাম ও ভারতপ্রজ্ঞা—মাতৃস্নেহ (-পিতৃস্নেহ) তপস্যা—বৈজ্ঞানিক আশঙ্কার ইঙ্গিত—

জীবনলক্ষ্যের আলোচনা—ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়—শাস্ত্রে ব্যক্তিধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্ম—বাস্তব বিশ্বাত্মতা—সর্ব্বশূন্যতার দুঃসাহস—

যুগসংযম ঃ নূতনযুগের নূতন ব্যাখ্যা—নাস্তিক আস্তিকতা—আধুনিক সভ্যতার শেষপ্রান্তে—জীবনবিকারের মধ্য দিয়াই জীবনসাধনা—'স্বাভাবিক' মানুষের অস্বাভাবিকতা—আমেরিকা ও রাশিয়া—যৌন অবদমন ও হিষ্টিরিয়া—যৌনকামে 'পাপ'তত্ত্ব—বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনে ফাঁকি—নারীস্বভাবের মৌলিক পরিবর্ত্তন—যৌনভালবাসার পবিত্রভাবোধ লুপ্তপ্রায়—'স্বাভাবিক' যৌনপ্রেমে অস্বাভাবিকতার তত্ত্বোদ্ঘাটন—অস্বাভাবিক' কামজীবনকে স্বাভাবিক বলিয়া চালাইবার চেষ্টা—Havelock Ellis ইত্যাদির মধ্যেই ব্যর্থতার স্বীকৃতি—প্রাচীন ভারতের ঋজু-বলিষ্ঠ কামজীবন—যৌনকামের সহিত রক্ষা ও সভ্যতার বিপর্যয়—কাম, আত্মচেতনা, আত্মাভিমান ও মায়া—ত্রিবিধ কামসংযম ও বাস্তব 'জীবনযজ্ঞ'—দেশ-জাতি-রাষ্ট্র-বিশ্বকল্যাণে জাতীয় ব্রহ্মচর্য—

সভ্যতার ভবিষ্যৎ ঃ—ধনসাম্যবাদ (Communism) ও গণতন্ত্রবাদ (Democracy)—দার্শনিক স্বরূপনির্ণয়—Karl Marx-এর মূল্যতত্ত্বের আলোচনা—যৌগিক-দার্শনিক ব্যাখ্যা—রাশিয়ার ধনকাম-নিবারণ—সামাজিক নীতিবাদ—যৌন-কামসংযমে Lenin—যৌনকাম-ধনকামের অসংযমে প্রভুত্বকামের বিস্তার—বাস্তবধর্ম্মে ত্রিবিধ কামসংযমের ভারতীয় চিন্তাধারা—ভারতীয় আদর্শে বিপ্লবের স্বরূপ—ভারতীয় বাস্তবধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকতা—'শাশ্বত সমাজধর্ম্ম' ও নূতন জীবনবাদ—গণতন্ত্রবাদের স্বরূপ ও ইতিহাস—রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ভোট (Vote)-এর

স্বরূপনির্ণয়—আধুনিক গণতন্ত্রযুগের নিদারুণ সমস্যা—প্রকৃত গণতন্ত্র সম্বন্ধে Bryce, Laski, Toynbee ও Ketelbey-র অভিমত—মানবিক সমাজধর্ম্মের 'বৈপ্লবিক' কর্ম্মপন্থা—নূতন বিশ্বগণধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে ভারতের নেতৃত্ব। ....পৃঃ ৪৩৯—৬৮২।

অনুযোজনা পত্র (১)

আধুনিক বাস্তব ধর্ম্মবাদের নমুনা..................পৃঃ /০—৵০

অনুযোজনা পত্র (২)

আধুনিক কামসমস্যা ও বাস্তব জীবনসমস্যার প্রশ্নোত্তরে আলোচনা ... . পৃঃ ১—৩৮।

শুদ্ধি পত্র

সংশোধন ও সংযোজন... ... ...পৃঃ ১—৬

নাম-নির্দ্দেশিকা (Index)

ব্যক্তি ও গ্রন্থের নাম-পত্রাঙ্ক...............পৃঃ (i)—(xvii)

—:o:—

ভূমিকা

ভারত 'অমৃত'-পথের পথিক। ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রও সে জন্য অমৃতের সাধনভূমি। বহু শতাব্দীর পরাধীনতার পর ভারত বিধাতৃবিধানে 'স্বাধীন' রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় অমৃত-সাধনার ক্ষেত্র আজ আবার উন্মুক্ত। সহস্রবৎসরের অবহেলায় ও অকর্ষণে উষর এই জাতীয় জীবনে পুনর্ব্বার অমৃতের ফসল ফলিতে নিশ্চয়ই সুদীর্ঘ সময় লাগিবে। কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সময় অবশ্যই আসিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই বিরাট ক্ষেত্রপ্রস্তুতির একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

অমৃতত্বের সাধনাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের লক্ষ্য মুক্তিলাভ, শান্তিলাভ, শক্তিলাভ। কিন্তু এই মুক্তি-শান্তি-শক্তি যে মহা-মুক্তি-মহাশান্তি-মহাশক্তি যাহা দেশ-জাতি-সমাজ ও বিশ্বমানবের মহাজীবনের অঙ্গীভূত—তাহার প্রকাশ ভারতে বহুশতাব্দী ঘটে নাই।

ভারত ধর্ম্ম বলিতে বুঝে 'শাশ্বত ধর্ম্ম।' এই ধর্ম্মের বাণী প্রাচীন ভারতের শাস্ত্র ও সাহিত্যের পাতায় পাতায় উচ্চারিত হইয়াছে। গৃহে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ছিল ইহার অপরিমেয় প্রভাব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও ইহাই ছিল নীতি। Dogma বা ধর্ম্মীয় মতবাদ এখানে বড় কথা নয়। মনুষ্যজীবনের সত্যকার স্বাভাবিকতা এবং মনুষ্যত্বের পরামুক্তিই ইহার আসল কথা। সমগ্র ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে এই মুক্তমানবতার বেদীতে

উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্বমানবতার সাধনাই ছিল প্রাচীন ভারতের লক্ষ্য।

কিন্তু মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসাধনার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত দেশীয় ও বিদেশীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের প্রাবল্যই ভারতে দেখা যায়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অনেকগুলি দেশ-জাতি-সমাজের গঠনমূলক ধর্ম্মান্দোলন দেখা দিলেও এগুলি মূলতঃ সম্প্রদায়প্রধান বা প্রতিষ্ঠানপ্রধান। ইহা গত সহস্রাধিক বৎসরের সাম্প্রদায়িক অনুবর্ত্তনের ফল, যদিও জাতীয় ধর্ম্মসাধনার অভিমুখিতা এখানে সুস্পষ্ট। অপর দিকে বিভিন্ন বৈদেশিক ধর্ম্মমতগুলি এখনও এই জাতীয় জীবনসাধনায় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। ফলে একমুখিতার ও একভিত্তিকতার অভাবে জাতীয় জীবনগঠনের কেন্দ্রে ভারতের 'শাশ্বত ধর্ম্ম' আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

অথচ ভারতের 'শাশ্বত ধর্ম্ম' বাস্তবকে লইয়া। গার্হস্থ্য-নীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, কাম বা ভোগনীতি, মোক্ষ বা ত্যাগনীতি সমস্তই ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই বাস্তব সমাজধর্ম্ম বা জাতীয় ধর্ম্মকে হারাইয়া ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও ভারতের এই শাশ্বত সমাজধর্ম্মকে বা জাতীয় জীবনধর্ম্মকে উদ্বোধিত করা সম্ভব। ভারতে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং এখনও করিতে পারে, একথা আমরা গ্রন্থমধ্যে আলোচনা করিয়াছি। ইহারই অভাবে আজ পর্যন্ত ভারতে ধর্ম্ম ও নীতিকে বাদ দিয়াই জাতিগঠনের

এক প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মবর্জিত ও নীতিবর্জিত সমাজ ও রাষ্ট্র যে দেশের ও বিশ্বের কল্যাণসাধনে অক্ষম তাহা সমসাময়িক ইতিহাসে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদেশে Secular State বা ঐহিক রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এইখানে।

কিন্তু তবুও ভারতের ক্ষেত্রে এই Secular State বা ইহসর্ব্বস্ব রাষ্ট্রের কথাটি একটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। ইহাকে বলা হয় 'ধর্ম্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র। এই 'ধর্ম্মনিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ লইয়া অনেক বাদানুবাদের অবকাশ আছে। ইহা কি ধর্ম্মের প্রতি নিরপেক্ষতা? অথবা ইহা সকল ধর্ম্মের প্রতি নিরপেক্ষতা? বলা হইয়া থাকে ইহা সকল ধর্ম্মের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বহীনতা। অর্থাৎ, ভারতরাষ্ট্রে সব ধর্ম্মই সমান। ভারত কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতবাদী রাষ্ট্র নয়। কথাটি শুনিতে ভাল, কিন্তু এটা একটি নেতিমূলক উক্তি মাত্র। ভারত কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতবাদী না হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবাদী অর্থাৎ মনুষ্যত্বসাধনায় বিশ্বাসী বটে কিনা এবং তাহা কার্যকরী করিতে চায় কিনা ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিকে এতদিন এড়াইয়া চলা গিয়াছে কিন্তু কালের পটপরিবর্ত্তনে আর তাহা সম্ভব নয়। মনুষ্যত্বসাধনার ধর্ম্ম ভারতের জাতীয় জীবনের মূল। এই মূলকে উপেক্ষা করিয়া আগায় জল দিলে—নিছক বিলায়তী রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিলে—জাতি বাঁচিবে না, ইহার বিচ্ছিন্নতা-দুর্ব্বলতা দূর হইবে না। সাধারণ্যে President Radhakrishnan-এর বিভিন্ন উক্তি হইতেও ইহা বুঝা যায়:—

'What is called Secularism is sometimes

mistaken for neglect of religion or indifference to religion. It means this : the aim of religion is the realization of the Supreme and every path-way to it has to be recognized, validated and appreciated. This is the meaning of Secularism. It does not mean that we do not care for religion..........Underneath this Secularism Gandhiji also gave us the proper concept of Socialism.........the kind of Socialism which he adopted was the democratic ethical kind of Socialism........', অর্থাৎ সেক্যুলারিজম্ বলিতে কখনও কখনও একটি ভুল ধারণা করা হয় যে ইহা বুঝি ধর্ম্মকে অবহেলা করা বা ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য। ইহার অর্থ : ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মহাসত্যকে লাভ করা, সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রত্যেকটি পন্থার মূল্য স্বীকার করিতে এবং তাহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। ইহাই সেক্যুলারিজমের অর্থ। ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা ধর্ম্মের ধার ধারি না...... এইরূপ ধর্ম্মনিরপেক্ষতার আশ্রয়ে গান্ধীজীও আমাদের সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃত ধারণা দিয়াছিলেন.... যে সমাজতন্ত্র তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ছিল গণতান্ত্রিক ও নীতিধর্ম্মসম্মত সমাজতন্ত্র...... ।' (বোম্বাই বক্তৃতা ২।১০।৬০)

ভারতরাষ্ট্রের সর্ব্বজনপ্রিয় দার্শনিক প্রেসিডেন্টের এই ভাষ্য নিশ্চয় সর্ব্বজনগ্রাহ্য। এখানে আমরা দেখিতে পাই ভারত কোনও বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রাষ্ট্র না হইলেও মূলতঃ ধর্ম্মবাদী রাষ্ট্র অবশ্যই বটে। উল্লিখিত প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ আরও

বলিয়াছেন যে আমাদের ধর্ম্মীয় উদারতা আমাদের ধর্ম্মসাধনায় গভীর আগ্রহশীলতারই পরিচয় দেয় (বোম্বাই বক্তৃতা, ২.১০.৬৩)। পুনশ্চ—আমরা যখন সমাজতন্ত্রের কথা বলি তখন আমরা নৈতিকভাবে ভাবিত সমাজতন্ত্রের কথাই বুঝাইতে চাই (রাষ্ট্রপতি-ভবন বক্তৃতা, ৩১ ১০।৬৩)। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে ভারত কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্র না হইলেও ধী'তধর্ম্মবাদী মনুষ্যত্ব-সাধনার রাষ্ট্র অবশ্যই বটে। কিন্তু তথাপি এই মনুষ্যত্বসাধনার কোনও ব্যবস্থাই বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রে বা সমাজে নাই ইহাই পরম বিস্ময়ের কথা

ইহার কারণ কি? একটা কারণ গত সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া ভারত নানা সম্প্রদায়-ধর্ম্মের সাধনাই করিয়াছে, শাশ্বত সমাজধর্ম্মের সাধনা হইতে দীর্ঘকাল বিরত আছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর পর হইতে এই অবস্থা আমরা ইহাকেই ভারতের মধ্যযুগীয় ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছ বাস্তবজীবনে যে অসাম্প্রদায়িক ঋষিবাদের, অর্থাৎ ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যের তপস্যা ভারতীয় গৃহ-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে ধরিয়াছিল, তাহা তখন হইতে শিথিল হইয়া ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দিয়াছে দেশী ও বিদেশী নানা বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ধর্ম্মের ভাবপ্রবণ বা চিন্তাপ্রবণ ব্যক্তিগত সাধনা। ইহাই শাশ্বত ভারতের জাতীয় জীবনে এক চরম অন্তর্বিপ্লব যাহার কিনারা আজ পর্যন্ত হয় নাই। আধুনিককালে কিছু কিছু দেশ-জাতি-সমাজের কল্যাণকর 'মানবীয়' ধর্ম্মপ্রচার চলিতেছে বটে, কিন্তু সেগুলিও মধ্যযুগের জের টানিয়া বিশেষ বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধারা বা বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়াই

পরিচালিত। সম্প্রদায়, ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানই সেখানে বড় কথা! বৈদিক যুগ হইতে বাস্তব জীবনে যে সর্ব্বপূজ্য-মহাসত্যের প্রতি একলক্ষ্য আনুগত্য ভারতের সমস্ত আচার্য-গুরুঋষিকুলকে একই তপস্যার সমাজধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিত এবং যে সমাজধর্ম্মের কাছে পরবর্ত্তী যুগের 'অবতার' বলিয়া পূজিত মহামানবগণও মাথা নত করিতেন তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজিও সম্ভব হয় নাই। ইহারই অভাবে ভারতের জাতীয় জীবন-ধর্ম্মের উদ্বোধন ঘটে নাই। ধর্ম্ম আজিও নেহাৎ private virtue বা ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, প্রতিষ্ঠানগত ব্যাপার হইয়া আছে, public virtue বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কোনও একলক্ষ্য জাতীয় চরিত্রসাধনার মান (standard) স্থাপিত হয় নাই। ইহা বিশ্বের পক্ষেও এক চরম দুর্ভাগ্য, কারণ বিভ্রান্ত বিশ্বকে আজ বাস্তব জীবনে সত্যপথ দেখাইবার কথা ভারতবর্ষেরই। দ্বিতীয় কারণ, ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা-রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞান যুগেরই একটি ফল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের পথে 'জনসেবা' বা 'দেশের কাজ' করিবার দুর্ব্বার প্রবৃত্তিই এখন বড় কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের দারিদ্র্য-অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য দূর করিবার অজুহাতে তাহাই এখন একমাত্র বাস্তব ধর্ম্মের স্থান দখল করিয়াছে। তৃতীয় কারণ, এই জনসেবা ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টার তুলনায় রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা ও সম্পদ্ (resources) বিরাট ও অফুরন্ত। সুতরাং 'ধর্ম্ম' জাতীয়জীবনে একটি নিতান্ত গৌণস্থান অধিকার করিয়া আছে। চতুর্থ কারণ, একটা মহান্ জাতি-গঠনের জন্য যে কঠোর পরিশ্রমের ত্যাগতপস্যা, ও তাহার পিছনে একটা সংযত-

চরিত্রের সমাজসাধনা প্রয়োজন একথা বিস্মৃতির তলায় তলাইয়া গিয়াছে। পরানুকরণ যে জাতির অভ্যাসগত স্বভাবে পরিণত হইয়াছে তাহার এ পরিণতি অনিবার্য। সে জাতি অপরদের বাহিরের দিকটারই নকল করে, ভিতরের গুণগুলি আয়ত্ত করে না। এজন্য কমিউনিস্ট রাশিয়ার, এবং বর্ত্তমানে চীনেরও, সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে এবং যুবজীবনে নানা কঠোরতা ও চারিত্রিক কৃচ্ছ্রতার উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনও চিহ্ন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এই সব আধুনিক দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি ও সমরনীতির humanism ('মানবিকতা') অপেক্ষা শাশ্বত ভারতের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমরনীতি কত মহত্তর ভাবে মানবধর্ম্মী (humanistic) ও বিশ্বকল্যাণের জনক তাহাও কেহ অনুসন্ধান করিতে আগ্রহ বোধ করেন না। পঞ্চম কারণ, দেশে ও বিশ্বে ধর্ম্মের কোনও সর্ব্বজন-গ্রহণীয় standard না থাকায় এবং সেরূপ কোনও মানবীয় ধর্ম্মের জীবন্ত ঐতিহ্য (tradition) কোথাও দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় ধর্ম্মকে জাতীয় জীবনে স্থান দিবার কথা কাহারও মনে উদিত হয় না।

অথচ ইতিমধ্যে দেশের ও বিশ্বের জীবনে নিছক রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের রাজত্ব এক নিদারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা জীবনকে দুর্ব্বিষহ ও সভ্যতাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এই চরম সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের একমাত্র পথ বিশ্বের রাজনীতি-অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের পশ্চাতে একটা বাস্তববাদী অসাম্প্রদায়িক নীতিধর্ম্মের সমাজসাধনা প্রবর্ত্তন করা। আজকাল রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানকেও অনেকটা humanize বা মানবিক ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং ইহারই ফলে গণতন্ত্র,

সমাজতন্ত্র, সাম্যতন্ত্র ইত্যাদির আবির্ভাব। কিন্তু এই সব ঔষধে রোগ মূলে না কমিয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে। ইহার কারণ diagnosis বা রোগনির্ণয় ঠিকভাবে হয় নাই। মানুষের সমাজধর্ম্মী চরিত্রের সাধনাকে বাদ দিয়াই মনুষ্যসমাজের সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছে।

এইরূপ এক চরিত্রের সাধনাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যের শাশ্বত মানবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য ঋষি-আচার্য, গৃহ-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে ও দেশের অর্থ-নীতি শিক্ষানীতি-সমরনীতি ইত্যাদি সবকিছুকে এইরূপ এক সমাজধর্ম্মের সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রকমের সম্প্রদায়ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক সমাজ ও স্থানীয় সংস্কৃতির অস্তিত্বসত্ত্বেও ভারতীয় সমাজজীবন ঐ মানবিক সমাজধর্ম্মের সংহতিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। এমন কি বিভিন্ন সময়ে দেশের মধ্যেই নানা রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা বৈদেশিক আক্রমণও দেশের ঐ সমাজ-সংহতিকে নষ্ট করিতে পারে নাই—সমস্তই এক জীবন্ত সমাজধর্ম্মের মানবিক আদর্শের মধ্যে সমন্বিত হইয়াছিল। মহাভারতে বিজিত 'দাস' জাতিকেও ঐ ধর্ম্মের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দিবার কথা আছে, অপর পক্ষে ধর্ম্মবিরোধী আর্যই হউক আর 'দস্যু'ই হউক তাহাকে শাস্তি দিবার কথাও আছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির কোনও প্রশ্নই সেখানে নাই।

ঋষি-অনুশাসিত এই সমাজ-পরিকল্পনাই ছিল সে যুগের 'জাতীয় পরিকল্পনা'। ইহাই সে যুগে 'বর্ণাশ্রম' নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন সংস্কারের মানুষকে তাহার স্বভাব-স্বাধীন স্বচ্ছন্দ-কর্ম্মের মধ্য দিয়া দেশ-জাতি-সমাজ-রাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত করিয়া

মহামুক্তির পথে পরিচালিত করাই প্রধানতঃ ছিল সে যুগের সমাজ-ধর্ম্মের একমাত্র ‘সাধনপন্থা’। ইহারই মধ্যে জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তপস্যার মধ্য দিয়া ধাপে ধাপে মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধনের একটা ক্রম ছিল। ব্রহ্মচর্যে হইত ইহার আরম্ভ এবং বিশ্বাত্মবোধে হইত ইহার পরিণতি। ধর্ম্ম এই দৃষ্টিতে মুষ্টিমেয় ‘বৈরাগী’ সাধকদের ব্যাপার ছিল না, ইহা ছিল ব্যাপক জনগণের সাধনা। প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মসাধনা ছিল ‘গণতান্ত্রিক’ ও ‘সমাজতান্ত্রিক’।

সুদীর্ঘ কালপ্রভাবে এই সমাজধর্ম্মের সাধনা ও তপস্যা ম্লান হইয়া ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং দেশের বক্ষে পড়িয়া থাকে এক গৌরবযুগের ধ্বংসস্তূপের মত ‘জাতিভেদ’ প্রথা। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মনুষ্যত্বের সাধনার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব ও অস্পৃশ্যতার আগাছা চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই জাতীয় প্রাণশক্তির দারুণ অবক্ষয়ের যুগেই বৈদেশিক আক্রমণেও সমাজদেহ ক্ষতবিক্ষত, পর্য্যুদস্ত হইতে থাকে। এই যুগেই ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক সমাজ-সাধনা লোপ পাইয়া সাম্প্রদায়িক ‘হিন্দু’ ধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটে এবং ‘হিন্দু’ নামটী বিদেশী প্রদত্ত একটা খেতাব হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। স্বভাবতঃই ‘হিন্দু’ ধর্ম্ম ও ‘হিন্দু’ সমাজ বলিতে পুর্ব্বোক্ত জাতিভেদাশ্রয়ী, সঙ্কীর্ণতাধর্ম্মী সমাজ ও পৌরাণিক-স্মার্ত্ত আচার-অনুষ্ঠান-পূজাপদ্ধতিকেই বুঝাইতে থাকে। ইতিমধ্যে জ্ঞানবাদ-ভক্তিবাদ-তন্ত্রবাদ-যোগবাদ ইত্যাদি দেশীয় সম্প্রদায়ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান-মুসলমান ইত্যাদি বিদেশীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত এবং পরে খ্রীষ্টান-মুসলমান ধর্ম্মের অনুকরণে কতকগুলি সংস্কারপন্থী

উপাসক-সম্প্রদায়ও উদ্ভূত হয়। সুতরাং 'হিন্দু' ধর্ম্ম কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম নয়, ইহা ভারতের শাশ্বত ধর্ম্মের একটী অপভ্রংশ মাত্র। আজ পর্যন্ত তাহারই জের চলিতেছে।

ফলে এই হইয়াছে ভারতীয় সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে আজ মানবিক চরিত্র সাধনার কোনও ধর্ম্মের স্থানই নাই। সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে তাহার কোনও চেষ্টাও করা হয় নাই। কিন্তু ভারতের সুপ্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্যে যে একটী অসাম্প্রদায়িক মনুষ্যত্বসাধনার অমর আদর্শ বিরাজিত রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। জাতীয় ধর্ম্মসাধনার সেই উৎসমুখ আজ উন্মুক্ত করিলে দেশের ঊষর বক্ষে যে বিশাল সত্যজীবনস্রোত প্রবাহিত হইবে তাহা দেশে ও বিশ্বে দিকে দিকে পুনরায় অমৃতের ফসল ফলাইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই উৎসমুখ উন্মোচনেরই একটী প্রচেষ্টা।

এই সমাজধর্ম্মী মনুষ্যত্বসাধনাটী কি তাহার কথায় আমরা এখনই আসিতেছি। তৎপূর্ব্বে আরও কয়েকটী সংশয়ের নিরসন করিয়া লই। এত দীর্ঘকাল পরে এই অন্তর্হিত সমাজধর্ম্ম পুনরায় আবির্ভূত হইবে কেমন করিয়া? —প্রকৃত পক্ষে এই সমাজধর্ম্ম অন্তর্হিত হয় নাই, অপ্রকট হইয়াছে মাত্র ভারতের শাশ্বত ধর্ম্ম একটী মানবিক মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহা একটী অমর ঐতিহ্য। যুগ-প্রয়োজনে ইহা বিশ্বকল্যাণে পুনরায় আবির্ভূত হইবেই। তাহা ছাড়া ভারতীয় 'হিন্দুসমাজে' জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কথা বাদ দিয়া বলা যায় সমাজে বহু জ্ঞানী, পণ্ডিত ও সাধক ব্যক্তি এখনও প্রাচীন বর্ণাশ্রম-যুগের মনুষ্যত্ব-সাধনার আদর্শটীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। প্রাচীন যুগের এই

উদার মনুষ্যত্বসাধনার ধারাই পরবর্ত্তী কালে 'হিন্দু' সমাজে একটা উদার পরমতসহিষ্ণুতার জন্ম দিয়াছে, কারণ সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মেও মনুষত্বসাধনার দিকটাকে 'হিন্দু'সমাজ শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং এই প্রাচীন সমাজধর্ম্মের ঐতিহ্য জাতীয় জীবনে অপ্রকট হইলেও আজিও ফল্গুধারার ন্যায় জীবন্ত। দ্বিতীয় সংশয় উঠিতে পারে, ইহা ত' 'হিন্দু'ধর্ম্মের ব্যাপার, সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায় ও ভারতের সমন্বয়ী জাতীয়তা ইহাকে মানিয়া লইবে কেন? প্রথম কথা, ইহা ঠিক্ 'হিন্দু'ধর্ম্মের ব্যাপার নয় তাহার আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। আসলে ইহা বিশ্বের সমস্ত ধর্ম্মেরই মনুষ্যত্বসাধনার মৌলিক ভাবের সহিত সংযুক্ত। দ্বিতীয় কথা, ভারতে যদি সাম্প্রদায়িক সমন্বয় ঘটাইতে হয়, তাহা একটা অসাম্প্রদায়িক জাতীয় সমাজ সাধনার ভিত্তিতেই সম্ভব এবং এরূপ অসাম্প্রদায়িক জাতীয় সমাজসাধনার ঐতিহ্য আমরা একমাত্র ভারতের প্রাচীন শাশ্বত ধর্ম্মের মধ্যেই পাইতে পারি। বলা বাহুল্য, ইহার অর্থ এই নয় যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, আদিবাসী ইত্যাদি সম্প্রদায়ধর্ম্মের নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত থাকিবে না। ইহার অর্থ, ঐগুলির পাশাপাশি একটি জাতীয় সমাজধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক মনুষ্যত্বসাধনার স্রোতও দেশে প্রবাহিত হইবে। প্রথমোক্তগুলি হইবে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্র, দ্বিতীয়টী হইবে জাতীয় ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্র। দ্বিতীয়টাকে ভিত্তি করিয়া প্রথমগুলির একটা federation বা সংযুক্তিও গঠিত হইতে পারে, যেমন আধুনিককালে রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে কমিউনিজ্‌মের মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া রাশিয়ায় নানা সমাজ-সংস্কৃতির সমন্বয় ও সহাবস্থান সম্ভব হইয়াছে।

প্রাচীনভারতে এইরূপে এক সমাজধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়-সংস্কৃতির সমন্বয় ও সহাবস্থান সম্ভব হইয়াছিল একথা আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। আর এক কথা, ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিতে বিভিন্ন দেশীয ও বিদেশীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়েব এক এক বিশেষ ধারা গৃহীত হইয়াছে ইহা অনস্বীকার্য। বৌদ্ধধর্ম্মের মনস্তাত্ত্বিকতা ও মানবপ্রেম, জৈনধর্ম্মের অহিংসা ও কঠোরতা, অদ্বৈতবেদান্তের জ্ঞানবিচার ও মায়াবাদ, শৈব-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেম-ভক্তিবাদ, ইস্‌লামের ঈশ্বরানুগতা ও সমাজসাম্য, খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্বাস ও জনসেবা, যোগধর্ম্মেব কাযাসাধনা, তন্ত্রধর্ম্মের গুহ্যানুষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি জাতীয় জীবনসংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের সহিত ভারতের আদি শাশ্বত ধর্ম্মের মানবিক সমাজসাধনার বিশিষ্ট ধারাটা যুক্ত না হইলে ভারতের জাতীয় জীবনের মূলে একটা বিরাট ফাক থাকিয়া যাইতেছে। ইহারই জন্য আজ পর্য্যন্ত কোনও বাস্তব ধর্ম্মসমন্বয় বা জাতীয় সংহতি সম্ভব সম্ভব হইতেছে না। জাতীয় জীবন একটা জীবন্ত organism, তাহার কোনও প্রাণাঙ্গ (vital organ) নির্জীব হইয়া থাকিলে সমস্ত দেহটাই নির্জীব ও বিপযস্ত হইয়া থাকিবে।

গত সহস্র বৎসরে ভারতের স্বাধীন জাতীয় জীবনের প্রশ্ন ছিল না বলিয়া এই সমন্বয় ও সংহতির প্রশ্নও দেখা দেয় নাই। আজ স্বাধীন ভারতের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এই প্রশ্নের সমাধানও অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুখের বিষয় এবং আশার কথা ভারতের শাশ্বত ধর্ম্মের সমাজসাধনা একদিকে যেমন অসাম্প্রদায়িক, অপর দিকে তেমনি বাস্তব গৃহ-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি-সমরনীতি ও বিশ্বশান্তিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোনও নূতন মানবিক আদর্শবাদকে তাহা গ্রহণ ও

করিতে পারে, যেমন তাহা পুরাতন বিশ্বাস-রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠানকে বর্জ্জনও করিতে পারে। ভারতের এই শাশ্বত ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম যাহা মানবমুক্তির জন্য যুগে যুগে নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। অপর পক্ষে যদি মনে করা হয়, বর্ত্তমান ঐহিকতার যুগে প্রাচীন যুগের ঐ মনুষ্যত্বসাধনা কঠিন বা অসম্ভব, তবে আমরা বলিব তাহা পাশ্চাত্য ধর্ম্মের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ও ভ্রান্ত। গ্রন্থমধ্যে সেই কথা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

এই আদর্শবাদ, এ যুগের অবশ্য প্রয়োজনীয়ও বটে। ইহা বহির্ম্মুখী জাতীয়তাবাদের স্থলে এক অন্তর্ম্মুখী জাতীয়তা-বাদেরও আদর্শ। বিশ্বের এই চরম আন্তর্জ্জাতিক সংঘর্ষ ও ধ্বংস সম্ভাবনার যুগে ইহার যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। আধুনিক সমাজতন্ত্রের নীতি বলে সমাজের সর্ব্বজনের সর্ব্বাঙ্গীন সুখ ও কল্যাণের জন্য ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণে তাহা সম্যক্ সম্ভব না হইলে সমাজতান্ত্রিক নীতিতে মানুষের মানসিক বা চারিত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও বাদ পড়ে না। মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুখী ও সার্থক করিতে গেলে যে এরূপ ব্যবস্থাও প্রয়োজন তাহা plato-Aristotle হইতে Rousseau পর্য্যন্ত অনেক রাষ্ট্রদার্শনিক মনীষীরও অভিমত। Rousseau, যাঁহাকে এযুগের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এমনকি সাম্যতন্ত্রের জনকও বলা যাইতে পারে, তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিক গঠনের জন্য একপ্রকার 'civil religion' বা নাগরিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। আধুনিক কমিউনিজ্‌মও যে আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য মানুষের চারিত্রিক উন্নতির

প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছে, গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত Lenin ও Kruschov এর কয়েকটী বিশেষ উক্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

ভারতের শাশ্বত ধর্ম্মে মনুষ্যত্বের এই সমাজসাধনা বস্তুটী কি? সংক্ষেপে এখানে আমরা তাহার উত্তর দিতেছি, কারণ গ্রন্থমধ্যে ইহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ত্রিবিধ কামের, অর্থাৎ যৌনকাম, ধনকাম ও জনকাম বা প্রভুত্বকামের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহারই ভিত্তিতে পরিচালিত গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্ত্তব্য পালনের মধ্যদিয়া ক্রমবর্দ্ধমান আনন্দ, শান্তি, শক্তি ও আত্মিক স্বাধীনতার স্তরে উন্নীত হওয়া। চরমে গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনেরও উর্দ্ধে এই স্বাধীনতাকে ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হইয়াছে 'স্বারাজ্য', বা মহামুক্তি। ইহা কোনও 'অবাস্তব' মধ্যযুগীয় রহস্যবাদী ব্যাপার নয় পরন্তু ইহা মানুষের স্বাভাবিক জীবন (ধর্ম্ম), অর্থ নৈতিক জীবন (অর্থ) এবং ভোগজীবন (কাম), এক কথায়, 'ধর্ম্মার্থকাম' এই 'ত্রিবর্গ'-কে লইয়া চরমে 'মোক্ষ' বা 'স্বারাজ্য' লাভ। একথা গ্রন্থমধ্যেও প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অপিচ, এই ত্রিবিধ কাম-নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়াই যে মানুষের সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক 'পাপ' বা চারিত্রিক দোষও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাও ভারতীয় শাস্ত্রালোচনা-প্রসঙ্গে আভাসিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যৌনকাম-সংযমের মধ্যে আলস্য-নিদ্রা-জড়তা-ব্যক্তিগত আসক্তি--মিথ্যা-কল্পনাবিলাস-নীচতা-আত্ম--কেন্দ্রিকতা-মোহ-আত্মবিশ্বাসহীনতা--কপটতা--দুর্ব্বলতা--কাপুরুষতা ইত্যাদি ক্ষুদ্রবৃত্তিরও সংযম নিহিত আছে। ধনকাম-সংযমের মধ্যে স্বার্থপরতা- সঙ্কীর্ণতা- লোভ- ঈর্ষা- মাৎসর্য-অহঙ্কার-দুরাকাঙ্খা-পর-

শোষণ ইত্যাদি দুষ্ট বৃত্তিরও সংযম নিহিত আছে। তেমনি জনকাম বা প্রভুত্বকামের সংযমের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা-ক্রূরতা-হিংসা-ক্রোধ- মদান্ধতা-দম্ভ-পারুষ্য-পিশুনতা-অন্যায়কারি-পরপীড়ন ইত্যাদি অমানুষী বৃত্তির সংযমও নিহিত আছে। সুতরাং ত্রিবিধ কামসংযমের সাধনা মূলতঃ সমাজধর্ম্মী মানবিক চরিত্রেরই সাধনা। মহাভারতের মতে এক 'সত্য' তের প্রকার ইহা এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং ইহা মধ্যযুগীয় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি-সাধনা মাত্র নয়, ইহা বাস্তব সমাজ-সাধনাও বটে। ইহাই প্রাচীন শাশ্বতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই সাধনায় ঐ ত্রিবিধ কামসংযম পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এজন্য একটাকে বাদ দিয়া অপরগুলির সাধনা ঐ দৃষ্টিতে মিথ্যা ও অবাস্তব। ইহারই জন্য ধনকাম-প্রভুত্বকাম নিবারণের মূলে যৌনকামকেও যদি নিরস্ত করা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে ব্যাপারটাতে সত্যজীবনের সাধনা নাই। তেমনি যৌনকাম-প্রভুত্বকাম-নিবারণের মূলেও যদি ধনকাম থাকে তবে তাহাও একটা ব্যর্থসাধনা বুঝিতে হইবে। ধনকাম-যৌন-কামেরও নিয়ন্ত্রণের মূলে প্রভুত্বকামের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এইভাবে বাস্তব সমাজজীবনে মানুষ গড়িয়া তোলাই ছিল সে যুগের জাতীয় চরিত্রসাধনা। এই চরিত্রসাধনা কেমন করিয়া প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীতে সম্ভব হইত তাহা গ্রন্থমধ্যে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই ছিল সে যুগে ধর্ম্মেরও সংজ্ঞা, কারণ public life বা জনসাধারণের জীবনকে যাহা কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে ধারণ করিয়া থাকে তাহাই ধর্ম্ম – 'ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ' (মহাভারত)। রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রপরিচালকগণের ক্ষমতাপ্রিয় কর্তৃত্বের পরিবর্ত্তে মানবিক নীতির নিয়ন্ত্রণে ইহা ছিল পুরাপুরি 'রিপাবলিকান্' আদর্শ।

এমন কি শাস্ত্রীয় ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রেও ভারত শুদ্ধ যুক্তিবিচারের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছে (মহাভারত, বৃহস্পতি), অশুদ্ধ, অন্ধ আনুগত্যের উপর জোর দেয় নাই। কালোপযোগী পরিবর্ত্তিত রূপে শাশ্বত ধর্ম্মের নীতি আধুনিক যুগের ক্ষেত্রেও আজ প্রযোজ্য ও প্রয়োজনীয়।

এই সমাজসাধনার মধ্য দিয়াই সেযুগের মানবধর্ম্মী রাষ্ট্রের 'নাগরিক' গঠিত হইত। সুতরাং শিক্ষা আজিকার মত ব্যক্তিগত ও স্বার্থমুখী না হইয়া আদর্শ সমাজমুখী ও রাষ্ট্রমুখী ছিল। এই ব্যাপক জাতীয় শিক্ষাকেই সেযুগে সাধারণভাবে বলা হইত 'ব্রহ্মচর্য'। 'ব্রহ্ম' অর্থে বৃহৎ, মুক্ত জীবন। সমগ্র সমাজ-জীবনের মধ্য দিয়াই এই বৃহৎ, মুক্ত জীবনের সাধনা চলিত। তাহারই অনুকূল আচরণ ও শিক্ষাসাধনাই ছিল 'ব্রহ্মচর্য'। 'ব্রহ্ম' অর্থে 'বেদ' ধরিলেও তৎকালীন সমাজ জীবনের নিয়ামক বেদপাঠের সহিত গুরুগৃহের নিয়ন্ত্রিত জীবনচর্যাই ছিল 'ব্রহ্মচর্য'। সুতরাং এই দৃষ্টিতেও ইহা ছিল সমাজমুখী শিক্ষাসাধনা। এই মানবধর্ম্মী সমাজ ও রাষ্ট্রের শিক্ষাসাধনাকে এজন্য 'জাতীয় ব্রহ্মচর্য সাধনা' নাম দেওয়াই সমীচীন এবং গ্রন্থমধ্যে এইভাবেই আমরা তাহাকে অভিহিত করিয়াছি। ইহা কোনও চরমপন্থী 'সাধু-সন্ন্যাসী'র মুক্তিসাধনা নয়, ইহা জাতীয় জীবনসাধনার একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, ইহাতে অবাস্তব বা অসম্ভবও কিছু নাই।

দেশের ও বিশ্বের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শাশ্বতধর্ম্মের এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আজ অনিবার্য প্রয়োজন। ইহারই অভাবে নিছক রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের আন্দোলন আজ ক্রমাগত বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিতেছে। ইহার ফলে সর্ব্বদেশে

একটা মোহভঙ্গের নৈরাশ্য ও cynicism বা সভ্যতাবিদ্বেষও ব্যাপকভাবে দেখা দিতেছে। শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যখন বিশ্বের 'জনমত' একটা সুস্থ, মানবিক আদর্শবাদের দাবী লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইবে। তখনই ভারতের এই শাশ্বত ধর্ম্মের 'জাতীয় পরিকল্পনা' নিজ মহিমায় নূতন রূপে বিশ্বের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবে। আজ ভবিষ্যতের সেই অনিবার্য সম্ভাবনার সম্মুখীন হইবার প্রস্তুতির সময় আসিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই প্রস্তুতির উদ্দেশ্য লইয়াই রচিত।

সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা, 'চরিত্রসুরক্ষা, যোগসাধনা ইত্যাদি যে সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া প্রচলিত ব্রহ্মচর্যসাধনার গ্রন্থাদি লিখিত হয়, এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গী তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ঐরূপ ব্রহ্মচর্যসাধনার খুঁটিনাটি নিয়মপ্রণালী লইয়া যাঁহারা বিশেষ আগ্রহান্বিত তাঁহারা প্রচলিত অনেক গ্রন্থেই তাহা পাইতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক, বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে অতি কমসংখ্যক ব্যক্তির জীবনেই উহাদের কোনও কার্যকারিতা দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে একটা মানসিক প্রতিক্রিয়াও উপস্থিত হইতে পারে। আর যাহাদের জীবনে কিছু বা সফলতা ঘটে তাহাও মধ্যযুগীয় ভাবে ভাবিত, অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সমাজ, জাতি বা বিশ্বের বৃহত্তর মহাজীবনের মহামুক্তির সহিত তাহা যুক্ত নয়। সুতরাং তাহাকে ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম্মের ব্রহ্মচর্যসাধনা বলা যায় না।

ব্যাপক ও সার্থক ব্রহ্মচর্যসাধনার জন্য যাহা মৌলিক প্রয়োজন তাহা সমাজজীবনে ও জাতীয়জীবনে একটা 'অনাসক্ত কর্ম্ম'-স্রোত প্রবাহিত করা। এই 'অনাসক্ত কর্ম্ম' কোনও উদ্দেশ্য-

হীন কর্ম্ম, লৌকিক পরোপকার অথবা সম্প্রদায়ধর্ম্মী সৎকার্য মাত্র নয়। ইহা একটী positive বা তত্ত্বাচক জীবনসত্য ও জীবন-নীতি। যে পরমশূন্যের মহাসত্যে ভারতের শাশ্বতধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ইহা তাহারই অনুবর্ত্তন। মহাভারতে ব্রহ্মচর্যকে 'নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ' বলা হইয়াছে। ইহা মধ্যযুগীয় জ্ঞানযোগের বা অদ্বৈতবিচারের 'নির্গুণ' নয়, ইহা বৈদিক অতিবাস্তব পরমনির্গুণ যাঁহার মধ্যে তপস্যার বা আত্মলয়ের ফলে এই জগৎ-জীবনের নিত্য উৎপত্তি-স্থিতি-গতি। 'অনাসক্ত কর্ম্ম' জীবনের ঐ মূল উৎসের সহিত যোগরক্ষা করিয়া চলা, যাহার ফলে বাস্তব জীবনের সব কিছুই পরমসমাধানের মহাসার্থকতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাই শাশ্বত ধর্ম্মের 'বৈজ্ঞানিক' জীবনদর্শন। এই জীবনপূর্ণতা-সাধক অনাসক্ত কর্ম্মের জন্য যে ত্যাগ-তপস্যা-সংযম-নিয়ন্ত্রণ তাহাই ভারতের জাতীয় ব্রহ্মচর্য। ইহাই প্রকৃত বিশ্বকল্যাণসাধনা। সর্ব্বসম্প্রদায়ের, সকলদেশের সকল মানুষের কল্যাণ হোক্, সকলে সুখী হোক্—'সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ'—ইহাই তাহার অন্তরের প্রার্থনা।

বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্ম্মে যেমন ভক্তির স্রোতে ইন্দ্রিয়সংযম ও রিপুদমন সহজসাধ্য হইয়া উঠে বলা হয়, ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম্মের নীতিতে তদ্রূপ আদর্শ জাতীয়জীবনের স্রোতে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য-সাধনা ব্যাপক, স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া উঠে। এবং যেহেতু ইহা বাস্তব গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্রজীবনের মধ্য দিয়া পরমসত্যের সাধনা, সেইহেতু গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্রজীবনের একটা নূতন 'দার্শনিক' সিদ্ধান্তও ইহার মধ্যে আছে। এবং স্বভাবতঃই আধুনিক বিশ্বের যে রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞান আজ ভারতের কৃত্রিম জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত

করিয়া পরিচালিত করিতেছে তাহারই মধ্য দিয়া পথ কাটিয়া এই নূতন 'জীবনদর্শন'কে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সর্ব্বব্যাপী অবিশ্বাসের যুগে এই নূতন 'জীবনদর্শন'কেও সেইজন্য নূতন যুক্তি-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। বর্ত্তমান গ্রন্থে মহাসত্য পরমগুরুতত্ত্বের প্রেরণায় সেই গুরুকার্যে হাত দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোনও কোনও জাতীয় নেতা বা দেশসেবক তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে যৌনকাম-সংযমমূলক ব্রহ্মচর্যের উপর জোর দিয়াছেন বটে, কিন্তু যৌনকাম-ধনকাম-লোককামসংযমের জাতীয় ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত সমাজসাধনা বা জাতীয় জীবন-সাধনার বিষয়ে কেহ চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এবং যেহেতু এইরূপ একটা 'জীবনদর্শন' ভারতীয় জাতির সমগ্র ইতিহাসের বিবর্ত্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত সেজন্য গ্রন্থমধ্যে এই বিবর্ত্তনের ইতিহাসও চিত্রিত করা হইয়াছে। সমগ্র-ভাবে এই ত্রিবিধ কামনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটাকে আধুনিক জীবতত্ত্ব (biology), শরীরতত্ত্ব (physiology), মনস্তত্ত্ব (psychology), রাষ্ট্রতত্ত্ব (political science), অর্থশাস্ত্র (economics), সমাজতত্ত্ব (sociology), ভারতীয় ও অভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র (scriptures), দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য (literature), দর্শন ও তত্ত্বদর্শন (philosophy and metaphysics) ইত্যাদি বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়াও মৌলিকভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে আসা হইয়াছে। বিভিন্ন ভারতীয় ধর্ম্মীয়-দর্শনের চিন্তাধারা ও তন্ত্রাদি গুহ্যসাধনার রহস্যও আলোচিত হইয়াছে। তৎসহ কামসূত্র এবং বিশেষভাবে পাশ্চাত্য যৌনকামতত্ত্ববিৎ ফ্রয়েড (Freud), হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis) ইত্যাদি পণ্ডিতগণের মতও মৌলিক দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে। একটা বিশ্বজনীন জীবনদর্শনের

ভিত্তিতেই ভারতীয় জাতীয় জীবনের শাশ্বত আদর্শ ও নীতির প্রচার-প্রসার-প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেই নূতন জাতিগঠন ও বিশ্বগঠনের অর্দ্ধেক কাজই হইয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এজন্য কোনও বিশেষ ধর্ম্মীয় বিশ্বাস বা মতবাদকে এখানে বড় করা হয় নাই। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বদৃষ্টিতেই সব বিচার করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি আলোচিত বিষয়গুলি এমনই ব্যাপক ও পরস্পর জড়িত যে সেগুলিব বিশদ আলোচনা বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। যথা, রাজনীতি ও অর্থনীতির নানা তথ্যঘটিত আলোচনা প্রথম অধ্যায় ছাড়া তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যেও বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে, শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের আলোচনাতে দ্বিতীয় অধ্যায় ছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়েও বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই 'জীবনদর্শন' প্রাচীন ভারতের মহাগৌরবময় যুগে এক রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা সমর্থিত ছিল এবং সেজন্যই তাহা সহজে সম্ভব হইত, একথা ঠিক্। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে কেমন করিয়া সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমান কালের জীবন নানা দিকে নানা ভাবে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই যুগ প্রধানতঃ ঐহিকতার যুগ, আধ্যাত্মিকতার যুগ নহে। সুতরাং সে দিক্ দিয়াও কেমন করিয়া সেই প্রাচীন যুগের আদর্শ জীবনধারা এ যুগে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে এ প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। তাহার উপর, এই সদা-পরিবর্ত্তনশীল ও ক্রমবিবর্ত্তনশীল জগতে ভারতের বা কোনও দেশের পক্ষে তাহার পুরাতন যুগের কথা কোনও অগ্রগতির মনোভাব নয় বলিয়াও মনে

হইতে পারে। প্রশ্নগুলির যুক্তিসঙ্গত উত্তর এই যুগ-আন্দোলনের সাকল্যকল্পে হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্রশক্তি গণশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতেও তাহাই ছিল। তবে এ যুগের গণতন্ত্রের ও রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্তে গণধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মই সে যুগে প্রবল ছিল, এবং মূলতঃ দুইই ছিল একই আদর্শের অনুবর্ত্তী ('অমৃতের পথে' পৃঃ ১৮৫-২০০ দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রশক্তি 'public opinion'-এর দ্বারা প্রভাবিত। এই 'public opinion'-এর আলোচনা-সূত্রে চিন্তাশীল লেখক James Bryce এক শ্রেণীর মানুষের কথা বলিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষাৎ রাজনীতির সহিত খুব বেশী সংশ্লিষ্ট নহেন, অথচ যাঁহারা 'public opinion'-এর জন্মদাতা না হইলেও রূপদাতা। কোনও শাসকগোষ্ঠী এই রূপায়িত জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারে না (Modern Democracies, pp : 176-182 দ্রষ্টব্য)। এক নূতন বাস্তব সমাজধর্ম্ম আজও এই জনমতকে এক আদর্শ নূতনরূপে রূপায়িত করিতে পারে। রাজনীতির ক্ষেত্রে না আসিয়াও তাহা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এইরূপ সমাজশক্তিকেই এ যুগে রাষ্ট্রসমর্থনের বিকল্পরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এ যুগের রাষ্ট্রশক্তির মারাত্মক সর্ব্বগ্রাসিতা (totalitarianism) যাহা রাষ্ট্র-নীতিবিদ্‌দেরও বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছে ('অমৃতের পথে', পৃঃ ৬৬৭-৭৫ দ্রষ্টব্য), তাহারও প্রতিকার করিতে পারে এক সুস্থ স্বস্থ সমাজশক্তি,—রাষ্ট্রশক্তি নয়। গণতন্ত্রের নামে আধুনিক পার্টিতন্ত্রের ব্যাধিরও ইহাই একমাত্র প্রতিষেধক। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটীর সম্বন্ধে বলা যায় এ যুগ ঐহিকতার যুগ হইলেও একটা 'humanism' বা মানবিকতারও যুগ। নূতন সমাজধর্ম্মের

প্রভাবে এই ঐহিকতাও আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত হইতে পারে। তৃতীয় প্রশ্নটীরও এখন উত্তর পাওয়া যাইবে। ভারতের প্রাচীন সমাজধর্ম্মের এক নবরূপায়ণের অর্থ কোনও পুরাতন যুগে ফিরিয়া যাওয়া নহে।

সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সমাজে এক নূতন ও বাস্তব জীবনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন। 'A changed society and an unchanged individual cannot go together', অর্থাৎ 'পরিবর্ত্তিত সমাজ ও অপরিবর্ত্তিত মানুষ একসঙ্গে চলিতে পারে না' রাষ্ট্রপতির একথা খুবই সত্য। James Bryce গণতন্ত্রের সাফল্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'with that comes the question of what religion will be in the future', অর্থাৎ—'ধর্ম্ম ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে সেই প্রশ্ন এই সঙ্গে আসিয়া যায়' (Modern Democracies, Vol II, p : 666)। আমরা বলিতেছি ভারতের প্রাচীন শাশ্বতধর্ম্ম ভাবীযুগের ধর্ম্মের সেই নূতন রূপ।

যৌনকাম-সমস্যার সমাধানকে Havelock Ellis আগামী যুগের প্রধান সমস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যৌনজীবনকে বুঝিতে না পারিলে আমরা জীবনকেই শ্রদ্ধা করিতে শিখিব না, কারণ ইহাই জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যা (Sex and Marriage, p : 12 দ্রষ্টব্য)। Ellis যে অর্থেই বলুন, কথাটী খুবই সত্য যে যৌনকামের কোনও সঠিক দর্শন না থাকায় আজ মানুষও জীবনের উপরই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যৌনকামই জীবনের কেন্দ্রদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অথচ তাহার কোনও যৌগিক-দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বনিরূপণ নাই ইহাই এ যুগের

সর্ব্বাপেক্ষা বড় ট্র্যাজিডি। মানুষ একযুগে দৈহিক মৃত্যুর সমস্যাকে লইয়া চিন্তিত হইয়াছিল এবং তাহারই ভিত্তিতে স্বর্গের সাধনায় ব্রতী হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের জীবনদর্শন খাড়া করিয়াছিল। এ যুগের মানুষ দৈহিক মৃত্যুতে ততখানি ভীত নয়, কিন্তু প্রাণিক মৃত্যুই তাহার দুর্বিষহ। একটা স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন জাগতিক জীবনের মধ্যেই সে সেই স্বর্গের আস্বাদ পাইতে চায়। কিন্তু তাহার এই জাগতিক জীবনকে সাক্ষাৎভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে যে যৌনকাম তাহার সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক্ দিয়া সে কিছুই জানে না। এই নিদারুণ অভাব পূরণ করিবার জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থে মানুষের যৌনকামজীবনের রহস্য নির্ণয়ে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দাবী আমাদের নাই, কিন্তু একটা প্রাথমিক পথপ্রস্তুতির প্রচেষ্টা হিসাবে ইহা সুধীজনের সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যৌনকাম একটা পৃথক্ শক্তি নয়। ইহা প্রধান ও কেন্দ্রীয় হইলেও ধনকাম ও প্রভুত্ব-কামের শক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এবং সেজন্য ত্রিবিধ কামনিয়ন্ত্রণই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ও বিশ্বজনীন ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা। এই সাধনা শুধু ব্যক্তিগত নহে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ও বটে। সেজন্য সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনসমস্যার সমাধানও বর্ত্তমান গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই সমাধানের পথই বাস্তব জীবনে অমৃতত্বের পথ, এ যুগের জীবনসমস্যার সমাধানের পথ। প্রাচীন ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম্মের ইহা নূতন রূপ।

প্রাচীন ভারতীয় শাশ্বত সমাজধর্ম্মের নেতা, শিক্ষাদাতা ও ও পরিচালক ছিলেন দেশব্যাপী অজস্র ঋষি ও আচার্য। ইঁহারাই

ছিলেন জাতীয় জীবনের রূপকার। বাচনিক শাস্ত্রশিক্ষাদান ছাড়া তাঁহাদের তপস্যাপূত জীবনই ছিল ঐ জাতীয় সমাজধর্ম্মসাধনার মূল উৎস। আজ দেশে সেই ঋষিকুল নাই। কিন্তু আশার কথা দেশে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা গুরু-মহাপুরুষ রহিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটা মর্ম্মান্তিক সত্য যে তাঁহাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও জাতীয় চরিত্রের উদ্বোধন আজিও ঘটে নাই। ইহার কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি এখনও প্রধানতঃ মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠানের ভাবে ভাবিত আছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে একটা সম্মিলিত জাতীয় জীবনসত্তা আজিও অনুভূত ও কার্যকরী হয় নাই। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তার বিধানে আজ তাহার সময় আসিয়াছে নচেৎ কাহারও আর নিস্তার নাই দেশের ও বিশ্বের এই নিদারুণ ধর্ম্মসঙ্কটের সময় সম্মিলিত শক্তিই একমাত্র পরিত্রাণের পথ। ইহার অর্থ বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব ক্ষেত্রে ও বৈশিষ্ট্য থাকিবে না তাহা নহে, কিন্তু এক সমষ্টিগত বিরাটের ক্ষেত্রেও সকলকে মিলিত হইতে হইবে। বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায় দেশ-জাতি-সমাজ-বিশ্বের উদ্ধারসাধন করিবে সে যুগ অতীত হইয়াছে। বিখ্যাত বিশ্ব-ঐতিহাসিক Arnold Toynbee সত্যই বলিয়াছেন—'The alternative to the destruction of the human race is a world-wide social fusion of all the tribes, nations, civilizations, and religions of man.'—'মনুষ্যজাতির ধ্বংস হইতে পরিত্রাণের একমাত্র পথ মানুষের সমস্ত উপজাতি, জাতি, সভ্যতা ও ধর্ম্মের একটা বিশ্বব্যাপী সামাজিক সংযোজন।' (World Aflame, Billy Graham, p : 210 দ্রষ্টব্য)। নিজ নিজ গুরু-সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ সাধক

হইয়াও জাতীয় জীবনধর্ম্মের বাস্তব ক্ষেত্রে সকলেরই মিলিত হওয়া আজ সম্ভব। প্রাচীন ভারতে তাহাই ছিল। এই ভাবমুখিতার কিছু নিদর্শন আমরা গ্রন্থমধ্যে দিয়াছি (পৃঃ ৮১-২ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে প্রশ্নোপনিষদের শেষে তরুণ শিষ্যগণের গুরুবন্দনার সহিত দেশের ঋষিধারার বন্দনাও তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা সকল গুরুকে স্বীকারের বা শ্রদ্ধার প্রশ্নমাত্র নয়। সমগ্র গুরুতত্ত্ব যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত সেই মহাসত্য পরমগুরু সর্ব্বনিয়ন্তার প্রবর্ত্তিত জাতীয় জীবনধর্ম্মে ইহা সম্মিলিতভাবে যোগদানের কথা।

ভারতীয় শাস্ত্রে পরমগুরু পরমতত্ত্বের বন্দনার কথাও আছে। বলা বাহুল্য 'হিন্দু'ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই মহামিলন সাধিত হইলে অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষেও মিলনের পথ সুগম হইবে তথা মিলনের আহ্বানও সার্থক হইবে।

গ্রন্থে পূজ্যপাদ বিভিন্ন সাধুসন্ত-গুরুমহাপুরুষের ভাবধারা ও বাণীর উল্লেখ করা হইয়াছে কারণ তাহা হইতে আমরা বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি ইহা বক্তব্য যে গ্রন্থের চিন্তাধারা, বিচার ও সিদ্ধান্ত আমাদেব নিজস্ব, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সম্পাদায় বা সংস্থার মতামতের সহিত তাহারা সংশ্লিষ্ট নহে।

দেশীয় ও বিদেশীয় বহু মনীষী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ ও লেখকের উক্তি আলোচনা-সূত্রে গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং যথাস্থানে তাহা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থেব উল্লেখসহ স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের সকলের নিকট সকৃতজ্ঞভাবে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থে বর্ণিত জীবনদর্শন অদূর-ভবিষ্যতে গৃহীত হওয়ার কোনও ভ্রান্ত আশা গ্রন্থকার পোষণ

করেন না। কিন্তু অনতিদূর ভবিষ্যতে বিশ্বভারতকে এই জীবন-দর্শনের পথে আসিতে হইবে ইহা গ্রন্থকারের সুদৃঢ় ও সুচিন্তিত ধারণা ও বিশ্বাস। অবশ্য এই জীবনদর্শন কোথায় কেমন বাস্তবরূপ গ্রহণ করিবে তাহা ভবিতব্যের হাতে। কিন্তু শাশ্বত ধর্ম্মের দেশ ভারতবর্ষে ইহার প্রচার-প্রতিষ্ঠা-অনুশীলনের সময় অবশ্যই আসিয়াছে। ইহা সর্ব্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তাঁহারই কৃপাপ্রেরণায় এ যুগের দুঃখবিদীর্ণ, সংশয়সমাকুল মরণপথযাত্রী মানবতার অমৃতের পথে যাত্রা আরম্ভ হউক, এই প্রার্থনা। ওঁ শম্।

ইতি—

গ্রন্থকার।

প্রথম অধ্যায়

রাজনীতি ও অর্থনীতি।

যদি প্রশ্ন করা যায়, মানুষ কি চায়, তবে সকলেই বলিবে, সুখ-শান্তি-শক্তি-স্বাধীনতা। কিন্তু বর্ত্তমান কালের মানুষ মনে হয় আরও বেশী কিছু, বিশেষ কিছু চায়। সে যেন সর্ব্বদাই সুখ-শান্তি-শক্তি-স্বাধীনতার উত্তেজনা পাইতে চায়। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, বর্ত্তমান যুগে মানুষের চেতনায় এমন একটা বিরাট ফাঁক দেখা দিয়াছে যাহার পূরণের জন্য মানুষকে সর্ব্বদাই সুখ-শান্তি-শক্তি-স্বাধীনতার পিছনে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। মানুষের মন যে এখন সর্ব্বদাই এক অসুখ-অশান্তি-দুর্ব্বলতা ও বন্ধনের চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে, ইহা তাহারই বহির্লক্ষণ। ইহারই প্রতিকারের আশায় মানুষ সর্ব্বদা রাজনীতি-অর্থনীতি লইয়া মত্ত হইয়া থাকিতে চায়, যেন রাজনীতি-অর্থনীতির হাতেই তাহার নিত্য সুখ-শান্তি-শক্তি-স্বাধীনতার চাবিকাটী রহিয়াছে।

মানুষের মনে আজ এক আমূল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। পুরাতন আধ্যাত্মিক কোনও সমাধানে সে বিশ্বাস করে না। তাহার কারণ, নিজের আত্মাতেই তাহার বিশ্বাস নাই।

মনের এই আত্মহারা সর্ব্বগ্রাসী অভাববোধই এ যুগের প্রধান ব্যাধি।

প্রচণ্ডভাবে বহির্ম্মুখী, বিক্ষিপ্ত মানুষের মন, আজ নিজের ছায়াচিত্র বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া তাহারই উপর চিত্তকে একাগ্র করিয়াছে। ফলে, সর্ব্বদাই অন্তরের হাহাকারের উপর চলিতেছে জীবনের বিচিত্র খেলা। সেই খেলা দেখিয়াই মানুষ সুখ-শান্তি-শক্তি-স্বাধীনতা পাইবার কল্পনাবিলাসে মত্ত আছে। ইহাকেই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরাম্ উন্মত্তভূতং জগৎ।" অর্থাৎ,—"মোহময়ী প্রমোদমদিরা পান করিয়া জগৎ উন্মত্ত হইয়া আছে।" কি এই প্রমোদমদিরা? সর্ব্বদাই বাহ্য বিষয়ে "স্ফূর্ত্তি" লইয়া চলিবার উদ্দাম আকাঙ্খা ও উন্মাদ প্রচেষ্টা! ইহারই তিনটি প্রধান রূপ,—কামলালসা, ধনলালসা, প্রভুত্বলালসা। দেহমনোবুদ্ধির সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া মানুষ আজ এই লালসার অনুশীলনে মাতিয়াছে। ইহাকেই সে আত্মানুশীলন ভাবিতেছে। এই আত্মহীন আত্মানুশীলন এক নবযুগের ছিন্নমস্তা বৃত্তি! ইহা নিজেকে নিঃশেষে নিষ্পেষিত করিয়া নিজের রক্ত নিজেই পান করিতেছে!! কিন্তু প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। মানুষ প্রতিকারের পথ খুঁজিতেছে।

বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নূতন পথ ও উপায় নির্ণয়ের জন্য আমরা বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারতযুগের ভারতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানের ভারতীয় জীবনকে তুলনামূলকভাবে দেখিবার চেষ্টা করিব। আমরা একথা বলি না যে প্রাচীন যুগে সবই

ভাল ও নিখুঁত ছিল। পার্থিব মানুষের জীবন চিরদিনই দোষত্রুটী-যুক্ত। গীতায় একথা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে,—"সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" (গীতা ১৮।৪৮)। অর্থাৎ—"সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টাই ধূমে আবৃত অগ্নির মত দোষে আবৃত।" সুতরাং বাস্তববাদী ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আলোচনায় প্রাচীনের উপর কল্পনাবিলাসের কোনই স্থান নাই। বর্ত্তমানে মানুষের সভ্যতা অনেক বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী প্রত্যক্ষ সত্য যে জীবনের মূল বিষয়টি আমরা হারাইয়াছি। সুতরাং, আধুনিক সভ্যতাকে সমূলে বর্জ্জন করিয়া আমরা প্রাচীন-যুগে ফিরিয়া যাইতে চাই তাহা নহে, কিন্তু আমরা জীবনের তীব্র অভিজ্ঞতার বিচারে সেই মূল বিষয়টিকে ফিরিয়া পাইতে চাই। আজ বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারতযুগের ভারত-ধর্ম্মের দিকে আমরা ফিরিয়া তাকাইতেছি এই জন্য যে সে যুগে বর্ত্তমানের মতই বাস্তবজীবনের যাবতীয় সুখ-দুঃখ-সংগ্রাম-সংঘর্ষের ভিতরেই এমন একটি সত্য বস্তুকে মানুষ ধরিয়াছিল যাহার ফলে নিত্য সুখ-শান্তি-শক্তি-স্বাধীনতার পথে নিত্য অভিযানই ছিল জীবন এবং এই জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল গৃহে, সমাজে ও রাষ্ট্রে। সুতরাং সে যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি ও গার্হস্থ্য-নীতির মধ্যে কোনও ফাঁক ছিল না। আজ সেই জীবনের সত্য বস্তুটিকে আমরা ফিরিয়া পাইতে চাই।

কেন আমরা এরূপ আশা করিতেছি? কারণ অতি সরল। রিপু-ইন্দ্রিয়ের অধীনতাই মানুষের জীবনকে পরাধীন, বিভ্রান্ত

করিয়া তোলে। ইহাকেই গীতায় "পরধর্ম্ম" বলা হইয়াছে এবং ইহাকে "ভয়াবহ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাই আত্মার স্বাধীন আলোক আচ্ছন্ন করিয়া দেহচেতনার আবরক অন্ধকার বিস্তার করে। এই দেহচেতনাই মন। এই মনই রিপু-ইন্দ্রিয়ের আধার। এই মনের কেন্দ্রস্থলে যে বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহাও এই রিপু ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া কাজ করে। এই জন্য গীতায় বলা হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে" (গীতা, ৩।৪০) অর্থাৎ,—"ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই তিনটিই কামের অধিষ্ঠান।" এবং "এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষঃ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্"(গীতা,৩।৪০)। অর্থাৎ,—"এইগুলির দ্বারা কাম দেহধারী মানুষকে বিমোহিত করে"; তাহার সত্য, সহজ, সরল, স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। তথাকথিত যুক্তিবিচার (Reasoning) কামের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং কামাচ্ছন্ন বুদ্ধি দিয়া বিচারশীল মানুষ নিজের ও অপরের উপর, তথা সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের উপর অবিচারই করে। নানা ভাল কথা, ভাল মতবাদের ছদ্মবেশে এই রাক্ষসী বুদ্ধিবিচার মনুষ্য সমাজে বিচরণ করে। ইহার কবলে পড়িয়া মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, তথা বিশ্বজীবনে নানা যুক্তি-জাল বিস্তার করিয়া নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করে; সুখের নামে অসুখ, শান্তির নামে অশান্তি, উপকারের নামে অপকার, মৈত্রীর নামে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ও বৃদ্ধি করে। বর্ত্তমানের রাজনীতি, অর্থনীতি, এইভাবেই "জনকল্যাণ" সাধন করিতেছে। এইভাবে শিক্ষিত সভ্যমানব আজ আত্মার

সত্য ও সারল্যের পরিবর্ত্তে বুদ্ধির মিথ্যা ও চাতুর্য্য লইয়া সগর্ব্বে বিচরণ করিতেছে। এই বিষ রাজনৈতিক জীবন হইতে আজ সমাজ-গৃহ-পরিবারকেও আশ্রয় করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনেও আজ সর্ব্বত্র Diplomacy বা কূটনৈতিক আচরণই প্রধান ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে রাজনীতি-অর্থ নীতির সর্ব্ববিধ অগ্রগতির তলায় আজ ব্যক্তিমানব নিষ্পেষিত। অথচ, এমনি এই রাজনীতি-অর্থনীতির সম্মোহ, ব্যক্তিমানব আজ এমনি আত্মবিস্মৃত যে, যে শৃঙ্খল তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাকেই সে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাই রাজনীতি-অর্থনীতিই হইয়া উঠিয়াছে আজিকার ধর্ম্ম। ইহাকেই গীতায় বলা হইয়াছে "তামসী বুদ্ধি", যাহা "সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ"— সব কিছুকেই উল্টা করিয়া দেখে, অসত্যকে সত্য, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, ও প্রতিকারের উল্টাপথ ধরিয়া চলে।

ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে ব্যক্তি ও জাতির জীবনের মধ্যে কোনও মৌলিক সংঘর্ষ বা বিরোধিতার স্থান নাই। রাষ্ট্র বা রাজশক্তির সহিত ব্যক্তি বা সমাজের কখনও কখনও সংঘর্ষ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাময়িক। তাহার উদ্দেশ্য বিপথগামী, অধর্ম্মাচারী, অত্যাচারী রাজশক্তির পরিবর্ত্তে আদর্শ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাকল্যাণসাধক রাজশক্তিকে স্থাপিত করা। কিন্তু এই যে রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্তি, ইহাও ব্যক্তিশক্তি ও সমাজশক্তির একটি অংশ মাত্র। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে যদি মুক্তজীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে জাতীয় জীবনেও তাহা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ইহারই জন্য নিছক রাষ্ট্রীয়

বা রাজনৈতিক রাজ্যজয় বা বিশ্বজয় ভারতীয় ঋষিপ্রজ্ঞার আদর্শ ছিল না। বিশ্বকে আর্য্যসংস্কৃতিতে রূপায়িত করার আকাঙ্খা সেই যুগে থাকিলেও, তাহা কোনও রাজনৈতিক অর্থে প্রযোজ্য ছিল না। রাজসূয়, অশ্বমেধ ইত্যাদি যজ্ঞের মধ্য দিয়া রাজ-চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ রাজধর্ম্মের একটি আদর্শ হইলেও তাহা প্রধান আদর্শ ছিল না, সমাজধর্ম্মকে রক্ষাই ছিল প্রধান দায়িত্ব। এই সমাজধর্ম্ম ছিল মানুষকে প্রকৃত সুখ-শান্তি-শক্তি-স্বাধীনতা দিবার একটি বিরাট যন্ত্র। সমাজধর্ম্ম ছিল ব্যক্তিধর্ম্ম ও ব্যক্তি-জীবনের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য আদর্শ ব্যক্তি-জীবনই ছিল সব কিছুর নিয়ন্তা। আর স্থিতপ্রজ্ঞ ঋষির হাতে এই ব্যক্তিচেতনা গঠিত হইয়া সমাজের আদর্শরূপে বিরাজ করিত।

এই কারণেই কালক্রমে ভারতভূমিতে ভারতীয় জাতীয় জীবনকে আদর্শরূপে গড়িয়া তোলাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল—রাজনৈতিক, ধার্ম্মিক বা সাংস্কৃতিক অর্থে পরদেশ জয়ের দিকে ভারতীয় জাতীয় চেতনা মনোযোগ দিবার অবসর পায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিয়া বিশ্বে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের ভূমিকা ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং দায়িত্ব এ যুগে আরও বিরাট ও ব্যাপক।

পাশ্চাত্য 'Crowd Psychology' বা জনতা মনো-বিজ্ঞানে যে জনমনের ধারণা করা হইয়াছে তাহা ভারতীয় জনমনের আদর্শের বাহ্যিক স্থূল ছায়ামূর্ত্তি মাত্র। ব্যক্তি

মানুষ সেখানে জনমনের অধীন এক ক্ষুদ্র নগণ্য যান্ত্রিক অংশ। সেজন্য তাহা নিষ্প্রাণ, জড়চৈতন্যময়। তাহাতে মুক্ত আত্মার স্বাধীনতা নাই। এই জড়চৈতন্যময় ব্যক্তির বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির স্বাধীনতাকেই এজন্য পাশ্চাত্য জগতে ব্যক্তিস্বাধীনতা নাম দেওয়া হইয়াছে। এবং এইরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথায় নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ভারতীয় ঋষিপ্রজ্ঞায় যে ব্যক্তিস্বাধীনতার রূপ ধরা দিয়াছে, তাহা ব্যক্তিরই মধ্যে মহাব্যক্তির চেতনা। এই মহাচেতনাকে বলা হয় আত্মা।

প্রত্যেক ব্যক্তির মহাচেতনাই সমাজ ও জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক। এজন্য ব্যক্তির মধ্যেই সমাজ ও জাতি। ব্যক্তি সমাজের অংশ নয়, সমাজই ব্যক্তির একটি বাহ্যিক প্রকাশ। সুতরাং ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভ হইলে সমাজ ও জাতীয় জীবনে সে স্বাধীনতার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। সেই সমাজ ও সেই জাতিই সেই পরিমাণে স্বাধীন যাহার মধ্যে যে পরিমাণে ব্যক্তির মুক্তস্বভাব প্রকাশলাভ করে। ইহাই ভারতীয় মতে সত্যকার জাতীয় স্বাধীনতা। তাহা অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতির দান নহে। সুতরাং তাহা অর্থ বা রাষ্ট্রের দাসও নহে। রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযমের উপরেই এই ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। ইহাই ভারতীয় জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা। ভারতীয় ঋষিদৃষ্টিতে এইরূপ ব্যক্তিস্বাধীনতাই সমাজজীবনে ও জাতীয়জীবনে প্রকৃত মুক্তি ও অভ্যুদয় সূচিত করে। নচেৎ মুক্তির নামে বন্ধন, বিপর্য্যয় ও ব্যর্থতাই প্রকট হইয়া উঠে।

আত্মহীন মানুষ স্বাধীনতার নামে অর্থশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তির অধীন হইয়া দিন কাটায়। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আত্মহারা মানুষ বৃথাই আত্মস্বাতন্ত্র্যের মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া বেড়ায়। আধুনিক উন্নত-অনুন্নত সকল দেশই তাহার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। সুতরাং জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরেই জাতীয় স্বাধীনতার প্রকাশ।

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার সহিত জাতীয় স্বাধীনতার বা রাষ্ট্রশক্তির সংঘর্ষ বাধিয়াছে। গণতন্ত্র (Democracy), সমাজতন্ত্র (Socialism) ইত্যাদি নানা কিছুর মধ্য দিয়া এই সমস্যার নানাভাবে সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সমাধান সর্ব্বদা দূরে সরিয়া যাইতেছে। সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যেই অব্যবস্থিত ভাব, উত্তেজনা, ভয়, হর্ষ, ব্যর্থতা, বিভ্রান্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রাচুর্য্য, যাহার ফলে সর্ব্বদাই সমাজজীবনে সংঘর্ষ প্রচ্ছন্ন অথবা প্রকটভাবে ক্রিয়া করিতেছে। আন্তর্জাতীয় (International) ক্ষেত্রেও তাহাই। মানুষের ব্যক্তিগত আত্মস্থতা নাই, তা'ই জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় আত্মস্থতারও একান্ত অভাব। অবস্থা ক্রমশঃই দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই একটা পরিত্রাণের পথ খুঁজিতেছে। কিন্তু চিন্তাশক্তি এমন আচ্ছন্ন, দৃষ্টিবিভ্রম এমন অভ্যাসগত হইয়া পড়িয়াছে যে মনুষ্যজীবনের সহজ, সরল সত্যটী চোখে পড়িতেছে না। এই যুগব্যাপী দৃষ্টিবিভ্রম হইতে আজ মুক্তির সময় আসিয়াছে। এই মুক্তি মানবের আত্মদৃষ্টির মুক্তি। জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যই ইহার মূল উপায়। এই পথ গ্রহণ

করিলে, ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন ও বিশ্বজীবন অনেকখানি সরল, সহজ, স্বচ্ছ, সুস্থ হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমানের রাজনীতিতে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত নাই। মত-বাদের অহঙ্কার ও রাজসিকতার লড়াই এখানে প্রধান বস্তু। দেশের সেবা, জনকল্যাণ উপলক্ষ্য মাত্র। ভারতের জনকল্যাণ যে কি তাহাই বা কে ভাবিতে চায়? দারিদ্র্য-অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য দূর করা ও জনসাধারণের নিরাপত্তাবিধান, এ'ত প্রত্যেক রাষ্ট্র বা রাজশক্তির প্রাথমিক অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রাথমিক অবশ্য কর্ত্তব্যের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মনুষ্যত্ব গঠনের দায়িত্বই প্রধান বস্তু। শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত জনসাধারণ এ বিষয়ে অনবহিত, রাষ্ট্রও সেজন্য এ বিষয়ে উদাসীন। ফলে রাজনৈতিক উত্তেজনাই যেন সর্ব্বকালের আসল বস্তু—এইরূপ ভাবই রাষ্ট্রপরিচালকগণের মধ্যে তথা জনসাধারণের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। ইহার কারণ পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুকরণ। ভারতের নিজস্বতা ইহাতে নাই।

ভারত বহুশতাব্দীর রাজনৈতিক পরাধীনতার পর তাহার রাষ্ট্রশক্তি ও ধনশক্তি হারাইয়া অতি হীন, দুর্ব্বল, বিপন্ন জীবন যাপন করিতেছিল, সুতরাং জাতীয় জীবনের এই প্রাথমিক বা আদিম প্রয়োজনের দিকে জনসাধারণ ও রাষ্ট্রনায়কদের প্রধান দৃষ্টি পড়াই স্বাভাবিক। তা'ছাড়া পাশ্চাত্য জাতীয়জীবনের আদর্শ ও শক্তির সংস্পর্শে তাহার বহুশতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গিতেছে বলিয়া স্বভাবতঃই পাশ্চাত্যের

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনকেই সে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া চলিতেছে—ভারতীয় মানবধর্ম্মের কথা বিশেষ ভাবিতে অবসর পায় না বা আগ্রহ বোধ করে না। তবুও স্বভাবতঃই ইহা ফল্গুধারার ন্যায় জাতীয়জীবনে প্রবহমান। বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতাগণের প্রবর্ত্তিত মানবীয় ধর্ম্মান্দোলন ভারতরাষ্ট্রের এক পার্শ্বে একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও ভারত মানবধর্ম্ম নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু এই মানবধর্ম্ম যে কি, সে বিষয়ে বহুশতাব্দীর অনভ্যাসবশে রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহার ঠিক্‌মত প্রয়োগ হইতেছে না। বুদ্ধদেব অহিংসা মন্ত্রের প্রচারক হইয়াও যে সেনাপতি সিংহকে ন্যায় ও মানবধর্ম্মের ভিত্তিতে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন সে কথা কাহারও মনে আসে না। প্রাচীন ভারতে বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত-মনুসংহিতা ইত্যাদির সর্ব্বত্র অহিংসাকে মানবধর্ম্ম হিসাবে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া সত্ত্বেও যে মানবধর্ম্মাশ্রয়ী দেশ-জাতি-সমাজকে রক্ষা ও পালনের উদ্দেশ্যে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করা রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত সে কথাও আজ বিস্মৃতির মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে। মানবধর্ম্মের আদর্শে প্রাচীন ভারতের জাতীয়জীবন প্রায় সহস্র বৎসর পৃথিবীর বক্ষে স্বমহিমায় তাহার জাতীয় সত্ত্বা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিরাজ করিয়াছিল, তাহাও কেহ ভাবিয়া দেখে না। এমন কি পরবর্ত্তী কালেও নানা বৈদেশিক আক্রমণে ক্রমাগত পর্য্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও বারে বারে ভারতীয় জাতীয়তা ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং বহির্ভারতেও আত্মবিস্তার

করিয়াছে, ইহাও কাহারও দৃষ্টিপথে উদিত হয় না। আজও তাহার সেই ধারা চলিতেছে। এই চিরন্তন মানবধর্ম্মের জাতীয় ধারাই ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। ইহা মূলতঃ কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতবাদ প্রচারের ধারা নয়। আজ আবার ভারতীয় জাতীয় জীবনের পুনর্জ্জাগরণ মুহূর্ত্তে এই ধারা সমাজ ও রাষ্ট্রে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিবে।

আজ পর্য্যন্ত ভারতে যতগুলি ধর্ম্মমত আসিয়াছে এবং ভারতেও যতগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, সকলের বিশেষ ধারা, যথা—কাহারও মানবসেবাবাদ, কাহারও সমাজসাম্যবাদ, কাহারও জ্ঞানভক্তিবাদ, কাহারও অনাসক্তকর্ম্মবাদ এই মহাজাতিগঠনের কাজে সহায়তা করিবে। এই সূত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা, অর্থাৎ মানবধর্ম্মের নীতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের আদর্শ একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিবে। সেই আদর্শ ত্যাগ ও সত্যের আদর্শ, জাতীয়জীবনে ব্রহ্মচর্য্য যাহার ভিত্তি। পশু-মানবকে দেব-মানবে রূপান্তরিত করিয়া প্রকৃত সুখ-শান্তি-শক্তি-স্বাধীনতার অধিকারী করাই ইহার নীতি। এই নীতি ও আদর্শকে বাদ দিয়া ভারতে মহাজাতিগঠনের কল্পনা অলীক স্বপ্ন মাত্র।

সে যাহা হউক, জনকল্যাণ বস্তুটি কি ? জনগণের প্রাণের চাহিদা কি ? অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য, এগুলি প্রাথমিক প্রয়োজন এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু প্রাথমিক

প্রয়োজনের অর্থ এই নয় যে এগুলি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবনের মূললক্ষ্যের গতি স্তব্ধ হইয়া থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে হাজার অভাব-অনটন-অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা-বিপদ্-আপদ্ সত্ত্বেও জীবনের কোন্ জিনিষটা বন্ধ হইয়া থাকে ? ইহারই মধ্যে ধনার্জ্জন-বংশবৃদ্ধি-খেলাধূলা-আমোদপ্রমোদ-নৃত্যগীত-কাব্য-সাহিত্য ও রাজনীতির আন্দোলন সবই ত চলে! তবে কি জীবনের মূল জিনিষটাই বন্ধ থাকিবে ? তাহা অসম্ভব। প্রকৃতির নিয়মেই তাহা কাজ করিবে। যদি ঠিক্ পথে প্রকাশ না পায়, তাহা বিপথে প্রকাশ পাইবে। এই মূল জিনিষটি মানবিকতার ভিত্তি, ব্রহ্মচর্য্য। জাতীয় জীবনে প্রকাশের পথ না পাইলে ইহার ব্যর্থশক্তি বিপথে বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে ও জাতীয়জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিবে। সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্য-অস্বাস্থ্য-অশিক্ষা ইত্যাদির অজুহাতে ইহাকে অবহেলা করা জাতীয় জীবনের পক্ষে মারাত্মক ভুল। বিশেষে সর্ব্বদেশে যে শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত সমাজ নিম্নস্তরের জনগণকে পরিচালিত করেন, যাঁহারা দেশের রাজনীতি-অর্থনীতিকে রূপদান করেন, তাঁহারা ত অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অভাবে একান্ত পীড়িত নন্ ? তবে কি কারণে তাঁহাদের স্তরের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনে ভারতের জীবনাদর্শের সাধনা অবহেলিত, উপেক্ষিত হয় ? আসলে এক্ষেত্রে প্রচলিত রাজনীতির মোহ এত প্রবল যে গভীরতর চিন্তার কোনও আগ্রহই নাই। চিন্তা করিলে ইহারা বুঝিতে পারিতেন যে ভারতে জাতীয় জাগরণের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা হইতেছে রাজনৈতিক আন্দোলন ও অর্থনৈতিক

পরিকল্পনার পিছনে ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতে দেশব্যাপী মনুষ্যত্বের সাধনা ও শক্তির উদ্বোধন।

আর জনসাধারণের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থার দোহাই দিয়া কি কোনও রাষ্ট্র সত্যই জনসাধারণের উপর চিরন্তন আধিপত্য করিতে পারে? রাজনীতিবিদ্ মাত্রেই জানেন মানুষ সবই ভুলিয়া যায়, সবই পথের পাশে ফেলিয়া যায়। এক চিরন্তন আত্মোপলব্ধির অনির্দ্দেশ্য পথে অগ্রগতিই তাহার একমাত্র কাম্য।

এজন্য দেখা যায়, সহস্র বাহ্যিক জনকল্যাণ সত্ত্বেও রাষ্ট্রকে এযুগের ব্যক্তি ও জনসাধারণ সংশয়ের চক্ষেই দেখে। রাষ্ট্রীয় অধীনতা হইতে তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও জনগণের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য নানা রক্ষাকবচ ও বিধি ব্যবস্থা করিতে হয় সর্ব্বদেশে। কেন এই স্ববিরোধ? এ কি শুধু রাষ্ট্রশক্তির স্বৈরাচার সীমাবদ্ধ করার জন্য? এক দিক্ দিয়া তাহা ঠিক্। কিন্তু অপর দিকে আরও বৃহত্তর সত্য হইতেছে এই যে, রাষ্ট্রেরও অধীনতা বা বশ্যতা মানুষ চায় না। কি ব্যষ্টিজীবনে, কি সমষ্টিজীবনে, মহামুক্তিই তাহার একমাত্র কাম্য বস্তু। ইহারই ছায়া আমরা দেখিতে পাই আধুনিক রাষ্ট্রীয় মতবাদে নানাভাবে নৈরাজ্যবাদের অথবা রাষ্ট্রপ্রভুত্ব ন্যূনতম করার প্রবণতায়।

ইহারই ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জীবনে, বিশেষে এযুগের রাজনীতির খেলায়, বিরোধের ভাবই যেন স্বাভাবিক। বিদ্রোহ-বিপ্লবই যেন নিয়ম, শান্তি যেন ব্যতিক্রম। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে

জনগণের অন্তরাত্মা স্বাভাবিক মহামুক্তির পথ পায় না বলিয়াই এই বিরোধ-বিদ্রোহ-বিপ্লবকেই স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করে। উপনিষদের ঋষি অন্নের কথা ভাবিয়াছেন, অর্থের কথা ভাবিয়াছেন, তাহাদের গুরুত্বও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের প্রধান করিয়া তোলেন নাই। মানুষের জীবনের লক্ষ্য স্বারাজ্য-লাভ, ইহাই তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্" এই মহাবাক্যে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উপনিষদের সম্পূর্ণ বাণীটির আরও তাৎপর্য্য রহিয়াছে বলিয়া আমরা সমস্ত মন্ত্রটি এখানে তুলিয়া দিলাম—"সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্‌পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতির্ব্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মনআনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, শিক্ষাবল্লী, ষষ্ঠানুবাক, ২।১৭)। অর্থাৎ,— "সুবঃ, এই ব্যাহৃতিরূপ আদিত্যে ও মহঃ, এই ব্যাহৃতিরূপ ব্রহ্মে তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন। তিনি সমস্ত নিখিল মনের আধিপত্য লাভ করেন। তিনি সমস্ত বাক্যের প্রভু, সমস্ত দৃষ্টির প্রভু, সমস্ত শ্রবণের প্রভু এবং সমস্ত বিজ্ঞানের (বুদ্ধির) প্রভু হন্। ইহা ছাড়া তিনি এমন কি আকাশ-শরীর ব্রহ্ম হন্, যাঁহার সত্যই আত্মা, যাঁহার প্রাণই আরাম, যাঁহার মনই আনন্দ, যিনি শান্তিসমৃদ্ধ অমৃত। হে প্রাচীন-যোগ্য, তুমি সেইভাবে তাঁহার উপাসনা কর।" লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখানে জীবনকে বর্জ্জন করার, অস্বীকার করার নেতি-

মূলক ভাব নাই; এখানে জীবনের পূর্ণতালাভের বাণীই ঘোষিত হইয়াছে। এই স্বারাজ্যের পথ সত্য ও ত্যাগ, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যই তাহার ভিত্তি। এজন্য এই উপনিষদেই আমরা গুরুর বহু ব্রহ্মচারী লাভের জন্য আকুল আহ্বানের বাণীও শুনিতে পাই। পৃথিবীর তথা ভারতের বর্ত্তমান জনজীবনে ও রাষ্ট্রে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা নাই। সেই জন্য জনজীবনে নিত্যবিরোধের সম্ভাবনাকে সর্ব্বদেশে রাষ্ট্রনায়কগণ নানা বাহ্যিক অভাবপূরণে শান্ত করিতে অথবা বলপ্রয়োগে দমন করিতে নিত্য চেষ্টিত থাকেন। অপরদিকে জনগণও বিরোধ-বিদ্রোহের মধ্যেই স্বারাজ্যের কল্পনা করিতে অভ্যস্ত।

সুতরাং, সুস্থ রাজনীতির জন্য যাহা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা সুস্থ মানবনীতি। আরণ্যক মানুষের সুস্থ রাজনীতি থাকিতে পারে না। পশু-মানবের জন্য কল্যাণ-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ এই একই সমস্যা। জনকল্যাণ, মানবকল্যাণের নামে রাজনীতি-অর্থনীতির ধূম্রজাল।

প্রচলিত ধর্ম্মমতবাদে মানুষের আস্থা নাই, কারণ জনজীবনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি একটা ভাববিলাসের আমেজ লাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র। উপরন্তু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতবাদের নামে মানুষের সমাজে প্রচুর সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থ-পরতা, অহঙ্কার, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, হিংসা-নিষ্ঠুরতা মহামারীর মত মনুষ্যসমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই যুগ-সঙ্কটে আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন খাঁটি মানবধর্ম্মের প্রচার-প্রতিষ্ঠা। বলা

বাহুল্য, তাহা কোনও দার্শনিকতার ভাববিলাসের দ্বারা সম্ভব নয়। মানব-সমাজে আজ ব্যাপকভাবে পশুত্বের ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করার আন্দোলন প্রয়োজন। এই পশুত্বের ভিত্তি, মানুষের যৌনকাম-সম্ভোগলালসা। এই দুষ্টক্ষত আজ ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে জগতের সর্ব্বত্র বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে এবং জীবনের সব কিছু প্রচেষ্টাকেই দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রচ্ছন্ন পাপকে মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া মানুষ জীবনের সর্ব্বত্র বিষই ছড়াইতেছে। ইহারই উপর দাঁড়াইয়া আছে মানুষের ধনকাম ও প্রভুত্বকাম। সুতরাং রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ঘুরিয়া ফিরিয়া দূষিত ধনকাম বা প্রভুত্বকামই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এই পাপচক্র হইতে মানুষের পরিত্রাণ প্রকৃতির নিয়মেই আসিতে হইবে।

দেশের ও বিশ্বের শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত সমাজে ও নেতৃসমাজে একটা বেশ আত্মপ্রসন্ন ভাব রহিয়াছে যেন যৌনকাম এক স্বাভাবিক ব্যাপার, মনুষ্যজীবনের ইহা ভিত্তি, সুতরাং ইহাতে বিচলিত হইবার কিছু নাই। বাল্য-কৈশোর-যৌবনের চাঞ্চল্য শীঘ্রই বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈধ-অবৈধ ভোগের মধ্য দিয়া একটা স্থিতিলাভ করে এবং বয়স্কজীবনে ধনমান-গৃহপরিবার লইয়া মানুষ "স্বাভাবিক" জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করে। সেই "স্বাভাবিক" জীবনের উপর স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া দেখা দেয় রাজনীতি-অর্থনীতির আন্দোলন। রাজনীতি-অর্থনীতির মধ্য দিয়া কি নেতৃত্বস্তরে, কি সাধারণস্তরে চলে জীবনের পরমা

তৃপ্তির অনুসন্ধান। অথচ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজকাল সাহিত্যে ও দর্শনে শোনা যায় আধুনিক মানুষের জীবনে গভীর "Frustration" এর (বিফলতার) কথা। কিন্তু ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সর্ব্বস্তরেই এই বিফলতাবোধের মূল যে কোথায় তাহা ভাবিয়া দেখা হয় না। বলা বাহুল্য, ইহা আধ্যাত্মিক বৈরাগ্য-বানের বিফলতাবোধ নয়। ইহা জীবনের মূলকে অস্বীকার করিয়া জীবন বিস্তারের কৃত্রিম প্রচেষ্টার পরিণতি। যৌনকামকে জীবনের স্বাভাবিক ভিত্তি বলিয়া বিবেচনা করা হইতেই এই ভয়ঙ্কর ভ্রমের উৎপত্তি। এই ভ্রমের স্বরূপ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে জীবতত্ব-মনস্তত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইবে। এখানে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে যৌনকাম-সম্ভোগের লালসাকে "স্বাভাবিক" ভাবিয়া তাহার সহিত রফা করিয়া চলাতে অস্বাভাবিক জীবন ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ অস্বাভাবিক জীবনই আজিকার রাজনীতি-অর্থনীতির মূল উপাদান। ব্যর্থতার কলঙ্কতিলক ইহার কপালে অঙ্কিত থাকিবেই।

কোনও কোনও আপাত-চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়ত বলিবেন "মানিলাম, ইহা অস্বাভাবিক। কিন্তু আদিম প্রবল প্রবৃত্তিকে সংযত করা কি সম্ভব ?" এই প্রশ্নটিই আসলে অনেক সদিচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধিকেও বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ইহার সদুত্তর অবশ্যই প্রয়োজন। বর্ত্তমান অধ্যায়ে ইহার আলোচনা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকবোধে আমরা পরবর্ত্তী একটি অধ্যায়ে ইহার অবতারণা করিব।

রাজনীতির আলোচনাসূত্রে যে কথাগুলি বলা হইল, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সেগুলি সমান প্রযোজ্য। অর্থাৎ, মূল মানবনীতি বা মানবধর্ম্মকে বাদ দিয়া যে কোনও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা অর্থনৈতিক বিপ্লব আমাদের বেশী দূর লইয়া যাইতে পারিবে না। মূলে যেখানে ভ্রম, সেখানে বাহ্যিক উন্নতির চেষ্টায় ঘুরিয়া ফিরিয়া ভ্রমই আবর্ত্তিত হইবে। অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টায় ইহাই ঘটিতেছে। ইহা শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের ক্ষেত্রেই সত্য।

ধন বা অর্থ মানুষের জীবনে সর্ব্বাধিক বাস্তব প্রয়োজন। যৌনকাম বাদ দিয়াও মানুষের দেহ বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু অন্ন-বস্ত্র-খাদ্য-বাসস্থান ইত্যাদি ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা করা দুর্ঘট। সুতরাং এগুলি জীবনের প্রাথমিক ও অনিবার্য প্রয়োজন। আর জীবনের এই প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার সূত্রেই ধনের মূল্য এতখানি। কিন্তু একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, ধন বা অর্থ তাহাদের প্রয়োজনীয়তার সীমার বাহিরে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। এই দুষ্ট প্রভাবই ধন বা অর্থকে আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিশাপ করিয়া তোলে। ইহার ফলে স্বাভাবিক ধনলাভ বা অর্থলাভের পরিবর্ত্তে অস্বাভাবিক ধনলোভ ও অর্থলোভই মানুষকে পরিচালিত করে। এক্ষেত্রে অধিকবিত্ত, মধ্যবিত্ত, বা অল্পবিত্ত, সকলের একই রোগ। সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্র এই রোগে রোগী। ইহা শুধু ধনবান্‌দের পাশাপাশি দরিদ্রদের সাহায্য দান, বা ধনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সাম্যতন্ত্রের (Communism) প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন নয়। তাহা

একদেশদর্শী সমাধান মাত্র। ধনী-দরিদ্র সকলেই যে মানসিক রোগে ভোগে, তাহার সুস্থতাবিধান এই পথে হয় না। সেই রোগ হইল ধনকাম বা বিত্তকাম। যৌনকামের মতই ইহা মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা স্ফূর্তি পায় না। ধন থাকা বা না থাকা বা সকলের সমান ধন থাকা, সেখানে আসল প্রশ্ন নয়। আসল প্রশ্ন ধনস্পৃহা বা ধনে আত্যন্তিক তৃপ্তিবোধ। আসলে ইহা ইন্দ্রিয়সম্ভোগময় জীবনের মধ্যে আত্যন্তিক তৃপ্তিবোধেরই রূপান্তর মাত্র। ইহা যৌনকামেরই সমপর্যায়ের বস্তু। ইহার ভিত্তিতে সুস্থ মানবতার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সেই জন্য সুস্থ সমাজ বা রাষ্ট্রও ইহার উপর গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুস্থ অর্থনীতির জন্য এই আদিম প্রবৃত্তির সংযমন-সংশোধন আবশ্যক। সুতরাং জাতীয় ব্রহ্মচর্য-সাধনার ইহাও একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।

যৌনকামসংযমের সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, অসহিষ্ণু পাঠক হয়ত এখানেও সেই প্রশ্ন করিয়া বসিবেন,—এই সব "সাধু-সন্ন্যাসীর" আদর্শ কি সাধারণ মানুষের জীবনে সম্ভব? ইহা কিভাবে কতদূর সম্ভব, এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ইহাকে একদিন কিভাবে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল, অন্যান্য অধ্যায়ে আমরা সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

বলা বাহুল্য, যৌনকামের মত এই ধনকাম বা বিত্তকাম মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে "স্বাভাবিকতা"র পদবী লইয়া বসিয়া আছে। ধনিকের শোষণ সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর সন্দেহ নাই, কিন্তু ধনকামের

শোষণ আরও গুরুতর ও গভীরতর। ইহা ধনতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্র, উভয়বিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া মানুষের স্বাধীন সত্বাকে শোষণ করিয়া ফেলে। ফলে ব্যক্তি মানব তাহার আত্মাকে হারাইয়া রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সখের পুতুল হইয়া জীবন যাপন করে মাত্র।

প্রাচীন ভারতপ্রজ্ঞা যৌনকাম, ধনকাম, ও প্রভুত্বকাম বা জনকামকে এই ব্যাধির বিভিন্নরূপ বলিয়া জানিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে এই কথাগুলি শুনিতে পাই—"যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণা।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)। অর্থাৎ—যাহাই পুত্রকাম তাহাই ধনকাম, যাহা ধনকাম তাহাই লোককাম। পুত্রকামনা, ধনকামনা, লোককামনা একই বস্তু। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, কাম ও কামনাও মূলতঃ এক। এজন্য সংস্কৃত সাহিত্যে নরনারীর "প্রেম" সম্পর্ককেও কাম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে "এক" বহুরূপে জন্মিবার যে ইচ্ছা করিলেন, যাহার ফলে মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের আবির্ভাব ঘটিল, সেই ইচ্ছাকেও "কাম" নামে অভিহিত করা হইয়াছে—"সোহকাময়ত"। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা লোককাম বা জনকামের সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই লোককামই তাহা যাহাকে আমরা জনপ্রিয়তা বা ইংরাজীতে Popularity বলি। এই বৃত্তি আসলে জনহিতৈষণা নয়, ইহা জনৈষণা। Individual Psychology বা ব্যষ্টি মনস্তত্ব ও Social Psychology বা সমষ্টি মনস্তত্বের দৃষ্টিতে এই বিষয়টির কামকেন্দ্রিক স্বরূপ আলোচনার যোগ্য।

এখানে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জনসেবার ক্ষেত্রে এই জনকামের ক্রিয়াই প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহাই কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে প্রভুত্বকামরূপে দেখা দেয়। ইহাই আধুনিক যুগে "Power" বা ক্ষমতার খেলা। আধুনিক রাজনীতিও প্রধানতঃ "Power Politics" বলিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে এত আগ্রহের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য মনীষীর দৃষ্টিতেও ব্যাপারটা পরিষ্কার। "Power corrupts, absolute power corrupts absolutely." অর্থাৎ, "ক্ষমতা দুর্নীতি আনে, আর একচ্ছত্র ক্ষমতা চরম দুর্নীতির জন্ম দেয়।" ইহা পাশ্চাত্য মনীষারই অবিষ্কার। এই ক্ষমতার বিকৃত ব্যবহার দূর করিবার জন্যই গণতন্ত্র, সাম্যতন্ত্র ইত্যাদি শাসনব্যবস্থার আবিষ্কার। কিন্তু তবুও এই বিকার পৃথিবীর রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত করা যায় নাই বরং উত্তরোত্তর ইহা বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। ইহার কারণ, যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা, সেই সরিষার মধ্যেই ভূত আত্মগোপন করিয়া আছে। অর্থাৎ, রাজনীতি-অর্থনীতির যত বাঁধন-কষণ, রক্ষাকবচ, বিশেষ ব্যবস্থা সেই সমস্তই ঐ একই প্রভুত্বকাম দোষে দূষিত। বাল্যকাল হইতে নাগরিকগণের মন ও বুদ্ধি এই দূষিত আবহাওয়াতেই বর্দ্ধিত হইতেছে। আর এই প্রভুত্বকামের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছে যৌনকাম ও ধনকাম। সুতরাং এই বিকৃত মনোভাবকে অন্তরে পোষণ করিয়া মানুষের সভ্যতা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইহার আওতায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ভদ্রবেশী

বর্ব্বরতা" ছাড়া আর কিছুর সৃষ্টি হইতে পারে না।

অর্থনৈতিক সাম্য ভারতের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে একেবারে নূতন কথা নয়। কিন্তু যে কলকারখানার যুগের বিষাক্ত ফলস্বরূপ আধুনিক Capitalism বা মূলধনতন্ত্রের আবির্ভাব, তাহা প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নিকট অজ্ঞাত ছিল। তখনকার দিনে ধনতন্ত্র ও ধনবৈষম্য থাকিলেও তাহা এত উদগ্র ছিল না। সে জন্য এই আধুনিক ব্যাধিকে চিকিৎসা করার জন্য নানা দাওয়াইয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। আমেরিকা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে, রাশিয়া ও চীন ধনসাম্যবাদী স্বৈরতন্ত্রে ও ভারত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু যেভাবে যেপথেই চিকিৎসা করা হউক, মূল সমস্যার দিকে দৃষ্টি না রাখিলে সাময়িক ও বাহ্যিক কিছু সুফল প্রসব করিয়া এই সব আন্দোলন আবার নানা জটিল সমস্যার মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে। এমন যে লোভনীয় রাশিয়ার ধনসাম্যবাদ, সেখানেও দিনের পর দিন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দলীয় একনায়কত্ব, এবং এমন কি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবনের পুনরুজ্জীবনের দিকে ঝোঁক পড়িতেছে। জাপান যেমন এককালে পাশ্চাত্য শ্রমশিল্পে হাত পাকাইয়া বড় হইতে চাহিয়াছিল, চীনও তেমনি রাশিয়ান ধনসাম্যবাদের চরমপন্থী অনুশীলনে বড় হইতে চাহিতেছে। মূল সমাধানের অভাবে একদিকে সাম্য স্থাপন করিতে যাইয়া দশদিকে, মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিশ্বব্যাপী বৈষম্য-বিরোধেরই আগুন জ্বলিতেছে। পাশবিক বলপ্রয়োগেই বিভিন্ন

রাষ্ট্রশক্তি নিজেদের আভ্যন্তরীন আত্মরক্ষা ও আন্তর্জাতিক আত্ম-প্রসারে সচেষ্ট হইতেছে।

সুতরাং এ যুগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধ-বৈষম্যের প্রতিবিধান করিয়া নূতন মানবীয় সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া পথ নাই। এই পথে যাহা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা মানুষের ব্যক্তিসত্বার মধ্যে যে তীব্র বিরোধ-বৈষম্য রাজত্ব করিতেছে তাহার প্রভাব হ্রাস করা। ইহা প্রধানতঃ একটি ব্যাপক আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। এরূপ নূতন প্রচেষ্টা যে কিছু কিছু নানা আকারে আরম্ভ না হইয়াছে তাহা নয়। ভারতে সর্ব্বোদয় আন্দোলন, পৃথিবীর নানা স্থানে M. R. A. আন্দোলন এবং আরও কতকগুলি আত্মশুদ্ধিভিত্তিক সমাজ-রাষ্ট্র-গঠনের আন্দোলন নানা দেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তবুও একথা অকপটে ও জোরের সহিত ঘোষণা করা চলে, যে আত্ম-শুদ্ধির মূল আন্দোলন, অর্থাৎ যৌনকামসংযমের আন্দোলনকে কোথাও প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশেই বলা যায়, গান্ধীজীর আদর্শকে ধরিয়া যে সব কর্ম্মপ্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে তাঁহার আত্মশুদ্ধি ও মনুষ্যত্বগঠনের যে মূল কথা—ব্রহ্মচর্য, তাহা স্থান পায় নাই, পাইয়া থাকিলেও তাহা প্রাধান্য লাভ করে নাই। গান্ধীজীর আন্দোলনের ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিক। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজনৈতিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে তাঁহার ঝোঁক পড়ায় তিনি প্রধানতঃ হইয়া উঠিয়াছিলেন রাজনীতির নূতন পথিকৃৎ। সেজন্য রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রবল প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হইবার

জন্য তাঁহাকে সরাসরি অহিংস সংগ্রামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আদর্শ মানুষের যে সমাজ ও রাষ্ট্র, তাহাকে রক্ষা করার জন্য যে ধর্ম্মযুদ্ধ বা ন্যায়যুদ্ধ, তাহা গান্ধীজীর আদর্শবাদে স্থান পায় নাই। ইহার কারণ সমসাময়িক পরিবেশ।

এই সব প্রচেষ্টা যে ভ্রান্ত বা ব্যর্থ তাহা নয়। সাময়িক সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়া মানবধর্ম্মকেও পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ঐখানেই তাহার ইতি নয়। নূতন যুগে মানব ধর্ম্মের যে নূতন প্রকাশ হইবে তাহা সাময়িক সুযোগ-সুবিধার উপর গড়িয়া-তোলা মানবধর্ম্মের কোনও নূতন সংস্করণ নয়। তাহা শাশ্বত মানবধর্ম্ম এবং তাহার ভিত্তিতে গঠিত আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র। নূতন যুগের যে মানবসমাজ ও মানব-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা বিশ্ববিধাতার অন্তরে জাগিয়াছে, তাহাতে ত্রিবিধ কামের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষাকারী মানুষের দল গড়িয়া তোলাই প্রথম ও প্রধান কথা। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ইতিহাসে ইহার প্রচুর উপাদান আছে। সংস্কারবর্জিত ভাবে আজ তাহাকে নূতন কাজে লাগাইতে হইবে।

ইহা একদিনে বা এক বৎসরে গড়িয়া তুলিবার কোনও আন্দোলন নয়। ইহা এক নূতনযুগের প্রস্তুতি। সম্পূর্ণভাবে বিশ্বনিয়ন্তার বিশেষ ইচ্ছায় আত্মসমর্পন করিয়া এই পথের সাধক দলকে অগ্রসর হইতে হইবে।

সুতরাং ইতিমধ্যে প্রকৃতির নিয়মে দেশে নানা রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক আন্দোলনের ধারা চলিবে না, তাহা নহে। তাহাই

নিয়ন্ত্রিত বাস্তব পন্থা। কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে দেশ-ব্যাপী ব্যাপক মনুষ্যত্বগঠনের আন্দোলনকে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই জাতীয় ব্রহ্মচর্য আন্দোলন।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম তাহা এই যে ভারতের ঐতিহ্যে অর্থনৈতিক সাম্যবাদ একেবারে নূতন কথা নয়। মহাভারত ও ভাগবতপুরাণে আমরা এই অপূর্ব্ব শ্লোকটি দেখিতে পাই :—

"যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেনঃ দণ্ডমর্হতি॥"

ইহার মূল ভাবার্থ, মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসঞ্চয়ের অধিকার নাই। ইহা চৌর্যবৃত্তি ও রাষ্ট্রের নিকট দণ্ডনীয়। গীতায় এই কথাই আরও একটু উচ্চস্তর হইতে ঘোষিত হইয়াছে। দেবশক্তির নিকট উৎসর্গ না করিয়া যাহারা মাত্র আত্মতৃপ্তির জন্য ভোগ করে তাহারা চৌর্যদোষে দুষ্ট—ইহাই গীতার কথা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই কথাগুলি আধুনিক ধনসাম্যবাদ বা কমিউনিজ্‌মের কাছ দিয়া যাইলেও মূলতঃ অনেক দূরের বা উচ্চের কথা। কারণ, এই আদর্শবাদ মানুষের আত্মায় সাম্য-স্থাপনে বিশ্বাস করে ও একমাত্র তাহারই ভিত্তিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার সম্ভব এই কথাই ঘোষণা করে। সে যাহা হউক, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে এই আত্মিক সাম্যের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে ধনবণ্টনের ব্যবস্থা ও

বিধি-নিষেধের কথা মহাভারত-সংহিতাদি গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে।

কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, এবং এখানে সেই কথারই পুনরুক্তি করিতেছি যে এই মৌলিক মানবীয় সাম্যবাদ (ইহাই সত্যকার Humanism বা মানবিকতাবাদ) একটি আদর্শ মানব-ধর্মী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সম্ভব। এবং সেই আদর্শসমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের জন্য দীর্ঘ যুগতপস্যার প্রয়োজন। ত্রিবিধকাম,—যৌনকাম, ধনকাম, ও জনকাম বা প্রভুত্বকামকে জয় করার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই হইবে তাহার মূল নীতি।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে এই কামজয়ের প্রচেষ্টাই জাতীয় ব্রহ্মচর্য আন্দোলনের মূল কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে নরনারীর যৌনকাম একটি Biological বা জীবতাত্ত্বিক ব্যাপার, সুতরাং ঐ 'স্বাভাবিক' প্রবৃত্তিকে সংযম বা জয় করা মানুষের সাধ্য নয়, উচিতও নয়।

এ বিষয়ে কতকগুলি মারাত্মক ভ্রম আধুনিক সমাজমনে বাসা বাঁধিয়া আছে। সুতরাং সত্যের উদ্‌ঘাটন করিতে কিছু বাস্তব আলোচনার প্রয়োজন।

যৌনকামসম্ভোগ একটি Biological বা জীবতাত্ত্বিক ব্যাপার, এ কথার তাৎপর্য্য কি ? এইভাবে যৌনকাম চরিতার্থ করাকে অবাধ ছাড়পত্র দেওয়ার পিছনে দুইটি মনোভাব ক্রিয়া করিতেছে। প্রথম, ইহা একটি জৈব স্বভাব ও জৈব প্রয়োজন, দ্বিতীয়, ইহা Biology বা জীবতত্ত্বকর্ত্তৃক সমর্থিত। এখানে দ্বিতীয় অংশটির কথাই আমরা প্রথমে আলোচনা করিব।

মনে রাখা উচিত যে বিজ্ঞান কতকগুলি প্রাকৃতিক তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কার করে। কিন্তু মানুষের জীবনে তাহাদের বাস্তব প্রয়োগ সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাহাদের উপযোগিতার উপর। মানুষের নৈতিক বিচার বা নীতিবিজ্ঞান সেখানে পথ নির্দ্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে সব বৈজ্ঞানিক আণবিক শক্তির আবিষ্কারে বা আণবিক বোমার প্রস্তুতীকরণে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অনেকে—যথা Einstein ও Oppen-

heimer—আণবিক বোমার ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সুতরাং মানুষের জীবনে কল্যাণ কোন্ পথে তাহাই 'স্বাভাবিকতা'র একমাত্র মাপকাঠি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মানুষের জীবনকে স্বাভাবিক করার যে পথ তাহাই ভারতীয় ঐতিহ্যে 'ধর্ম্ম' নামে পরিচিত। নতুবা নবাবিষ্কৃত যে কোনও প্রাকৃতিক ব্যাপারের পিছনে ছুটিতে মানুষকে যদি উৎসাহিত করা হয়, তবে তাহা সভ্যতার বিপর্য্যয় ঘটাইতে বাধ্য। সৌভাগ্যক্রমে কোনও দায়িত্বশীল বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন না।

এখন আধুনিক জীবতত্ত্ব কি বলে তাহাই আমরা দেখিব এবং তাহাতে অবাধ কামসম্ভোগের সমর্থনে কিছু আছে কিনা তাহাও বিচার করিব।

আধুনিক জীবতত্ত্ব যৌনপ্রজনন সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিতেছে। শক্তিশালী অনুবীক্ষণের সাহায্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুংজননকোষ (Spermatozoid) ও স্ত্রীজননকোষ (Ovule) এর মিলন-মিশ্রণের রীতিও নির্ণীত হইয়াছে। 'Chromosome' ও 'Gene' তত্ত্বের উপর জীবদেহের গঠন ও প্রকৃতির বংশগত ধারা অথবা ব্যক্তিগত বিশিষ্টতারও নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু মানুষের অনন্ত রহস্যময় জীবনের নৈতিক ও আত্মিক ক্ষেত্রে জীবতত্ত্ব অনধিকার প্রবেশ বা অনধিকার চর্চ্চা করে নাই। কিন্তু আসল কথা হয়ত তাহা নয়। তাহা সম্ভবতঃ এই যে যৌনসঙ্গম ও যৌনপ্রজননের ক্ষেত্রটি যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তখন নরনারীর যৌনসম্পর্কের

ব্যাপারে সংযম শালীনতা-নীতির প্রশ্ন অবান্তর। বলা বাহুল্য ইহা একটি উদ্ভট যুক্তি। ইহার পিছনে জনমানসে আধুনিক বিজ্ঞানের মোহই ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিকও সম্ভবতঃ এরূপ বিকৃত যুক্তি সমর্থন করেন না। জীবনের রহস্য-নির্ণয়ে ও সমস্যাসমাধানে বিজ্ঞান ছাড়া আরও অনেক 'বিদ্যা' নিযুক্ত রহিয়াছে। বিজ্ঞান জ্ঞানসমুদ্রের উপকূলে কয়েকটি নুড়ি কুড়াইতেছে মাত্র, এই চেতনায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক নম্রশির। কিন্তু বিজ্ঞানের 'Prestige Suggestion' বা 'মর্য্যাদার সম্মোহ' সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করে। বিজ্ঞানের নামে নীতি-ধর্ম্মকে অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি এযুগের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিকৃত মানসিকতারই পরিচায়ক।

জীবতত্ত্বের নজির দিয়া কিছু করিতে বা বলিতে গেলে আমাদের জীবতত্ত্বের আবিষ্কৃত তথ্যকে তাহার 'logical conclusion' বা যুক্তিসঙ্গত পরিণতি পর্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে। প্রথমেই যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই যে জীবতত্ত্বের দৃষ্টিতে আজ মানুষ জীব হিসাবে কোনও বিশেষ মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত নয়। জীবতত্ত্ব আজ জীবনের মূল উপাদান ও মূল রহস্য নানাভাবে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে। জীবদেহ ও মনুষ্যদেহ যে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকোষ (Cells) লইয়া গঠিত, তাহাদেরই মধ্যে জীবনের সমস্ত আদিলক্ষণ আজ পর্য্যবেক্ষণ করা হইতেছে। প্রাণী বা মানুষের অতি ক্ষুদ্র 'Reproductive Cells' বা যৌনকোষের মধ্যে জীবনের মূল সূত্রের সন্ধান করা হইতেছে। এই সমস্ত যৌনকোষের জীবনে

চেতনা বা ইচ্ছাশক্তিরও লক্ষণ দেখা যাইতেছে। Alfred Binet লিখিত 'The Psychic Life of Micro-Organisms' (The Open Court Publishing Company) গ্রন্থে আমরা যৌনকোষের মধ্যে যৌনপ্রেরণার কথাও শুনিতে পাই। '......the spermatic element in directing itself towards the ovule to be fecundated is animated by the same sexual instinct that directs the parent organism towards its female', অর্থাৎ—'পুরুষ-প্রাণী স্ত্রী-প্রাণীর দিকে যে যৌনকামের বশে পরিচালিত হয়, সেইরূপ এক যৌনকামের প্রেরণাতেই ঐ প্রাণীর দেহস্থ পুংশুক্রকোষ স্ত্রীরজঃকোষের দিকে প্রজননের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়।' এই যৌনকোষের যৌনমিলনের ও মিশ্রণের যে জীবন্ত চিত্র উক্ত লেখক তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আরও চমকপ্রদ। বাহুল্যভয়ে ও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন-বোধে আমরা তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না। যৌনকোষের জীবনই যে মুখ্য এবং জীব বা মানুষের জীবন যে গৌণ এবিষয়ে একটি প্রামাণ্য উক্তি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। 'In the last analysis, the development of the body can be regarded as a kind of by-product in the process of self-reproduction of the genotype which may be the essence of life. Samuel Butler put this in a nutshell by saying, 'The hen is the egg's way of making another egg' (Principles

of Genetics, Sincott, Dunn and Dobzhausky), অর্থাৎ—'চরম বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিলে বলা যায় যে যৌন বীজপ্রকৃতির আত্মবিসৃজন বা বংশবৃদ্ধিই জীবনরহস্যের আসল ব্যাপার। এই ব্যাপারে গৌণ, আনুষঙ্গিক পদার্থরূপে মাত্র উদ্ভূত হয় জীবশরীর। Samuel Butler এই কথাটিই চুম্বক আকারে বর্ণনা করিয়াছেন, 'ডিম্ব-ডিম্ব সৃষ্টি করে, সেজন্য তাহা যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে, সেই পদ্ধতিটিই মুরগীর দেহ।" সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে জীবতত্ত্বের দৃষ্টিতে Sex-cells বা যৌনজীবকোষগুলিই প্রকৃত জীবনের অধিকারী। তাহাদের সাময়িক ধারক-বাহকরূপেই স্ত্রীপুরুষের দৈহিক জীবন বা যৌন-মিলনের যা কিছু গুরুত্ব। নরনারীর যৌনমিলনের কোনও নিজস্ব মূল্য বা গুরুত্ব নাই, এবং এই দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানসৃজনের ও তাহাদের সন্তানদের দৈহিক জীবনেরও কোনও নিজস্ব মূল্য নাই। যৌনকোষের জীবনধারা রক্ষা করাই প্রকৃতির প্রধান কাজ। মনে রাখা উচিত মৌলিক জীবকোষ (এককোষ বা Unicellular) এক দিক্ দিয়া সাধারণ জীবকোষসমষ্টি প্রাণী-দেহের মত মরণশীল নয়, কারণ তাহারা Fission বা বিভাজনের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে। সুতরাং জীবতত্ত্বের দৃষ্টিতে মূল জীবন ও অমরত্বও কতকটা আদি জীবকোষের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেহধারী স্ত্রীপুরুষের জীবন একান্তই গৌণ ও দ্বিতীয় স্তরের। যৌনজীবকোষের জীবনই মুখ্য প্রথম স্তরের বস্তু।

তবে নরনারীর যৌনকাম একটি 'Biological' বা জীবতাত্ত্বিক (জৈব) ব্যাপার বলিতে যদি ইহা বুঝান হয় যে

অন্যান্য প্রাণীর জীবনে আহার-নিদ্রা-শ্বাসগ্রহণ ইত্যাদির মত ইহা জীবনধারণের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মে অনিবার্য্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয়, তবে আমরা জোরের সহিত বলিব তাহা নহে। কিছু পরেই আমরা প্রামাণ্য উদ্ধৃতির সাহায্যে এই কথা প্রতিপন্ন করিব।

যদি এরূপ সাধারণ যুক্তি প্রয়োগ করা হয় যে যৌন-জীবকোষের সন্ততপ্রবাহরক্ষার জন্যই প্রকৃতির নিয়মে মানুষকে কামের তাড়নায় ছুটিতে হইবে, তবে তাহার উত্তর এই যে যৌনজীবকোষের জীবন প্রাণীজীবনের আদি উৎস হইলেও তাহা নিতান্ত যান্ত্রিক জীবন মাত্র। জীবনের সেই আদি অন্ধকার গুহায় যে অন্ধ শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহার স্বরূপ বিজ্ঞানের নিকট অজ্ঞাত। জীবন যে কি বস্তু তাহাও আজ পর্য্যন্ত জীবতত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। একটি যৌনজীবকোষের সৃজন-লীলার পার্শ্বে অজস্র যৌনজীবকোষের অপচয় আজিও এক প্রহেলিকা। এই বিপুল অন্ধকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া বলা যায় যে নরনারীর অবাধ যৌন-আকর্ষণ ও যৌনমিলন জীবতত্ত্বসম্মত ব্যাপার?

আর এযুগের সভ্য মানব কি সত্যই স্বীকার করিবে যে নরনারী হিসাবে তাহাদের দৈহিক জীবনের ও যৌনমিলনের কোনও নিজস্ব মূল্য ও গুরুত্ব নাই? যদি তাহাই তাহারা মনে করে, তাহা হইলে তাহারা শুক্রবীজ ও রাজোবীজের অধীনস্থ যন্ত্র মাত্র, ব্যক্তিত্বের মহিমা বা মনুষ্যত্ব বলিয়া তাহাদের কিছুই থাকে

না। সে ক্ষেত্রে মানুষ সভ্যতা বলিয়া যাহার বড়াই করে, তাহার গৃহ-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-শিক্ষা তাহার প্রেমভালবাসা স্নেহসহানুভূতি, শিল্পকলা, দর্শনবিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতি ইত্যাদিরও কোনও অর্থ থাকে না। এমন কি যে শিশুসন্তানদের পরম সম্পদ্ বলিয়া মনে করা হয়, তাহাদের জন্মদান-লালন-পালন-আনন্দবর্দ্ধন ও 'মানুষ' করা—সবই নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছেলেখেলামাত্র হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু হয়ত 'এহ বাহ্য', আসল কারণ আরও গভীরে। সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে জীবতাত্ত্বিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। অর্থাৎ, এ যুগের মানুষের মন এমনি নৈরাশ্য-নিরানন্দে আচ্ছন্ন, সংশয়-অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন যে যৌনকামচরিতার্থ করার সহজ ও সুলভ উপায়ে সে তাহার জীবনের তীব্র বেদনাকে সব সময় ভুলিয়া থাকিতে চায়। সুতরাং 'Biological' বা 'জীবতাত্ত্বিক' কথাটির দ্বারা একটি 'বৈজ্ঞানিক' পর্দ্দা টানিয়া সে তাহার অন্তরালে নিজ সংযমহীনতার সমর্থন করিতে চায়।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান হিসাবে জীবতত্ত্ব কতদূর সীমাবদ্ধ তাহাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। জীবতত্ত্বের নানা আধুনিক আবিষ্কার সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতই বিশেষ চমকপ্রদ এবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রজননবিদ্যার মধ্য দিয়া জীবতত্ত্ব জীব ও মানুষের দৈহিক জীবনে নানা মনোমত ও প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করার আশা রাখে, একথা সত্য। জীব ও মানবের নানা দৈহিক বিকৃতি বা ব্যাধির কারণনির্ণয় ও তাহাদের

প্রতিকারেও জীববিজ্ঞান সচেষ্ট ইহা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ইহাদের প্রয়োগক্ষেত্র একান্তভাবেই স্থূল, যান্ত্রিক, দৈহিক জীবন এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, জীবতত্ত্বের দৃষ্টিতে মানুষ বা যে কোনও প্রাণী প্রধানতঃ জীবকোষনির্মিত একটি যন্ত্র। প্রাণের স্বরূপ সম্বন্ধে জীবতত্ত্ব একান্ত অজ্ঞ, মন ও আত্মার রহস্য ঢের দূরের কথা। অথচ এই প্রাণের ক্ষেত্রে, এমনকি দৈহিক প্রাণের ক্ষেত্রেই, অধ্যাত্মবিজ্ঞান কতদূর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া চলিতে পারে, তাহা ভারতের সুপ্রাচীন উপনিষদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজননক্ষেত্রের রহস্যময় বীজপদার্থ (Semen) সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৩।৭।২৩) বলিতেছেন—'যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোহন্তরঃ, যং রেতো ন বেদ, যস্য রেতঃ শরীরম্, যো রেতোহন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ, ... অতোহন্যদার্ত্তম্.........।', অর্থাৎ—'যিনি রেতোমধ্যে বাস করেন, রেতঃ হইতে পৃথক্, যাঁহাকে রেতঃ জানে না, রেতঃ যাঁহার শরীর, যিনি ভিতর হইতে রেতঃকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত। ....অন্য সব কিছুই আর্ত্ত (পীড়িত).........।' এতখানি সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া জীববিজ্ঞান কবে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে যৌনবীজতত্ত্বের সমূহ রহস্য আয়ত্ত্ব করিয়া মনের মত জীব ও মানব গড়িয়া তুলিবে তাহার আশায় আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ কি হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে? এরূপ অলীক কল্পনার উপর যৌনজীবনের তৃপ্তিসাধন করা একটি বিশেষ রকমের মানসিক বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

জড়বিজ্ঞান তথা জীববিজ্ঞান যে প্রকৃতির রহস্যময় রাজ্যে অতি সামান্য অংশ লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকমাত্রেই স্বীকার করেন। জীববিজ্ঞানের যে কোনও ছাত্রের নিকট ইহা সুবিদিত যে জৈব জীবনের বহু প্রাথমিক ব্যাপারও জীববিজ্ঞানের নিকট রহস্যাবৃত। জীববিজ্ঞান ন্যায়-সঙ্গতভাবেই তাহার জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রকে মূলতঃ প্রাণীজগতে স্থূল প্রাণের বিকাশ-প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। যে কোনও জীবতত্ত্ববিজ্ঞানী মানুষের মনোবুদ্ধি ও আত্মার অনন্ত রহস্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করেন না ও করিতে পারেন না। সুতরাং পুংশুক্রকোষ ও স্ত্রীরজঃকোষের মধ্যেই যে যৌন মিলন বা মিশ্রণের বর্ণনা আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি, জীবনের কোন্ মহান্ রহস্যের মহীয়ান্ শক্তি তাহার অন্তরালে ক্রিয়া করিতেছে তাহা Biology বা জীবতত্ত্বের জ্ঞানের সীমার বাহিরে, হয়ত বা তাহার জিজ্ঞাসারও বাহিরে।

এখন আমরা যৌনকাম একটি 'Biological' বা 'জীবতাত্ত্বিক' ব্যাপার—এই কথাটির পিছনে যে প্রথম ভাবটি ক্রিয়া করিতেছে, অর্থাৎ ইহা জৈব স্বভাব ও জৈব প্রয়োজন, সুতরাং স্বাভাবিক—তাহার আলোচনা করিব।

যদি একথা বলা হয় যে যৌনপ্রবৃত্তির সম্মুখে মানুষ জীব হিসাবে খুবই দুর্ব্বল ও অসহায় তবে প্রাথমিক যুক্তি হিসাবে হয়ত তাহা কতটা স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায়। মানুষ সে ক্ষেত্রে তাহার যৌনজীবনের অন্ধ যান্ত্রিকতাকে স্বীকার করে

ও তাহাকে আয়ত্ত করিয়া তাহার ঊর্দ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে বুঝিতে হইবে। যৌনজীবনের অহঙ্কার, দম্ভ ও তাহার অবাধ চরিতার্থতার আকাঙ্খা সেখানে থাকিতেই পারে না।

কিন্তু সত্যিই মানুষ উন্নতস্তরের জীব হিসাবে যৌনপ্রবৃত্তির নিকট এতখানি অসহায় কিনা তাহা স্থিরবুদ্ধিতে বিচারের বিষয়। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বাদ দিলেও সাধারণ জীবনে বিচারশীল ব্যক্তিগণের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পাশ্চাত্য দেশেও মনীষীগণের মধ্যে আমরা এই কথাই শুনিতে পাই। 'The sexual instinct', says Oesterlen Professor at Tubingen University, 'is not so blindly all-powerful that it cannot be controlled, and subjugated entirely, by moral strength and reason', অর্থাৎ—Tubingen বিশ্ববিত্তালয়ের অধ্যাপক Oesterlen বলেন, 'যৌনপ্রবৃত্তি এমন কোনও সর্ব্বশক্তিমান্ অন্ধশক্তি নয় যে ইহাকে নৈতিক শক্তি ও বিচারের দ্বারা সংযত, অথবা সম্পূর্ণরূপে দমিত করা যায় না।' 'The example of the best and noblest among men, says Sir Lionel Beale, Professor at the Royal College in London, 'has at all times proved that the most imperious of instincts can be effectively resisted by a strong and serious will, and by sufficient care as to manner

of life and occupation,' অর্থাৎ—লণ্ডনের Royal Collegeএর অধ্যাপক Sir Lionel Beale বলেন, 'সর্ব্বকালেই শ্রেষ্ঠ মহীয়ান্ ব্যক্তিগণের উদাহরণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবৃত্তিকেও সাফল্যের সহিত বাধা দেওয়া সম্ভব, যদি ইচ্ছাশক্তিকে জোরের সহিত ও ঐকান্তিকভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং জীবনযাত্রা ও কাজকর্ম্মের ধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।' [M. Paul Bureau লিখিত 'Towards Moral Bankruptcy' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক Self-Restraint V. Self-Indulgence গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট] যৌনসম্ভোগ খুব "স্বাভাবিক" ব্যাপার ও নরনারীর দাম্পত্য-জীবনে ইহা বিশেষ প্রয়োজন, এরূপ অজ্ঞান যুক্তি মারাত্মক ভ্রান্তির জনক। নরনারীর দাম্পত্যজীবনে দৈহিক কামের অসংযমই মনীষী Bernard Shaw এর "Marriage is nothing but legalised prostitution", অর্থাৎ— "বিবাহিত সম্পর্ক একটী আইনের দ্বারা সমর্থিত গণিকাসম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়" এই শ্লেষপূর্ণ উক্তিকে সম্ভব করিয়াছে। বস্তুতঃ রিপু-ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় স্বামী-স্ত্রীর মিলনও "স্বাভাবিক" মিলন নয়। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "I must declare with all the power I can command that sensual attraction even between husband and wife is unnatural. ..... Lustless love between husband and wife is not impossible. Man is not a

brute" (Young India পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রহ্মচর্য" বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে), অর্থাৎ — "আমার পক্ষে যতদূর জোরের সহিত বলা সম্ভব আমি ততদূর জোরের সহিতই ঘোষণা করিতেছি যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও ইন্দ্রিয়াসক্তি অস্বাভাবিক। যৌনলালসাবর্জ্জিত ভালবাসা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসম্ভব নহে। মানুষ পশু নয়।"

মানুষের জীবনের ব্যক্তিত্ব বা নিজস্ব জীবনের একটা বিশেষ মূল্যবোধ ও গুরুত্ববোধ রহিয়াছে। পশুদের তাহা নাই। সকল মানুষের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য, ইহার জন্য 'ধার্ম্মিক' বা 'সাধুসন্ন্যাসী' হইতে হয় না। ভোগের ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। সুতরাং মানুষ হিসাবে ভোগজীবন একমাত্র মানবিক ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতেই সম্ভব। এই মানবিক ব্যক্তিত্ব যেখানে দুর্ব্বল, সেখানে পশুত্বই প্রবল। এইরূপ পশুত্ব লইয়া নরনারীর প্রেমজীবন বা দাম্পত্যজীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। এজন্য বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্মচর্যহীনতা একটা 'অস্বাভাবিক' বৃত্তি। উচ্চতর আধ্যাত্মিক বা ত্যাগের জীবনে ত কথাই নাই।

প্রকৃতির নিম্নস্তরে বৃক্ষলতা-জীবজন্তুর জীবনে যাহা স্বাভাবিক, প্রকৃতির উচ্চস্তরে তাহাকেই স্বাভাবিক বলা চলেনা। নরনারীর যৌনমিলনকে এই ভ্রান্ত মনোভাব লইয়াই অনেক সময় অকারণ মহিমার উচ্চ শিখরে বসান হয়। ইহাকে Biological Necessity বা জৈব প্রয়োজন বলা আসলে এই মনোভাবেরই একটা চতুর অজুহাত। এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত

Mr. P. Bureau লিখিত গ্রন্থ হইতে আমরা আরও কয়েকটী উদ্ধৃতি দিতেছি। 'As to the sexual desire, we assert, the intelligence and the will have absolute control over it. It is necessary to employ the term sexual *desire*, not *need*, for there is no question of a function, the non-accomplishment of which is incompatible with existence. Really it is not a need at all; but many men are persuaded that it is" (Dr. Escande), অর্থাৎ —"যৌন কামনা সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় মত এই যে বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি ইহাকে সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনিতে পারে। যৌন 'প্রয়োজন' এর পরিবর্ত্তে যৌন 'কামনা' কথাটী প্রয়োগ করা উচিত, কারণ এখানে এমন কোনও স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রশ্ন নাই যাহা না করিলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়। আসলে ইহা মোটেই একটী প্রয়োজন নয়; কিন্তু অনেকেরই এরূপ ভুল ধারণা।" —(ডাক্তার Escande) অপিচ, "A fiction," writes Dr. Toulouse, "which often hinders the happiness of married life, is that the instinct of love is a tyrant and must be satisfied at any price......... Now the very characteristic quality of man, and the apparent end of his evolution, is an ever-growing independence of his appetites.",

অর্থাৎ—ডাক্তার Toulouse লিখিয়াছেন, "যে কাল্পনিক ধারণা প্রায়ই বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি নষ্ট করে তাহা এই যে কামপ্রবৃত্তি এমন একটী অমিতক্ষমতাশালী শক্তি যাহাকে যে কোনও মূল্যে তৃপ্ত করিতেই হইবে। ....কিন্তু মানুষের লক্ষণই হইল এই যে সে প্রবৃত্তির ক্ষুধা হইতে উত্তরোত্তর মুক্তি লাভ করিতে পারে, এবং ইহাই মানুষের বিকাশোন্মুখ বিবর্ত্তনের লক্ষ্য বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।" Reader's Digest (Sept, 1960) পত্রিকায় জনৈক বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী (Sylvanus Duval) লিখিয়াছেন –, 'To say that sex is beautiful and good is as meaningless as to say that liquids are nourishing and delicious ...... Sex can be beautiful and good or neurotic and vicious', অর্থাৎ— 'পানীয়মাত্রেই পুষ্টিকর ও সুস্বাদু, এইরূপ কথা বলা যেমন অর্থহীন, যৌনমিলন একটি সুন্দর ও ভাল জিনিষ বলাও তদ্রূপ অর্থহীন। ....যৌনমিলন যেমন সুন্দর ও ভাল হইতে পারে, তেমনি স্নায়ুবিকারগ্রস্ত ও পাপপূর্ণও হইতে পারে।' বিবাহিত জীবনের সাফল্যের জন্য সন্তোষজনক যৌনসঙ্গম একান্ত আবশ্যক, এই ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি—'In many successful marriages satisfactory sexual adjustments are achieved late or not at all.', অর্থাৎ—'বহু সার্থক বিবাহিত জীবনে মনোমত যৌন-সম্পর্ক হয় বহু বিলম্বে ঘটে অথবা মোটেই ঘটে না।' যৌন-সঙ্গম কেমন করিয়া নরনারীর প্রেমসম্বন্ধকে কলুষিত ও শুষ্ক

করিয়া দেয়, সে বিষয়েও তাঁহার উক্তি—'These facts help to explain what puzzles many engaged couples—that the establishment of sex-relationship has cooled their love rather than increased it.', অর্থাৎ—'এইরূপ বাস্তব ঘটনাবলী হইতেই বিবাহকামী প্রণয়ী-যুগলের জীবনের যাহা ধাঁধা হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ যৌনসম্পর্ক স্থাপনের পর হইতে তাহাদের ভালবাসা বৃদ্ধি না পাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায় কেন,—এই রহস্যের উত্তর পাওয়া যায়।' নারীগণ যৌনসঙ্গম-ক্ষুধাতুরা, এই ভ্রান্ত ধারণার বশেও পুরুষেরা অনেক সময় যৌনসম্পর্কের মধ্য দিয়া নারীর তৃপ্তিসাধন ও তাহার সহিত প্রেমসম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়। এই সম্বন্ধেও উক্ত লেখক বলেন—'According to the Kinsey studies, only a small proportion of women are so highly sexed that a lack of sexual relationship is distressing.' অর্থাৎ—'Kinsey গবেষণা অনুযায়ী (ইহা প্রমাণিত যে) খুব কম সংখ্যক নারীই এত তীব্র যৌনভাবাপন্না, যে যৌনসম্পর্কের অভাব তাহাদের কষ্টকর হইতে পারে।'

যৌনমিলনের অভাবে বা সংযমে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় ইহা অপর একটি মারাত্মক ভ্রান্তি। এ বিষয়েও আমরা পূর্ব্বোক্ত M. P. Bureau র গ্রন্থ হইতে আরও কতকগুলি প্রামাণ্য উদ্ধৃতি দিতেছি। 'There was also a unanimous declaration issued by the professors of the Medical Faculty of Christiania University

a few years ago : 'The assertion that a chaste life will be prejudicial to the health rests, according to our unanimous experience, on no foundation. We have no knowledge of any harm resulting from a pure and moral life.'......
......'Dr. Viry is therefore right in denying that the question is one of a true instinct or a real need. 'Every one knows what it would cost him not to satisfy the need of nourishment or to suppress respiration, but no one quotes any pathological consequences either acute or chronic, as having followed either temporary or absolute continence", অর্থাৎ—'কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Christiania বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলী একবাক্যে একটি ঘোষণা বাহির করেন। তাহা এই—'সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে, এরূপ উক্তি, আমাদের সর্ব্বসম্মত অভিজ্ঞতা অনুসারে, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পবিত্র ও নৈতিক জীবন যাপনের ফলে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এরূপ কিছুই আমাদের জানা নাই।' ....'সুতরাং ডাক্তার Viry ইহাকে একটি সত্যকার অনিবার্য্য প্রবৃত্তি বা বাস্তব প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার না করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। 'প্রত্যেকেই জানেন যে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে অথবা শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ রাখিলে তাহার পরিণাম কি দাঁড়ায়, কিন্তু কেহই

চিরস্থায়ী বা সাময়িক সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের ফলে তীব্র অথবা জটিল কোনও শারীরিক কুফল দাঁড়াইয়াছে, তাহা বলিতে পারেন না।"

চৈতন্যাতীত কোন্ পরম সত্যের লীলা জড়ে, জীবে ও মানবে প্রতিস্পন্দিত হয়, তাহা একমাত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অধিগম্য। সুখের বিষয় জড়জগৎ ও জীবজগতে চরমতত্ত্বের অনুসন্ধান ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক জগতের তত্ত্বের দিকেই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিতেছে। Matter, Energy এবং Spirit অর্থাৎ জড়, শক্তি ও চৈতন্য ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটতর হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দর্শনের ক্ষেত্রে ইহা অনেকখানি স্বীকৃত।

জীবজগতের যাবতীয় 'মানসিক' ক্রিয়াকে জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবার একটা প্রবৃত্তি অনেক জীবতাত্ত্বিকের মধ্যে দেখা গেলেও অন্য অনেকে যথেষ্ট প্রমাণ সহযোগে Vitalism বা প্রাণবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দর্শনের দিক্ দিয়া Bergson জড়জগতে ও জীবজগতে মুক্তচৈতন্যের লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। ফরাসী লেখক Alfred Binet জীব-জগতের অতি নিম্নস্তরে অর্থাৎ সূক্ষ্মতম জীবকোষের মধ্যেও চেতনা বা মানসিক ক্রিয়ার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। পুংজননকোষ ও স্ত্রীজননকোষের মধ্যে যৌনমিলনসদৃশ মিলনের ও মিশ্রণের কথা তাঁহার গ্রন্থ হইতে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শুক্রবীজ রজোবীজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পরই তিনি একটি কৌতূহলজনক চিত্রেরও বর্ণনা দিয়াছেন। ......'The head presents the

appearance of a radiate figure, of diminutive sun advancing towards the female nucleus', অর্থাৎ—'......শুক্রবীজের মাথাটি একটি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের আকারে দেখা যায়, ঠিক্ যেন একটি ক্ষুদ্রাকার সূর্য্য রজোবীজের কেন্দ্র-বস্তুর দিকে অগ্রসর হইতেছে।' এই সামান্য চিত্রটি বৈজ্ঞানিক অনুবীক্ষণের তলায় দৃষ্ট, সুতরাং প্রামাণ্য। তবুও প্রচলিত জীবতত্ত্বের বিচারে ইহার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য গৃহীত হইতে না পারে। কারণ, মানুষের দৈহিক জীবনের ঊর্দ্ধে যে আত্মিক জীবন রহিয়াছে, সেই জ্যোতির্ম্ময় স্তরের কথা চিন্তা করা জীবতাত্ত্বিকের এলাকার বাহিরে।

মানুষের দেহমনোবুদ্ধির স্বাভাবিক সুস্থতা ও শক্তিমত্ত্বা প্রধানতঃ নির্ভর করে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের উপর। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ধারণাশক্তি যাহাকে ভারতীয় শাস্ত্রে 'মেধা' বলা হয়, তাহার উৎপত্তিও অনেকখানি নির্ভর করে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম গঠন ও বিকাশের উপর। ইহা ছাড়া সাধারণভাবেও ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির সুস্থতা ও সজীবতাও অনেকাংশে সুস্থ ও সজীব স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত যে প্রচুর যৌনজননকোষ অপব্যয়িত না হইলে ইন্দ্রিয়-স্নায়ু-মস্তিষ্কের স্বাভাবিক সৃজন-সংগঠনের কাজে লাগিতে পারে। নিম্নগামী প্রজনন (generation) ক্রিয়ার স্থলে ইহাকে ঊর্দ্ধগামী সংসৃজন (Regeneration) ক্রিয়া বলা হইয়াছে। ইহাই সম্ভবতঃ ভারতীয় 'ঊর্দ্ধরেতস্ত্বম্।' সে যাহা হউক, এই সংসৃজন (Regeneration) ক্রিয়া সম্বন্ধে W. L. Hare

লিখিত সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'Generation and Regeneration' (The Open Court Journal), হইতে আমরা কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 'The nervous system—cerebro-spinal and sympathetic—is, like all other organs, built up of cells that have once been germ-cells, drawn from the deepest seat of life : in continuous streams they are distributed and differentiated to the ganglia of the systems, and of course in immense quantities to the brain. Withdrawal of germ-cells from their upward regenerative course for generative or merely indulgent purposes deprives the organs of their full replenishing stock of life, to their cost, slowly and ultimately', অর্থাৎ—'অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মত মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয় ও সংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রও যে সব জীবকোষ দ্বারা গঠিত তাহারা এক সময়ের প্রজননকোষ, ও জীবনের গভীরতম প্রদেশ হইতে আহৃত। নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে তাহারা স্নায়ুতন্ত্রের গ্রন্থি-গুলিতে ছড়াইয়া পড়ে ও বিশিষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং বিশেষ ভাবে মস্তিষ্কে তাহারা বিপুল পরিমাণে সঞ্চারিত হয়। প্রজনন-কোষগুলিকে এই ঊর্দ্ধগামী সংস্থজনকারী পথ হইতে বংশবৃদ্ধি অথবা নিছক কামচরিতার্থতার উদ্দেশ্যে নামাইয়া আনিলে ইন্দ্রিয়-গ্রাম তাহাদের প্রাণশক্তির সম্যক্ পরিপূর্ত্তি হইতে বঞ্চিত হয়,

এবং ক্রমশঃ ইহার পরিণামে তাহারা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' সুতরাং আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বাদ দিলেও দেহমনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সজীবতার জন্যও সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা উপরের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে।

Physiology বা শরীরতত্ত্বের দিক্ দিয়া ব্রহ্মচর্য্যসাধনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা ভক্ত দেশসেবক অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ' পুস্তক হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। 'All eminent physiologists agree that the most precious atoms of blood enter into the composition of the semen.', অর্থাৎ—'সমস্ত বিশিষ্ট শরীরতত্ত্ববিৎ এ বিষয়ে একমত যে রক্তের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অণু হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়।' (ডাক্তার লুই লিখিত 'Chastity' নামক পুস্তক হইতে)। পুনশ্চ—'It is a medical—a physiological fact that the best blood in the body goes to form the elements of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life, this matter is re-absorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve and muscular tissue.', অর্থাৎ—'ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত ও শরীরতত্ত্বসম্মত সত্য যে শরীরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রক্ত হইতে নর ও নারী উভয়ের মধ্যে প্রজননের উপাদান উৎপন্ন হয়। সংযত ও পবিত্র জীবনে এই উপাদান পুনরায় শরীরে মিশিয়া যায়। ইহা রক্তের স্রোতে ফিরিয়া গিয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংস-

পেশী গঠনে সহায়তা করে।' (ডাক্তার নিকল্‌স লিখিত 'Esoteric Anthropology' গ্রন্থ হইতে)।

বেদ-উপনিষদ্ ও যোগশাস্ত্রে শারীরিক ব্রহ্মচর্য্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কারণ ইহা হইতে 'ব্রহ্মবর্চ্চঃ' বা স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য এবং ওজঃশক্তি লাভ হয়। ইহা হইতেই আধ্যাত্মিক ধীশক্তি বা 'মেধা' লাভ হয়। ইহাই মনুষ্যত্বের ভিত্তি। স্নায়ুতে ও মস্তিষ্কে এইভাবে শক্তি সঞ্চিত না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনেও উন্নতি করা অসম্ভব। এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ', অর্থাৎ 'বলহীন আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।'

জীবতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনার সূত্রে আমাদের এ কথাও বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে নরনারীর যৌন আকর্ষণ ও যৌনমিলনের মধ্যে এমনিতেই অশুচি বলিয়া কিছু নাই। বরং এই আকর্ষণ ও মিলনকে ভিত্তি করিয়াই মনুষ্যজীবনের সন্ততপ্রবাহ ও মানবসভ্যতার বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীনভারতীয় সামাজিক ঐতিহ্যে যৌনকামের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা যথেষ্টই স্বীকৃত ছিল। ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে বহুস্থানে আমরা নিঃসঙ্কোচ যৌন আলোচনা দেখিতে পাই। কিন্তু তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য উচ্চতর মানবজীবনের বিকাশসাধন করা। উদাহরণস্বরূপ, উপনিষদের স্থানে স্থানে দৈহিক যৌন-মিলনকে 'যজ্ঞ'দৃষ্টিতে দেখিবার ও উপযুক্ত সন্তানের জন্ম দিবার পন্থা বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যৌনজীবনের

বিকারকেও দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা ও সাধনাও রহিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থে নরনারীর যৌন-সম্পর্কের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। কোথাও তাহাকে ঘৃণ্য বা অশ্লীল দৃষ্টিতে দেখা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব। কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে এই যৌনসম্পর্ক সেখানে দুর্ব্বল, বিকৃত কামনার উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। আমরা এ যুগে যে 'moral squeamishness' বা 'নৈতিক খুঁৎখুঁতেমি'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, সে যুগে তাহার প্রয়োজনই ছিল না। ভারতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ গীতাতে ভগবানের সত্তা ধর্ম্মসঙ্গত যৌনকামের মধ্যেও বিদ্যমান, এ কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। 'ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামোহস্মি' (গীতা, ৭।১১)। এইরূপ সুস্থ-সংযত যৌনজীবনের উপরই মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অনেকখানি সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য নির্ভর করে। ইহাই ভারতের 'family life' বা পারিবারিক জীবনকে একটি আশ্রমের মর্য্যাদা দিয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যই ছিল তাহার ভিত্তি।

এখন বিষয়টি মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিবার ও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রেই যাহা মনে আসে তাহা আধুনিক অবচেতন-মনস্তত্ত্ব ও ফ্রয়েডীয় কামতত্ত্বের কথা। কারণ, এই মতবাদ মানুষের চিন্তাধারায় একটি আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। সহজ কথায় বলিতে গেলে এ যুগের যৌনমনস্তত্ত্ব নীতিধর্ম্মের রাজ্যে একটা ওলট-পালট আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু এক্ষেত্রেও সূক্ষ্ম বিচারের সাহায্যে সত্যনির্ণয় করিতে হইবে। কাজটি এখানে আরও দুরূহ, কারণ মনস্তত্ত্ব মন লইয়া কারবার করে, সুতরাং মনের মধ্যেই সংশয় বা ভ্রান্তসংস্কার উৎপন্ন হইলে প্রতিকার সহজ হয় না। কিন্তু স্থির, নিরপেক্ষ বুদ্ধির সাহায্যে অগ্রসর হইলে এই ভ্রান্তসংস্কারের জটাজাল হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। এই 'স্থির, নিরপেক্ষ বুদ্ধি'কে যোগজবুদ্ধি বা যোগদৃষ্টি বলা যায়। অধ্যাত্মশাস্ত্র বলেন, 'মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ' (গীতা, ৩।৪২), অর্থাৎ—'মনের উপরে বুদ্ধি এবং বুদ্ধির উপর তিনি বা আত্মা।' এই আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি যোগজবুদ্ধি এবং উহাই যোগদৃষ্টি। কামনা এবং কাম যখন ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তখন সংযমসাধনা বা ব্রহ্মচর্যাসাধনার একমাত্র উপায় বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। এই শুদ্ধবুদ্ধির দৃষ্টি লইয়া আমাদের এই সমস্যাটির সমাধান করিতে হইবে।

কিন্তু প্রথম কথা এই যে, ব্যাধিচিকিৎসায় যে তত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রয়োগ, তাহা স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষের জীবনে প্রযুক্ত হয় কোন্ যুক্তিতে? তাহা ছাড়া, মানসিক ব্যাধি-চিকিৎসার দিক্ দিয়াও এই অবচেতনতত্ত্ব ও কামতত্ত্বের প্রয়োগে এমন অনেক ফাঁক রহিয়াছে যাহাতে ইহাদিগকে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না। উদাহরণ স্বরূপ, নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামনাকে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার দ্বারা সজ্ঞান মনের স্তরে লইয়া আসিলেও, মানসিক ব্যাধি সাময়িক উপশমসত্ত্বে অনেক ক্ষেত্রে পুনরায় দেখা দেয়। ইহার যুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিক উত্তর

পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া, এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে। ফ্রয়েড (Freud) মানসিক বিকারের চিকিৎসায় যে কামতত্ত্বের উপর সম্যক্ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা অন্য অনেক বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকের মতে অসঙ্গত। উদাহরণস্বরূপ, Adler, Jung ও অন্য অনেকে মানসিক বিকারের চিকিৎসায় কামতত্ত্বের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেন না। যৌনকামকে তাঁহারা জীবনের মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকারও করেন না।

আমরা অবশ্য এতটা যাই না। আমরা কামতত্ত্বকে দৈহিক জীবনের মূলতত্ত্ব বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করি। ভারতীয় প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ইহা স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়াই কামসংযম বা ব্রহ্মচর্য্যের উপর আধ্যাত্মিক জীবনসাধনার সৌধকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইহার উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই একমত।

কিন্তু ভারতীয় যোগদৃষ্টিতে কাম দৈহিক জীবনের মূল তত্ত্ব হইলেও মানুষের উচ্চতর সত্তাজীবনের মূলতত্ত্ব নহে। মানুষের উচ্চতর জীবনসত্বার মূলতত্ত্ব হইতেছে প্রেম বা 'আনন্দ'। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই প্রেম বা 'আনন্দ' সাধারণ দৈহিক জীবনের বা জাগতিক জীবনের কোনও ভাব নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে সাধারণ চেতনার যখন রূপান্তর ঘটে তখনই যে সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বাধার জীবনরসের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাই প্রেম বা

'আনন্দ'। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি ভাবাতীত মহাভাব। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহাকে 'রস' বলা হইয়াছে। 'রসো বৈ সঃ'। বলা বাহুল্য, ইহাও কোনও প্রচলিত রস নয়, ইহা পূর্ব্বলিখিত রূপান্তরিত চেতনায় নিহিত সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বাধার জীবনরস। এই 'রসকে' দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার উপনিষদের অনুবাদে 'Essence of Life' বলিয়াছেন, ইহাই মানুষের উচ্চতর জীবনসত্বার মূলতত্ব। ইহাতেই মানুষ নিত্যানন্দ ও অভয় লাভ করে ('লব্ধানন্দী ভবতি.........অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে')। এই জীবনরসই স্থুল প্রাণীজীবনে নিম্নমুখী বা অধোগামী হইয়া কামরূপে দেখা দেয়। লিঙ্গমূলে এই অধোমুখী রসশক্তি সঞ্চিত থাকে বলিয়া ঐ স্থানকে যৌগিক ভাষায় মূলাধার চক্র বলে। ইহাই ইতিপূর্ব্বে লিখিত W. L. Hare এর ভাষায় 'The deepest seat of Life', অর্থাৎ—'জীবনের গভীরতম অবস্থানভূমি।' এখানেই যৌনকামশক্তির উদ্ভব ও ক্রিয়া। এই শক্তি নিম্নমুখী হইয়া অবৈধ প্রজনন বা স্বেচ্ছা-চারিতায় অপব্যয়িত হয়। এখানে প্রেমশক্তি হয় কামশক্তি, আনন্দশক্তি হয় উত্তেজনা-কণ্ডূয়নশক্তি। ইহাই মানুষের ও সর্ব্বজীবের দৈহিক চেতনার ভিত্তি। এখানে অন্ধভাবে Generation বা বংশবৃদ্ধিক্রিয়ার স্রোত বহিতে থাকে। ইহাকে সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় ঊর্দ্ধগামী করিলে W. L. Hare এর ভাষায় Generation এর পরিবর্ত্তে Regeneration, অর্থাৎ আত্মবিসৃজনের পরিবর্ত্তে আত্মসংসৃজনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। প্রথমটি আত্মার মৃত্যুর গতি এবং দ্বিতীয়টি

আত্মার জীবনের গতি। শাস্ত্রে ইহাকেই বলিয়াছেন 'মরণং বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ।' দেহের মৃত্যু ও দেহের জীবন ইহার তুলনায় নগণ্য। এই মহামৃত্যুকে এড়াইয়া ঐ মহাজীবন লাভ করাই Human Evolution বা মানবীয় অভিব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য। ইহার অভাবে মানবীয় সভ্যতা 'Intelligent Animal' বা বুদ্ধিমান্ পশুর সভ্যতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। আধুনিক যুগে ইহাই মূল সমস্যা।

জীবনের এই আধ্যাত্মিক রসশক্তি যখন আধিভৌতিক বা জৈবস্তরে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহা ঐ উর্দ্ধশক্তির একটি অক্ষম অনুকরণ মাত্র। এখানে ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের 'বিদ্যা-অবিদ্যা' ইত্যাদির দার্শনিক প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে না যাইয়া আমরা এইটুকু মূলসত্য গ্রহণ করিতে পারি যে মানুষের নিত্যমুক্ত স্তরের আনন্দ যখন নিত্যবদ্ধ স্তরে আত্ম-প্রকাশ করে তখন তাহা প্রধানতঃ যৌনকামের রূপ পরিগ্রহ করে। এই যৌনকাম দেহমনোবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া যৌন-তৃপ্তির সহিত অন্যান্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেও নেপথ্যে থাকিয়া পরি-চালিত করে। এজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—বহির্জগতের যাবতীয় ভাব, এক কথায় দৈহিক জীবনের যাবতীয় 'বিষয়' মানুষের চেতনাকে আকৃষ্ট ও আসক্ত করিয়া কামের উৎপত্তি ঘটায়। এই কাম হইতে ক্রোধ, মোহ, লোভ ইত্যাদি সঞ্জাত হয়। 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ ......।' (গীতা, ২।৬২)। এই কাম মূলতঃ যৌনকাম হইলেও ইহা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া সর্ব্ববিধ কামের

জনক। ইহার লক্ষণই হইতেছে সাময়িক একটু তৃপ্তিবোধ, তারপর আত্মনাশের বিষক্রিয়া। 'বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্। পরিণামে বিষমিব.........।' (গীতা—১৮।৩৮)। এই 'বিষয়রস'ই উচ্চতর মানবজীবনের তথা অধ্যাত্মজীবনের চরম পরিপন্থী। ভারতীয় সাধকদের ভাষায় বলা যায়--'যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম', অর্থাৎ 'যেখানে কাম আছে, সেখানে রাম বা ঈশ্বর নাই।' আমরা আধুনিক জীবনের পরিভাষায় বলিতে পারি, সেখানে মানুষের মনুষ্যত্বও নাই। এই জন্য জৈবজীবনের বা জাগতিক জীবনের যাবতীয় প্রবৃত্তি—যাহাদের ইংরাজীতে 'Instincts' বলা হয় তাহারা সকলেই এই একই যৌনকামের সমসূত্রে গ্রথিত। এইজন্যই ধনকাম, জনকাম বা প্রভুত্বকাম সকলই একই কামের বিভিন্ন প্রকাশ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অধোমুখী কামবৃত্তি আসলে ঊর্দ্ধমুখী প্রেম বা আনন্দের বিকৃত প্রকাশ মাত্র। ইহা সত্য জীবনরসের মিথ্যা অনুকরণ। আদি জীবনরস যেখানে আত্মস্থ থাকিয়া 'একোহহং বহু স্যাম্' এই মহাভাব লইয়া ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে আত্মসৃজন করিয়াছেন, বিকৃত কামরস সেখানে আত্ম-বিচ্যুত হইয়া এক মহা-অভাববোধের তাড়নায় বহুত্বের পিছনে ছুটাছুটি করিতেছে। ইহাই মানুষের জীবনে নিত্য ব্যর্থতাবোধের কারণ। ইহাই জৈব আত্মবিসৃজন বা 'Generation' এর মূল কথা। সুতরাং মনুষ্যজীবনের একমাত্র সার্থকতার তৃপ্তি আসিতে পারে এই আত্মবিসৃজনের পরিবর্ত্তে আত্মসংসৃজনের মধ্য দিয়া।

ইহাই সত্যকার 'Creative Activity' বা সৃজনক্রিয়া। একমাত্র ইহারই মধ্য দিয়া জৈব মানবের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটে। বলা বাহুল্য, ইহা কামবৃত্তির পরিমিত চরিতার্থতাও নহে, ইহা কাম-মানসিকতারই আমূল পরিবর্ত্তন। ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইবে, এই ব্রত-উদ্‌যাপনের পর প্রাচীন ভারতে কামের সদ্ব্যবহারের প্রশ্ন উঠিত। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গার্হস্থ্য আশ্রম।

কিন্তু এই জীবনরসকে ঊর্দ্ধগামী করার অর্থ কোনও কৃত্রিম 'Repression' বা অবদমন নয়। এই 'Repression' বা অবদমন কথাটি আধুনিক ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে এক বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা সামাজিক বা নৈতিক অনুশাসনের চাপে ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যৌনকামনাকে প্রকাশিত না করিয়া অবচেতন বা নির্জ্ঞান (Unconscious) মনের কোঠায় সরাইয়া রাখাকে বুঝায়। ইহার ফলে Hysteria (হিষ্টিরিয়া)-জাতীয় বিকার দেখা দেয়। যৌনকামনাকে এইভাবে চাপিয়া রাখা কিন্তু সজ্ঞানে আত্মসংযম করা নয়। ইহার পিছনে অবচেতন বা নির্জ্ঞান (Unconscious) মনের ক্রিয়াই প্রবল। এই সামান্য ব্যাপারটিও সাধারণের মধ্যে এত অজ্ঞাত যে ইহার ফলে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও সাধারণভাবে যৌনমনস্তত্ত্বের নামে কামপ্রবৃত্তির ঢালা অসংযম ও স্বেচ্ছাচারিতাই চারিদিকে রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই ভ্রম ও উদ্‌ভ্রান্ত ভাবের 'ফ্যাশান' যে কত মারাত্মক তাহা আধুনিক সমাজজীবনে নগ্ন যৌন-অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাই

জানেন। শুধু সমাজজীবনে নয়, আধুনিক সাহিত্যে ও দর্শনে পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, একদিকে বহির্দ্দেশদর্শী মার্ক্সীয় সাম্যবাদ ও অপরদিকে অধোদেশদর্শী ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব, ইহারাই যেন আজিকার কেন্দ্রচ্যুত মানবীয় সভ্যতার নিয়ামক। বিকৃত কামকাঞ্চনবাদের এই মণিকাঞ্চনসংযোগের ফলে আজ গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যাবতীয় অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে দানবীয় বীভৎসতা ও উলঙ্গ ধৃষ্টতা রাজত্ব করিতেছে। এসব কথা আরও কিছু বিস্তারিত ভাবে আমরা 'সমাজ ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম তাহা এই যে ফ্রয়েডীয় 'Repression' বা অবদমনের অর্থ প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দমন বা সংযম নয়। অসংখ্য সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ স্মরণাতীতকাল হইতে নানাভাবে প্রবৃত্তিদমন ও আত্মসংযম করিয়া চলিয়াছে এবং ইহারাই মনুষ্যসভ্যতাকে যুগে যুগে নানা আদর্শে রূপ দান করিয়াছে। মনুষ্যসভ্যতা আজিও যেটুকু দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা এই স্বাভাবিক মানুষের প্রবৃত্তিদমন বা আত্মসংযমের অবদান।

ফ্রয়েডীয় যৌনকামতত্ত্ব এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট আধুনিক মনস্তত্ত্ব কোথাও Neurosis বা স্নায়বিক-মানসিক বিকার দূর করিবার জন্য যৌনপ্রবৃত্তির ইচ্ছাকৃত অসংযম করিতে বলে নাই। মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবদমিত

যৌন-আকাঙ্খা (Repressed Sexual Desire) যাহাতে রোগীর নির্জ্ঞান (Unconscious) মন হইতে সজ্ঞান (Conscious) মনে ভাসিয়া উঠে এবং রোগী সজ্ঞানে সেটিকে লইয়া স্বাভাবিকভাবে চলিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা হয়। তথাকথিত Repression বা অবদমন বর্জ্জনের নামে মানসিক সুস্থতালাভের অজুহাতে যাহারা যৌনকামের অসংযম বা স্বেচ্ছাচার প্রকাশ করার পক্ষপাতী, তাহারা যে কত মারাত্মক ভুল করে তাহা প্রমাণ করার জন্য আমরা একটি উদ্ধৃতি দিতেছি। বিখ্যাত আধুনিক মনোবিশ্লেষক, চিকিৎসক ও লেখক J. H. van der Hoop তাঁহার Character and the Unconscious গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'It would be foolish to attempt the cure of such patients merely by providing them with direct sexual satisfaction. Not only would other emotions oppose this very strenuously, but the whole temper of their emotional life is too delicate and complex to find satisfaction in a coarse and elementary manner. What is needed is that by increasing the sphere of their consciousness, they should attain a new harmony of emotions.' অর্থাৎ,—'এইজাতীয় রোগীদের (যাহারা যৌনকামের অবদমনের ফলে স্নায়বিক-মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত) সোজাসুজি স্থূল যৌনতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়া রোগমুক্ত করিবার

চেষ্টা একটি মূর্খের মত কাজ হইবে। তাহাদের মনের অন্যান্য আবেগ ইহার প্রতিবন্ধক হওয়া ছাড়া তাহাদের আবেগ-জীবনের বিশিষ্ট ধারা এইরূপ স্থূল ও প্রাথমিক চরিতার্থতায় তৃপ্তি পাইতে পারে না, কারণ ঐ আবেগের জীবন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল। যাহা সত্যিকার প্রয়োজন তাহা হইতেছে এই যে তাহাদের চেতন বা সজ্ঞান মনের ক্ষেত্রকে এমনভাবে বিস্তৃত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা তাহাদের আবেগের রাজ্যে এক নূতন সাম্য ও সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়......' বিখ্যাত আধুনিক যৌনমনস্তত্ত্ববিৎ ও চিকিৎসকের এই উক্তি হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে Repression বা যৌনকামের অবদমন বর্জ্জন করার নামে ও মানসিক বা স্নায়বিক বিকারমুক্তির নামে যৌনপ্রবৃত্তির অবাধ সম্ভোগ বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থিত নয়। অসুস্থ বা অস্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেই এতদূর। সুতরাং সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে ঐভাবের অজুহাতে অবাধ কাম-চরিতার্থ করা নিতান্তই যুক্তিহীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রকারান্তরে ইহা, যে মানসিক দুর্ব্বলতার ফলে যৌন অবদমন ও মানসিক-স্নায়বিক বিকারাদি ঘটে, তাহাকেই ডাকিয়া আনে বা তাহার তীব্রতা বাড়াইয়া তোলে। সুতরাং এই দুর্ব্বুদ্ধি মানুষের নৈতিক দুর্ব্বলতা ও মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি করিবার পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারতীয় যোগদৃষ্টিতে দেখিলে এইজাতীয় মনোবিকার বা স্নায়বিক বিকারের মূল কারণ রোগীর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তীব্র এক তমোগুণ। আধুনিক মনস্তত্ত্ব যেখানে অন্ধভাবে যুক্তির

জোড়াতালি দিয়া 'Heredity' বা 'বংশগতভাব' বলিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দেয়, ভারতীয় প্রজ্ঞাদৃষ্টি সেখানে জন্মান্তরীন সংস্কারের কথা বলে। এবং যাবতীয় চারিত্রিক দুর্ব্বলতা বা 'পাপ' হইতে মুক্তির জন্য মানুষের ব্যক্তিত্বকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহাই সাধনা। মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব অবদান। এই জন্মান্তরীন তমোগুণের কোনও বিশিষ্ট দুর্ব্বলসংস্কারের বশেই মানুষের মনে নানাবিধ প্রবৃত্তির তাড়না বা ঘটনার আঘাত 'স্বাভাবিক' প্রতিক্রিয়ার পরিবর্ত্তে বিকৃত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইহারই ফলে তথাকথিত অবদমন ও স্নায়ুমনোবিকার দেখা দেয়। আধুনিক ফ্রয়েডীয় ও তাহার সগোত্র মনস্তত্ত্বও ইহা স্বীকার না করিয়া পারে নাই। সভ্য মানবের সমাজে নানাবিধ কামনাদমন সকল মানুষকেই করিতে হয়, কিন্তু বহু 'স্বাভাবিক' মানুষ ইহার ফলে অবদমন ও তাহার কোনও অসুস্থ প্রতিক্রিয়ায় পীড়িত হয় না কেন, এ সম্বন্ধে ফ্রয়েড্ ও তাঁহার সজাতীয় মনস্তাত্ত্বিকদের চিন্তা করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত J. H. van der Hoop এর সুচিন্তিত গ্রন্থ হইতে আমরা পুনরায় কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। 'If hysterical symptoms usually occur whenever there has been repression, one would surely expect them to occur more frequently. Does not civilisation compel us everyday to repress our emotions, and are they not frequently of a violent character? This,

then, is not enough to explain how hysterical symptoms arise. Freud discovered that it was not always the repression of strong emotions that was the cause of morbid symptoms. Sometimes they would appear with relatively small occasion ....At first Freud considered these events of early childhood, which had led to conflict and repression, to be actually the predisposing causes of mental disease, especially of hysteria. But he soon abandoned this view, when further investigation showed that many normal people had similar conflicts in early youth, which yet had not resulted in morbid conditions in later life', অর্থাৎ—'যদি অবদমন হইলেই হিষ্টিরিয়াজাতীয় বিকারের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহা আরও অনেক বেশী ক্ষেত্রে ঘটিতে দেখা যাইত। সভ্যতার ফলে কি প্রত্যহই আমাদের ভিতরের আবেগ দমন করিতে হয় না? অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি কি তীব্র আকারের নয়? সুতরাং ইহা পরিষ্কার যে মাত্র এইভাবে স্নায়ুমনোবিকারের লক্ষণপ্রকাশের ব্যাখ্যা করা যায় না। ফ্রয়েড্ দেখিলেন যে, সব সময় তীব্র আবেগদমনের ফলেই যে বিকার-লক্ষণ দেখা যায় তাহা নহে। কখনও কখনও ছোটখাট ঘটনা হইতেও তাহাদের উদ্ভব ঘটে। ....প্রথমে ফ্রয়েড্ মনে

করিলেন যে শৈশবের ঘটনাবলী হইতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অবদমন ঘটে এবং তাহা হইতেই মানসিক বিকার, বিশেষতঃ হিষ্টিরিয়ার প্রবণতা জন্মে। কিন্তু তিনি শীঘ্রই এই মত বর্জ্জন করিলেন, কারণ আরও অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যে বহু স্বাভাবিক ব্যক্তি শৈশবে ঐজাতীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া গিয়াছেন অথচ তাহা হইতে তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবনে কোনও কুফল দেখা যায় নাই। ইহার পর ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন—'We must suppose either that there was something peculiar in the child which made it more susceptible to the unfavourable influence of certain events, or that the child had experienced a conflict of emotions solely through its imagination. These deviations, which lead to hysterical symptoms, are not therefore provoked by circumstance alone, but also by disposition.', অর্থাৎ—'আমাদের অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে শৈশবে তাহার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার জন্য সে কতকগুলি বিরুদ্ধঘটনার প্রভাবে স্বভাবতঃই অধিক প্রভাবিত হইয়াছিল, অথবা শৈশবে সে নিছক তাহার কল্পনার মধ্য দিয়াই একটি আবেগময় অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম, যাহার ফলে স্নায়ুমনোবিকার দাঁড়ায়, এগুলি কেবল মাত্র বাহ্যিক ঘটনার ফলে ঘটিতে পারে না, রোগীর নিজস্ব স্বভাবও ইহার জন্য দায়ী।'

উপরোক্ত প্রামাণ্য উদ্ধৃতি হইতে এখন পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে আধুনিক মনস্তত্ত্বের মতেই স্নায়ুমনোবিকারের জন্য রোগীর ব্যক্তিগত স্বভাবই অনেকখানি দায়ী। ফ্রয়েড অবশ্য তাঁহার এই স্বীকৃতিসত্ত্বেও তাঁহার নিজস্ব ভাবধারায় চিন্তা করিতেন। সেজন্য ব্যক্তিগত স্বভাব আবার কেমন করিয়া বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই পথেই তাঁহার গবেষণা অগ্রসর হয়। এভাবে Infantile Sexuality বা শৈশবের কামভাব লইয়া তিনি অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার এই অস্বাভাবিক যৌনকেন্দ্রিক মত তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী অনেক বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকের সমর্থন বা স্বীকৃতি লাভ করে নাই। তাঁহারা ভিন্ন পথে স্নায়ুমনোবিকারের চিকিৎসা করিয়াও সাফল্য লাভ করিয়াছেন। আধুনিককালের চিন্তাধারা ও গবেষণা ফ্রয়েডকে ছাড়াইয়া অনেক দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব, তাহার মনের সূক্ষ্ম ও জটিল গঠন ও অচিন্তনীয় সম্ভাবনা, এমনকি মানুষের 'আত্মা'র রহস্যময় সত্বার অভিমুখেও আধুনিক মনস্তত্ব সাহসের ও সাফল্যের সহিত পা বাড়াইতেছে। ফ্রয়েড যেখানে মানুষের নির্জ্ঞান (Unconscious) মনের গভীরে কেবল অন্ধ প্রবৃত্তির বিশৃঙ্খল সংস্কারপুঞ্জ (Id) দেখিতেছিলেন, ইউং (Jung) সেখানে একপ্রকার নিশ্চেতন বিশ্বাত্মার সন্ধান পাইলেন। উহাকে তিনি বলিলেন 'Collective Unconscious' বা বিশ্ব-নির্জ্ঞান। ফ্রয়েড ও তৎপরবর্ত্তী Mechanistic বা যান্ত্রিক চিন্তাধারার যুগেও এই সব আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা এবং তাহাদের

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা আর একজন বিখ্যাত আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকের মত উদ্ধৃত করিতেছি। Jan Ehrenwald, M. D., তাঁহার 'From Medicine Man to Freud' গ্রন্থের সুচিন্তিত পরিশিষ্টে লিখিতেছেন—'C. G. Jung, O. Rank, E. Fromm and many others have pointed out that the Scientific method is incapable of doing justice to all aspects of personality................This growing interpretation of religion and mental healing and the increasing concern of the psychotherapist with religious problems does not seem to be accidental. It reflects the increasing dissatisfaction of western man with his own mechanistic scheme of the universe...............There are indications that both the patient lying on the couch and the analyst sitting behind him also feel that the Freudian representation of the self as an assemblage of the Ego, the Id and the Superego is incomplete.............The therapeutic potentialities of religious experience are once more engaging the interest of the psychotherapist.', অর্থাৎ—' C. G. Jung, O. Rank, E. Fromm এবং আরও অনেকে ইহা দেখাইয়াছেন যে জড় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি সব দিক্ দিয়া সুবিচার করিতে পারে না। ....ধর্ম্ম এবং মানসিক চিকিৎসা সম্বন্ধে ক্রমবর্দ্ধমান নূতন ব্যাখ্যা এবং আধ্যাত্মিক প্রশ্ন লইয়া মানসিক চিকিৎসকগণের উত্তরোত্তর বেশী আগ্রহ হঠাৎ ঘটিতেছে তাহা নহে। বিশ্ব-জগতের যান্ত্রিক ধারণা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষই ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে। ....এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে শয্যায় শায়িত রোগী এবং তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট মনোবিশ্লেষণকারী চিকিৎসক উভয়েই অনুভব করিতেছেন যে আত্মা সম্বন্ধে ফ্রয়েড যে বর্ণনা দিয়াছেন—অর্থাৎ আত্মা Ego, Id এবং Super Ego এইগুলির সমবায়ে গঠিত, এই বর্ণনা অসম্পূর্ণ। ....আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে চিকিৎসার কাজে লাগাইবার সম্ভাবনা বিষয়ে মানসিক চিকিৎসকগণ পুনরায় আগ্রহান্বিত হইতেছেন।' ফ্রয়েডীয় অবদমনতত্ত্বের অজুহাতে যাঁহারা উদ্‌ভ্রান্তভাবে নীতিধর্ম্ম ও সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চান্ আমরা এইদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ঊর্দ্ধগামী জীবনরসের সার্থক পরিণতিলাভই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেহাশ্রয়ে এই শুদ্ধ চৈতন্যময় জীবনরস স্থূল কামশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, একথাও আমরা বলিয়াছি। এই অধোগামী কামচেতনা বা কামশক্তি দৈহিক রসাশ্রয়ে রেতঃ বা রজঃপদার্থের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে। পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। অনেকের মনে এরূপ ধোঁকাও লাগিয়া থাকে যে আধ্যাত্মিক জীবন সূক্ষ্ম চৈতন্যময় আত্মাকে লইয়া, সুতরাং স্থূল

জড়বস্তু রেতঃ বা রজঃ লইয়া তাহার ঊর্দ্ধগামিতা বা অধোগামিতা ঘটিবে কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আধুনিক বিজ্ঞানে জড় ও শক্তি,—Matter and Energy, এবং আধুনিক দর্শনেও জড় ও চৈতন্য,—Matter and Spiritএর মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ দূর হইয়া যাইতেছে। এমনকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অতি আধুনিক যুগে জড়জগৎ ও চৈতন্যজগতের পার্থক্য সরিয়া যাইতেছে। Sir James Jeans তাঁহার 'The Mysterious Universe গ্রন্থে বলিতেছেন, 'The old dualism of mind and matter......seems likely to disappear......through substantial matter resolving itself into a creation and manifestation of mind.', অর্থাৎ—'জড় এবং চৈতন্যের প্রাচীন দ্বৈতভাব অন্তর্হিত হইবে বলিয়াই মনে হয়,......অস্তিত্ববান্ জড়পদার্থ চৈতন্যের প্রকাশ ও সৃষ্টিরূপেই দেখা দিবে।' বিশেষতঃ ভারতীয় যোগদৃষ্টিতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকেও দেহের মত 'জড়' ভাবা হয়, এবং এই সবগুলি লইয়া 'আত্মা'র শরীর কল্পনা করা হয়। সুতরাং আত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্যের জন্য বীর্য্য-ধারণ অবশ্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। 'বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্'—ইহাই পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের মত। বাচনিক ও মানসিক তপস্যার ন্যায় শারীরিক তপস্যাও সাধনার প্রধান অঙ্গ। সবগুলি মিলিয়া 'তপঃ' এবং ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপঃ বলিয়া বিবেচিত। 'ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে' (গীতা,—১৭।১৪)। ব্রহ্মচর্য্য অর্থে স্থূল কোনও শারীরিক ব্যাপার বুঝায় না, এজন্য

গীতার এই শ্লোকে অহিংসার মত একটি আত্মিক শুদ্ধিকে ব্রহ্মচর্য্যের সহিত সগোত্র করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য যে স্থূল শরীর-সাধনার মত কোনও জড়সাধনা নয় তাহার আরও বহু প্রমাণ রহিয়াছে। বৈদান্তিক জ্ঞানসাধনার প্রথমেই যে শমদমাদি সাধন-সম্পদের প্রয়োজন হয় তাহার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। গীতাতেও ব্রহ্মচর্য্য বা আত্মিক জীবনরসকে ঊর্দ্ধগামী করার জন্য স্থূল, কৃত্রিম সংযমের পরিবর্ত্তে পরমাত্মযোগের ভিত্তিতে সংযমকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। 'রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' (গীতা,—২।৫৯), অর্থাৎ—'জীবনরস স্থূল বিষয়রস বর্জন করিয়া পরমাত্মযোগে নিবৃত্তি লাভ করে'।

ফ্রয়েডীয় ও অন্যান্য আধুনিক যৌনমনস্তত্ত্বের অনুগামি-গণের অনেকে সংযম-ব্রহ্মচর্য্যকে একজাতীয় Sublimation বা অবচেতন মনের অবদমিত কামবৃত্তির সমাজসম্মত বহিঃপ্রকাশের চেষ্টা বলিয়া মনে করিতে পারেন। ইঁহাদের মতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যৌনকামই একমাত্র সত্য বস্তু। তবে 'সভ্যতা' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, অর্থাৎ শিল্পকলা-কাব্যসাহিত্য-দর্শনধর্ম্ম ইত্যাদি, প্রকারান্তরে তাহারা অবদমিত কামশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। এইরূপ কামমূলক সভ্যতাকে কিন্তু গীতায় দৈবী সভ্যতা না বলিয়া আসুরী বা রাক্ষসী সভ্যতা বলিয়াছেন। 'অপরস্পর-সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্' (গীতা, ১৬।৮)। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বাহিরে সর্ব্ববিধ 'সভ্যতা'র আয়োজন সত্ত্বেও এইখানেই বর্ত্তমান যুগের তীব্র ব্যর্থতার কারণ নিহিত। বর্ত্তমান সভ্যতা কামমূলক, দিব্যসভ্যতা 'প্রেমানন্দ'মূলক। এই প্রেমানন্দ ও

দিব্যজীবন একই কথা। ইহার জন্য জীবনরসের ঊর্দ্ধগামিতার সাধনা অবশ্য প্রয়োজন। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদর্শযুগের ভারতীয় সভ্যতা বা ভারতের সনাতন সংস্কৃতি কোনও দিনই ঐহিক বা জাগতিক জীবনের ধনসম্পদ্-মানযশ-প্রেমপ্রণয়-যৌনমিলনকে বিকৃত চক্ষে দেখে নাই। যাহাকে বিকৃত ও বর্জ্জনীয় বলা হইয়াছে তাহা কামভিত্তিক জীবন। কামজয়ের ভিত্তিতেই ভারত তাহার সমাজসভ্যতা ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিল ও শাশ্বত ভারত বর্ত্তমানে তাহাই চায় ও চিরকাল তাহাই চাহিবে। ইহা আজ বিশ্বজগতেরও চাহিদা। কে এই চাহিদা মিটাইবে?

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ ও সংস্কৃতি।

প্রথম অধ্যায়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে জাতীয়জীবনের তথা বিশ্বমানবজীবনের প্রকৃত উন্নতিকল্পে ব্রহ্মচর্য্য বা ত্রিবিধ কামসংযম একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে অবাধ কামচরিতার্থতার পরিবর্ত্তে আত্মসংযম বা ব্রহ্মচর্য্যের নীতি আধুনিক জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের বিচারেও সমর্থিত। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা বিষয়টিকে সমাজ ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া বিচার করিব।

আজিকার দিনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শবাদের কথা প্রচুর শোনা যায়। কিন্তু সমাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শবাদের কথা তেমন শোনা যায় না। সামাজিক ন্যায়-বিচারের কথা অবশ্য যথেষ্ট আলোচিত হয়, কিন্তু তাহা প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শবাদেরই প্রতিধ্বনি। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) বা গণতন্ত্রবাদ (Democracy)-এর সহিত সমাজসাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাচীন সমাজধর্ম্ম ও সামাজিক প্রথা আজ প্রাণহীন। এই প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্য, কাব্য, দর্শনও প্রতিবাদ-মুখর। এগুলি স্বভাবতঃই এযুগে জনপ্রিয়। ইহার কারণ, ইহারা নিষ্প্রাণ সমাজজীবনে নূতন প্রাণের প্রয়োজন ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকাংশেই ভাঙ্গনের উন্মাদনাই

প্রবল, সত্যকার কল্যাণধর্ম্মী, বাস্তব গঠনের অনুপ্রেরণা নিতান্তই কম। এজন্য বাস্তব জীবনে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে ইহাদের কোনও সার্থকতা নাই। তাই সাহিত্য, কাব্য, দর্শনাদি আজ অনেক ক্ষেত্রেই intellectual gymnastics and mental relaxation, অর্থাৎ—বুদ্ধির ব্যায়াম ও চিত্তের বিনোদন মাত্র হইয়া উঠিয়াছে। এযুগের বাস্তববাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনে সেজন্য ইহারা রাজনীতি-অর্থনীতির পার্শ্বচর বা অনুচররূপেই অনেক সময় দেখা দিতেছে। এইখানেই আধুনিক সমাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপুল ব্যর্থতার কারণ নিহিত।

কিন্তু ভারতীয় আদর্শে আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ সমাজ-নীতি ও সংস্কৃতিই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি তাহারই বাহ্যিক রূপায়ণ-ব্যবস্থা। মানুষের মনুষ্যত্বই এই সমাজনীতি ও সংস্কৃতির ভিত্তি। মানুষের আত্মার বিকাশ-প্রকাশ ও মহামুক্তিই এই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই মনুষ্যত্বের সাধনাই ধর্ম্ম। গৃহে-সমাজে-রাষ্ট্রে, ইহকালে-পরকালে যাহা মানুষের এই সত্য সত্বাকে ধারণ করিয়া থাকে তাহাই ধর্ম্ম। আচার-অনুষ্ঠান-রীতিনীতি-বিশ্বাসের নানা বৈচিত্র্য দেখা দিলেও ইহারা ভারতে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ রূপ। অন্তরঙ্গ রূপে ভারত এক 'আত্মা'র ধর্ম্মেই বিশ্বাসী। সাম্প্রদায়িক মতবাদ ভারতে ধর্ম্মের মূল কথা নয়। মনুষ্যত্বের উদ্বোধক এই ভারত-ধর্ম্ম আজ নিষ্প্রাণ, সেজন্য ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমাজগঠন ও রাষ্ট্র-পরিচালনা আজ কল্পনারও অতীত। ধর্ম্ম আজ নিতান্তই ব্যক্তি-গত ব্যাপার, ক্ষেত্র তাহার সীমাবদ্ধ, প্রভাব তাহার ম্লান। মাত্র

কতকগুলি সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহার কিছু কিছু প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। সমগ্র সমাজ ও জাতির জীবনে পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যত্বের মুক্তির আদর্শ রূপায়িত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু এই মৌলিক সাধনা ও তপস্যাই ভারতের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের মূল মন্ত্র। ইহারই জন্য আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তন। প্রসঙ্গতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে আজ ভারতের জাতীয় জীবনকে যতগুলি অনাচার-কদাচার ও চারিত্রিক হীনতা কলুষিত, দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের একলক্ষ্য সাধনাই তাহার প্রতিকার। জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য সাধনা—যৌনকাম, ধনকাম ও জনকামের সংযম। ইহারই ভিত্তিতে সত্য, ত্যাগ, বীরত্ব, সংকল্পনিষ্ঠা, প্রেম ও মানবসেবার সাধনা—ইহাই সর্ব্বধর্ম্মের সার। একথা আমরা 'শিক্ষা ও সাধনা' অধ্যায়ে কিছু সবিস্তারে আলোচনা করিব। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনই নবীন ভারতের জাতীয় চরিত্র গঠনের একমাত্র পথ।

প্রাচীন গৌরবময় যুগে শাশ্বত ভারত এই মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে সমাজসাধনাকে এক অপূর্ব্ব সাফল্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। কালক্রমে তাহার অবনতি, বিকৃতি ও অবলুপ্তি ঘটিলেও তাহার সংস্কার ও স্মৃতি আজিও জাতীয় চরিত্রের 'অবচেতনে' বিরাজমান। সুনির্দ্দিষ্ট যুগোপযোগী নূতন পন্থায় তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলাই আজ জাতিগঠনের প্রথম কাজ।

মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে এই সমাজসাধনাই বিশ্বসভ্যতায় ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান। সেকালের ভাষায় ইহাই 'বর্ণাশ্রম'। এখানে পরিষ্কার বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে আমরা এখানে প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমর্থনে কিছু বলিতেছি না। মহাসত্যের প্রেরণায় আমাদের আভাসিত আন্দোলন কোনও Revivalist বা পুরাতন মতবাদের পুনঃপ্রবর্ত্তনকামী আন্দোলন নয়। প্রাচীন ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-রীতিনীতি-প্রথাবিশ্বাস এযুগের জীবনে অনেকখানিই অচল ও অফলপ্রসূ। কিন্তু ভাবের সত্য দেশকালাতীত। সুতরাং 'বর্ণাশ্রম'-সাধনার মূল ভাবসত্যটি আজিও সত্য। অনুকূল পরিবেশে তাহা নূতন আকারে আত্ম প্রকাশ করিবে। ভারতের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে মানুষগঠনের আন্দোলনে আজ তাহা অবশ্যই গ্রহণীয়। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট অবদানে ভারতের জাতীয় জীবন আজ সমৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে। এই মহাসমন্বয়ের বিরাট যজ্ঞক্ষেত্রে ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতির এই মানবীয় আদর্শ ও সাধনা উপেক্ষিত হইলে ইহা শিবহীন দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

এখন এই বর্ণাশ্রমসাধনার মূল ভাবটি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহা আসলে একটি আধ্যাত্মিক সমাজসাধনা। সমাজ-সাধনার অর্থ কোনও সামাজিক সেবাকার্য্য (Social Service) মাত্র নয়, কোনও ধর্ম্মমতবাদী সমাজগঠনও নয়। ইহা সমগ্র সমাজে মানুষের আত্মার মহাপ্রকাশ বা মহামুক্তির সাধনা। সেজন্য ইহা একদেশদর্শী নয়। দেহমনোবুদ্ধিকে লইয়া গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্র সব কিছুর মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশপ্রকাশই ইহার লক্ষ্য।

শৈশবকাল হইতেই মানুষের ত্রিবিধকাম, অর্থাৎ—যৌনকাম, ধনকাম, ও লোককামকে দমিত করিয়া মানুষকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উত্তীর্ণ করাই ইহার লক্ষ্য। সেজন্য সেকালে বাল্যকাল হইতে গুরু অথবা আচার্য্যগণের সাহচর্য্যে ও তত্ত্বাবধানে ভাবী নাগরিকগণের শিক্ষা-সাধন চলিত। এই গুরু এবং আচার্য্যগণ ছিলেন সমাজধর্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম্মের ধারক-বাহক-পরিচালক। ইঁহারাই ছিলেন 'Philosopher Class' অর্থাৎ দার্শনিক শ্রেণী। ইঁহারা 'দর্শনের অধ্যাপক' ছিলেন না, ইঁহারা ছিলেন সত্য জীবনদর্শনের জীবন্ত মূর্ত্তি। ইঁহাদের শক্তিতে ও সংস্পর্শে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্র একই মহামুক্তি বা Highest Liberation এর অভিমুখে নিত্য অভিযান করিত। পরবর্ত্তীকালের বা বর্ত্তমানের মত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা বা পরিপুষ্টি তখনকার প্রধান লক্ষ্য ছিল না। দেশব্যাপী মানুষগঠনের মহান্ ব্রতে এই সব গুরু বা আচার্য্য আত্মনিয়োগ করিতেন। এযুগের 'গুরু' বা 'আচার্য্য' বলিতে আমরা বুঝি লৌকিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাতা অথবা শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। সুতরাং সেযুগের দেশ-জাতি-সমাজ-সংগঠক গুরু ও আচার্য্যগণের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা এখন দুরূহ। 'গুরু' বা 'আচার্য্য' বলিতে আমরা এযুগে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের আধ্যাত্মিক নেতাদেরও বুঝিয়া থাকি। বিভিন্ন মতে ও পথে মানুষকে শান্তির সন্ধান দেওয়া ইঁহাদের ব্রত। দেশ ও সমাজের কল্যাণসাধনও ইঁহাদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য। কিন্তু সমগ্র দেশ-জাতি-সমাজ-

রাষ্ট্রকে একই ব্রহ্মজীবনের অভিমুখে পরিচালিত করিবার একলক্ষ্য ভাব, আদর্শ ও সাধনা সেযুগের গুরু ও আচার্য্যগণকে উদ্বুদ্ধ করিত। বেদ ও উপনিষদের আত্মোপলব্ধির আদর্শের সহিত কতকগুলি মৌলিক নীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা মানুষ-গড়ার কাজে হাত দিতেন। ত্যাগ, সত্য, সংযম, বীরত্ব, সংকল্পনিষ্ঠা, সেবা ও প্রেম, এই মৌলিক নীতি। ইহাই ছিল সে যুগের জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ। সুতরাং ইহাই ছিল সে যুগের জাতিগঠনের ভিত্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির ঐক্যসূত্র। প্রসঙ্গতঃ ভারতের জাতীয় সংহতি আনিতে গেলে ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ অবদান এই জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য সাধনাকে শিক্ষার আদর্শরূপে অনুশীলন করিতে হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মমতের পাশাপাশি এই মানবীয় ও বিজ্ঞানসম্মত মনুষ্যত্ব-সাধনার ঐক্যমূলক ধর্ম্মকে আজ প্রাধান্য দিয়া প্রচার করিতে হইবে। অবশ্য ইহার শিক্ষা ও সাধনা সে যুগের রীতি-নীতি-পদ্ধতি হইতে অনেকখানি পৃথক্ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পরে যথাস্থানে ইহার আলোচনা করিব।

ভারতের এই প্রাচীন গৌরবময় সংস্কৃতি ব্রহ্মমুখী জীবনের সাধনা ছিল বলিয়া ইহা 'ব্রাহ্মণ্য'সংস্কৃতি নামে পরিচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধ হইয়া সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন তাঁহারাই ছিলেন 'ব্রাহ্মণ'। কালক্রমে এই উদার জাতীয় আদর্শ প্রাণহীন হইয়া নানা শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক বৈষম্যের পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারই জের বর্ত্তমানেও চলিতেছে, একথা

সত্য। কিন্তু এই শাশ্বত মানবীয় আদর্শ এমন এক মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত যে কালস্রোতেও ইহার মৃত্যু নাই, আজ যথাকালে ইহার পুনঃপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

এই বিরাট সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব উদ্‌যাপনের জন্য দেশব্যাপী বহু গুরু ও গুরুকুলের সেযুগে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। অরণ্যের আশ্রম ছাড়া সমাজজীবনের মধ্যে গুরুগৃহগুলিই ছিল ছাত্র-শিষ্যদের শিক্ষাসাধনার স্থান। এইগুলিই ছিল ভারতের জাতীয়তার বীজভূমি। রাষ্ট্রশক্তি ও রাজন্যবর্গও এখানে মাথা নত করিতেন। আজিকার বিদ্যাপীঠগুলির মত কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রগুলি রাজা বা ধনীর দয়ার উপর নির্ভর করিত না। যৌনকামের সহিত অর্থকামকেও জয় করিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব-প্রতিষ্ঠা যেখানের উদ্দেশ্য সেখানে রাজা বা ধনীর প্রভাব স্বীকৃত হইতে পারিত না। রাজা বা ধনীর শ্রদ্ধানত আনুকূল্য স্বীকৃত হইলেও আত্মিক স্বাধীনতা (Spiritual Autonomy) ছিল এই বিদ্যানিকেতনগুলির প্রাণবস্তু। রাজকীয় দানগ্রহণ—যথা রাজর্ষি জনকের নিকট ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের গোধনগ্রহণ—রাজকীয় আনুকূল্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে এবং কি পরিবেশে এই দান গৃহীত হইত তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম-বিদ্যা দান করিতেছেন এবং প্রতিদানে জনক কিছু অর্থসাহায্য বা দক্ষিণা দিতেছেন তাহা নহে, তিনি নিজেকে এবং এমনকি নিজের সমগ্র রাজ্যই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের চরণে নিবেদন করিতেছেন। 'সোঽহম্ ভগবতে বিদেহান্ দদামি, মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি,'

অর্থাৎ—'ভগবন্, আমি আপনার দাসরূপে সেবা করিবার জন্য বিদেহসাম্রাজ্য এবং নিজেকেও আপনার নিকট সমর্পন করিতেছি।' (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৩)—ইহাই জনকের উক্তি। অপরদিকে ইহাও বিবেচ্য যে এই প্রাচীন গুরু বা আচার্য্যগণ নিজ নিজ গৃহে বহু ছাত্রশিষ্যকে নিজব্যয়ে অধ্যাপনা করিতেন। শিক্ষা-সমাপনান্তে ছাত্রশিষ্যের পক্ষে গুরুকে সম্ভবমত উপঢৌকনপ্রদানের রীতি থাকিলেও, ছাত্রশিষ্যদলকে নিজ পরিবারের মত পালন করার রীতি ছিল। আর্থিক সম্পর্ক এখানে মোটেই প্রাধান্য লাভ করে নাই। *

অপরদিকে এই গুরু ও আচার্য্যগণের শিক্ষাদানের আগ্রহ দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (শিক্ষাবল্লী, ১।৪।২), আমরা নিম্নলিখিত অপূর্ব্ব প্রার্থনা-মন্ত্রের সন্ধান পাই। আচার্য্য বলিতেছেন—'আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা, বিমায়ন্তু ব্রহ্মচা-রিণঃ স্বাহা, প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা, দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা, সমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।', অর্থাৎ—'চারিদিক্ হইতে ব্রহ্মচারি (ছাত্রশিষ্য)-গণ আমার নিকট আসুক, নানাভাবে ব্রহ্ম চারিগণ আমার নিকট আসুক, প্রকৃষ্টভাবে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুক, আত্মসংযম করিয়া ব্রহ্মচারিগণ আমার কাছে আসুক, স্বস্তির সহিত ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুক।' কি আকুল আবেদন! কি ব্যাকুল আহ্বান!! এই সকল ব্রহ্মচারী ছাত্র

---

* ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী তাঁহার Ancient Indian Education গ্রন্থে এবিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শিষ্যদের দলে দলে আহ্বান করিয়া অধ্যাত্মবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিয়া তাঁহারা যশস্বী হইতে চাহিতেন এবং নিজদিগকে ধনীব্যক্তি অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন। ইহারও প্রমাণ, যথা—'যশো জনেহসানি স্বাহা, শ্রেয়ান্ বস্যসোহসানি স্বাহা, ...যথাপঃ প্রবতাযন্তি, যথা মাসা অহর্জ্জরম্, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতস্‌স্বাহা......, অর্থাৎ—'আমি যেন জনসাধারণের মধ্যে যশস্বী হই, আমি যেন বিশেষ ধনীর অপেক্ষা শ্রেয়ান্ হই,......বারি যেমন নীচের দিকে প্রবাহিত হয়, মাস সকল যেমন বৎসরের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া প্রবেশ করে, হে বিধাতঃ, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার মধ্যে আসুক .....।' ইহাই ছিল তাৎকালিক জাতিসংগঠক আচার্য্যগণের প্রাণের আকুতি। পৃথিবীর যে কোনও দেশে ছাত্রের জন্য গুরুর এই ব্যাকুলতা সহজে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

বেদ-উপনিষদের মহান্ আধ্যাত্মিক ধারার উত্তরাধিকারী সে যুগের বর্ণাশ্রমসাধনায় আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি যাহা এযুগের নূতন সমাজসাধনার পক্ষে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। সে যুগে রিপু-ইন্দ্রিয়ের দৈহিক জীবনকে সুসংযত করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবশ্যবিহিত হইলেও পরবর্ত্তী বিবাহিত জীবনে বংশরক্ষা বা প্রজাসৃষ্টিও অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইত। যথা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে আমরা পাই,—'প্রজাতন্তুম্ মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ' (১।১১।১), অর্থাৎ—'সন্তানসৃষ্টির স্রোতকে ছিন্ন করিও না।' পুনশ্চ—'প্রজা চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ' (১।৯।১), অর্থাৎ—'প্রজাসৃষ্টির সহিত বেদ-আলোচনা ও প্রচার (অধ্যয়ন-

অধ্যাপন) চালাইয়া যাইতে হইবে।' আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বেদ উপনিষদের বহুস্থানে বহু মন্ত্রেই অন্ন, বস্ত্র, ধন, যশঃ, বীরসন্তান, শ্রী, জয়, ভূতি (Prosperity বা উন্নতি), সর্ববিষয়ে কার্যাসিদ্ধির উপযুক্ত নীতি ইত্যাদির লৌকিক বা ঐহিক প্রার্থনা রহিয়াছে। যথা,—পূর্বলিখিত তৈত্তিরীয় উপনিষদের মন্ত্রে আমরা এইরূপ প্রার্থনাও পাই—'ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।' (১।১১।১), অর্থাৎ—'উন্নতি-অভ্যুদয়কে অবহেলা করা উচিত নয়।' অথবা—'আবহন্তী বিতন্বানা, কুর্ব্বাণাচীরমাত্মনঃ, বাসাংসি মম গাবশ্চ, অন্নপানে চ সর্ব্বদা, ততো মে শ্রিয়মাবহ .. .. ।' (১।৪।২), অর্থাৎ—'হে ভগবন্, তুমি তারপর আমার নিকট প্রভূত বস্ত্র ও পশুসমূহ, অন্ন এবং পানীয় দ্রুত আনয়নকারিণী ও বর্দ্ধনকারিণী শ্রীকে লাভ করাও' * কিন্তু মূল কথা সেই একই—'অমৃতস্য দেব, ধারণো ভূয়াসম্' (১।৪।১), অর্থাৎ—'হে দেব, আমি যেন অমৃতের (অমৃতত্বের) ধারক হই।' এইরূপ সর্ব্বত্র। বাল্যকৈশোরে ও যৌবনের প্রারম্ভে এইভাবে বাস্তব, জাগতিক জীবনেই আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য গুরু ও আচার্য্যগণের হাতে শিক্ষিত হইত সেযুগের ছাত্র-

---

*গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষেও এইভাবের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে, যথা—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্ম্মতির্মম ॥'

(গীতা—১৮।৭৮)

শিষ্যগণ। ঐহিক (Temporal) ও পারত্রিক (Spiritual) জীবনের ইহা ছিল এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। ইহাই ছিল সেযুগের সমাজ-সংস্কৃতির ভাষায় 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম'। ইহাই ছিল জীবনসাধনার প্রথম ধাপ। এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা-সাধনা ব্যতীত সেযুগের গৃহ-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র কল্পনাই করা যায় না। ইহার পর গার্হস্থ্য জীবনে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত ভোগজীবনের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ আরও উচ্চতর জীবনের প্রস্তুতিপর্ব্ব চলিত। পূর্ব্বের শিক্ষাসাধনার ফলে এই ভোগজীবন মানুষের আত্মাকে কামনা-বাসনার আবরণে আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সম্মত ভোগের মধ্য দিয়া ভোগপিপাসার নিবৃত্তি ঘটাইয়া উচ্চতর ত্যাগ জীবনের মহিমায় মানুষকে উন্নীত করাই ছিল বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য। এজন্য সেযুগের বিবাহিত জীবন মাত্র family life ছিল না, ইহা ছিল গৃহস্থাশ্রম—জীবনসাধনার পথে দ্বিতীয় ধাপ। সাংসারিক জীবনের নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তখন বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির সাধন হইয়া উঠিত। ইহারই ফলে জীবনের শেষ পর্য্যায়ে বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণ হতাশার পরিবর্ত্তে দেখা যাইত মুক্তজীবনের নূতন আনন্দ। এভাবে ভোগ লইয়া যাইত ত্যাগে, ত্যাগ লইয়া যাইত অমৃতত্বের দুয়ারে। ইহা ছিল মর জগতের সহিত অমর জগতের সেতুবন্ধন। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া ঈশোপনিষদে বলা হইয়াছে—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে', অর্থাৎ—'অবিদ্যার মধ্য দিয়া মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার মধ্য দিয়া অমৃতত্ব লাভ ঘটে।' এই সামান্য আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে এই যুগের ভারতীয় জীবন-

সাধনায় পরবর্ত্তী যুগের তথাকথিত Pessimism বা জীবনে ব্যর্থতাবাদের কোনও স্থানই ছিল না। কিন্তু ইহা সম্ভব হইয়াছিল একমাত্র সেযুগের দেহমনপ্রাণে দেশব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য-সাধনায়। আজ ভারতের ও বিশ্বের জীবনে চরম ব্যর্থতাবোধের দুর্দ্দিনে এই সাধনাই ভারতের জাতীয় জীবনে ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই নূতন জাতীয়সাধনার স্বাভাবিক জীবনধর্ম্মকে পৃথিবীর মানবসমাজে বিস্তার করিবার বিধিনির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব আজ ভারতের।

পুনরায় আমরা মূল প্রসঙ্গে আসিতেছি। অধিকাংশের জীবনে গৃহস্থাশ্রমের সাধনাই যদিও ছিল নিয়ম, কিন্তু বিশেষ ব্যতিক্রম যে ছিল না তাহা নহে। অর্থাৎ বিশেষ উচ্চসংস্কার-সম্পন্ন শিষ্যছাত্রগণ বেদানুশীলনের সহিত আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ব্রত গ্রহণ করিতেন। ইঁহারা ছিলেন সেযুগের মানদণ্ডে 'exceptionally meritorious students', অর্থাৎ—'বিশেষ প্রতিভাবান্ ছাত্র' এবং ইঁহারাই দেশের ও সমাজের উচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মান বজায় রাখিতেন। ইঁহাদের বলা হইত 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী'। সে যাহা হউক, গৃহস্থাশ্রমী একদিকে নিজ গৃহপরিবারের, অপরদিকে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যপালনের মধ্য দিয়া (ইহার সহিত সেযুগের বিশ্বাস অনুযায়ী অতিথি, দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, এমনকি পশুপক্ষী ইত্যাদির প্রতিও কর্ত্তব্যপালনের মধ্যদিয়া *)

---

* ইহাকে সেযুগের পরিভাষায় বলা হইত 'পঞ্চযজ্ঞ'।

উচ্চতর মুক্তজীবনের অধিকারী হইতেন। তখন এই স্তরের আশ্রমকে বলা হইত বানপ্রস্থ। ইহার পরে চরম মহামুক্ত জীবনের স্তর। তাহার নাম যতি-আশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম। এই শেষ আশ্রমে সম্পূর্ণভাবে মানুষের ব্যক্তিগত, ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী জীবন নৈর্ব্যক্তিক ভূমাজীবন বা অমৃতজীবনে উন্নীত হইত। এইখানে ঘটিত মনুষ্যজীবনের চরম অভিব্যক্তি। এইভাবে মানুষের individual বা ব্যক্তিগত সত্বাকে আত্মবিকাশের মধ্য দিয়া universal বা বিশ্বসত্বার স্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই জীবনসাধনার দৃষ্টিতে বার্দ্ধক্যের কোনও অবকাশ নাই, মৃত্যুরও কোনও স্থান নাই। ইহাই প্রাচীন ও শাশ্বত ভারতের চির-আকাঙ্খিত অমৃতত্বের সাধনা। উপ-নিষদের বহুস্থলেই এই 'অমৃতম্' এর জয়গান গাওয়া হইয়াছে।

এইস্থলে আরও একটী বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। তাহা এই যে ভারতের সেই আদর্শ সমাজধর্ম্মের যুগে আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনার জন্য সাধারণতঃ গৃহজীবন ও সমাজজীবনকে বর্জ্জন করার কোনও প্রশ্ন বা প্রয়োজন ছিল না। সন্ন্যাসের যুগ তখন দেখা দেয় নাই। বিবেক-বৈরাগ্যের ক্রমবিকাশের সহিত মহামুক্তির সাধনা সংসারজীবনের মধ্য দিয়াই ধাপে ধাপে অগ্রসর হইত। পরবর্ত্তী কালে এই বর্ণাশ্রমের যুগ অতীত হইলে দেশজাতি-সমাজরাষ্ট্র-গৃহপরিবার সব কিছুকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির সাধনা করার যুগ আদর্শ আবির্ভূত হয়। এইরূপ সন্ন্যাসবাদের তীব্র প্রয়োজন পরবর্ত্তীকালে অবশ্যই দেখা দিয়াছিল এবং এই নূতন পথেই ভারতীয় সংস্কৃতি তখন তাহার

শাশ্বত মুক্তিসাধনার বা অমৃতত্বলাভের আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিক আদর্শে গঠিত শক্তিমান্ ভারতীয় সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবন তথা পারিবারিক জীবনের ভাঙ্গিয়া-পড়ার যুগ এবং এই দিক্ দিয়া ইহা জাতীয় জীবনে একটী বিপর্য্যয় সূচিত করে। ইহার পর আমরা ভারতের সংস্কৃতিজীবনে দেখিতে পাই নিছক জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ, ইত্যাদির আশ্রয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব ও বিভিন্ন সময়ে তাহাদের প্রাধান্যলাভ। শক্তিশালী, সুসংহত, একলক্ষ্য সমাজধর্ম্ম তখন তিরোহিত হইয়াছে।

কিন্তু বহু শতাব্দীর বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে আবার ভারতধর্ম্মকে তাহার সেই শাশ্বত জীবনধর্ম্মের দিকে লইয়া যাইতেছে, আমরা তাহার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। অধিকাংশ সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠানই আজ আধ্যাত্মিক আদর্শে সমাজ-জাতি-গৃহপরিবার পুনর্গঠনের পক্ষপাতী। এই দৃষ্টিতেই আমরা বলিতেছি যে ইহা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যুগ। লক্ষ্য তাহার এক—ব্যক্তি, সমাজ, জাতি তথা বিশ্বের মহামুক্তি। উপায় তাহার এক—ত্যাগ, সত্য, সংযম, বীরত্ব, ব্রহ্মচর্য্য, সেবা, ও প্রেম। জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্ম্ম সমস্তই এখানে সম্মিলিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়সাধনার মধ্যে আজ অনেকটা এই একই মূল সুর। বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান আজ মূলতঃ এই একই পথের পথিক। নবযুগধর্ম্মের আত্মপ্রকাশের সহিত ইহাদের একলক্ষ্যতা ও একপ্রাণতা ক্রমশঃ আরও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। কারণ সর্ব্বসত্যের মূল উৎস মহাসত্য

আজ সক্রিয়, সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ সর্ব্বনিয়ন্তাই আজ 'ভারত-ভাগ্য-বিধাতা'।

ভারতের সেই সুপ্রাচীন যুগে বহু গুরু ও গুরুকুল থাকিলেও এবং তাঁহাদের মধ্যে স্বাভাবিক ও সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও, এক মহান্ লক্ষ্যের কাছে সকলেরই নতিস্বীকার এক অপূর্ব্ব জাতীয়সংহতির সাক্ষ্য দেয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যগণের মধ্যে এই সাম্যভাব ও জাতীয় আদর্শ আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষা-সমাপনান্তে আচার্য্য ছাত্রশিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন—'যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্, ····· অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকৎসা বা স্যাৎ, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, যুক্তা আযুক্তাঃ, অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ, যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্, তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ।' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—১।১১।৩,৪), অর্থাৎ—'আমাদের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ যে সব ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে শ্রান্তিদূর করিবার জন্য আসন দান করিবে (অথবা, কোনও কথা না বলিয়া তাঁহাদের উপদেশের সার গ্রহণ করিবে)। যদি কোথাও কখনও তোমার করণীয় কর্ম্ম বিষয়ে অথবা আচরণীয় বিষয়ে কোনও সন্দেহ জাগে, তবে সেইস্থানে যে সব বিচারক্ষম, সদাচারসম্পন্ন, অপরের প্রভাবমুক্ত, অরূক্ষপ্রকৃতি, ধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা সেইরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ আচরণ করিবে।' এখানে যাহা সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই যে সমগ্রদেশব্যাপী একই উদ্দেশ্যে

অনুপ্রাণিত বহু গুরু ও আচার্য্য না থাকিলে এবং সমগ্র দেশ-জাতি-সমাজের জীবনে একই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান না থাকিলে এরূপ উপদেশ প্রদান সম্ভব হইত না। সমগ্র দেশ-জাতি-সমাজের জীবনে এই একলক্ষ্য আদর্শ ও সাধনা অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই আবির্ভূত হইয়াছিল এবং বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এই মূল ঐক্যের নীতি সকলেরই নিকট স্বীকৃত ছিল। 'এষা বেদোপনিষদ্, এতদনুশাসনম্ ···।' —'ইহাই বেদ-উপ-নিষদের সারকথা, ইহাই অনুশাসন······।' প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় আমরা ভাগবতে দেখিতে পাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নানাভাবে এই সমাজধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। আজও ভারত-ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সম্প্রদায়-গুরু-মহাপুরুষের মধ্যে এই মূল ঐক্যের বোধ ও সাধনা যে নাই তাহা নহে, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে যথাকালে ইহার আরও সুস্পষ্ট ও সুসংহত প্রকাশের জন্য আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। মহাসত্যের এই মহাপ্রকাশ ভারতে অবশ্যম্ভাবী, কারণ সর্ব্বসম্মতভাবে ইহা মহাজাগরণ ও মহাসমন্বয়ের যুগ।

বাস্তব সংসারজীবনের মধ্য দিয়া ধাপে ধাপে এই ব্রহ্মমুখী জীবনসাধনার প্রসঙ্গে আমাদের আর একটী বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাহা এই যে বর্ণাশ্রমসাধনা আধ্যাত্মিক জীবনবিজ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজসাধনা। সুতরাং বাস্তবজীবনের ভোগস্তরকে ইহাতে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার আদিতে সংযম ও অন্তেও সংযম, সংযম দিয়া ইহা দুই দিকে টানিয়া বাঁধা। সুতরাং শিথিল, রিপু-পরবশ, ইন্দ্রিয়-

পরায়ণ ভোগবিলাসের কোনও অবসর ইহার মধ্যে নাই। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সাধারণ মনুষ্যজীবনের দোষ-ত্রুটী-দুর্ব্বলতা বা স্খলন ইহার মধ্যে ঘটিবে না। মুনির আশ্রমের মধ্যেই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার দুর্ব্বল প্রণয়লীলা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা সেখানে স্থায়ী ভাবে স্থান পায় নাই, ভ্রমকে ভ্রমমুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বর্ণাশ্রমেও তাহাই। কিন্তু বর্ণাশ্রমসাধনার প্রসঙ্গে একথা ভাবিলে চরম ভ্রান্তির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে যে অসংযত সংসারজীবনেই পরমতত্ত্ব বা মহামুক্তি লাভ করা যাইবে। 'সংসার করিলে কি ধর্ম্ম করা যায় না?'—প্রাকৃতবুদ্ধির প্রচলিত এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের শাস্ত্রের স্পষ্ট উত্তর—'না'। তপস্যাবিহীন রিপু-ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবনে সত্যকার ধর্ম্মসাধনা অসম্ভব। তাহা তীরে নোঙ্গর ফেলিয়া নৌকায় দাঁড় টানার মত। 'অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।' (গীতা—৬।৩৬), অর্থাৎ—'অসংযতস্বভাব ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহাই আমার মত।' সুতরাং এই সংযমসাধনার পিছনে আছে চরম ত্যাগের ও বৈরাগ্যের আদর্শ। এজন্য এই প্রাচীন সমাজ-সাধনার যুগেও নানাভাবে সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসগ্রহণের প্রবণতা দেখা গিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের সহসা সংসার পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ তাহার প্রমাণ। বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে এই সম্যক্ ত্যাগের আদর্শ বলবৎ ছিল, জনকের নিকট যাজ্ঞ-বল্ক্যের নিম্নলিখিত উক্তিও তাহার প্রমাণ :—'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ

প্রজাং ন কাময়ন্তে। কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ, যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি।', অর্থাৎ—'এই আত্ম(ব্রহ্ম)-লোক লাভ করিবার ইচ্ছাতেই প্রব্রাজিগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ইহা জানিতেন বলিয়াই প্রাচীন জ্ঞানিগণ সন্তানসন্ততি কামনা করিতেন না। (তাঁহারা বলিতেন) সন্তানসন্ততি লইয়া আমরা কি করিব, কারণ আমরা এই আত্মা ও এই (ব্রহ্ম)-লোক লাভ করিয়াছি।' (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে বেদ-উপনিষদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রমসাধনার যুগে পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়া ব্রহ্মমুখী জীবন বিহিত হইলেও নিছক বিষয়-সম্ভোগের জীবন কখনও সমর্থিত হয় নাই। বর্ণাশ্রম ছিল মানুষের চিত্তশুদ্ধি বা মনুষ্যত্বলাভের ক্রমসাধনা। ইন্দ্রিয়সম্ভোগের সহিত রফা করিয়া চলা কখনও ইহার উদ্দেশ্য ছিল না।

সে যুগের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সম্বন্ধে আর দুই একটি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

পারিবারিক স্নেহ-কোমল পরিবেশ ত্যাগ করিয়া ছাত্রশিষ্যগণ বাল্য-কৈশোরেই গুরুগৃহবাসে অভ্যস্ত হইত। 'ভৈক্ষ্য' বা ভিক্ষাব্রত ব্রহ্মচারিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। গুরুশিষ্যের মিলিত বেদপাঠ ও বেদালোচনা পরম পবিত্র ও অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। ইহারই মধ্য দিয়া উভয়েরই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মভাব স্ফুরিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। এইভাবে মহামুক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যা-

লাভ সমাজেরও অভীপ্সিত ছিল বলিয়া 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' জনসাধারণের জীবনে এতখানি আদরণীয় ছিল। এজন্য ব্রহ্মচারীকে সাদরে ও সগৌরবে 'ভিক্ষা' দেওয়া হইত। ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাব্রত কোনও দারিদ্র্যের ব্রত ছিল না। তাহা হইলে বেদ-উপনিষদের বহু স্থানে এবং পরবর্ত্তী যুগের 'ইতিহাস' অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতের বহু স্থানে মনুষ্যত্বের সাধনার সহিত ধন, যশঃ, বীরসন্তান, ঐশ্বর্য্য, অভ্যুদয়েরও এত প্রার্থনা ও কথা থাকিত না। প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষাব্রতের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন মুক্ত মানবাত্মার মহিমা প্রকাশিত হইত, অপর দিকে তেমনি সমাজের উপর নির্ভরতা ও সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ স্বতঃই জাগিয়া উঠিত। ইহাই ছিল সেযুগের আদর্শ social contact বা সমাজ-সংযোগ। আত্মজ্ঞান লাভের মধ্য দিয়া 'সর্ব্বেষা-মভয়প্রদঃ'—'সকলের অভয়দানকারী' হওয়াই ছিল ব্রহ্মজ্ঞ সমাজনায়কগণের ব্রত। এই অভয়দান কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উপদেশদানে সীমাবদ্ধ থাকিত না। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তথা সামাজিক সর্ব্বক্ষেত্রে ধর্ম্মসঙ্গত ন্যায়বিচার ও সত্যপালনের সহিত বিপন্নের পরিত্রাণ, বৃত্তিহীনের বৃত্তিসন্ধান, দরিদ্রের অভাব-মোচন, আশ্রিতের পালন ও সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্রকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার প্রেরণা দান সবই ছিল তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এই মহান্ দায়িত্ব উদ্‌যাপনের বীজ উপ্ত হইত কিশোর মনে জাতীয় সংস্কৃতির ধারক আচার্য্যগণের পরিচালিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে। সেযুগের অভিজাত ক্ষত্রিয় ও ধনাঢ্য বৈশ্যগণকেও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ভিক্ষাব্রত লইতে হইত, সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে ব্রহ্মচারীর

এই ভিক্ষাব্রত দারিদ্র্যমনোবৃত্তির পরিপোষক ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয় সমাজ ও জাতির ঐশ্বর্য্যের জন্য খ্যাতিও ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে, ভিক্ষা-ব্রতের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বসাধকের ধনকাম ও জনকাম বা প্রভুত্ব-লালসাকে উন্মূলিত করার ব্যবস্থা হইত। এইভাবে ব্রহ্মচর্য্য-জীবনের পূর্ণাঙ্গতা সাধিত হইত, কারণ কেবল মাত্র যৌনকাম সংযম করিলেই ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণ হয় তাহা নহে। সুতরাং এই ভিক্ষাব্রতে শৈথিল্য করিলে ব্রহ্মচারীকে যৌনসংযমে শৈথিল্যের মতই প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত, একথা আমরা সংহিতাগ্রন্থে পাই। ইহা ছাড়া ব্রহ্মচারীকে সম্পূর্ণ আলস্য বর্জ্জন করিয়া গুরুর নির্দ্দেশমত নানা সাধারণ কার্য্যে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইত। এইভাবে মহান্ আদর্শের সহিত একাত্মতা সাধিত হইত। ইহাই ছিল গুরুর আনুগত্য বা আচার্য্য সেবা। এই সকলের সহিত সেযুগে পরমসত্যের প্রতীক অগ্নিকে নিয়ত জাগাইয়া রাখাও ছিল ব্রহ্মচারীর অবশ্য করণীয় কাজ। এইভাবে কাম-কামনা, ভোগসুখ-স্পৃহা এবং অহঙ্কার-অভিমানকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া 'আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী' নাগরিক গঠন করিয়া সেযুগে জাতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা হইত।

এখন ইহা অনেকটা পরিষ্কার বোঝা যাইবে যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল মানবীয় আদর্শে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করা। সেজন্য আমরা দেখিতে পাই এই আদর্শ জাতীয় আদর্শরূপে সমগ্র জনসাধারণের নিকট স্বীকৃত ছিল। জাতীয় জীবনে সমাজ-সংস্কৃতির ধারক

ও বাহক 'ব্রাহ্মণ', রক্ষক ও পালক 'ক্ষত্রিয়' এবং পরিপোষক 'বৈশ্য'—এই তিন শ্রেণীর কর্মীকেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মধ্য দিয়া যাইতে হইত। অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন ও দান ছিল 'ব্রাহ্মণ'শ্রেণীর জাতীয় কর্ত্তব্য, অধ্যয়ন, যজন, দান ও দেশজাতি-সমাজ-সংস্কৃতির রক্ষা ছিল 'ক্ষত্রিয়'শ্রেণীর জাতীয় কর্ত্তব্য এবং অধ্যয়ন, যজন, দান, ও কৃষি-পশুপালন-বাণিজ্য ছিল 'বৈশ্য' শ্রেণীর জাতীয় কর্ত্তব্য। সুতরাং জাতীয় জীবনে আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও আত্মত্যাগ ঐ তিন শ্রেণীরই সাধারণ কর্ত্তব্য ছিল। এইভাবে ভারতের সংস্কৃতি দেশ-জাতি-সমাজের বিরাট অংশের মধ্যেই সক্রিয় ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে আধুনিক ইতিহাসে যাহাদের কৃষক-পশুপালক (cultivators and herdsmen) বলিয়া আদিমযুগের নিম্নস্তরের সভ্যমানব বলা হয়, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তাহাদেরও 'বৈশ্য'রূপে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সভ্যতার আওতায় আনিয়া ফেলিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সহিত একই সংস্কৃতির ধারকরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। এজন্য আমরা দেখিতে পাই 'দ্বিজ' বলিতে সেযুগে শুধু ব্রাহ্মণকেই বুঝাইত না, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন শ্রেণীকেই বুঝাইত। 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণকারী। পিতামাতার নিকট দৈহিক জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরু বা আচার্য্যের নিকট ইঁহাদের সকলকেই দ্বিতীয়বার মনুষ্যত্বের নবজন্ম গ্রহণ করিতে হইত। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু 'গুহ্য' সম্প্রদায়ে 'পুরোহিত' বা 'ধর্ম্মনেতা'গণের নিকট 'initiation' বা দীক্ষা গ্রহণ এবং রহস্যময় আচার-অনুষ্ঠান ('mysteries')

ও সাধনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র দেশ-জাতি-সমাজকে বাস্তবজীবনে এইভাবে মনুষ্যত্বলাভের পথে পরিচালিত করা সত্যই এক অভিনব ব্যাপার। এবং বর্ত্তমান আলোচনায় ইহা অনেকটা সুস্পষ্ট হইবে যে জাতির বিরাট অংশ, অর্থাৎ—জ্ঞানী-বিদ্বান্, যোদ্ধা-রাজন্য, বণিক্-ব্যবসায়ী, কৃষক-পশুপালক* ইঁহারা সকলেই জীবনের প্রারম্ভে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা-সাধনা গ্রহণ করিতেন। ইহা ছিল তাঁহাদের পক্ষে compulsory বা অবশ্যগ্রহণীয়। এই শিক্ষাসংস্কার লাভ না করিলে তাঁহারা সমাজে ও দেশে নিন্দার্হ হইতেন। তাহার কারণ, মাত্র বিদ্বান্ হইলেই ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা হইলেই ক্ষত্রিয় অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যাদি করিলেই বৈশ্য হওয়া যাইত না। এই সকলের পিছনে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য রিপু-ইন্দ্রিয়দমনের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের সাধনা করিতে হইত। এই সাধনার সহিত সত্য ও ত্যাগের, সেবা ও আনুগত্যের শিক্ষাও যুক্ত থাকিত। ইহাই ছিল জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা।

সমাজে আর এক শ্রেণীর জাতীয় কর্ম্মী ছিলেন যাঁহাদের বলা হইত 'শূদ্র'। এই 'শূদ্র' কথাটির সহিত অনেক সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন কালক্রমে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে বর্ণধর্ম্ম বা তথাকথিত 'জাতিভেদ' সমস্যার আলোচনা

---

*'কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্' (গীতা—১৮।৪৪) 'বৈশ্যস্য......কৃষিপাশুপাল্যে বণিজ্যা চ।' (কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র—১ম প্রকরণ)

অনেকটা অবান্তর। সেজন্য আমরা অন্য গ্রন্থে ইহার আলোচনায় চেষ্টিত হইবে। এখানে শুধু ইহাই বলা প্রয়োজন যে সুদীর্ঘকালের প্রভাবে বর্ণধর্ম্ম নানা বৈষম্য, সংকীর্ণতা ও দাম্ভিকতার কারণ হইয়া উঠিলেও মূলে ইহা মানুষের স্বভাবগত জাতীয় কর্ত্তব্য-বিভাগের ব্যবস্থা রূপে দেখা দিয়াছিল, এবং তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। যে ভারতীয় সংস্কৃতি সমাজের কৃষক-পশুপালক শ্রেণীর মানুষকেও 'দ্বিজ'স্তরে তুলিয়া ধরিয়াছিল তাহা যে এক শ্রেণীর মানুষকে নীচে ফেলিয়া রাখিবে ইহা অসঙ্গত কল্পনা।* আসলে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বসমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা স্থূল কায়িক কর্ম্মের দিকে, সূক্ষ্ম মানসিক, বৌদ্ধিক বা আত্মিক অনুশীলনের দিকে নয়। এই কায়িক কর্ম্মের প্রাবণতাসম্পন্ন 'শূদ্র'দেরও তাৎকালিক সমাজধর্ম্ম উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সহায়তা বা 'পরিচর্য্যা' কর্ম্মে নিযুক্ত করিত। ঐ তিন বর্ণের মত ইঁহাদেরও অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারিতা বর্জন করিয়া আত্মিক ঊর্দ্ধগতির শিক্ষা-সাধনা গ্রহণ করিতে হইত। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

---

*'যদি ভারতের ইতিহাস পড়ো, তবে দেখবে—এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও।'

—স্বামী বিবেকানন্দ।

(বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫)

বর্ণধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল সকল রকম স্বাভাবিক প্রবণতার মানুষকেই তাহাদের নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্ম্মের মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞানের অভিমুখী করিয়া তোলা। এই 'স্বাভাবিক কর্মকে' বলা হইত 'স্বকর্ম' বা 'স্বধর্ম্মপালন।' এইভাবে প্রত্যেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আধ্যাত্মিক মহামুক্তি বা আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেন। মনে রাখিতে হইবে সমাজ ও রাষ্ট্রও সেযুগে এই মহামুক্তি বা আত্মজ্ঞানের প্রবর্ত্তক ছিল। সেজন্য সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় দায়িত্ব-কর্ত্তব্য পালন তখন এযুগের মত 'চাকুরী' বলিয়া বিবেচিত হইত না, তাহা ছিল 'স্বধর্ম্মপালন' এবং পরম গৌরবময়। এই স্বধর্ম্মপালনের দৃষ্টিতে বড় ছোটর ভেদ ছিল না।

এই জাতীয়সাধনায় সকলেই ছিলেন সমানভাবে মহামুক্তির অধিকারী। গীতায় নিম্নলিখিত ঘোষণাই তাহার প্রমাণ :—

যতো প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্‌।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥'

(গীতা—১৮।৪৬)

অর্থাৎ—'যাঁহা হইতে মনুষ্যগণের কর্ম্মপ্রবৃত্তি আসে এবং যিনি সব কিছুর মধ্যেই রহিয়াছেন, নিজ স্বাভাবিক কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া মানুষ সিদ্ধি (আত্মজ্ঞান বা মহামুক্তি) লাভ করে। ইহা বর্ণধর্ম্মের আদর্শেরই প্রতিধ্বনি। সুতরাং 'work is worship', অর্থাৎ—'কর্ম্মই উপাসনা', একথা এখানেই সম্যক্‌ভাবে সার্থক। এই উপাসনামূলক জাতীয় কর্ম্ম

বা 'National Duty' বিভিন্ন স্বভাবগুণসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বিভিন্নভাবে বিহিত হইয়াছিল, গীতা একথাও বলিয়াছেন। যথা :—

'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥'

(গীতা—১৮।১৪)

অর্থাৎ—'হে পরন্তপ অর্জ্জুন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম তাহাদের স্বভাবসঞ্জাত গুণের ভিত্তিতেই বিভাগ করা হইয়াছে।'

এই নিজ নিজ 'স্বভাবগুণ'-অনুযায়ী কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রত্যেকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু লাভ করিতে পারে, সুতরাং কর্ম্মের ভেদ থাকিলেও মনুষ্যত্বের ভেদ এখানে নাই, সকলেই এই দৃষ্টিতে সমান।—

'স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।'

(গীতা—১৮।৪৫)

অর্থাৎ—'নিজ নিজ স্বভাবগত কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াই মানুষ সংসিদ্ধি লাভ করিতে পারে।' ইহাই ভারতের সমাজসাম্য। ইহাতে প্রাকৃতিক নিয়মকে স্বীকার করিয়া, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সত্বাকে স্বীকার করিয়া, তাহার 'স্বভাব-স্বাধীন' কাজের মধ্য দিয়া প্রত্যেক মানুষকে সকলের সহিত আত্মজ্ঞান লাভের সমান সুযোগ ও সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহাই ছিল সে যুগের আদর্শে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমাজসাম্যের অপূর্ব্ব

সমন্বয়। আজিকার যুগের কাহিনী কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক্। এক দিকে Individualism বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, এমন কি বিভিন্ন জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে সমান সুযোগ ও সমান অধিকারের উত্তেজনাপূর্ণ দাবী ও উন্মাদনাপূর্ণ সংঘর্ষ, অপর দিকে Socialism বা সমাজতন্ত্রের নামে জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতাপ্রয়োগ সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হয়।

আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ ভুল হইবে যে আমরা প্রাচীন বর্ণধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। আমরা পূর্ব্বেই ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে প্রাচীন এই সমাজব্যবস্থা ও তাহার রীতিনীতি এযুগের জীবনে অনেকখানিই অচল। মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে এই কয়েক সহস্র বৎসরের ব্যবধানে বিরাট পরিবর্ত্তনও সাধিত হইয়াছে। অনেক নূতন ভাব ও চিন্তাধারা দেখা দিয়াছে, অনেক পুরাতন আদর্শ ও প্রথা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। বিশেষে বিংশ শতাব্দীর এই যুগ-সঙ্কটে ধর্ম্মে-দর্শনে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-শিল্পে, রাষ্ট্রে-সমাজে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে কোনও নূতন আদর্শবাদকেও আজ নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় না, পুরাতনের ত কথাই নাই। তবে কেন আমরা এই প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির আদর্শবাদ লইয়া আলোচনা করিতেছি?

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ভারতীয়

সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাস্তব অবদান তাহার প্রাচীন বর্ণাশ্রমের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক মানবীয় আদর্শ বিরাজমান যাহা আজও পরিবর্ত্তিত আকারে যুগসমস্যার সমাধানে কাজে লাগিবে। ইহা সত্য যে সেযুগের এই আদর্শ মূলতঃ আধ্যাত্মিক এবং এযুগের জীবন প্রধানতঃ আধিভৌতিক। সেযুগ আত্মবাদী, এযুগ জড়বাদী; সেযুগ ত্যাগবাদী, এযুগ ভোগবাদী; সেযুগ রহস্যবাদী, এযুগ যুক্তিবাদী; সেযুগ ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের যুগ, এযুগ বিজ্ঞান ও অর্থনীতির যুগ। এবং সর্ব্বোপরি যন্ত্রবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব অগ্রগতিতে কয়েক হাজার বৎসর আগের কথা দূরে থাক, দুইশত বৎসরের আগের জগৎকেও আজ চিনিবার উপায় নাই।

কিন্তু মানুষ মানুষই আছে। তাহার দেহমনোবুদ্ধির পিছনে তাহার আত্মার দৃষ্টি পূর্ব্বের মত আজিও অনন্তের দিকে প্রসারিত। আজও তাহার প্রাণের বেদনাময় আকুতি 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?'—'যাহাতে আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিব তাহাতে আমার কি হইবে?' আজও মানুষ জীবনকে ভালবাসে এবং বাঁচিতে চায়, কিন্তু অনন্ত অমর জীবনের আশা ও বিশ্বাস হারাইয়া আজ সে ক্ষণস্থায়ী দৈহিক জীবনকেই আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, শাশ্বত প্রেমের ধারণা হারাইয়া আজ সে ক্ষণিক কামের কল্পনাতেই ডুবিতে চাহিতেছে, 'প্রাণারামং মন আনন্দম্'কে ধরিতে না পারিয়া আজ সে যান্ত্রিক আরাম ও কৃত্রিম আনন্দের পিছনে ছুটাছুটি করিতেছে। ব্যর্থতার দাবানল দাউ দাউ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং ছড়াইয়া পড়িতেছে। মানুষের অবসন্ন অসুখী আত্মা

মরিয়া হইয়া নানা বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক সাজ-সরঞ্জামের মধ্য দিয়া নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিতে চাহিতেছে। কিন্তু একটা সহজ সত্য মানুষ ভুলিয়া যায় যে দেহমনোবুদ্ধি-আমিত্ব ও বাহিরের জড় জগৎ কোনটিই তাহার নিজের সৃষ্টি নয়। 'সুতরাং 'Self-management' বা আত্মনিয়ন্ত্রণ এখানে বেশী খাটিবে না, তাহাকে প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবেই।

মনুষ্যজীবনে এই প্রকৃতির নিয়মকেই বলে ধর্ম্ম। সেজন্য ধর্মীয় মতবাদ ভারতে বড় কথা নয়। জীবনের নিয়মকে জানা ও অনুসরণ করাই বড় কথা। প্রাচীন ভারতে এই জীবন-নিয়মের দ্রষ্টাকে বলা হইত ঋষি। এই ঋষিগণের বিধানেই বর্ণাশ্রম গঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদেরই অনুশাসনে ইহা পরিচালিত হইত। সুতরাং জড়জগতে যেমন বিজ্ঞানের নিয়মকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তেমনি মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে আত্মার নিয়মকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই,--করিলে—উপনিষদের ভাষায়, 'মহতী বিনষ্টিঃ', অর্থাৎ বিপুল বিনাশ। সেজন্য জড়বাদী বা ভোগবাদী হইয়াও মানুষ তাহার ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে স্বস্তিতে থাকিতে পারে না। জড়ের মধ্যে, ভোগের মধ্যেও প্রাকৃতিক বিধানে সে যেন চৈতন্যের বন্ধনমুক্তির দিকেই ছুটিতে চায়।

কালচক্রের আবর্ত্তনে মানবাত্মার এই বন্ধনমুক্তির যুগ কিন্তু সব সময় আবির্ভূত হয় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া যথাসময়ে তাহা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশে ও কালে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপও

গ্রহণ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধর্ম্মান্দোলনগুলি এই ভাবেই দেখা দিয়াছে। সেগুলির দ্বারা মানবসমাজের এক একটা অন্ধকার দিক্ সহসা আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে এগুলি বিশ্বমানবের জীবনে প্রসার লাভ করিয়া তত্তৎ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুগামী মানুষের সংখ্যা দেশে-বিদেশে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গুলিকেই বলে proselytizing বা স্বসম্প্রদায়ভুক্তকারী ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্ম ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। পৃথিবীতে আজ এই সব ধর্ম্মের অনুগামীর সংখ্যা বিশাল। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মও যে এভাবে আত্মপ্রসার করে নাই তাহা নহে, নচেৎ বৈদিক সমাজ-সংস্কৃতি এতখানি প্রসার লাভ করিতে পারিত না।

কিন্তু তবুও বলিতে হয় যে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মের একটা নিজস্ব স্বভাব ও গতি ছিল যাহার এযুগের দৃষ্টিতেও একটা প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহা এই বর্ণাশ্রম সমাজসাধনা। ইহার মূল উদ্দেশ্য কোনও ধর্ম্মমতবাদের প্রচার-প্রসার নয়, পরন্তু একটা সমগ্র সমাজ ও জাতির জীবনে মনুষ্যত্বের সাধনা ও মহামুক্তির আন্দোলন ধাপে ধাপে গড়িয়া তোলা। এবিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই বৈশিষ্ট্য ভারতীয় ধর্ম্মে এমনি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে কালক্রমে ভারতধর্ম্ম কোনও proselytizing বা ধর্ম্মান্তরী-করণের আদর্শে জোর দেয় নাই, মুক্তিমার্গী মানুষগঠনের সাধনাই তাহার ব্রতরূপে দেখা দিয়াছিল। এই জন্যই

আমরা দেখিতে পাই পরবর্ত্তী যুগে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগেও ভারতে যতগুলি উল্লেখযোগ্য ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মান্দোলন আবির্ভূত হইয়াছে তাহারা বহির্ভারতে দলবৃদ্ধি বা স্বমতাবলম্বীদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে ততখানি জোর দেয় নাই, যতখানি দিয়াছে মানুষের জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার দিকে। রোমের মহামান্য বর্ত্তমান Pope, Paul VI কেও আজ ভারতের 'rich heritage of spiritual values' এর প্রশংসা করিতে হইয়াছে (Vatican ভাষণ, ২০।১২।৬৪)।

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ধর্ম্মমতের মধ্যেই বিশ্বমানবধর্ম্মেরই উপাদান রহিয়াছে এবং দেশে-বিদেশে সেই ধর্ম্মমতের অনুরাগী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি সেই ধর্ম্মের সফলতারই পরিচয় দেয়। বিশ্বধর্ম্মের এইরূপ প্রচার-প্রসার স্বাভাবিক এবং মানবসভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয়ও বটে। পরস্পর বিরোধিতা সত্বেও বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লামধর্ম্ম মানুষের সভ্যতায় এক ব্যাপক আধ্যাত্মিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে ইহা অনস্বীকার্য্য। নানাভাবে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনধারাকে ইহারা সমৃদ্ধ করিয়াছে। পৃথিবীর বিরাট বিরাট জনসমষ্টি এই ধর্ম্মমতগুলির অনুগামী। কিন্তু তবুও বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্কটে আজ সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হয় যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ মনুষ্যত্বের মান দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। এই বিজ্ঞান-অর্থনীতি-রাজনীতির যুগে বিশ্বমানবের চিন্তারাজ্যে একটা ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। 'পুরাতন' ধর্মীয় আদর্শেও অধিকাংশ মানুষের

আজ আস্থা নাই। বিশ্বমানবের গ্রহণীয় কোনও মানবিক আদর্শের অনুশীলন আজ সহজে চোখে পড়ে না। বিশ্বধর্মগুলির দ্বারা এক বিশ্বমানবতার আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে এরূপও বলিতে পারা যায় না। অপর দিকে জড়বাদী অর্থনীতির মধ্য দিয়া 'কমিউনিজ্‌ম' বা ধনসাম্যবাদ যে বিশ্বমানবতার সৌধ গড়িতে যাইতেছিল, তাহাতেও বড় বড় ফাটল দেখা দিয়াছে। 'Class Struggle' বা শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়া বিশ্বশ্রমিক সমাজ ও বিশ্বশ্রমিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে গিয়া আজ এই মতবাদ দেশে-দেশে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে হিংসা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের জনক হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর চারিদিকে আজ সেজন্য নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনীভূত।

আজ বিশ্বমানবের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এক মানবতা-ধর্মী আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই আন্দোলন কোনও ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মতবাদকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। আজ চাই মতবাদ নয়, মানুষ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যদি আজ বিশ্বশান্তি ও বিশ্বসমৃদ্ধি লক্ষ্যস্থল হয়, তবে এমন নূতন মানুষের সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা মানবতাকেই সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার একটি সাম্প্রতিক ভাষণে (বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায়) ইউরোপীয় তরুণদের সম্মুখে এই কথাটিই তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আজ উৎকট জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই আদর্শ সার্থক করিতে

গেলে মনঃসংযমন এবং আন্তর পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নূতন মানুষ গড়িতে হইবে।

এতক্ষণে আমরা আসল কথায় আসিতে পারিয়াছি। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোনও ক্ষেত্রেই আজ এক নূতন আদর্শ ছাড়া সভ্যতার এই মহাসঙ্কট হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করা যাইবে না। এই আদর্শ হইবে জীবন্ত বিশ্বমানবতাবাদ। কোনও বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাস বা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতের মূল্য অবশ্যই আছে ও থাকিবে, কিন্তু এগুলিকে সম্পূরণ (supplement) করিবার জন্য আজ চাই বাস্তব জীবনে মতনিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের সাধনা ও প্রসার। ইহাই হইবে আজিকার বিশ্বমানবতার ভিত্তি এবং এই ভিত্তিতেই আজ বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের, সমাজ ও সংস্কৃতির মহাসমন্বয় ও মহামিলন ঘটিতে পারে। এমনকি রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রকৃত সাফল্য ও আন্তর্জাতিক সমন্বয় একমাত্র এই পথেই সম্ভব। আজিকার বিশ্বসমস্যার সমাধানের ইহাই চাবিকাটি।

কিন্তু এই মানবতার ধর্ম্ম কোনও মনগড়া ধর্ম হইতে পারে না। বাস্তব জীবনে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ইহা আসা চাই এবং 'ঐশ্বরিক' বা মহাপ্রাকৃতিক বিধানে ও নিয়মে ইহা পরিচালিত হওয়া চাই। প্রথমটির আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে ধর্ম-মতনিরপেক্ষ মানবতার সাধনা ও তাহার উপাদান প্রাচীন ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মধ্যে রহিয়াছে। এই সমাজ-সাধনা ভারতের এক সুদীর্ঘ গৌরবময় যুগে সাফল্যের সহিত পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। ইহারই ভিত্তিতে কয়েক সহস্র বৎসর এই দেশের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি সুপরিচালিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালের বহু বিদেশী পর্য্যটক ভারতীয় সমাজে ও রাষ্ট্রে জনসাধারণের চারিত্রিক উৎকর্ষের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। জনজীবনে এই মানবীয় সদ্‌গুণের প্রতিষ্ঠা একদিনে বা একযুগে ঘটে নাই। বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগ হইতে রামায়ণ-মহাভারতযুগে ও তথাকথিত ঐতিহাসিক যুগেও সমাজে ও রাষ্ট্রে এই মনুষ্যত্বসাধনার ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। এই tradition বা ঐতিহ্য যে কত প্রাচীন ও কত সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা নানাভাবে প্রমাণিত। ইহা সত্য যে এই গৌরবময় যুগের কোনও পরিষ্কার 'আধুনিক' ইতিহাস আমরা পাই না। তাহার কারণ, এই সংস্কৃতি জাগতিক বা ঐহিক 'ইতিহাস সৃষ্টি'র দিকে মোটেই ঝোঁক দেয় নাই। ইহার ইতিহাসের সংজ্ঞাও ইহার বিশিষ্ট চিন্তাধারার সাক্ষ্য দেয় :—

'ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পুরাবৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসঃ প্রচক্ষতে॥'

অর্থাৎ—'ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপদেশ দেওয়ার জন্য যে প্রাচীন কাহিনী তাহাকেই ইতিহাস বলে।' নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য এখানে সুস্পষ্ট। এজন্য মানবীয় কীর্ত্তি-ঘোষণার উদ্দেশ্যে স্তম্ভাদিস্থাপনও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অভিমত ছিল না। প্রাচীন গ্রীক লেখক Arrian খৃষ্টপূর্ব্বযুগের ভারতবাসীগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন—'It is further said that the Indians do not rear monuments to the

dead, but consider the virtues which men have displayed in life, and the songs in which their praises are celebrated, sufficient to preserve their memory after death.', অর্থাৎ—'আরও জানা যায় যে ভারতীয়গণ মৃতের জন্ত স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করেন না, পরন্তু তাঁহারা মানুষের জীবিতকালে আচরিত ধর্ম এবং তাঁহাদের স্তবগাথাকেই মৃত্যুর পরে স্মৃতিরক্ষার জন্ত যথেষ্ট মনে করেন।' * ইহাতেই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ধরা যায়। কিন্তু তবুও ইহা বর্ত্তমানে প্রমাণিত যে সুপ্রাচীন বেদ-উপনিষদ্-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে এই গৌরবময় যুগের ঐতিহাসিক উপাদান প্রচুর ছড়ান রহিয়াছে। ভারতযুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় হইতে সুসম্বদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বস্তুতঃ রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির ঐতিহাসিক মূল্য ভারতের ইংরাজযুগের ঐতিহাসিকগণের নিকট অনেকটা অস্বীকৃত হইলেও আধুনিককালে ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অর্থপূর্ণ নিদর্শন হইতেছে এই যে এই যুগের প্রভাব আজিও ভারতের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে ব্যাপকভাবে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। Homer এর Iliad ও Odyssey বহুকাল ইউরোপীয় সমাজজীবনে মৃত, কিন্তু পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত—স্মৃতি—সূত্র ভারতীয় জীবনে আজিও জীবিত। Sardar K. M. Panikkar এর ন্যায়

---

*Classical Accounts of India—(Arrian Mc Crindle) Ed. Dr. R. C. Mozumdar; Pg. 223.

গোঁড়ামিবর্জিত (unorthodox) আধুনিক ইতিহাস-সমালোচকও তাঁহার 'A Survey of Indian History' গ্রন্থে লিখিতেছেন—'The society described in the Mahabharat is not essentially different from what holds sway to-day in India,' অর্থাৎ—'মহাভারতে বর্ণিত সমাজ আজিকার ভারতীয় সমাজজীবন হইতে মূলতঃ পৃথক্ নহে।' অপরদিকে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে সহস্রাধিক বৎসরের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের যে সুসম্বদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে তাহাতেও রামায়ণ-মহাভারতযুগের সংস্কৃতির জীবন্ত প্রভাব প্রমাণিত হয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। *এই পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে সর্ব্বত্র বর্ণাশ্রমসাধনার মহিমাই ঘোষিত হইয়াছে। মনু-সংহিতাদি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থেও বর্ণাশ্রমের বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কৌটিল্যের রাজনীতি-অর্থনীতি-বিষয়ক বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'অর্থশাস্ত্র'গ্রন্থেও রহিয়াছে বর্ণাশ্রমের আলোচনা। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ও খ্রীষ্টাবর যুগের কাব্যগ্রন্থ ও দার্শনিক

---

* দ্রষ্টব্য : Ancient Indian Historical Tradition
—F. E. Pargiter.
Political History of Ancient India
—H. C. Ray Chaudhuri.
The History and Culture of the Indian People
—Bharatiya Vidya Bhavan

গ্রন্থাদিতেও সেই একই কথা। যতগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় ভারতে পরবর্ত্তিকালে উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদাকে স্বীকার করিয়াছে। সংস্কারপন্থীরাও প্রকারান্তরে ইহার সুদীর্ঘকালের প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়াছেন।

মানবতাসাধনার এই সামাজিক আদর্শকে ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই 'শাশ্বত ধর্ম্ম' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্ম্মের সংজ্ঞা। সেজন্য কোনও সীমাবদ্ধ নাম, যথা—'আর্য্য' বা 'হিন্দু'—ভারতের জাতীয় জীবনে বা জনমানসে তত স্থায়ী প্রাধান্য লাভ করে নাই। কিন্তু তথাপি এই শাশ্বত ধর্ম্মের একটি নিজস্ব বাস্তব সামাজিক রূপ রহিয়াছে, তাহাই বর্ণাশ্রমসাধনা। মনুষ্যত্বের সাধনার ভিত্তিতে মহামুক্তির সাধনাই ভারতের 'শাশ্বত ধর্ম্ম'। শাশ্বত ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করাই ছিল বর্ণাশ্রমের লক্ষ্য। সুতরাং এ যুগে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় জীবনকে গঠিত ও সংহত করার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির এই জাতীয় আদর্শটিকে উপেক্ষা করা চলে না।

জাতীয় জীবনে আজ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় ও সংহতি-গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই প্রচেষ্টা খুবই বাস্তবধর্ম্মী হওয়া প্রয়োজন, তবেই ইহা সফল হইতে পারে। জাতীয় জীবনে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসা ও মানবপ্রেম, ইস্‌লামধর্ম্মের নিষ্ঠা ও সমাজসাম্য এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্বাস ও জনসেবার আদর্শকে

যেমন গ্রহণ করিয়াছি ও করিতেছি, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় শাশ্বতধর্ম্মের মনুষ্যত্বসাধনার আদর্শকেও জাতীয় জীবনে আজ গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন সমাজসাধনার পাশাপাশি এই অসাম্প্রদায়িক মানুষগঠনের সমাজসাধনাও আজ প্রকৃতির নিয়মে একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কোনও মহান্ আদর্শবাদ ছাড়া কোনও জাতি স্থায়ীভাবে উন্নতি বা অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যত্বের ধর্ম্মই আজ ভারতের সেই জাতীয় আদর্শ-বাদ। আজ পর্য্যন্ত যে এক্ষেত্রে জীবন্ত সমন্বয় সাধিত হয় নাই তাহার কারণ আমরা এতদিন একটি বুদ্ধিবাদী দার্শনিক উদারতা ও বিশ্বজনীনতাকেই জাতীয় ধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছি। সমন্বয়ের আদর্শ ভারতে কিছু নূতন কথা বা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। বহুবিধ ধর্ম্মের বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়াও ভারতে বর্ণাশ্রমসাধনার মানবীয় বাস্তব আদর্শ সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সামগ্রিকভাবে বহুকাল বিরাজিত ছিল। ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজসংহতির মূল রহস্য। এই সমাজসংহতির ভিত্তিতে ঐতিহাসিক যুগেই সহস্রাধিক বৎসর ব্যাপিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে এক শক্তির তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই যুগেই একদিকে যেমন ভারতের জাতীয়জীবনে শান্তিসমৃদ্ধি, শিল্পকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য, কাব্যদর্শনের প্রাচুর্ভাব ঘটিয়াছিল, অপরদিকে বহির্ভারতে সুমাত্রা-জাভা-ইন্দোনেশিয়া-মালয়-শ্যাম-ইন্দোচীনে ভারতীয় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সব দেশের বহুস্থানে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্পকলা, ধর্ম্ম-

রীতিনীতি ও রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাবনিদর্শন, আজিও বিদ্যমান। তবুও এরূপ বৈদেশিক রাজ্যস্থাপনের প্রবণতা লইয়া বহির্ভারতে অভিযান ভারতীয় প্রতিভার মূল লক্ষ্য ছিল না তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রাচীন বিদেশী লেখকের ভাষাতেই বলি, 'On the other hand, a sense of justice, they say, prevented any Indian king from attempting conquest beyond the limits of India', অর্থাৎ—'অপরপক্ষে, তাঁহারা (ভারতীয়েরা) বলেন যে ন্যায়ধর্মবোধ হইতেই কোনও ভারতীয় নরপতি ভারতের বাহিরে রাজ্যজয়ের চেষ্টা করেন নাই।'—(Arrian)। ইহা আলেক্জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সমসাময়িক কালের কথা। যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির কথা আমরা বলিতেছি এখানে তাহারই স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পুনরায় বলিয়া রাখি যে প্রাচীন বর্ণাশ্রমসাধনার পক্ষসমর্থন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যে ঐতিহাসিক ও 'ইতিহাস'-পূর্ব্বযুগের আলোচনা করিয়াছি তখন বর্ণাশ্রম যে একটি নির্দ্দিষ্ট-রূপে সব সময় বিদ্যমান ছিল তাহাও নয়। তাহার মধ্যে যাবতীয় আদর্শবাদের মত নানা ত্রুটীও যে ছিল না একথাও আমরা বলি না। কিন্তু তথাপি একথা সত্য যে ঐ সহস্রাধিকবর্ষ-ব্যাপী জাতীয় জীবনের ইতিহাসে একটি মনুষ্যত্বসাধনার আদর্শ ও 'ধর্ম্ম' ভারতীয় সমাজজীবনে স্বীকৃত ছিল। ইহাই ভারতের জাতীয় ঐক্যের ও আত্মবিশ্বাসের মূল সূত্র—তাহার জাতীয় আদর্শবাদ। আজ এই জাতীয় আদর্শের মূলনীতির

উপযোগিতাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভারতের জাতীয় জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের মানবপ্রেম ও অহিংসার আদর্শ, খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্বাস ও মানবসেবার আদর্শ, মুসলমানধর্মের নিষ্ঠা ও সমাজসাম্যের আদর্শ আমরা জাতীয়জীবনে গ্রহণ করিয়াছি ও করিতেছি একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ভারতীয় 'শাশ্বত ধর্ম্ম' বা 'হিন্দু'ধর্ম্মের কোন্ অবদান আমরা জাতীয় জীবনে গ্রহণ করিব ? মাত্র দার্শনিক উদারতা ও বিশ্বজনীনতা এই অবদান হইতে পারে না। সকল ধর্ম্মেরই নিজস্ব দার্শনিক উদারতা ও বিশ্বজনীনতার আদর্শ আছে। তবে ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম্মের বিশিষ্ট অবদান কি ? বর্ণাশ্রমের জাতীয় মনুষ্যত্বসাধনাই তাহার বিশিষ্ট অবদান। দার্শনিক উদারতা ও বিশ্বজনীনতার আদর্শ প্রচারের যুগ অতীত হইয়াছে। ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে—সমযোপযোগী ধর্ম্মান্দোলনের প্রবর্ত্তক রামানন্দ-কবীর-নানকের যুগে—ইহার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। ইস্‌লামধর্ম্মের অভিনব সংঘাতে আত্মস্থ থাকিবার উপায় হিসাবে ভারতীয় শাশ্বতধর্ম্মের ক্ষেত্রে ইহা যুগ-প্রয়োজনেই প্রচারিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবল প্রভাবের সম্মুখেও আত্মস্থ থাকিবার জন্য এক উদার ধর্ম্মসমন্বয়ের মত ভারতীয় সমাজে প্রচার করিবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজিকার নূতন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সমবায়ে নূতন জাতীয় জীবনগঠনের পরিকল্পনার যুগে, ঐ মধ্যযুগীয় দার্শনিকতার জের টানিয়া লাভ হইবে না। অথচ অভ্যাসবশে আমরা তাহাই

করিয়া চলিয়াছি। আমরা ভারতের বাস্তব সমাজধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়া চলিয়াছি, এজন্য সমস্ত সমন্বয়প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। আমরা সমন্বয় চাই কোথায়? নিশ্চয় দার্শনিকতা বা ব্যক্তিগত ধার্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, পরন্তু সামাজিক ও জাতীয় জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিক ঐক্য প্রতিপন্ন করিয়া অথবা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে স্বাভাবিক আদান-প্রদানের নজির দেখাইয়া ভারতের বিশাল সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটান যাইবে না। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজধর্ম্মের সহিত ভারতীয় সমাজধর্ম্মের সমন্বয়সাধনাই তাহার একমাত্র বাস্তব পন্থা। আর বর্ণাশ্রমই ভারতের সেই সমাজধর্ম্ম।

বহু শতাব্দীর নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিবার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম-সমাজ-সাধনার মধ্য যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও বিপর্যয় ঘটিয়াছে এবং কালক্রমে ইহা একটি প্রাণহীন জাতীয় আদর্শের স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সমস্ত আদর্শবাদেরই এভাবে 'মৃত্যু' ঘটে, ইহা ইতিহাসপাঠে জানা যায়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতের এই সমাজসাধনার প্রতি মৃত্যুহীন শ্রদ্ধা আজিও জাতীয় মনের অবচেতনে অনির্ব্বাণ দীপশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। এই আদর্শ আত্মিক আদর্শ বলিয়া অমর। এজন্য ইহার জীর্ণ কঙ্কালকেও ভারতীয় 'হিন্দু'সমাজ আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। নানাভাবে ইহার বাহ্যিক সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সমাজজীবনে তাহাতে ব্যাপক কোনও সাফল্য

দেখা দেয় নাই। ভারতীয় 'হিন্দু'সমাজ তাহার প্রাচীন সমাজ-ধর্ম্মের মূলনীতির পুনর্জ্জাগরণের আশায় অপেক্ষা করিয়া আছে জ্ঞাতসারে নয়,— অজ্ঞাতসারে,— 'race-unconscious' বা জাতীয় মনের নির্জ্জ্ঞানস্তরে।

কি সেই মূল নীতি? ব্রহ্মচর্য্যসাধনার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনগঠন এবং 'স্বকর্ম্ম'-সাধনার ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দায়িত্ব-কর্ত্তব্য পবিত্র ব্রতজ্ঞানে উদ্‌যাপন—এই দুইটি সেই মূল নীতি। এ বিষয়ে কিছু বিশদ আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। প্রাচীন বর্ণাশ্রমের রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাস সমাজে পুনর্জ্জাগরিত করিবার যুগ ইহা নয়, তাহা বর্ত্তমান যুগপরিবেশে সম্ভব বা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু ভারতের সমাজজীবনে ও জাতীয়জীবনে আজ পূর্ব্বোক্ত দুইটি 'বিজ্ঞানসম্মত' ও 'ধর্ম্মসম্মত' মনুষ্যত্বসাধনার সময় ও প্রয়োজন আসিয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন সমাজধর্ম্মের মূল মানবিক যে নীতিগুলি গৃহীত হওয়ার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ভারতীয় 'হিন্দু'সমাজ-ধর্ম্মের এই দুইটি মূল নীতিকে গ্রহণ না করিলে সমাজসমন্বয়, ধর্মসমন্বয়, জাতীয় সংহতি ও জাতীয়তার নবজাগরণ সুদূরপরাহত।

আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে প্রথম হইতেই গীতার আদর্শ ও সাধনার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হইয়াছে। লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং আরও অনেকে গীতার সাধনাকেই জাতীয় জীবনসাধনায় রূপান্তরিত করিতে

নানাভাবে প্রয়াসী হন। কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে জাতীয় জীবনে বা সমাজজীবনে গীতার সাধনা নাড়া দিতে পারে নাই। তাহার কারণ গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শ ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী হইতে গেলে যে অনুকূল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশের প্রয়োজন তাহা আজিও ভারতে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত এবং সমগ্র মহাভারতের মধ্যে সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্ম্মসংস্থাপনের কথাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মসংস্থাপন কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার নয়, তাহার ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ইহা 'শাশ্বত ধর্ম্ম' এবং এই শাশ্বত ধর্ম্মের মূল কথা ব্রহ্মচর্য্য ও স্বকর্ম্মসাধনা। কিন্তু অনুকূল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশেই এই সাধনা সার্থক হইতে পারে। এজন্য গীতার মধ্যেও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ধর্ম্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার সূত্রেই কর্ম্মযোগের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'লোকসংগ্রহ' কথাটিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। লোকসংগ্রহের অর্থ জনসাধারণকে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ধর্ম্মপালনে যথাবিহিত নিরত রাখা। সুতরাং এই সমাজধর্ম্মের ও জাতীয় ধর্ম্মের আদর্শকে বাদ দিয়া গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শ প্রচার একটি অবাস্তব পরিণতি লাভ করিতে বাধ্য। কার্য্যতঃ হইয়াছেও তাহাই।

ভারত আজ যুগোপযোগীভাবেই ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম্মনিরপেক্ষতার অর্থ অধার্ম্মিকতা নয়, ইহা অনেক দেশনেতা ও বহু দেশহিতৈষী মনীষী উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ধর্মীয় মতবাদকে বর্জন

করিতে চাই কিন্তু মনুষ্যত্বসাধনার ধর্মকে অবশ্যই বর্জন করিতে চাই না ও পারি না। আমাদের আদর্শ শুধু 'বিলাতী' কল্যাণ-রাষ্ট্র (welfare state) নয়, আমরা চাই নিজস্ব আদর্শে কল্যাণরাষ্ট্র।

সুতরাং সমস্যা হইতেছে কেমন করিয়া ভারতের নিজস্ব আদর্শে কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা যায়। সমাজতন্ত্র (socialism) বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (democratic socialism) আজ আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রনীতির আদর্শ। কিন্তু ইহার মধ্যে কেমন করিয়া ভারতের মানবতার আদর্শকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া যাইতে পারে তাহাই প্রশ্ন। আমরা ধর্মীয় গোঁড়ামি বর্জন করিয়া যন্ত্রবিজ্ঞান (technology)-এর সহায়তায় একটি সুখী ও সমৃদ্ধ আধুনিক জাতিতে পরিণত হইতে চাই। কিন্তু এই ঐহিক অভ্যুদয়ের সহিত আমরা ভারতের শাশ্বত আধ্যাত্মিক সম্পদ্ ও তাহার সংস্কৃতির অভ্যুদয়কেও নিশ্চয় যুক্ত করিতে চাই। ভারতের অবিসম্বাদী মহান্ নেতা শ্রীজহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—

'I do not want to barter away India's idealism, India's great thought, even for material prosperity. I do not see why we should not have both. I invite all of you to join this tremendous adventure,' অর্থাৎ—'এমনকি জাগতিক সমৃদ্ধির জন্যও আমি ভারতের আদর্শবাদ, ভারতের

মহান্ চিন্তাধারাকে বিনিময় করিতে চাহিনা। আমরা দুইটিকেই কেন লাভ করিতে পারিব না তাহা আমি বুঝি না। আমি আপনাদের সকলকেই এই বিপুল অভিযানে যোগদান করিতে আহ্বান জানাই।'— (মাদুরাই জনসভার বক্তৃতা, ৫ই অক্টোবর, ১৯৬৩)। জাতীয়জীবনে ঐহিক উন্নতির জন্য আজ আমাদের প্রশংসনীয় ও সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু 'ভারতের আদর্শবাদ ও মহান্ চিন্তাধারাকে' জাতীয়জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কোথায়? আমরা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে ভারতের চিরন্তন সমাজধর্ম্মের ঐতিহ্য ও অবদানকে বাদ দিয়া ইহা গড়িতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। দেশে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনার বিশেষ অভাব নাই, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীগণকে আধ্যাত্মিক আশা ও সান্ত্বনা দিবার ধর্মমত বা প্রতিষ্ঠানেরও নিশ্চয় অভাব নাই। কিন্তু সমগ্র জাতীয় জীবনকে মনুষ্যত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার সুসংহত প্রচেষ্টা বা সাধনা কোথায়? মহাত্মা গান্ধী এ পথে পা' বাড়াইয়াছিলেন; এ জন্য তিনি সাহস ও বীরত্বের সহিত সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাকে তাঁহার জীবন সাধনায় ও জাতীয় জীবনসাধনায় প্রধান স্থান দিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন— 'My Mahatmaship is worthless. It is due to my outward activities, due to my politics which is the least part of me and is therefore evanescent. What is of abiding worth is my insistence on truth, non-violence and *Brahmacharya* which is the real part

of me. ... . It is my all.', অর্থাৎ— 'আমার মহাত্মানামের কোনও মূল্য নাই। ইহা আমার বাহ্যিক কার্য্যাবলীর—আমার রাজনীতিচর্চ্চার—ফলশ্রুতি এবং ইহা আমার জীবনের সামান্যতম অংশ, সুতরাং অস্থায়ী। যাহার মূল্য চিরস্থায়ী তাহা আমার সত্য, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্যকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা এবং ইহাই আমার জীবনের সত্যিকার ও প্রধান অংশ। ... ইহাই আমার সর্ব্বস্ব।' (Young India পত্রিকা, পূর্ব্ব-লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৭) এই কথাগুলি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় গান্ধীজী জীবনসাধনায় ভারতীয় সমাজধর্ম ও সংস্কৃতির কয়েকটি প্রধান নীতিকে সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নীতিগুলিও ভারতীয় সমাজধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রযুক্ত হয় নাই। পরন্তু গান্ধীজীর মহান্ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে সমাজ-সংস্কারের মনোভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহারই জন্য ফল আশানুরূপ হয় নাই ও নানা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। অহিংসা —অর্থাৎ স্বার্থপরভাবে পরপীড়ন না করা এবং সর্ব্বজীবে আত্ম-সমজ্ঞান—ইহা ভারতীয় সমাজধর্ম্মেরই নীতি। বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারতের সর্ব্বত্র এই অহিংসাকে ধর্ম্মসাধনার একটী প্রধান অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজধর্ম্মে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করাকেও অহিংসাধর্ম্মের অনুকূল মনে করা হইয়াছে। এজন্য শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় অহিংসার বিশেষ প্রশংসা থাকিলেও অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয়োচিত সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবও অহিংসাবাদী হইয়াও সেনাপতি সিংহকে ন্যায়যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। —(The Gospel of Buddha: Paul Carus,

ভিক্ষু শীলভদ্রকৃত অনুবাদ 'বুদ্ধবাণী', পৃঃ ১১৯।১২১)। কিন্তু গান্ধীজীর নীতিও ন্যায়যুদ্ধের বিরোধী নহে, তাহা ইদানীং ভারত-রাষ্ট্রের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও তরুণ সৈন্যদলের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও বিজয়-লাভে প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা বলিব এখানে বর্ণাশ্রমসাধনার ক্ষত্রিয়-আদর্শেরই পুনরাবির্ভাব ঘটিতেছে। ঠিক্ এমনই ভাবে দেশে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ-আদর্শ, বৈশ্য-আদর্শ ও শূদ্র-আদর্শেরও পুনরাবির্ভাব ঘটিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে জাতীয়জীবনে আমরা বিভিন্ন সংস্কার-সম্পন্ন মানুষের কর্মজীবনের আদর্শের কথা বলিতেছি, জাতিবিভাগের কথা বলিতেছি না। ব্রাহ্মণ-আদর্শ—চরিত্রবান্, সর্ব্বত্যাগী, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন সমাজরাষ্ট্র-উপদেষ্টাদের মধ্যে পুনরাবির্ভূত হইবে। বৈশ্য-আদর্শ—দেশ-জাতি-সমাজের কল্যাণে ন্যায়সঙ্গত ধনার্জ্জন ও ধনবৃদ্ধির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে। মনুসংহিতায় বৈশ্য-আদর্শ নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

'ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবিদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ॥'

—(৯।৩৩৩)

অর্থাৎ— বৈশ্য ধর্ম্মসঙ্গতভাবে ধনবৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। এবং সকল মানুষকে ও জীবকে অন্নদান করিতেও বিশেষভাবে চেষ্টিত থাকিবেন।' প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারা যায় যে এরূপ সমাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে state-charity বা রাষ্ট্রদাক্ষিণ্য অথবা philanthropy বা জনসেবার জন্য পৃথক্ প্রতিষ্ঠানাদিরও বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। সমগ্র সমাজই হইয়া উঠে জনসেবার 'আশ্রম'। এই প্রসঙ্গে সংহিতাগ্রন্থে আদর্শ গৃহস্থগণের প্রয়োজনের

অতিরিক্ত সঞ্চয়ের নিষেধও লক্ষণীয়। তারপর শূদ্র-আদর্শ—সৎসঙ্গ-সৎসেবার দ্বারা নিম্নস্বভাব হইতে উচ্চস্বভাব মানুষে পরিণত হওয়ার সমাজসাধনা। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে—

'শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্মৃদুবাগনহংকৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে॥'

—(৯।৩৩৫)

অর্থাৎ—'উৎকৃষ্টচরিত্রের সেবাপরায়ণ, নম্রভাষী, পবিত্র, অহঙ্কার-বর্জ্জিত, তিন দ্বিজস্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট শূদ্র উৎকৃষ্ট জাতির মানুষে পরিণত হন্'।

এই চার প্রকৃতির মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশী সাধনার উপরই বর্ণাশ্রমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে মানুষ এই চার স্বাভাবিক শ্রেণীতে বিভক্ত। সুতরাং ইহা একটী সমাজবিজ্ঞান (Sociology) ও মনোবিজ্ঞান (psychology)–সম্মত ব্যাপার। আমরা এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই জিনিষটাকে দেখিতেছি। বর্ণাশ্রম বলিতে যে caste-system বা জাতিভেদ প্রথার কথা ভাবা হয়, আমরা তাহার কথা মোটেই আলোচনা করিতেছিনা। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন-সংস্কারসম্পন্ন মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশের প্রশ্নই আমাদের আলোচ্য। সুতরাং এই চারপ্রকার স্বভাবসংস্কার লইয়া সকলেই যাহাতে দেশজাতিরাষ্ট্রের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন এবং তাহারই মধ্য দিয়া মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিজ ও পারিবারিক জীবনে লাভ করিতে পারেন তাহারই জন্য বর্ণাশ্রমের মূলনীতি দুইটী সমাজে ও জাতীয় জীবনে গ্রহণীয়। অবশ্য ইহার

বাস্তব রূপায়ণ সময়সাপেক্ষ এবং সমস্যাসঙ্কুল। কিন্তু আদর্শ গৃহীত হইলে সমাজই অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও প্রয়োজনমত সমাধান বাহির করিয়া লইবে। কিন্তু শ্রেষ্ঠস্থানীয় সমাজসাধকগণকে সংহতভাবে এই কাজে অগ্রণী হইতে হইবে। জনসাধারণ তখনই সেপথে অনুসরণ করিবে। গীতায় বলা হইয়াছে—

'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥'

এ বিষয়ে উদারধর্ম্মমতাবলম্বী ও ভারতের জাতীয় অভ্যুদয়ের অন্যতম পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দের কথাও স্মরণে রাখার মত। স্বামীজী বলিয়াছেন— 'জাতিবিভাগ কখনও যেতে পারেনা, তবে মাঝে মাঝে একে নূতন ছাঁচে ঢালতে হবে, 'পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই, যেখানে জাত নেই।' —(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬, ৪৬৪)। স্বামীজী বর্ত্তমান জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কিরূপ তীব্র বিরোধী ছিলেন তাহা আমরা জানি। সুতরাং তাঁহার এই উক্তির অর্থ বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। আমরা এখানে যে চার প্রকার মানবিক আদর্শ-সাধনার কথা বলিতেছি তাহার সহিত প্রাচীন জন্মগত জাতিবিভাগ প্রথার কোনও সাক্ষাৎ সংশ্রব নাই। আমরা মূলনীতি ও আদর্শের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এই মানবধর্ম্মী সমাজসাধনার মূল ব্রহ্মচর্য্যসাধনা। পুনশ্চ ইহা জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যসাধনা, ব্যক্তিগত ব্রহ্মচর্য্যসাধনা নয়। সুতরাং ভারতীয় সমাজধর্মই ইহার ভিত্তিভূমি।

ভারতীয় জাতির আত্মবিস্মৃতিজনিত ব্রহ্মচর্য্যহীনতাকে আমরা কিন্তু চাপা দিয়া চলিতেছি। ফলে জাতীয় জীবনের সর্ব্বত্র যে চারিত্রিক বিকার ও উন্মার্গগামিতা উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার সম্মুখীন না হইয়া আমরা রাজনীতি-অর্থনীতির মধ্যেই মুখ লুকাইয়া থাকিতে চাহিতেছি। গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্য্যকেও আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত, প্রকৃতিগত প্রবণতা বলিয়া হয়ত ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিতেছি। তাঁহার অনুগামিগণ যে সব আন্দোলনের মধ্য দিয়া নূতন জাতিগঠনের কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন সেখানেও ব্রহ্মচর্য্যের কোনও বিশিষ্ট স্থান বর্ত্তমানে আছে বলিয়া শোনা যায়না। ইহার প্রত্যক্ষ কারণ এই যে ব্রহ্মচর্য্যকে আমরা ব্যাক্তিগত আদর্শরূপেই বুঝিতে শিখিয়াছি, 'জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য' যে কি বস্তু, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজসাধনায় ইহার বাস্তব রূপ কি, এ বিষয়ে আমরা চিন্তা করি নাই। ফলে আমরা এখনও পশ্চিমী দেশগুলির ভাবদাসত্ব করিতেছি। অথচ আমরা রাষ্ট্রহিসাবে জগৎসভায় এক নিজস্ব মানবতার আদর্শ লইয়া চলিতে চাহিতেছি। এই অসামঞ্জস্যের আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

ব্রহ্মচর্য্যসাধনাকে ভারতীয় সমাজধর্ম্মের অঙ্গীভূতরূপে আমরা দেখিতে বা বুঝিতে শিখি নাই। এই জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যসাধনা যে কত স্বাভাবিক আদর্শ তাহাও আমরা ভাবিতে শিখি নাই। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে 'শিক্ষা ও সাধনা'র আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার তত্ত্বনিরূপণে চেষ্টিত হইব। কিন্তু এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে ভারতের এই শাশ্বত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতীয় জাতিগঠন একটা ব্যর্থ ও অলীক কল্পনা।

এই ব্রহ্মচর্য্য ও স্বকর্মসাধনার আদর্শ ভারতীয় 'হিন্দু'-সমাজধর্ম্মের মূল আদর্শ। কিন্তু ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও নাই। বৌদ্ধ সমাজধর্ম্মের মানবপ্রেম ও অহিংসা, খৃষ্টান সমাজধর্ম্মের জনসেবা ও বিশ্বাস, ইস্‌লাম সমাজধর্ম্মের নিষ্ঠা ও সমাজসাম্য যেমন সাম্প্রদায়িক নয়, ইহাও তাহাই। সুতরাং ভারতের শাশ্বত সমাজধর্ম্মের এই মূল নীতি আজ নিঃসঙ্কোচে গ্রহণীয়। প্রসঙ্গ-বিশেষে স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন—'এখন কেবল positive thought (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিন্দু জাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে।' —(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬)।

ভারতকে আজ তাহার বিশ্বজনীন সমাজধর্মের আদর্শে গঠিত করিয়া সমগ্র বিশ্বে এক নূতন মানবতাবাদী জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতে হইবে।

এতক্ষণ আমরা ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির মূল আদর্শবাদের দিক্ আলোচনা করিলাম। উপসংহারে আমরা কিছু প্রামাণ্য উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইতে চাই যে প্রাচীন এই আদর্শবাদের যুগে ভারতের সাধারণ সমাজজীবন আজিকার মতই আনন্দমুখী ছিল। পার্থক্যের মধ্যে, তখনকার সমাজজীবনের আনন্দ ছিল অনেক-খানি স্বাভাবিক, সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং এই সাংসারিক আনন্দ-কোলাহলের পশ্চাতে সমগ্র সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আত্মিক জীবনের মহামুক্তির উপর। রামায়ণে অযোধ্যানগরীর বর্ণনা এইরূপ—

'তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্ম্মাত্মানো বহুশ্রুতাঃ।
নরাস্তুষ্টা ধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈরলুব্ধা সত্যবাদিনঃ॥
কামী বা ন কদর্য্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ॥
সর্ব্বে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধর্ম্মশীলাঃ সুসংযতাঃ।'

অর্থাৎ—'সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে মানুষেরা মনের আনন্দে থাকিত। সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যরত ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিল। সকলেই নিজ নিজ ধনে তুষ্ট, অলোভী ও সত্যবাদী ছিল। অযোধ্যায় কামুক, কদর্য্যস্বভাব, নৃশংস, অশিক্ষিত, ধর্ম্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি দেখা যাইত না। ....সমস্ত নর ও নারী ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় ছিল।'

—(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৬।৬, ৮, ৯)

প্রাচীন ভারতের সমাজজীবনের এই বর্ণনা যে কাল্পনিক নয় তাহা বিদেশী পর্য্যটক বা রাজদূতগণের সাক্ষ্য হইতে বহুলাংশে প্রমাণিত হয়। আদিকাণ্ডেরই পঞ্চম সর্গে পুনরায় আমরা পাই—বহুরত্নাদিশোভিত আকাশচুম্বী অট্টালিকার বর্ণনা, সুন্দর জল-সিঞ্চিত রাজপথ, উপবন (আধুনিক Park), সুপরিকল্পিত গৃহসন্নিবেশ ও সুসজ্জিত বাজার (আধুনিক Town-planning), বধূনাটক সংঘ অর্থাৎ মহিলাদের নিজস্ব অভিনয়মঞ্চ বা নাট্য-শালা ও সম্মেলনগৃহ (আধুনিক Ladies' club) ইত্যাদির কথা। প্রাচীন সমাজজীবনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি লিখিয়াছেন—'এই যুগের ভাস্কর্য্যে জীবনের আহ্লাদপূর্ণ দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যেও জীবনের হাল্কা দিকের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয় ছাড়া

'ভাঁড়' (আধুনিক 'কমিক'), ও অনুকরণ-শিল্পী (আধুনিক 'ক্যারিকেচার'-প্রদর্শনকারী) ইত্যাদির দ্বারা আমোদপ্রমোদ-দানের ব্যবস্থা ছিল। ....ঘরের ভিতরের (Indoor) খেলা ও খোলা মাঠের (Outdoor) খেলার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। ....দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে মৃগয়া (শিকার), রথের দৌড়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Race), তীরধনুকের প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), মুষ্টিযুদ্ধ (বক্সিং)........প্রমোদ-মেলার অনুষ্ঠানে—যাহাদের সে যুগে 'উৎসব', 'সমাজ', 'বিহার' নামে অভিহিত করা হইত—আমোদপ্রমোদের সহিত নানা সুস্বাদু খাবারের ও উত্তেজক পানীয়ের ব্যবস্থা থাকিত.........এরূপ জনসম্মেলন ছাড়াও অনেক সময় মাংসজাতীয় সুস্বাদু খাদ্য স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইত।' —(History and Culture of the Indian People, Bharatiya Vidya Bhavan, Vol II হইতে সংগৃহীত ও অনূদিত, পৃঃ ৫৭৯)। বলা বাহুল্য এরূপ বর্ণনা আধুনিক যুগের 'পার্টি' (Party)-র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অথচ এই সমস্ত স্বাভাবিক আনন্দোচ্ছল জীবনলীলার পশ্চাতে ছিল দৈহিক জীবনের ক্ষুদ্রতার চিন্তা এবং মৃত্যুর ঊর্দ্ধে অমৃতলোকে উত্তরণের আকুল আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা। ভারতের ইতিহাস এই ঊর্দ্ধমুখী আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টারই ইতিহাস। বেদ-উপনিষদ্-সংহিতা-রামায়ণ-মহাভারতে তাহারই নিদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যষ্টিশিক্ষা ও সমষ্টিসাধনা।

জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যসাধনার অনুকূলে আমরা বিভিন্ন দিক্ দিয়া বিষয়টির সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। ইহার কারণ, ব্যক্তিগত সাধকের ব্রহ্মচর্য্যসাধনা ও জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা কতকটা পৃথক্ বস্তু। আমরা গ্রন্থের ভূমিকায় ও বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যেও ইহার কিছু ইঙ্গিত দিয়াছি। এই পার্থক্যজ্ঞান না থাকাতেই ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ক কোনও আলোচনা ব্যক্তিগত সাধনার দৃষ্টিতেই দেখা হয়, সে জন্য অধিকাংশ তরুণ ও বয়স্কদের জীবনে, বিশেষে এই সংশয়বাদিতা ও আদর্শভ্রষ্টতার যুগে, ইহা বিশেষ কোনও রেখাপাত করে না, বরং প্রতিক্রিয়ামূলক (Reactionary) বিরোধী ভাবই জাগাইয়া তুলে। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় একটি জাতীয় ও সামাজিক আদর্শবাদ, সেজন্য ইহার বাস্তব শিক্ষা ও সাধনার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সমাজমানসে দীর্ঘকাল-সঞ্চিত পুঞ্জীভূত বিরুদ্ধসংস্কারকে (Prejudices) সর্ব্বাগ্রে দূর করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

একটি কথা প্রথমেই পরিষ্কারভাবে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে জাতীয়সাধনা বা সমাজসাধনা বলিতে আমরা কোনও লৌকিক জীবনের 'প্ল্যান'-রূপায়ণের কথা বলিতেছি না। আমরা ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করি যে এ যুগ আধ্যাত্মিক মহাজাগরণের

যুগ এবং এযুগে ব্যাপক আধ্যাত্মিকজীবন বা শান্তি-শক্তি-মুক্তি-লাভের জীবন প্রবর্ত্তিত করাই বিধিনির্দ্দিষ্ট আদর্শ পন্থা। যুগ-যুগব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়মে উত্থানপতনের মধ্য দিয়া শাশ্বত ভারত তাহার মহামুক্তির লীলা প্রকটিত করিতেছে। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান-যুগের ও উপনিষদের আত্মানুসন্ধানযুগের পর সমগ্রভারতে এক মহান্ জাতীয় জীবনের স্রোত প্রবাহিত হয়। রামায়ণ-মহাভারতে তাহারই বিরাট চিত্র, গীতায় তাহারই মন্ত্র—জ্ঞানভক্তিসমন্বিত মহান্ কর্ম্মযোগের সাধনা। কিন্তু এই জাতীয় সাধনার ভিত্তিরূপে ছিল জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের জীবনসাধনা, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই বিরাট জাতীয়সাধনা সহস্রাধিক বৎসর ব্যাপিয়া একদিকে উপনিষদের আত্মজ্ঞানসাধনা ও অপর-দিকে পাশুপত-ভাগবতধর্ম্মের (শৈববৈষ্ণব) ভক্তিমতের সাধনাকে সঙ্গে লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিল, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ-জৈন-আজীবিক ইত্যাদি নানা সংস্কারপন্থী ধর্ম্মান্দোলনকেও ধীরে ধীরে নিজের অঙ্গীভূত করিয়াছিল ঐ শাশ্বত ভারতধর্ম্মের অভিযান। পরে সমাজ-রাষ্ট্র-জাতীয়তার ধর্ম কালক্রমে মন্দীভূত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ার সঙ্কটকালে আমরা পর্য্যায়ক্রমে পাইয়াছি সমাজ–জাতীয়তা–রাষ্ট্রাদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন নিছক জ্ঞানবাদী ধর্ম্মান্দোলন (শ্রীশঙ্করাচার্য্য) ও নিছক ভক্তিবাদী ধর্ম্মান্দোলন (শ্রীরামানুজ-মধ্ব-বল্লভ চৈতন্য প্রভৃতি)। সহস্র বৎসরের জাতীয় অবনতির যুগে এই ধর্ম্মান্দোলনগুলিই ভারতের শাশ্বত আত্মার মহাপ্রকাশরূপে দেখা দিয়াছিল। উনবিংশ-বিংশশতাব্দীর জাতীয় নবজাগরণের যুগে আমরা পুনরায় জ্ঞান-

ভক্তিসমন্বিত কর্ম্মযোগ-সাধনার আদর্শের উপর জোর দিয়াছি, কিন্তু সমাজধর্ম্মের শিথিল ভিত্তির উপর গীতার মহাজীবনের সৌধ গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেজন্য গীতার মহাসাধনার ভিত্তিরূপে সমাজধর্ম্মকে গড়িয়া তোলাই আজ আমাদের লক্ষ্য এবং জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ-প্রসার তাহারই ভূমিকা। সুতরাং এই জাতীয় সাধনা এ যুগের আধ্যাত্মিক মহামুক্তিরই সাধনা।

এখন এই জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যসাধনার স্বরূপ কি এবং ইহার শিক্ষা-সাধনাই বা কিরূপ সেই বাস্তব নীতির আলোচনায় আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বলা বাহুল্য ইহাতে তত্ত্বালোচনা অপেক্ষা বাস্তব সমস্যা ও বাস্তব নীতির কথাই বিশেষভাবে স্থান পাইবে। আর একটি কথা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা এই যে, এই শাশ্বত ভারতের আদর্শবাদ কেবল তরুণ-সম্প্রদায়ের জন্য নহে। ইহা বয়স্ক ও প্রবীনদের জন্যও। বস্তুতঃপক্ষে ইহা আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেরই জন্য এবং গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত কর্মক্ষেত্রেই ইহা সমান প্রয়োজন। সর্ব্বত্র গীতার জ্ঞানভক্তিমূলক কর্ম্মযোগের আদর্শ স্বীকৃত হইলে তাহার উপায় হিসাবে ইহা সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হইতে পারে। অপরদিকে এই জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ জাতীয়জীবনে কার্য্যকরী হইলে তবেই গীতার সাধনাদর্শ সফল হইতে পারে। সুতরাং জাতীয় জীবনের এই ধর্ম্মসাধনায় কোনও দিকই অবহেলার নয়। কোনও দিকে ফাঁক থাকিলেই সব দিকেই তাহা শিথিলতার সৃষ্টি করিবে, কারণ ইহা সমস্ত সমাজের সম্মিলিত সাধনা।

এই শিক্ষা ও সাধনাকে বাস্তবধর্ম্মী করিতে হইলে অনর্থক আকাশচুম্বী আদর্শ ও উপদেশের কথা না বলিয়া ইহাকে বর্ত্তমান যুগের বাস্তব সমস্যাসমাধানের ভিত্তিতে রচিত করিতে হইবে। ইহাই হইবে ভাবীকালের সূচনা।

জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যসাধনার দুইটি দিক্—একটি সমাজগত ও অপরটি ব্যক্তিগত। এই দুইটি দিক্ পরস্পরের পরিপূরক। প্রথমে আমরা ইহার সমাজগত দিক্‌টির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কারণ সমাজসাধনাই এখানে ব্যক্তিসাধনার ভিত্তি।

সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে Family Life বা পারিবারিক জীবনের উপর। বস্তুতঃ পারিবারিক জীবনই সামাজিক ও জাতীয় জীবনের মূল Unit বা একক। আর সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় বিধিব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালীও এই পারিবারিক জীবনের সহায়তার জন্যই পরিকল্পিত। এজন্য ভারতীয় শাস্ত্রে গৃহকে ও গৃহস্থাশ্রমকে অত্যন্ত উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে—

'যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥'

(৩।৭৭)

অর্থাৎ—'যেমন প্রাণবায়ুকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীব বাঁচিয়া থাকে তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রম (ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি) জীবিত থাকে।' সুতরাং এখানে আমরা দেখিতে

পাই যে গৃহস্থজীবনকে সমাজজীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করা হইয়াছে। এজন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—'তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী', অর্থাৎ—'সেই কারণে গৃহীর জীবনই শ্রেষ্ঠ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।' শুধুমাত্র অন্নাদি দান করিয়া অন্যান্য আশ্রমকে পালন করার জন্য গৃহস্থের এই প্রাধান্য ও গৌরব নহে, পরন্তু 'জ্ঞানেনান্নেন', অর্থাৎ জ্ঞানবিতরণে বা সমাজে জ্ঞানের প্রসারসাধনে সহায়তা করার জন্যও বটে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় সেকালের সমাজ-জীবনের ও জাতীয়জীবনের Culture বা সংস্কৃতি অর্থাৎ বেদজ্ঞান-বিস্তারের মহান্ দায়িত্ব ছিল গৃহস্থগণের উপর। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও যতিগণের মাধ্যমে গৃহীগণের ব্যবস্থাপনায় ও আনুকূল্যে ইহা সাধিত হইত। সুতরাং মূল কথা এই যে জাতীয় জীবনের Culture বা সংস্কৃতি ও আদর্শকে ধারণ-পোষণ-প্রসারণ করা ভারতীয় Family Life বা পারিবারিক জীবনের অন্যতম আদর্শ। কিন্তু কয়জন family man বা গৃহপরিবারী মানুষ আজ এই গৌরবের দাবী করিতে পারেন, অথবা কয়জন এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন ? অবশ্যই কথা উঠিতে পারে বর্ত্তমানে ভারতের জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতি বলিতে কিছু নাই, সে কারণ গৃহীগণ কিভাবে তাহার আনুকূল্য করিতে পারেন ? সংস্কৃতি বলিতে এখন নৃত্যগীত-সিনেমা-জলসাকেই বুঝাইয়া থাকে এবং এই তরল সংস্কৃতির আনুকূল্য যে দেশবাসী প্রয়োজনাতিরিক্তভাবেই করিয়া থাকেন তাহা এই সমস্ত অনুষ্ঠানে ও ব্যবসায়ে অর্থব্যয়ের ও অর্থাগমের পরিমাণ হইতেই সূচিত হয়। তবে এতটা হতাশ হইবার কারণ নাই। নৃত্যগীত, অভিনয় ও

'সমাজ' অর্থাৎ Club Life বা সম্মিলিত আমোদ-আহ্লাদ সে যুগেও ছিল, ইহার বহু নিদর্শন রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাসে, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে, এমনকি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণের মধ্যেও পাওয়া যায়। (India as Known to Panini —V. S. Agarwala লিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সেকালে এইগুলিকে জাতীয় চিত্তবিনোদনরূপেই গ্রহণ করা হইত, জাতীয় জীবনের গুরুত্ব বা গৌরব ইহাদের মধ্যে নিহিত ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে 'সংস্কৃতি' বলিয়া কোনও কথা সেযুগের জাতীয় জীবনের ও সমাজজীবনের আদর্শের দ্যোতকরূপে শোনা যাইত না। Culture-অর্থে 'সংস্কৃতি' কথাটি নেহাৎ আধুনিক কালের উদ্ভাবন। ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহাকে চিরদিন বুঝাইয়াছে তাহা মানুষের মনুষ্যত্বলাভ ও মুক্তির সাধনা বা ধর্ম্ম। উদ্দেশ্য তাহার সুমহান্, গুরুত্ব তাহার সুগভীর। এখন জীবনের সে মহত্বও নাই, সে গুরুত্বও নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য কিছু আশার কথা এই যে এখনও অনেক গৃহস্থ বিভিন্ন মহাত্মাগণের নিকট 'সাধন' গ্রহণ করিয়া অথবা বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুগামী হইয়া সাধ্যমত ধর্ম্মসাধনার চেষ্টা করেন, বিভিন্ন আশ্রমাদিতে ও সেবাকার্য্যে অর্থসাহায্যও করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্যই ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতির আংশিক আনুকূল্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশব্যাপী যেখানে অনাচার-কদাচার-অধর্ম্ম স্বেচ্ছাচারিতার বান ডাকিতেছে সেখানে এই ব্যক্তিগত সাধনা ও সেবাকার্য্যে সহায়তার জাতীয় ও সামাজিক মূল্য কতটুকু তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। ইহা যে এই নৈরাশ্যপূর্ণ আব্-হাওয়ায়

আশার লক্ষণ এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নাই। এবং জাতীয় মনে যে আধ্যাত্মিক ভাব এখনও অন্তঃসলিলা ধারায় প্রবাহিত হইতেছে ইহা তাহারই লক্ষণ। কিন্তু ভারতীয় আদর্শে গৃহস্থজীবন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মসাধনার জন্য নহে, তাহা সমাজ ও জাতির জীবনের আধ্যাত্মিক ধারার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজজীবনে ভারতের শাশ্বত ধর্ম্মসংস্কৃতির আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করা—ইহাও ভারতীয় গৃহস্থজীবনের অন্যতম দায়িত্ব-কর্ত্তব্য। কিন্তু সুদীর্ঘকালের প্রভাবে এই সমাজধর্ম্মের প্রায় বিলোপ ঘটিয়াছে বলা যায়। সেজন্য জাতীয় ও সামাজিক জীবনের পুনর্জাগরণের এই যুগে ঐ সমাজধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তন অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র যদি মানিতে হয় তবে বলিতে হইবে ভারতীয় গৃহস্থের জীবনে ধর্মসাধনা শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, পরন্তু তাহা সমাজধর্ম্মের ধারক-বাহকরূপে দেশ-জাতি-সমাজের সেবার মধ্য দিয়া মহামুক্তির সাধনা। কিন্তু এরূপ আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দেশে প্রথমেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে মনুষ্যত্বের সাধনা—যাহা ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম্মের মূলনীতি—তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এবং ইহার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের পুনরুদ্বোধন এবং পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠন। 'অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ', অর্থাৎ—'ব্রহ্মচর্য্য হইতে অবিচ্যুত থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।' ইহাই মনুসংহিতার বিধান (৩।২)। পুনশ্চ—

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥'
—(৩।৭৯)

অর্থাৎ—'(যেহেতু গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ আশ্রম, সেইহেতু) এই গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালনীয়, কারণ ইহাতে পরজীবনে অক্ষয় স্বর্গ যেমন লাভ করা যাইতে পারে, তেমনি ইহজীবনেও সর্ব্বদা সুখভোগ করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের ইন্দ্রিয়সংযম নাই তাহারা এই আশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে অক্ষম।' অক্ষয় স্বর্গে এযুগে অনেকেরই বিশ্বাস থাকিবার কথা নয়, কিন্তু এই জীবনেই সব সময় আনন্দ-সুখসম্ভোগ কে না চায়? ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম্মে তাহারও উপায় নির্ণীত হইয়াছে।

এ যুগের সংসারজীবনে প্রকৃত সুখের আস্বাদ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কোনও সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের অর্থে বলা হইতেছে না, অন্নবস্ত্রের সমস্যার দিক্ দিয়াও বলা হইতেছে না। ইহা বলা হইতেছে মানুষের সুখসম্ভোগের উপযুক্ত দৈহিক-মানসিক অবস্থার দিক্ দিয়াই। ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম সকল মানুষকে 'বৈরাগী' বানাইতে চায় না, মানুষকে সংসার জীবনেও সুখী করিতে চায়। সমাজধর্মকে হারাইয়া আমরা এই সহজ সত্যটিকেও হারাইয়াছি। সেজন্য ধর্মের সহিত এখন পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের কোনও বাস্তব সম্পর্কই নাই। পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র তাই অবিশ্বাসের খেদোক্তি (অথবা শ্লেষোক্তি?) শোনা যায়, 'সংসার জীবনে কি ধর্ম করা যায়?' ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের উল্লিখিত উক্তি তাহারই উত্তর। সুখশান্তিবর্জ্জিত পারিবারিক জীবনে ইহা কি এক পরম আশা ও আশ্বাসের বাণী নয়?

প্রশ্ন উঠিবে এযুগের গৃহস্থজীবনে কি ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সম্ভব ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা এখানে সংসারত্যাগী বৈরাগীর ব্যক্তিগত ব্রহ্মচর্য্যসাধনার কথা আলোচনা করিতেছি না। আমরা জাতীয় জীবনে বাস্তব ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ ও সাধনার কথাই বলিতেছি। কিন্তু সে কথা বাদ দিয়াও বলা যায় যে ইহা সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন নয়। ইহা অনিবার্য্য নিয়মের বা প্রয়োজনের প্রশ্ন। যদি সংসারজীবনেও সুখভোগ করিতে হয় তবে ইন্দ্রিয়-সংযম বা ব্রহ্মচর্য্যের একান্ত প্রয়োজন, ইহাই ভারতীয় সমাজধর্মের অভ্রান্ত নির্দ্দেশ। উহাই সংসারসুখের একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ নাই। হাজার বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতির ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের মধ্য দিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কারণ, প্রকৃত সুখের আস্বাদ বস্তুসম্ভারের সহিত দেহমনের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। এই দেহমনের যোগ্যতা সৃষ্টি করাই জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য। ইহাই সেজন্য এযুগের 'জীবন যন্ত্রণা' ও Frustration বা ব্যর্থ-মানসিকতার একমাত্র প্রতিকার। সুতরাং এই উপায়কে আজ অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। আসলে ইহা সুখসম্ভোগের জন্য কষ্টস্বীকার ও অভ্যাসের প্রশ্ন। সংসারে কোন্ ভাল জিনিষ বিনা আয়াসে ও অভ্যাসে পাওয়া যায় ? এযুগের নূতন নীতিতে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের উদ্গাতা বিখ্যাত চিন্তানায়ক শ্রীবার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell) তাঁহার Marriage and Morals গ্রন্থের উপসংহারে লিখিতেছেন, 'The doctrine that I wish to preach is not one of licence, it involves nearly as much self-control as is involved in the

conventional doctrine.', অর্থাৎ—'আমি যে মতবাদ প্রচার করিতে চাই তাহা উচ্ছৃঙ্খলতার মতবাদ নহে; ইহাতে সমাজে প্রচলিত মতবাদের প্রায় সমপরিমাণ আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।' রাসেল মহাশয় অবশ্য এখানে অনুরূপ সংযমের কথা বলিতেছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার অভিপ্রেত আদর্শের সিদ্ধির জন্য কষ্টস্বীকার ও অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

পারিবারিক জীবনে বর্ত্তমানে যে নিদারুণ পরিস্থিতি বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আমরা সে বিষয়ে সকলকেই গুরুত্বপূর্ণভাবে চিন্তা করিতে বলি। এমন পরিবার ও পারিবারিক জীবন দুর্লভ যেখানে চরম বিপর্য্যয় ও মোহভঙ্গের কাহিনী নিত্য শুনিতে না হয়। ইহা ব্যতিক্রম নয়, ইহাই যেন নিয়ম। শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত পরিবারে যদি ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া উঠে, তবে দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ করিবার এত চেষ্টা জাতীয় জীবনে কোন্ সার্থকতা আনিবে? জনসাধারণ কোন্ আদর্শকে দেখিয়া উদ্বুদ্ধ হইবে? অন্নবস্ত্রের সমস্যা মিটাইতে আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। কিন্তু অন্ন-বস্ত্র যাহাদের আছে এমন লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনে যে মনুষ্যত্বের দুর্ভিক্ষ ও পাশবিক উলঙ্গতা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারে তৎপর না হইলে ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তা কোন্ খাতে গিয়া পড়িবে কে বলিতে পারে?

পশ্চিমের সভ্য ও সমৃদ্ধ দেশগুলিতে আজ পারিবারিক ও

সামাজিক জীবনের চরম বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে। যে কোনও সমাজচিন্তাশীল লেখকের বই পড়িলে এবং সংবাদপত্রাদির পাতা উল্টাইলে অথবা আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইলেই ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না। ভারতের সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবন হয়ত ক্রমশঃ ইহারই অনুকরণ করিতে চাহিবে। কিন্তু নবজাগ্রত ভারতকে যদি বিশ্বে নবযুগের পথিকৃৎ হইতে হয় তাহা হইলে পশ্চিমের এই অন্ধ গলিতে ঢুকিয়া তাহার কি লাভ হইবে? ভারত রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের ভাবদাসত্ব ভারতে আজও সমানে চলিতেছে, হয়ত বা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাল জিনিষের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাই একথা সত্য। আবার প্রয়োজন কোনও আইন মানে না একথাও সত্য। কিন্তু এই দুইটি ফাঁকের মধ্য দিয়াই আজ সমাজে, দেশে ও পারিবারিক জীবনে হুড়্ হুড়্ করিয়া উদ্ভ্রান্ত পশ্চিমী ভাব ও রীতি প্রবেশ করিতেছে, বলিবার কেহ নাই। সমগ্র দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা আদর্শের দিক দিয়া আজ নিতান্তই অভিভাবক-হীন ও অসহায়।

পারিবারিক জীবনে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা-স্বার্থপরতা-দম্ভ-কপটতা-ঔদ্ধত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার সার্থকতা ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে। পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব ও মহিমার কথা ঘোষণা করা হয় কিন্তু এই ভাঙ্গনের স্রোতের সম্মুখে আজ আমরা ভাসিয়া যাইতেছি। ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনা যে পারিবারিক জীবনে নাই তাহা নয়, কিন্তু যৌনকামসম্পর্কই যে

যুগে মানুষের 'ধর্ম্ম' বলিয়া নির্ব্বিচারে স্বীকৃত, যে যুগে কামজ সন্তানেরই দিকে দিকে প্রাদুর্ভাব, সে যুগে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনার বালির বাঁধ এই যৌনমানসিকতার জলোচ্ছ্বাসকে কেমন করিয়া রোধ করিবে? প্রচলিত ধর্ম্মগুলি আজ এই জন্যই সমাজজীবনে এক প্রকার পঙ্গু হইয়া আছে। ইহারই ফলে সামাজিক জীবনের সর্ব্বত্র আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা-স্বার্থপরতা-দম্ভ কপটতা-ঔদ্ধত্যের উৎকট প্রাবল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের স্বার্থপরতা-দম্ভ-কপটতা-ঔদ্ধত্য অবশ্য একমাত্র যৌন-কামের অসংযমের উপরই নির্ভর করে না, কিন্তু তবুও একথা সত্য যে উভয়ের মধ্যে একটি নিবিড় আধার-আধেয় সম্পর্ক রহিয়াছে। বস্তুতঃ যৌনকামপরায়ণতা একটি চরম আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তি, এজন্য যাবতীয় সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি ইহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রাক্-কথিত M. Paul Bureauর গ্রন্থে যে তীব্র সমালোচনা রহিয়াছে আমরা তাহার কিছু অংশ তুলিয়া দিতেছি। 'The social solidarity which unites the people of one nation, and, beyond the individual nations, all humanity, finds no difficulty in passing through all walls, even those of the secret chambers, and a terrible interrelation joins that supposed private action to the most distant series of actions in that social life which it helps to disorganize. Whether he wills it or not, every individual, who asserts his right to

temporary or sterile sexual relations, who claims the right to use the reproductive energy with which he is endowed merely for his own enjoyment, spreads, in society the germs of division and disorder. All deformed as they are by our selfishness and our disloyalties, our social institutions still take for granted that the individual will accept with good will the obligations inherent in the satisfaction of the reproductive appetite. It is by discounting this acceptance that society has built up its countless mechanisms of labour and property, of wages and inheritance, of taxation and military service, of the right of Parliamentary suffrage and civil liberties. By this refusal to take his share the individual disorganises everything at one stroke, he violates the social pact in its very essence, and while he makes the burden heavier on others' shoulder, he is no better than an exploiter and a parasite, a thief and a swindler.........', অর্থাৎ—'যে সমাজসংহতি জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদের একত্বের বন্ধনে মিলিত করে এবং এক এক জাতির বাহিরেও সমগ্র মানবজাতিকে একত্ব দান করে, সেই

সমাজসংহতি সহজেই সমস্ত বাধার প্রাচীর, এমনকি গুপ্ত প্রকোষ্ঠের প্রাচীর পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে এবং (যে যৌনপ্রণয় ও যৌনমিলনের) ক্রিয়াটিকে একান্তই ব্যক্তিগত গোপনীয় ব্যাপার ভাবা হয় তাহাকে সমাজজীবনের বহুদূরবর্ত্তী কার্য্যপরম্পরার সহিত ভয়ঙ্কর যোগসূত্রে গ্রথিত করে। ইহার ফলে ঐ সমাজজীবন বিপর্য্যস্ত হয়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে ভাবেই হউক, যে ব্যক্তি খুশীমত অথবা নিরর্থক যৌনসম্পর্কের অধিকার দাবী করে অথবা যে নিছক আত্মসুখের জন্য প্রকৃতিদত্ত প্রজননশক্তিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চায় সে সমাজে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার বীজ ছড়াইয়া দেয়। আমাদের স্বার্থপরতা এবং অবিশ্বস্ততার দরুণ সমাজের বিধিব্যবস্থাগুলিতে বিকৃতি ঘটিলেও ঐ সব ক্ষেত্রে এখনও ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মধ্যে যে সামাজিক দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই স্বীকার করিয়া লইবে। এইরূপ স্বীকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই সমাজ তাহার শ্রম ও সম্পত্তি, পারিশ্রমিক ও উত্তরাধিকার, কর ও সামরিক দায়িত্ব-কর্ত্তব্য, ভোটাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা ইত্যাদি অসংখ্য বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে। এই (সামাজিক) দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে এই ভাবে অস্বীকার করিয়া ঐ ব্যক্তি সমস্ত কিছুকে এক সাপটে লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। সমাজজীবন যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যক্তি তাহার মূল ধরিয়াই টান দেয় এবং অন্য সকলের বোঝা ভারী করে বলিয়া সে শোষক, পরজীবী, তস্কর এবং প্রবঞ্চকের বেশী কিছু নয়।' (—পৃ ২৭)

এইখানেই যৌনকেন্দ্রিক সভ্যতার চরম বিপদ্। এই যৌন স্বেচ্ছাচারের জন্যই আধুনিক যুগে যাবতীয় সমাজবিরোধী অপরাধপ্রবণতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত-ইতর সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দ্রুত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহাই রাক্ষসী বা আসুরী বৃত্তি বলিয়া গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। গীতার বর্ণনা এত হুবহু এযুগের সঙ্গে মিলিয়া যায় যে আমরা কিছু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি। —

'অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেহশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়ালব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥

(গীতা, ১৬।৮—১৬)

অর্থাৎ—'ইহারা (আসুরপ্রকৃতির লোকেরা) বলে যে এই জগৎ সত্যহীন এবং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাহীন, ইহা স্ত্রীপুরুষের মিলন হইতে উদ্ভূত, কামসম্ভোগই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহার ঈশ্বর বা নিয়ন্তা বলিয়া কিছু নাই, এই জগৎ এইরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়া এই নষ্টমতি, অল্পবুদ্ধি, উগ্রকর্ম্মা, অমঙ্গল-সৃজনকারী ব্যক্তিগণ জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয়। দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় করিয়া দম্ভ-মান-মদযুক্ত হইয়া, নানা অসৎ উপায়ে কামকাঞ্চনাদিলাভের দুরাশায় অপবিত্র সংকল্প লইয়া তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সীমাহীন দুশ্চিন্তা লইয়া তাহারা আমরণ কাল কাটায়, কাম উপভোগ করাকেই তাহারা পরম বস্তু বলিয়া মনে করে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা শত-শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা কামী ও ক্রোধী জীবন যাপন করে এবং কামভোগের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থসঞ্চয় করিতে চেষ্টিত হয়। আজ ইহা লাভ করিলাম, এই আকাঙ্খিত বস্তু পরে লাভ করিব; এই ধন আমার আছে, পুনরায় এই ধন আমার হইবে; অমুক শত্রুকে হত করিয়াছি, অন্যদেরও পরে হত করিব; আমি সকলের উপরে (প্রভু), আমি ভোগসুখ লাভ করিতেছি, আমার সাফল্য লাভ হইয়াছে, আমি শক্তিশালী, আমি সুখভোগ করিতেছি, আমি ধনী, আমি অভিজাত (উচ্চ-বংশজাত), আমার সমান আর কে আছে ?—আমি বড় বড়

কাজ করিব (যজ্ঞ করিব), আমি লোককে দান করিব, আমি আমোদ করিব,—এইরূপ অজ্ঞান ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, বহুবিধ চিন্তায় বিভ্রান্ত হইয়া, মোহজালে আচ্ছন্ন এবং বিবিধ কামভোগে আসক্ত হইয়া ইহারা কদর্য্য নরকে (হীন জীবনে) পতিত হয়।'

পাঠক লক্ষ্য করিবেন গীতার এই সুদীর্ঘ বর্ণনায় এযুগের মনুষ্য-সমাজের চিত্র কেমন ফুটিয় উঠিয়াছো। ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে এই কয়টি শ্লোকের মধ্যে আমরা যে ত্রিবিধ কামের কথা বলিয়াছি, অর্থাৎ—যৌনকাম, ধনকাম ও লোককাম (মান, প্রভুত্ব), তাহা কতবার উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি ইহা লক্ষ্য করিবেন যে এই আসুরিক, অর্থাৎ অমানুষিক জীবনের গোড়াতেই যৌনকামের প্রাবল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলিয়া রাখি যে এযুগের নিছক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে সুস্থ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হইতে বাধ্য, এ পথে দুর্নীতি দূর করা যে অসম্ভব,—উপরের উদ্ধৃতি হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে।

পারিবারিক জীবনকে যদি আমরা অস্বীকার করিতে পারিতাম তাহা হইলে কোনও কথা ছিলনা। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগতের ভাঙ্গিয়া-পড়া পারিবারিক জীবনের যাবতীয় রূঢ় পরিণতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পাশ্চাত্য জগতে পারিবারিক জীবন যে ভীষণভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা মনীষী Bertrand Russell-এর নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বেশ ধারণা

করা যায়— '.........an opposite movement has taken place, until the family in the Western World has become a mere shadow of what it was.', অর্থাৎ—'...একটা বিপরীত আন্দোলন সংঘটিত হইয়াছে যাহার ফলে পাশ্চাত্য জগতে পারিবারিক জীবন পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।' (—Marriage and Morals, pg. 137)। ইহার পর ঐ একই গ্রন্থে শ্রীরাসেল যখন বিবাহিত দম্পতীর, বিশেষে বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে স্বাধীনভাবে মনোমত বহু পর-পুরুষের সঙ্গে যৌনসঙ্গম এবং Contraceptive বা জন্মনিরোধের উপায়-অবলম্বনে সে সব ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিতেছেন এবং এই উপায়েই আধুনিক বিবাহিত দম্পতীর প্রণয়জীবন সুখী হইবে এই 'নূতন নীতিবাদ' (New Morality) প্রচার করিতেছেন,— তখন ভারতের বিবাহিত নরনারী এতটা (এমন কি মতবাদ হিসাবেও) হজম করিতে পারিবেন কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার। পাশ্চাত্যে ছেলে-মেয়ে বয়স্ক হইলেই পিতামাতার সহিত পৃথক্ থাকিবার রীতি ও রেওয়াজ দাঁড়াইয়াছে এবং অজস্র বয়স্ক-নরনারী জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পারিবারিক পরিবেশহীন নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা বহিতেও অভ্যস্ত হইয়াছেন— এই সমস্ত কি ভারতীয় ধাতে সহ্য হইবে? আমরা কি সত্যই এই সব চাই? আসলে আমাদের পাশ্চাত্য অনুকরণও খুবই হাল্কা ও ভাসা-ভাসা জিনিষ। এজন্য যে সব পরিবারে নানাবিধ পশ্চিমী রীতি-নীতি,

আদব-কায়দা ঢুকিয়াছে সেখানেও পারিবারিক জীবন নানাসূত্রে নানাভাবে পূর্ব্বেরই আচার-অনুষ্ঠানের জের টানিয়া চলিয়াছে এবং পারিবারিক জীবনে বিকৃতি আসিলেও সম্পর্কের আকর্ষণ এখনও সমানে বজায় আছে। সুতরাং পারিবারিক জীবন উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ভারতে কম ইহা এক প্রকার ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিশেষে পাশ্চাত্য দেশের ও অন্যান্য প্রাচীন সভ্য দেশের সহিত ভারতের একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহা এই যে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি আজিও জীবন্ত এবং ইহাই পারিবারিক জীবনে কোনও গুরুতর স্থায়ী পরিবর্ত্তনে শেষ পর্য্যন্ত বাধা দিবে।

অথচ আমাদের জাতীয় জীবনের মূল কেন্দ্র এই পারিবারিক জীবনকে সুস্থ-সংযত-স্বাভাবিক রাখিবার কোনও শিক্ষা বা সাধনা নাই। আজ Domestic Science বা গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বলিতে মাত্র আধুনিক পদ্ধতিতে রাঁধাবাড়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশু-পালন, হিসাবপত্র-রাখা ইত্যাদিকেই বুঝায়। অধুনা Family Planning বা পরিবার-নিয়ন্ত্রণ বলিতে কেবল কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনিরোধকেই বুঝাইয়া থাকে। গৃহস্থ-বিজ্ঞান যে একটি মানব-বিজ্ঞান এবং পরিবার-নিয়ন্ত্রণ যে এক প্রকার আত্মনিয়ন্ত্রণ একথা কেহ ভাবে না। আজ এই আদর্শ ও নীতিগুলির জন্য আমাদের একমাত্র ব্যক্তিগত সদিচ্ছা ও সামাজিক রীতিনীতির উপরই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই সদিচ্ছা ও রীতিনীতিও আজ ম্রিয়মান। সেজন্য এগুলির প্রভাবে যে রিপু-ইন্দ্রিয়ের সংযম পারিবারিক

জীবনে সাধিত হইত তাহা আজ নির্ব্বাপিতপ্রায়। এইরূপ অবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। যৌন-অসংযমের প্রাবল্য ও স্বার্থপরতা-ঔদ্ধত্য-কপটতার প্রকোপ পারিবারিক জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া সমাজজীবনেও দ্রুত তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আসুরিকতার আজ অবাধ রাজত্ব।

পাশ্চাত্য দেশে ইহা অনেকটা 'ধাতু-সহ' তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ও পরিবার এখনও প্রাচীন নীতির জের টানিয়া চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও চলিবে তাহার আভাসও আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। সুতরাং ভারতীয় সমাজহিতৈষীদের এই পারিবারিক সমস্যার বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

যুগের স্রোতে এই সমস্যা হয়ত আরও বাড়িবে। কিন্তু তবুও একটা প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দেখা দিবে ইহা সুনিশ্চিত। আমরা তথাকথিত প্রাচীনপন্থী 'গোঁড়া' প্রতিক্রিয়ার কথা বলিতেছি না। প্রাচীনপন্থী গোঁড়ামি বা Conservatism-এর মধ্যে একটা সনাতন-মূল্যমানরক্ষার সৎপ্রচেষ্টা থাকিলেও নূতন যুগের নূতন পরিবেশকে অস্বীকার করায় তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। আজ একদিকে আধুনিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং অপরদিকে প্রাচীন সংরক্ষণশীলতা, এই দোটানায় পড়িয়া সমাজজীবন বিপর্য্যস্ত ও বিভ্রান্ত। গৃহে-পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিষময় পরিণাম আরও প্রকট ও উৎকট আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষ পরিত্রাণের পথ খুঁজিবে।

তখনি হইবে নবযুগের সূত্রপাত। তখন শাশ্বত মানবতার আদর্শের উত্তরাধিকারী ভারতের মানুষ চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইবে। সে মহা-পরিবর্ত্তন এক নূতন মানবগঠনের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

কিন্তু সমস্ত সার্থক বিপ্লবেরই পিছনে সুদীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে। বহুজনের আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদান সেই বিপ্লবের পথ সুগম করিয়া দেয় এবং বিপ্লব যখন আসে তখন তাহার আদর্শ ও নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করে। কিন্তু যে মানবধর্মী ভাবী মহাবিপ্লবযুগের কথা আমরা বলিতেছি তাহা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিপ্লব নয়, তাহা মানবনৈতিক বিপ্লব। এদেশে নানা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এক মানবনৈতিক আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে বাধ্য। ত্যাগ ও আত্মবলিদানের প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে আরও গম্ভীরতর। বাহিরের উত্তেজনা-উন্মাদনায় নয়, অন্তরের আত্ম-বিশ্বাসে ও আত্মপ্রশান্তিতে ইহার প্রতিষ্ঠা। একদিনের দৈহিক মৃত্যুবরণের প্রস্তুতি নয়, প্রতিদিনের তপস্যার আত্মাহুতি হইবে ইহার লক্ষণ। এই ভাবীযুগের বিপ্লবসাধনায় সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মত্যাগী মানুষের প্রয়োজন। পারিবারিক জীবনও তাহার ব্যতিক্রম নয়। বরঞ্চ পারিবারিক জীবনই হইবে এই বিপ্লবের বীজভূমি। নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত, সংগঠিত ও পরিচালিত পারিবারিক জীবনেই আমরা ভবিষ্যৎ ভারতের নূতন বিপ্লবীদের সন্ধান পাইব। এইরূপ বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—'তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।'

সুতরাং ভারতে পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব আজ কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জাতীয় দায়িত্ব আজ সর্ব্বনিয়ন্তার ন্যস্ত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব উদ্‌যাপনের মধ্যেই আজ পারিবারিক জীবনের মহামুক্তির সাধনা। প্রত্যেকটি পিতামাতা, স্বামীস্ত্রী, ভ্রাতাভগ্নী, পুত্রকন্যাকে আজ নূতনযুগের সমাজধর্ম্মসাধনার ও জাতীয় আদর্শবাদের এই রহস্য বুঝিতে হইবে। এই নূতন সাধনার মূল ব্রহ্মচর্য্য, কাণ্ড সত্য, শাখা-প্রশাখা ত্যাগ, ফুল ও অমৃত ফল মহামুক্তি। ইহাই এযুগের জাতীয় জীবনের আধ্যাত্মিক মহীরুহ।

সুতরাং পারিবারিক জীবনের গোড়াতেই আজ সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। মূল ব্যতীত যেমন কাণ্ড দাঁড়াইতে পারে না ও শাখা-প্রশাখা বিস্তারলাভ করিতে পারে না, ব্রহ্মচর্য্যব্যতীত সেইরূপ সত্যও দাঁড়াইতে পারে না, ত্যাগও প্রসার লাভ করিতে পারে না। রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা নানাভাবে ত্যাগ ও কষ্টস্বীকারের কথা শুনিয়া থাকি। ইহাও তপস্যা বিশেষ। কিন্তু ইহার পিছনে আত্মসংযমের প্রেরণা অনেক সময় থাকে না। এরূপ তপস্যা ও কর্ম্ম রাজসিক।

'যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥'

—(গীতা, ১৮।২৪)

অর্থাৎ—'যে কর্ম্ম কামেপ্সু ব্যক্তির দ্বারা অহঙ্কারবশে এবং বহু

ক্লেশ সহ্য করিয়া করা হয় তাহাকে রাজসিক কর্ম্ম বলে।'

'সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসংচলমধ্রুবম্॥'

—(ঐ, ১৭।১৮)

অর্থাৎ—'লোকের প্রশংসা, সম্মান, পূজা পাইবার জন্য যে তপস্যা দাম্ভিকতার সহিত করা হয় তাহা রাজসিক, অস্থির ও অধ্রুব।'

এইরূপ তপস্যার পিছনে থাকে 'লোক-কাম' এবং তাহারও পশ্চাতে আছে ধনকাম ও যৌনকাম। ইহাই আসুরিক জীবনের মূল, যাহার কথা আমরা শ্রীমদ্গীতার দৃষ্টিতে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

সুতরাং জাতীয় জীবনে সত্যপ্রতিষ্ঠ ত্যাগের আদর্শ প্রসার করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য্যের।

এ যুগে ব্রহ্মচর্য্যের মহান্ উদ্গাতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর কামসংযমের উপায় সম্বন্ধে একটি বাণী আছে। তিনি বলিয়াছেন—'স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়াই মানুষের মনে কামভাবের উদয় হয়।' বলা বাহুল্য এই তীক্ষ্ণ উক্তিটির মধ্যে সন্ন্যাসীর জীবনে কামসংযমের উপায়ই নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু কামতত্ত্বের মূল সম্বন্ধে এই আর্ষ উক্তিটির মধ্যে পারিবারিক জীবনেরও নীতিনির্দ্ধারণের ইঙ্গিত রহিয়াছে। পারিবারিক জীবন প্রধানতঃ স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসার বিকার হইতেই বিকৃত যৌনকামের উদ্ভব ঘটে। অপরপক্ষে ঐরূপ যৌনকাম

যেখানে অবাধ প্রশ্রয়লাভ করে সেখানে স্নেহ-মায়া—মমতা ভালবাসাও বিকার-গ্রস্ত হইতে বাধ্য। এই জন্যই যৌনকামের সংযমকে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বধর্ম্মে 'পবিত্রতা' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই পবিত্রতা ব্যতিরেকে সংসারজীবন ব্যর্থতার প্রহসনে পরিণত হইতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সভ্যজগতের ঘরে ঘরে এবং আত্মবিস্মৃত ভারতেরও বহু ঘরে এই ব্যর্থতার বিকট প্রহসনই চলিতেছে।

সুতরাং আজ ভারতীয় পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে প্রথমেই যাহা প্রয়োজন তাহা স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা ও প্রেমপ্রণয়ের সহিত যৌনকামের সংশুদ্ধি। এখনই আমরা এরূপ কোনও ব্যাপক সংযমসাধনা আশা করিতে পারি না। কিন্তু চোখ খুলিয়া দেখিবার, চিন্তা করিবার ও চেষ্টা করিবার সময় অবশ্যই আসিয়াছে।

দাম্পত্যজীবনে স্বাধীন যৌনবিলাসের রীতি ও মনোভাব ভারতের সমাজজীবন ও জাতীয়জীবনের আদর্শের ধ্বংসসাধক ইহা ভারতপ্রমিক সকলকেই আজ উপলব্ধি করিতে হইবে। ভারতীয় যৌন-পবিত্রতার আদর্শের ব্যতিক্রম ভারতীয় সংস্কৃতিরই অমর্য্যাদা ও সেজন্য জাতীয় অপরাধ। বিবাহিত জীবন একটি নিছক ব্যক্তিগত (Private) ব্যাপার নয়, ইহার ভাবধারা সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে, সুতরাং ইহার সামাজিক ও জাতীয় গুরুত্ব রহিয়াছে ইহা আজ জোর গলায় দৃঢ়ভাবে প্রচার করার দিন আসিয়াছে। Birth-Control বা

জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া আমরা প্রকারান্তরে দাম্পত্য-জীবনে সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্বের কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছি।

জাতীয় জীবনে দৈহিক খাদ্যাভাবের অনিবার্য্য আশঙ্কায় আমরা বিবাহিত জীবনে সন্তানপ্রজননকে সীমাবদ্ধ করিতেছি। কিন্তু জাতীয় জীবনে যে নৈতিক দুর্ভিক্ষ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারে যদি বিবাহিত জীবনে যৌন-কামনাকে সংযত করার প্রয়োজন থাকে তবে তাহাতে আমরা পরাঙ্মুখ কেন? ভারতের জাতীয় আদর্শের স্বার্থেই, জাতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনেই আজ আমাদের নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রেও জাতি হিসাবে বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্যও সমাজে এক নূতনতর ও উচ্চতর পারিবারিক জীবনাদর্শ পরিকল্পনা (Family Life-Ideal Planning) অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

হয়ত নৈতিক জীবনে মানুষের মত বাঁচিবার কথা এখন জাতির মাথায় আসে না। ইহার অবশ্য একটা কারণও রহিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে নীতিধর্ম্মের অনুশীলন যে অল্পবিস্তর দেশে নাই তাহা নহে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি কেমন করিয়া প্রায় সহস্র বৎসর আমরা সমাজধর্মকে ধীরে ধীরে হারাইয়াছি। সেজন্য জাতীয় জীবনে নীতিধর্ম্মের অনুশীলন আমাদের কাছে আজ একটা 'ফাঁকা কথা' মাত্র। এবং ইদানীং পশ্চিমী দেশের প্রভাবে আমরা এক নূতন নীতিধর্ম্মের শিক্ষালাভ করিয়াছি; তাহা রাজ-নীতি, অর্থনীতি ও জড়বিজ্ঞাননীতি। পৃথিবীব্যাপী আজ

ইহাদের প্রভাব; সুতরাং আমরাও সকলের দেখাদেখি আমাদের সমাজজীবনকে ও জাতীয়জীবনকে ঐ একই ছাঁচে ঢালিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। ইহা অবশ্য কতকটা স্বাভাবিক, কারণ সহস্র বৎসরের মৃতকল্প সমাজ ও জাতি এইভাবে এক নূতন প্রাণের স্পর্শে নড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে ও স্বাভাবিকভাবে বাঁচিয়া উঠিতে হইলে ভারতকে ক্রমশঃ তাহার নিজের পথই ধরিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আমাদের কিছু জাতীয় ও সামাজিক আদর্শবাদের তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইতেছে, কারণ জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনে পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্বকর্ত্তব্যের কথায় আসিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দেশেও আজ দেখি অল্পবিস্তর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও কতদিকে গভীর জীবনব্যর্থতা মানুষকে অহরহ ব্যথিত করিতেছে। তাহার প্রমাণ সমসাময়িক ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাই-তেছে। আমেরিকার মত শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী জাতির জীবনেও আজ সামাজিক আদর্শবাদের কথা শুনিতে পাই। আমেরিকার বর্ত্তমান (১৯৬৬) প্রেসিডেণ্ট Lyndon B. Johnson বলিতে-ছেন—'A great nation is one which breeds a great people. A great people flower not from wealth and power, but from a society which spurs them to the fulness of their genius.', অর্থাৎ—'যে জাতি মহান্ গণদেবতার উদ্ভব ঘটায় তাহাকেই মহান্ জাতি বলা যাইতে পারে। ধন বা ক্ষমতা (রাজনৈতিক)

হইতে মহান্ গণদেবতার উদ্ভব হয় না; পরন্তু যে সমাজ জাতীয় প্রতিভার উন্মেষে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে, সেই সমাজ হইতেই তাহার উদ্ভব ঘটে।' —(U. S. Congress বক্তৃতা, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৬)। শ্রীযুক্ত জনসন্ এক এক জাতির নিজস্ব সমাজসংস্কৃতির উপর যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা তিনি কোন প্রাচীন আধ্যাত্মিক অর্থে করেন নাই বটে, কিন্তু এই অর্থনীতি-রাজনীতির যুগে এই সমাজসংস্কৃতির কথা ভাবিয়া দেখার মত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে আমেরিকার ত কোন প্রাচীন সমাজসংস্কৃতি নাই, রাশিয়ারও তাই। জাপান, চীন, মিশর সকলেই ত আজ পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণ নূতন সংস্কৃতি লইয়া চলিতেছে। কথা হয়ত অনেকটা সত্য। কিন্তু তবুও এ কথা আরও সত্য যে ভারতের প্রাচীন জাতীয় প্রতিভায় এমন কিছু রহিয়াছে যাহা শাশ্বত মানবধর্ম্মী বলিয়া অমর। কালপ্রভাবে যুগে যুগে তাহার পরিবর্ত্তন হইলেও পরিবর্জন সম্ভব নয়। পশ্চিমী কমিউনিজ্মের সমর্থকগণ 'সংস্কৃতির অগ্রগতি' নাম দিয়া ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতিকে আধুনিক অর্থনৈতিক রাজনীতির ছাঁচে ঢালিবার স্বপ্ন দেখিতে পারেন, কিন্তু ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির আধ্যাত্মিক মূল এত গভীরে যে তাহাকে উন্মূলিত করিবার দুরাকাঙ্খা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার বিশ্ব-কমিউনিজ্মের এককালীন ঘনিষ্ঠ সহযোগী M. N. Roy পরবর্ত্তীকালে সমাজতন্ত্র ও

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর কতখানি বিশ্বাস হারাইয়া জনকল্যাণের নূতন মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু তবুও এই নির্ম্মম বাস্তব সত্যকে আজ স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতের জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব সমাজপ্রতিভা বহুকাল মৃতকল্প হইয়া আছে। গতানুগতিক পুরাতনের উপর নূতনের বাহ্যিক চাকচিক্যই আজ ভারতীয় সমাজের রূপ। পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে-প্রতিষ্ঠানে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে আজ অন্ধ অন্তঃসারশূন্য পরানুকরণবৃত্তিই প্রবল। এই উদ্দাম পরানুকরণবৃত্তি আমাদের জাতীয় মনের অপরিণত (undeveloped) অবস্থারই দ্যোতক। এই অবস্থা যে জাতীয় জীবনের পক্ষে কতদূর মারাত্মক তাহা বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-সুভাষচন্দ্রের বহু উক্তিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। *

* 'আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।' —স্বামী বিবেকানন্দ।

'ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ম'রে যায়নি। দু' বা তিন হাজার বছরের আগেকার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় আজও আমাদের মূলতঃ একই চিন্তা, একই জীবনাদর্শ…' —নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

'এ কথা নিশ্চয় জানবেন ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে, সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে, ভারত রক্ষা পাবে।' —রবীন্দ্রনাথ (গোরা)।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ সুবিদিত।

ভারতে ইতিপূর্ব্বে যতগুলি দেশপ্রেমমূলক আন্দোলন দেখা দিয়াছে সেগুলি সবই মূলতঃ এক আত্মিক ও নৈতিক আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ফল যে আশানুরূপ হয় নাই তাহার কারণ আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণের নৈতিক ও আত্মিক বিশ্বাস জাতির প্রাণে ততখানি সঞ্চারিত হয় নাই। তাহা ছাড়া স্থূল জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে অর্থনীতি-রাজনীতির আন্দোলনই দেশের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দারিদ্র্য-অন্নাভাব-অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য ইত্যাদিই যে জীবনের প্রাথমিক অনিবার্য্য সমস্যা এবং ইহাদের সমাধানব্যতীত জাতীয় জীবনের উচ্চতর নৈতিক সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত একথা অতি সত্য। কিন্তু এই যুক্তির পিছনে একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি কাজ করিতেছে। তাহা এই যে দৈহিক জীবন ও আত্মিক জীবন, জাগতিক প্রয়োজন ও নৈতিক প্রয়োজন পৃথক্ বস্তু। কিন্তু তাহা সত্য নহে। প্রকৃত নৈতিক উন্নতি, দৈহিক ও জাগতিক উন্নতির সহায়ক; অপরপক্ষে প্রকৃত দৈহিক ও জাগতিক উন্নতিও নৈতিক উন্নতির সহায়ক হইতে পারে।

প্রাচীন ভারত কোনও দিন এই বাস্তবকে অবহেলা করে নাই, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রামাণ্য উদ্ধৃতি-সহযোগে দেখাইয়াছি। মধ্যযুগের পতনোন্মুখ আবহাওয়ায় একটা চিন্তার ও ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু প্রাচীন ভারতের মানবতাবাদ আবার সমাজ ও জাতির জীবনে তাহার আসন করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহার

কথাও আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ভারতের নব-জাতীয়তাবাদ তাহারই সূচনা। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক নায়ক গোরাকে 'অনন্তের দিক হইতে একটি মুক্ত নির্ম্মল আলোক আসিয়া এই ভারতবর্ষকে সর্ব্বত্র যেন জ্যোতির্ময় করিয়া' দেখাইত। '.........গোরা তাহার স্বদেশের সমস্ত দুঃখ-দুর্গতি-দুর্ব্বলতা ভেদ করিয়াও একটা মহৎ সত্য পদার্থকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইত।' এই আত্মিক আদর্শবাদ ছাড়া ভারতের ভারতত্বই থাকে না।

সুতরাং আজ ভারতের Secular বা ঐহিক উন্নতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র Moral বা নৈতিক আন্দোলনের একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ পশ্চিমের দেশগুলি যে ব্যর্থতার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া পাক খাইতেছে আমাদেরও সেই অবস্থা হইবে। পরন্তু আমরা জাতীয় স্বধর্ম্মকে হারাইয়া আরও হীন দুর্দ্দশায় পতিত হইব। সুতরাং ভারতের জাতীয় জীবনের মূল মানবিক আদর্শকে অটুট রাখিয়া আমাদের যাবতীয় যুগোপযোগী সংস্কার-সাধন করিতে হইবে।

সমাজ ও জাতির জীবনে নরনারীর প্রেমসম্পর্ক এবং পারিবারিক জীবন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইখানে ভারতের মানবিক আদর্শের শ্রদ্ধাপূর্ণ গবেষণা-আলোচনা-প্রচার-পরিকল্পনা প্রয়োজন। বর্ত্তমানের সামাজিক ওলট-পালটের দিনে এই কর্ম্মপদ্ধতির প্রবর্ত্তনে বিলম্ব করা চলে না।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতি-নীতি ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি এখনও হুবহু বজায় রাখিতে হইবে এমন কোনও

কথা নাই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নরনারীর প্রেমসম্পর্ক ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয়তা (flexibility) ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি মূল রিপু-ইন্দ্রিয়-সংযমের ও পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা সেখানে সর্ব্ববাদিসম্মত নীতি। বিশ্বব্যাপী এই ভাঙ্গনের দিনে ভারতকেই এই মৌলিক জীবননীতি ধরিয়া থাকিতে ও বিশ্বে প্রচার করিতে হইবে।

বিবাহিত জীবনে ও পারিবারিক জীবনে এই মহান্ জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু আলোচনা করিতেছি।

১) বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য যৌনকামের লীলাবিলাস নয় ইহা জানিয়াও যেন আজ আমরা ইহা ভুলিয়া আছি। যৌন-মিলনের 'আনন্দ'ই যদি উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে পারিবারিক জীবন বা বিবাহিত জীবনের ছাপ দিবার প্রয়োজন কি থাকিত? ইহার সমর্থনে শাস্ত্রীয় উক্তির প্রয়োজন হয় না। সাধারণ জ্ঞানের বিচারেই প্রতিপন্ন হয় যে বিবাহিত জীবনের অর্থ যৌনজীবন নয়। যৌনভিত্তিক প্রেমপ্রণয়ও বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যৌন স্বাধীনতার চরমবাদী সমর্থক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—'Marriage is something more serious than the pleasure of two people in each other's company; it is an institution which, through the fact that it gives rise to children, forms part of the intimate texture of society,

and has an importance extending far beyond the personal feelings of the husband and the wife',

—(Marriage and Morals, Pg. 63)

অর্থাৎ—'বিবাহ কেবলমাত্র দুইটি ব্যক্তির পরস্পরের সান্নিধ্যে আনন্দলাভ মাত্র নয়, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর একটি ব্যাপার; ইহা এমন একটি প্রতিষ্ঠান (প্রথা) যাহা সন্তানসৃজনের কারণে সমাজের গভীর গঠনব্যবস্থার অঙ্গীভূত, এবং স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত ভাবসম্পর্কের বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার গুরুত্ব বিস্তৃত। '

সন্তানসৃজনের সামাজিক গুরুত্বের কথায় পরে আসিতেছি, কিন্তু ব্যক্তিগত কামতৃপ্তিকেই যেখানে বড় করিয়া দেখা হয় এবং তাহাকেই দাম্পত্যজীবনের 'ভালবাসা' বলা হয়, সেখানে বিবাহিত জীবনের গুরুত্ববোধ কেমন করিয়া আসিতে পারে ? সেজন্য প্রথমেই যাহা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন তাহা যৌনপ্রবৃত্তির উপর তীব্র সংযমের প্রভাব। বর্ত্তমানে বিবাহের পূর্ব্বে সংযমব্রহ্মচর্য্যশিক্ষার অভাবে এরূপ প্রভাব এমনি খুব আশা করা যায় না।

কিন্তু নান্যঃ পন্থাঃ। মানুষকে মানুষ হইতে গেলে মনঃসংযমই তাহার একমাত্র পথ। সুতরাং বিবাহিত পারিবারিক জীবনেই আজ মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় ভারতীয় শাস্ত্রে বিবাহিত জীবন এবং সন্তানসৃজন একটি পবিত্র কর্ত্তব্যরূপেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই কর্ত্তব্য সমাজধর্ম্ম ও জাতীয়ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। সন্তত-প্রবাহকে রক্ষা ক'রে বলিয়াই সন্তান।

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ ॥'

—(মনু' ৯।৯৬)

অর্থাৎ— 'সন্তানসৃজনের জন্য পুরুষ ও গর্ভধারণের জন্য স্ত্রী সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সন্তানসৃজনের ন্যায় সমস্ত ধর্ম্ম-কার্য্যই পত্নীর সহিত করণীয়, বেদে এরূপ বলা হইয়াছে।' মনে রাখিতে হইবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্ম্মের অর্থ খুবই ব্যাপক। একদিকে সনাতন বা শাশ্বত ধর্ম্ম, অপরদিকে দেশ-জাতি-সমাজের জীবনে তাহারই 'আচার' বা আচরণ। সেজন্য জাতীয় জীবনে আচরণীয় নীতিও ধর্ম্ম। মহাভারতে কুন্তী বলিতেছেন—

'নমো ধর্ম্মায় মহতে ধর্ম্মো ধারয়তি প্রজাঃ'

—(উদ্যোগপর্ব্ব, ১৩৭।৯)

অর্থাৎ— মহান্ ধর্ম্মকে প্রণাম, যিনি প্রজাসাধারণকে (Public) ধারণ করেন।' ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সুতরাং জাতীয় জীবনের সন্ততপ্রবাহকে রক্ষা করার গুরুতর ধার্ম্মিক দায়িত্ব লইয়াই বিবাহ। এই জাতীয় জীবনরক্ষা শুধু হস্তপদধারী কতকগুলি জীবসৃষ্টি নয়, পরন্তু প্রকৃত মানুষসৃষ্টি। এই মানুষসৃষ্টির জন্য প্রাচীন শাস্ত্রে গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকগুলি সংস্কারের মধ্য দিয়া পশুকল্প মানবশিশুকে দেবকল্প

আর্য্যমানবে পরিণত করা হইত। এই সংস্কারের অর্থ Process of Development বা উন্নয়নের পদ্ধতি। এই সংস্কারের অভাবেই আর্য্য মানব অসংস্কৃত প্রাকৃত মানবের স্তরে থাকিয়া যাইত। শিশুকাল হইতে উপনয়ন, গুরুগৃহে বাস, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যাদিই ছিল এই সব সংস্কারের মূল কথা। সুতরাং প্রকৃত মানুষসৃষ্টি এবং প্রকৃত মানুষের সমাজসৃষ্টি করাই ছিল সন্তানপ্রজননের লক্ষ্য। এই জন্যই ইহা ছিল একটী পবিত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযমের আদর্শ ব্যতীত এই পবিত্র কর্ত্তব্যের কোনও সামাজিক পরিবেশই সৃষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং সেক্ষেত্রে যৌনমিলনের পবিত্র উদ্দেশ্যের কোনও প্রশ্নই উঠে না।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা এক মানবিক মহা-বিপ্লবের যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সেজন্য সমাজে ঐরূপ ধর্ম্মের পরিবেশসৃষ্টির বিরাট দায়িত্ব আজ পারিবারিক জীবনের উপর বর্ত্তিয়াছে। আজ 'ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়' খুলিয়া কতকগুলি ছেলেকে প্রাচীন আদর্শে গঠিত করিবার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা করা অপেক্ষা পারিবারিক জীবনকেই নূতন আদর্শে গঠিত করা সমধিক প্রয়োজন, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদর্শ পারিবারিক জীবনই হইবে এযুগের জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের বীজভূমি। সুতরাং নবজাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই আজ পারিবারিক জীবনে সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য 'জাতীয় পারিবারিক জীবন

সংগঠন'-এর মত কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সহরে সহরে ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা, সাহিত্যপুস্তকাদি বিতরণের ব্যবস্থা, নিয়মিত আলোচনাকেন্দ্র-স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি সভ্যসভ্যাগণের মধ্যে এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প সংস্কারের প্রচেষ্টা নীতিগতভাবে চালাইতে হইবে।

যৌনকামের বেদীমূলে নিজেদের মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের মহিমা বলি দিয়া, যৌনসম্ভোগকেই জীবনের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য জ্ঞান করিয়া গৃহস্থ নরনারী যে ইন্দ্রিয়জীবনের দাসে পরিণত, সেই নিদারুণ অবস্থা হইতে ইঁহাদের উঠিতে হইবে এবং অন্যদের উঠাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়সুখসর্ব্বস্বতাই আজ পারি-বারিক জীবনে আবালবৃদ্ধ সকলের মধ্যে অলিখিত গোপন চুক্তির মত কাজ করিতেছে। এই গোপনচুক্তিকে আজ নাকচ করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের অমর ঋষি-মহর্ষিগণের অভিপ্রেত জ্ঞান করিয়া ইঁহাদিগকে এই নূতন জাতিগঠনের কাজে ব্রতী হইতে হইবে।

বিবাহিত জীবনে সংযম-ব্রহ্মচর্য্য অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবার কিছুই নাই। একমাত্র প্রয়োজন একটি মহৎ দিব্য জাতীয়তার আদর্শকে অনুসরণ করিয়া রূপায়িত করার সংকল্প। ইহা এযুগে ভারত-ভাগ্যবিধাতা সর্ব্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত কাজ। সুতরাং যে সব পরিবারে অল্পবিস্তর ধর্ম্মকার্য্য ও ধর্ম্মসাধনা চলি-তেছে তাঁহাদেরও এই যুগধর্ম্মসাধনার ব্রতে সংঘবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই সমাজসাধনার ধর্ম্ম বেদ-উপনিষদ্-পুরাণ-স্মৃতি-রামায়ণ-মহাভারতের ধর্ম্মসাধনা, সুতরাং এই যুগসন্ধিক্ষণে

সর্ব্বনিয়ন্তার এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ না করিলে অধর্ম্মাচরণের ফলে ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনার মধ্যেও বিরাট্ ফাঁক থাকিয়া যাইবে। যাহা হউক শাস্ত্রে যে অসম্ভব কিছু কথা নাই তাহার প্রমাণ, মনু বলিয়াছেন—

'ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া॥

—(৩।৪৫)

অর্থাৎ—'সর্ব্বদা পরস্ত্রীসম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া ঋতুকালে পর্ব্বদিন (অমাবস্যা-পূর্ণিমাদি পবিত্র দিন) বাদ দিয়া ভার্য্যার প্রীতির উদ্দেশ্যে রতিকামনায় নিজস্ত্রীর সহিত মিলিত হইবে।' এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় পরস্ত্রী বিষয়ে চিত্তচাঞ্চল্যনিরোধের বিধান। আজকাল 'বিদ্রোহী' মনোভাব লইয়া অনেক বক্তা-লেখক-সংস্কারককে বলিতে শোনা যায় যে স্ত্রীলোকের বেলা পরপুরুষ সম্বন্ধে সতীত্বধর্ম্মে নানা বাধানিষেধ কিন্তু পুরুষেরা স্বাধীন। একথা যে কত ভ্রান্ত, শাস্ত্রের এই উক্তি হইতেই তাহা বোধগম্য হইবে। ইহা ছাড়া 'তদ্‌ব্রত' ও 'রতিকাম্যয়া' কথা দুইটির মধ্যে স্ত্রীর প্রীতিসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানেও ভারতীয় শাস্ত্রের ব্যবস্থা কত স্বাভাবিক তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আধুনিক কালে একটী প্রচলিত অভিযোগ এই যে বিবাহিত যৌনসঙ্গমে নারীর স্বাভাবিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুবই উপেক্ষিত। উল্লিখিত শ্লোক সে মনোভাবেরও বিরোধী।

ঋতুকালীন ষোল রাত্রির মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি বাদ দিয়া দশরাত্রি স্বামীস্ত্রীর মিলন শাস্ত্রসম্মতভাবে স্বাভাবিক। ইহার উপরে যাঁহারা আরও সংযমের মধ্য দিয়া বিবাহিত জীবনেই ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিতে চান্ তাঁহাদের পক্ষেও শাস্ত্রীয় বিধান রহিয়াছে—

'নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্রতত্রাশ্রমে বসন্॥'

—(মনু, ৩।৫০)

অর্থাৎ—'(পূর্ব্বলিখিত) বর্জনীয় ছয়রাত্রি এবং অন্য যে কোনও আটরাত্রি (অর্থাৎ ষোল রাত্রির মধ্যে মোট চৌদ্দ রাত্রি) বাদ দিয়া (মাত্র দুই রাত্রি) মিলিত হইলে যে কোনও (বান-প্রস্থাদি) আশ্রমবাসীর পক্ষেও ব্রহ্মচারী হইয়াই থাকা হয়।'

এই সমস্ত বিধান হইতে বুঝা যাইবে ভারতীয় সংযম-শাস্ত্র কত Elastic বা স্থিতিস্থাপক এবং কত স্বাভাবিক। আমরা শাস্ত্রীয় বিধানগুলি তুলিয়া ধরিলাম এই জন্য নয় যে হুবহু ঐ বিধান মতই সকলকে চলিতে হইবে। হইলে ভাল হইত কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু এতখানি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তমান সমাজে উহা নিশ্চয় স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রীয় বিধান রক্ষা করা 'Form' বা ঠাটের দিক্ দিয়া হয়ত ঠিক্ হইতে পারে, কিন্তু 'Spirit' বা ভাবের দিক্ দিয়া নয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মনির্ণয় বিষয়ে কেবলমাত্র শাস্ত্রের কথার উপর নির্ভর না করিয়া বিশুদ্ধ

যুক্তিবিচারের সহিত বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং গৃহস্থজীবনে সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের মূল উদ্দেশ্য ও ভাব বুঝিয়া সকলেই যুগপরিবেশ-অনুযায়ী ইহার সাধনায় ব্রতী হইতে পারেন। মূলকথা আদর্শটিকে একটি ভারতীয় সমাজধর্ম্মের বা জাতীয়ধর্ম্মের অঙ্গরূপে দেখা এবং নিছক আত্মসুখের ভাব লইয়া যৌনসঙ্গমে প্রবৃত্ত না হওয়া। এজন্য উল্লিখিত বিধানগুলির সহিত এমন বিধানও রহিয়াছে (যথা—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ২৬৯ অধ্যায়) যে ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্বীয় পত্নীতেও সঙ্গত হওয়া চলে না। ঋতুকালে বিধিনিষেধের নিয়ম পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

পিতামাতা বা স্বামীস্ত্রী এই সংযম ও পবিত্র চরিত্রের অভ্যাস ও আচরণ না করিলে এযুগের সন্তানদের জীবনে তাহা প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কিছু বুঝেনা এইরূপ একটা কাল্পনিক মনোভাব লইয়া চলার ফলেও বহু শিশুর যৌনজীবন ও ভবিষ্যৎ চরিত্র বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আধুনিক শৈশব-বাল্য-কৈশোরের যৌনমনস্তত্ত্ব এ বিষয়ে অনেকের চোখ খুলিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ব যেখানে চারিদিকে অন্ধকার দেখে ভারতীয় শাস্ত্রসংস্কৃতি সেখানে আশার উজ্জ্বল আলো প্রকাশিত করে। পিতামাতা এবং বয়স্কদের যৌনজীবনে অসংযমের প্রভাবে ছেলে-মেয়েরা বাল্যকাল হইতে নানা গুপ্ত অসংযমের হাত হইতে আত্মরক্ষা করার কোনও প্রেরণা পায় না। জীবনের গোড়াতেই

এই আদর্শের বিপর্যায় ভবিষ্যতে তাহাদের সংশয়বাদী (sceptical) ও আদর্শবিদ্বেষী (cynical) করিয়া তোলে। সমাজ ও সভ্যতার প্রতি একটা মৌলিক অশ্রদ্ধাবোধই তাহাদের স্বভাবগত হইয়া দাঁড়ায়। এ যুগের সভ্যতায় সর্ব্বদেশে কিশোর ও তরুণদের অনেকসময় তীব্র বিদ্রোহপ্রবণতার ইহাই কারণ কিনা কে বলিবে ? বয়স্ক ও প্রবীণ নরনারী যেখানে নিজেদের চরিত্রমহিমা ও পদমর্য্যাদাকে 'abdicate' (স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ) করেন সেখানে সমাজমনস্তত্ত্বের নিগূঢ় নিয়মানুসারেই কিশোর-তরুণেরা সেস্থান অধিকার করিবে। ইহাই অনেকক্ষেত্রে এযুগের 'juvenile precocity and delinquency.' বা শৈশবের অকালপক্কতা ও অপরাধপ্রবণতার মূলে থাকা বিচিত্র নয়।

আজকাল একটা সহজ সমালোচনা করা হয় যে ছেলেমেয়েরা শিক্ষক-গুরুজন ইত্যাদিকে মানে না। কিন্তু জীবনের যে তরল ও হাল্‌কা দিক্‌টায় তাহারা বিভ্রান্ত হয় তাহারই স্রোতে শিক্ষকগুরুজনেরা ভাসিয়া চলিয়াছেন দেখিলে কোন্ ছেলেমেয়ে তাঁহাদের কাছে আন্তরিক মাথা নত করিতে পারে ? যৌন-আবেদনপূর্ণ সাহিত্য-সিনেমা-থিয়েটার-নৃত্যগীত ইত্যাদিতে বয়স্ক গুরুজনেরা একান্ত লঘুজনের মত আচরণ করিয়া ছেলেমেয়েদের সমপর্য্যায়ে নামিয়া, অনেক সময় তাহাদের লইয়াই, এসব উপভোগ করেন। তখন 'তদা নাশংসে' ছাড়া আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে কি ? ইহার ফলে আজ কিরূপ

'সুখী পরিবার' গঠিত হইতেছে তাহার নমুনা ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শিশু ও কিশোরদের লইয়া বয়স্ক অভিভাবকেরা যে চরম আদর-আব্দারের চব্বিশ ঘণ্টা অভিনয় করেন তাহাতে তাঁহাদের অবদমিত কামকামনার তৃপ্তি হয়ত যথেষ্টই ঘটে, কিন্তু শিশু ও কিশোরদের চরিত্র যে ইহাতে কতখানি ক্ষতি-গ্রস্ত হয় তাহা ভবিষ্যতে ইহাদের হাতে আশাভঙ্গ না-হওয়া পর্য্যন্ত কোনও অভিভাবক বুঝিতে পারেন না। আধুনিক যৌন-মনস্তত্ত্ব শৈশব এবং কৈশোরের কামবৃত্তি—পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও বয়স্কদের আদর-সোহাগে কতখানি উত্তেজিত হয় তাহার উদ্‌ঘাটন করিয়া একদিকে কল্যাণসাধনই করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজসাধনা কিন্তু কয়েকসহস্র বৎসর পূর্ব্বেই এই মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া আদর্শ মানুষগঠনের জন্য শৈশব-কৈশোরের সন্ধিস্থলেই ভাবী নাগরিকদের পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নীর আদর-সোহাগের স্বার্থপর বিলাসক্ষেত্র হইতে সরাইয়া সংযতচরিত্র আচার্য্যের ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তাহাদের উপনীত করিত। ইহাকেই সেযুগে বলা হইত 'উপনয়ন'। আজ পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব যখন পিতামাতা-পুত্রকন্যা-ভ্রাতাভগ্নী ইত্যাদি সকলের মধ্যেই পরস্পর এক যৌনকামের সম্পর্ক প্রমাণ করিতেছে, তখন আমরা তাহা সাগ্রহে এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ফল? সবকিছু সাংসারিক সম্পর্ককে কুৎসিৎদৃষ্টিতে দেখার আত্মনাশী বৃত্তি! অথচ কয়েকসহস্র

বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতের ঋষি বলিয়াছিলেন—

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥'

অর্থাৎ—'মাতা-ভগ্নী-কন্যার সহিতও বিবিক্তভাবে আসীন হইবেনা, কারণ ইন্দ্রিয়গণ এমনি বলবান্ যে বিদ্বান্ লোককেও অভিভূত করে।', তখন আমরা সে কথা প্রাচীনের কুরুচি বলিয়া অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়াছি। অথচ এই প্রাচীনের দৃষ্টি আধুনিকের মত দুর্নীতির নৈরাশ্য না জাগাইয়া বাস্তব নীতিধর্ম্ম-সাধনারই পথ দেখাইয়াছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি পুনরায় আজ আমাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টি অনুশীলন করিতে হইবে।

নারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ভারতীয় পারিবারিক জীবনের একটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভেরও আজ 'ভিৎ' আল্‌গা করা হইতেছে, নানা পশ্চিমী মতবাদের বিচারহীন অনুকরণে। বিবাহিত পুরুষের সংযমব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় বিবাহিতা নারীরও পাতিব্রত্য ও সতীত্ব একটি বিশিষ্ট ভারতীয় আদর্শ। প্রশ্ন উঠিতে পারে স্বামীর একাধিক স্ত্রীগ্রহণে শাস্ত্রীয় আপত্তি না থাকিলেও স্ত্রীর বেলা এই একনিষ্ঠার প্রশ্ন কেন? ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে স্ত্রী থাকিতে পুনরায় কামসম্ভোগের ইচ্ছায় অন্য এক বা একাধিক স্ত্রীগ্রহণ ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন লাভ করে নাই। তাহার প্রমাণ আমরা পাই পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২৬৯ অধ্যায়ের মধ্যেই যেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে 'যে

ব্যক্তি একপত্নী সত্ত্বে সম্ভোগার্থে অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ...... না করেন, তাঁহারই উপস্থব্রত পরিরক্ষিত হয়। ...... যিনি (উহা) রক্ষা করিতে না পারেন তাঁহার সমুদয় কার্য্যই নিষ্ফল হয়। তিনি তপস্যা, যজ্ঞ বা শরীর দ্বারা কোনও ফলই লাভ করিতে সমর্থ হন্ না।' (মূলানুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ)। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সে যুগে প্রচলিত থাকিলেও এক স্ত্রীই সম্ভবতঃ ছিল 'norm' বা স্বাভাবিক মান। এজন্য রাজা দশরথের তিন পত্নী থাকিলেও স্বয়ং রামচন্দ্র এক ধর্ম্মপত্নী সীতা ছাড়া দ্বিতীয় পাণিগ্রহণ করেন নাই; এমন কি যজ্ঞকার্য্যের জন্য সীতার অভাবে স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞনিষ্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই কথিত আছে। সে যাহা হউক, এক বা একাধিক পত্নীগ্রহণ— এই উভয়ক্ষেত্রে যাহা মূল লক্ষ্য ও আদর্শ তাহা যৌনসম্ভোগের লালসাবর্জ্জন, এ বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে দ্বিমত নাই।

এজন্য সন্তানপ্রজননের পবিত্র ধামিক উদ্দেশ্যে রাজা দশরথ বিরাট যজ্ঞসম্পাদন করিয়াছিলেন, সগর রাজাও দুই পত্নী সহ হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বংশ-রক্ষা শুধু যৌনবিলাসের একটি পরিণাম ছিল না, তাহা ছিল সাক্ষাৎভাবে একটি তপস্যামূলক ধর্ম্মকার্য্য।

এ যুগে জনসংখ্যা কমাইবার জন্য জন্মনিরোধের ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও যৌনকামসংযমের গভীর প্রয়োজনীয়তা ও পবিত্র কর্ত্তব্য তিলমাত্র লঘু হয় নাই। জন্মনিরোধকে একটি আপৎ-

কালীন উপায় বা 'আপদ্ধর্ম্ম'-রূপে গণ্য করিলে ইহার বিকৃত পরিণাম অনেকাংশে হ্রাস পাইতে পারে। প্রয়োজনমত ও মনোমত গুণসম্পন্ন পুত্র বা কন্যার জন্মদান অথবা গর্ভনিরোধের জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা কতকগুলি প্রক্রিয়ার কথা দেখিতে পাই—(৬।৪)। কিন্তু সেখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় খেয়ালখুশীমত অসংযত যৌনসঙ্গমকে স্থান দেওয়া হয় নাই। পরন্তু সমগ্র ব্যাপারটিকে একটি পবিত্র যজ্ঞীয় দৃষ্টিতে দেখিতে বলা হইয়াছে। এইরূপ জ্ঞান লইয়া যৌনমিলন না করিলে মানুষের চরম অধোগতি হয় একথা সেখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। অপরপক্ষে এই পবিত্র দৃষ্টিতে যৌনমিলনে 'বাজপেয়' যজ্ঞের মহান্ ফল লাভ হইয়া থাকে তাহাও বলা হইয়াছে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ এবিষয়ে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন—'They include even love-charms to compel a woman to yield her love, charms to prevent conception or bring it about where desired. Even here the knowledge motive is dominant.' —(The Principal Upanishads : Pg 322), অর্থাৎ—'ঐ (প্রক্রিয়া) গুলির মধ্যে বশীকরণ, গর্ভনিরোধ অথবা ইচ্ছামত গর্ভসৃজনের মন্ত্রাদিও আছে। কিন্তু এই ব্যাপারেও জ্ঞানলাভের (মনুষ্যত্ব লাভের) উদ্দেশ্যই বলীয়ান্।' বর্ত্তমান যুগের কৃত্রিম জন্মনিরোধের সহিত ইহার স্বর্গ-নরক বা আকাশ-পাতাল প্রভেদ সহজেই বোধগম্য হয়। সে যাহা হউক ইহা Birth-Control বা কৃত্রিম জন্মনিরোধের যুগ বলিয়া অবাধ

যৌন-অসংযমের হুজুগে মাতিবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে করি না।

নরনারীর বিবাহিত জীবনে পুরুষের সংযম ও নারীর সতীত্ব দুইটি অমূল্য রত্ন। জীবনসমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে মনুষ্যত্বের এই দুইটী বিরাট্ আলোকস্তম্ভ। আমরা কি অন্ধ উন্মত্ততার আবেগে ভারতের এই দুইটি চিরন্তন আলোকবর্ত্তিকাকে নিভাইয়া দিব? সভ্যতায় তাহা হইলে আর থাকিবে কি? এমন কি পাশ্চাত্য জগতেও ধ্বংসোন্মুখ পারিবারিক জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেকেই এই মৌলিক আদর্শের কথা চিন্তা করিতেছেন। 'The christian family is the germ of the yet higher civilization of the future.........the thing of highest importance for all time and to all nations is Family Life.' (The Ascent of Man; Encyclopaedia of Religion and Ethics : Pg. 727) অর্থাৎ—'খ্রীষ্টীয় পরিবারই ভবিষ্যতের আরও উচ্চতর সভ্যতার বীজ।.........সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হইতেছে পারিবারিক জীবন।' সুতরাং কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, মতের অমিল এ বিষয়ে কোথাও নাই। কিন্তু তবুও সমগ্র পাশ্চাত্য, এমনকি সমগ্র পৃথিবীতে দ্রুত এই আদর্শ ধ্বসিয়া পড়িতেছে। কারণ এই আদর্শের প্রাসাদকে ধরিয়া রাখিবার মত দৃঢ় ভিত্তি কোথাও নাই। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে মধ্যযুগে সন্ন্যাসী সাধকদের জীবনে chastity and celibacy অর্থাৎ

পবিত্রতা এবং কৌমার্য্যের যথেষ্ট অনুশীলন হইয়া থাকিলেও সমগ্র সমাজের ভিত্তিরূপে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ ও সাধনা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষই সেই দেশ যেখানে সমাজ-সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গরূপে যৌনসংযম বা ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাকে ঋষিরা স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আজ সভ্যতার যুগসঙ্কটে ভারতেরই ইহা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট 'মিশন' বা সুমহান্ দায়িত্ব। স্বামী বিবেকানন্দের অনেক আদর্শবাণী হইতেই আমরা জাতীয়জীবনে প্রেরণা লাভ করিয়া থাকি। ভারতীয় বিবাহিতা নারীর সতীত্বের ও পাতিব্রত্যের আদর্শ সীতার সম্বন্ধে ও তাঁহার বাণী আমাদের অবশ্য স্মরণে রাখা উচিত। স্বামীজী বলিয়াছেন —'আমি জানি যে-জাতি সীতা চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে— ঐ চরিত্র যদি কাল্পনিকও হয় তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, নারী জাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই।' অপিচ, 'আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গড়িয়া তুলিবার যে-সকল চেষ্টা হইতেছে সেগুলির মধ্যে যদি সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে।' —(বাণী ও রচনা ; ৯-৪৮৯, ৫-১৪৯)

পারিবারিক জীবনে যৌনকামসর্ব্বস্বতার পরিণামে পুরুষের স্বাভাবিক পৌরুষ ও নারীর স্বাভাবিক নারীত্বেরও একান্ত অভাব ঘটিতেছে। সংযমহীন পুরুষ অনেক সময় স্বামীরূপে উচ্ছৃঙ্খল-উৎপীড়ক হইয়া উঠে একথা যেমন সত্য, অপরদিকে সংযমহীনা নারীর প্রভাবে বহু স্বামী পৌরুষহীন জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয় একথাও সমান সত্য। পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে

বলা হইয়াছে—'যাহারা এইরূপ জানিয়া (যৌনমিলনের যজ্ঞতত্ত্ব জানিয়া) যৌনসঙ্গম করে তাহারা স্ত্রীগণের সুকৃতকে লাভ করে, অপরপক্ষে যাহারা এই জ্ঞান বিনা যৌনসঙ্গম করে তাহাদের সুকৃতকে স্ত্রীগণ হরণ করিয়া লয়।' —(বৃহদারণ্যক, ৬।৪।৩) নারীজীবনের প্রধান বস্তু প্রেম। প্রেমের প্রধান গুণ হইতেছে প্রিয়কে পরিপূরণ করা। সুতরাং নারীশক্তি যদি পুরুষশক্তির পূর্ণতাসম্পাদনে সহায়ক হইতে পারে তাহাই নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ও গৌরব। সুতরাং যৌনমিলনের ক্ষেত্রে পুরুষ যদি নারীর সুকৃতকে লাভ করে তাহাই স্বাভাবিক ও সুন্দর। কিন্তু নারী যদি পুরুষের সুকৃতকে হরণ করে তবে তাহা উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক। উপনিষদের উক্তিটির দ্বিতীয় অংশে সেই মারাত্মক সম্ভাবনারই আশঙ্কা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহার জন্য স্ত্রী অপেক্ষা সংযমশক্তিহীন পুরুষই সমধিক দায়ী। এই সংযম-হীন কামপরতন্ত্র জীবনই আজ দাম্পত্যজীবনে ঘোরতর বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়াছে।

স্ত্রীস্বাধীনতার যুগ যে আজ স্ত্রীপ্রাধান্যের যুগে পরিণত হইয়াছে ইহারও মূলে পুরুষের সংযমশক্তিবিহীন পৌরুষহীনতা কতখানি বিদ্যমান তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীমর্য্যাদা ভারতে কিছু নূতন কথা নয়। যে পর্দ্দাপ্রথা সরাইয়া আমরা একটা নবজীবনের উল্লাস বোধ করিতেছি সে পর্দ্দাপ্রথাও ভারতের প্রাচীনকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। বিদুষী, জ্ঞানবতী, বীর্য্যবতী স্ত্রীলোকও প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের পাতায়

পাতায় তাহার স্বাক্ষর আছে। কিন্তু সংযমী, পূতচরিত্র, পৌরুষ-সম্পন্ন পুরুষের পাশেই নারীর স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা শোভা পায়, বর্ত্তমান সমাজ এই সহজ সত্যটিকে উপেক্ষা করিয়া বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিতেছে।

২) যে কারণেই হোক্ ভারতীয় 'হিন্দু' পরিবারে এখনও বৈধব্যের সমস্যা জাগিয়া রহিয়াছে। পরিণত বয়সে বিবাহ হওয়ার দরুণ বালবিধবার সমস্যা এখন অবশ্য অনেকটা কম। তথাপি সহরে এবং গ্রামাঞ্চলে বহুগৃহস্থেই বৈধব্যব্রতধারিণীদের সাক্ষাৎ মিলিবে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে ইঁহারা কতকটা সম্মানের ও নিরাপত্তার পদবীতে প্রতিষ্ঠিতা। কিন্তু সমাজে যখন সংযমের বাঁধ ভগ্ন এবং অসংযত পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে যখন তাঁহাদের জীবন কাটে তখন ভারতীয় বৈধব্যের সাধনা ও আদর্শ বজায় রাখা একটি দুরূহ সমস্যা।

বৈধব্যের সমস্যা আজ নূতন নয় এবং ইহার পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক ও সামাজিক আন্দোলনও হইয়াছে। আমরা সে প্রশ্নের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। তাহার কারণ, চিরবৈধব্য বা বিধবার পুনর্ব্বিবাহ যাহাই হউক না কেন, আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা, এবং বিবাহিতা, অবিবাহিতা বা পুনর্ব্বিবাহিতা, সর্ব্বক্ষেত্রেই ইহার গুরুত্ব সমান। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ যে ক্ষেত্রবিশেষে অনুমোদিত তাহার প্রমাণ নারদসংহিতা, পরাশর সংহিতা ইত্যাদিতে রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহা সত্য যে

যৌনজীবনের সংযমপবিত্রতা ও বিবাহিত জীবনে আত্মিক মিলন-সাধনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এরূপ একটি প্রথা ভারতীয় সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় বিধবার জীবনসাধনাকে আজীবন ব্রহ্মচারীর জীবনসাধনার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যথা :—

'অনেকানি সহস্রাণি কুমার-ব্রহ্মচারিণাম্ ।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্ ॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা ।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥'

— (মনু, ৫।১৫৯-৬০)

অর্থাৎ—'বহু সহস্র চিরকুমার ব্রহ্মচারী বিপ্র বংশরক্ষার জন্য সন্তানসৃষ্টি না করিয়াই দিব্যলোক (স্বর্গ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেইরূপ স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী অপুত্রা হইয়াও ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া ঐ ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।' বলা বাহুল্য বৈধব্যের সাধনার ইহা অপেক্ষা উচ্চতর প্রশংসা হইতে পারে না।

কিন্তু তথাপি ইহা একটি রূঢ় সত্য যে সমগ্র সমাজে এই আদর্শের ব্যাপক প্রসারের পিছনে নানা সমস্যাও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্ত্তনের পর হইতে অনেক শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় সংস্কারবাদী সমাজের অনেকে কার্য্যতঃ বিধবাবিবাহ দিয়াছেন বা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদেরও

মধ্যে সকলেই যে ইহাতে সমান উৎসাহবোধ করিয়াছেন তাহা নহে, কারণ, যেমন তাঁহাদের মধ্যে তেমনি পাশ্চাত্য দেশেও, বহু মহিলা স্বামীর স্মৃতি ও জীবনধারা লইয়া চলিতেই অধিকতর তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন। হয়ত ইহার মধ্যে নারীস্বভাবের একটি উচ্চতর প্রবণতাই পরিস্ফুট হইয়াছে। অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ইত্যাদি প্রসিদ্ধ লেখকগণের উপন্যাসে বিধবার জীবনের মানবিক দিক্‌টি সহানুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বহুগৃহে বিধবাগণ লাঞ্ছিতা ও সমাজে অনেকক্ষেত্রে 'অমঙ্গল চিহ্ন' রূপে পরিগণিতা ইহাও নিষ্ঠুর সত্য। আবার মানুষের যেমন ভালমন্দ আছে, বিধবারও তেমনি ভালমন্দ আছে। বিধবার সংযম-ব্রহ্মচর্য্য যে সামাজিক বিধানেই সাধিত হইয়া যাইবে তাহাও সম্ভব নয়। তরুণী বিধবাদের চরিত্ররক্ষা একটি কঠিন সমস্যা। কিন্তু তরুণী সধবাদের ক্ষেত্রেও এ সমস্যা কম নয়, বিধবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইহা অন্ততঃ সাময়িকভাবে প্রকট হইয়া উঠে এই মাত্র। কিন্তু সর্ব্বোপরি মনে রাখা দরকার, ভারতীয় আদর্শে কি সধবা কি বিধবা সকলেরই ক্ষেত্রে যৌন-জীবনের সংযমসাধনা একটি বিরাট মানবীয় আদর্শ। এবং সকল মানবীয় আদর্শের সাধনাই পাপের বা অমনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রামের মত। এই সংগ্রামে জয়-পরাজয়, বাঁচা-মরা সুনিশ্চিত; কিন্তু উচ্চ আদর্শের মহিমা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। 'Though the best institutions may easily become the most mischievous when they are perverted and mismanaged, that does not affect their intrinsic

value'—(Encyclopoedia of Religion and Ethics —Vol V, Pg. 727), অর্থাৎ—'যদিও শ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রথাগুলি বিকৃত হইলে এবং সুপরিচালিত না হইলে সহজেই খুব ক্ষতিকর হইয়া পড়িতে পারে, তথাপি তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক মূল্য কমিয়া যায় না।' বৈধব্য নানা সমস্যাসমাকুল হইলেও এবং বিধবাদের সীমায়িত পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত হইলেও বিধবার সংযত জীবনের উচ্চ আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতিতে অম্লান হইয়া থাকিবে। সুতরাং 'ভারতীয়সমাজ সংগঠন আন্দোলন'-এর মধ্যে বৈধব্যের আদর্শরক্ষার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে। আধুনিক যুগে অনেক বিধবা লেখাপড়া শিখিয়া শিক্ষিতা কুমারীদের মতই সসম্মানে জীবন যাপন করিতেছেন এবং পরিবারের অনেকের সহায়তাও করিতেছেন। মধ্যবিত্ত এবং অল্পবিত্ত সমাজেও ইঁহাদের যাহাতে গলগ্রহ হইয়া চলিতে না হয় অথবা চতুর আত্মীয়স্বজন কিছু দয়া দেখাইয়া ইঁহাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া শোষণ করিতে না পারে তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ নেতৃত্বের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতীয় রাষ্ট্রেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব থাকা উচিত। কিন্তু সব কিছুর উপরে বড় প্রশ্ন হইল, এই পবিত্র প্রথাটিকে বাঁচাইয়া রাখিলে মাত্র হইবে না। ইহার মধ্যে নবজীবনের প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল পরিবেশ—সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সাধনার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা অবশ্য প্রয়োজন। দেশে শিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণীগণের আশ্রম-মঠজাতীয় প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাওয়া দরকার এবং সন্ন্যাসিনী কর্মীগণের অন্যতম দায়িত্ব

হওয়া উচিত সহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিধবাগণের মধ্যে আদর্শ শিক্ষা-সাধনার ব্যবস্থা করা। ভারতে 'হিন্দু' বিধবার সংখ্যা অনেক। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কার্য্যক্ষম ও বিশেষে সন্তানহীনা তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা পাইলে ও সংগঠিত হইলে পাশ্চাত্য 'nuns and sisters'দের মত এক বিরাট আদর্শ সমাজ-সেবিকা দলে পরিণত হইতে পারেন এবং ভারতে আদর্শ সমাজ ও জাতি-গঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সম্মান ও গৌরব অর্জ্জন করিতে পারেন। বর্ত্তমানে ইঁহাদের অতি সামান্য ভগ্নাংশকে নার্স অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণ-প্রচারিকা ইত্যাদি রূপে কাজে লাগাইবার যে চেষ্টা তাহা এ আদর্শ হইতে বহু দূরে।

৩) বিধবা-সমস্যার মতই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইতেছে অবিবাহিতা কুমারীজীবনের সমস্যা। এখানেও বালিকাকাল হইতে যৌনসংযম ও পবিত্রতার শিক্ষাসাধনা প্রবর্ত্তিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কুমারীদের বিবাহের সমস্যা আজকাল তত চিন্তার কথা নয়, কারণ বয়স্কা কুমারীদের বিবাহ এখন প্রচলিত। তাড়াহুড়া করিয়া যে-সে পাত্রে কন্যাদান সব সময় ভারতীয় ধর্ম্ম-সম্মতও ছিল না। শাস্ত্রীয় উক্তিই তাহার প্রমাণ—

'কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥'

—(মনু ৯।৮৯)

অর্থাৎ—'ঋতুমতী হইয়াও কন্যা আমরণ গৃহে বাস করা ভাল, তথাপি কখনও তাহাকে গুণহীন ব্যক্তির হাতে সমর্পন করা ঠিক্

নয়।' যথাসময়ে বিবাহ সম্ভব হইয়া না উঠিলে কন্যা উপযুক্ত সদৃশ পতি নিজেই বরণ করিতে পারেন, শাস্ত্রে এ ব্যবস্থাও আছে—'বিন্দেত সদৃশং পতিম্' (ঐ ৯।৯০), ইহাতে কোনও পাপও হয় না—'নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি' (৯।৯১)। সুতরাং এযুগে পরিবর্ত্তিত সামাজিক পরিবেশে কুমারীগণের দীর্ঘ-কাল অবিবাহিত থাকা এবং সুবিধামত নিজেই পতিবরণ করা শাস্ত্রীয় ভাবেই সমর্থন করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ভারতীয় শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে, যাহাতে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ (আজকালকার Love Marriage) পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইহাকে স্বাভাবিক বিবাহের পর্য্যায়ে ফেলিলেও কামোৎপন্ন ও যৌনমিলনেচ্ছাসম্ভূত ('মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ') বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চারি প্রকার আদর্শবিহীন বিবাহের মধ্যে ইহা একটি, কারণ—

'ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥'

—(৩।৪১)

অর্থাৎ—'অবশিষ্ট চারি প্রকার (আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ) বিবাহে নৃশংসপ্রকৃতি, মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মধর্ম্ম-বিদ্বেষী পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করে।' মনে রাখিতে হইবে বর্ত্তমানে সমাজে যে কন্যা-সম্প্রদানের বিবাহ প্রচলিত তাহা দেখিতে অনেকটা 'ব্রাহ্ম' বিবাহের মত মনে হইলেও তাহা অর্থঘটিত বিবাহ, সেজন্য তাহা মূলতঃ উল্লিখিত 'আসুর' শ্রেণীতেই পড়ে। দেশে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং পৃথিবীতে এই সব আদর্শবিহীন বিবাহের

প্রাচুর্য্যের ফলেই উক্তপ্রকার ক্রূরস্বভাব, মিথ্যাচারী, মনুষ্যত্বের আদর্শবিরোধী মনুষসকল ব্যাপকভাবে জন্ম গ্রহণ করিতেছে কিনা, তাহা আধুনিক দেশহিতৈষী বা বিশ্বহিতৈষী সমাজবিজ্ঞানী-দের বিবেচ্য।

অনিন্দিত চারিপ্রকার (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য) বিবাহের লক্ষণই হইল সেগুলি সমাজের কল্যাণজনক যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত যুক্ত, বর সেখানে 'শ্রুতশীলবান্' অর্থাৎ সংযমাদিসমন্বিত, চরিত্রবান্ ও বেদজ্ঞানসম্পন্ন ইত্যাদি। স্বেচ্ছা-চারিতার সেখানে স্থান নাই, অহঙ্কার-কাপট্য-দম্ভ বহুদূরের কথা। অবশ্য এরূপ অনিন্দিত শ্রেষ্ঠ বিবাহই যে পূর্ব্বকালে সব সময় সব ক্ষেত্রে হইত তাহা নয়, কিন্তু ইহাই ছিল সমাজের শ্রেষ্ঠ Moral Standard বা নৈতিক মানদণ্ড।

নারীজাতির শিক্ষাসাধনা ও সম্মান ছিল সেযুগে খুব উপরে। কতগুলি নারী-ঋষি ও ব্রহ্মবাদিনী প্রাচীন ভারতের সমাজ ও জাতীয় জীবনকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নারীপ্রগতি আজ পাশ্চাত্যের নিকট শিখিতে হইতেছে, তাহার কারণ আমাদের জাতীয় আদর্শের সমাজ ও রাষ্ট্র আজ সহস্রাধিক বৎসর ভগ্নদশায় পড়িয়া আছে। 'কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়া প্রযত্নতঃ', অর্থাৎ— 'কন্যাকেও যত্নসহকারে পালন ও শিক্ষাদান করিতে হইবে' ইহা প্রাচীন ভারতের কথা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।৪।১৭) 'পণ্ডিতা কন্যা' লাভ করিবার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়াও বিহিত

হইয়াছে। দেশে ও সমাজে পণ্ডিতা কন্যাদের গৌরব না থাকিলে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইত না। বৈদিক ও তৎ-পরবর্ত্তী যুগে কুমারীগণও ব্রহ্মচর্যাব্রত লইয়া শাস্ত্রচর্চ্চার মধ্য দিয়া ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। এব এইভাবে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্রহ্মবাদী বর লাভ করিতেন। রামায়ণে সীতা ও কৌশল্যার চরিত্র এবং মহাভারতে দ্রৌপদী এবং কুন্তীর চরিত্র যে কোনও আধুনিক যুগের সুশিক্ষিতা, জ্ঞানবতী. ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলাকে হার মানাইবে। ইঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান, সপ্রতিভতা, বাস্তববুদ্ধি ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্মবোধ যে কোনও দেশের যে কোনও কালের সভ্যসমাজের গৌরব। ভারতীয় মহিলার উচ্চ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব ছিল না। রামায়ণেই শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালে স্বয়ং মহর্ষি বশিষ্ঠ সীতা-দেবীকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৭।২৪)। মহাভারতে দ্রৌপদীর রাজনীতি ও অন্যান্য নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান বিস্ময়কর। কিন্তু সর্ব্বোপরি বিস্ময়কর সে যুগের নারীগণের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের রহস্য কি ?—সমগ্র জীবনব্যাপী তীব্র সংযমবোধ এবং যৌন পবিত্র-তার মধ্য দিয়া একনিষ্ঠ সত্যজীবনের সাধনা। রামায়ণে তেজস্বিনী সীতা বনবাসেও মনেপ্রাণে শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামিনী। ইহা কোনও ভাবপ্রবণ স্বামীপ্রীতির কথা নয়, ইহা সংযতজীবনের নিষ্ঠার কথা। ইহাই ভারতীয় জাতীয়জীবনে নারীর আদর্শ। দাম্পত্যপ্রেমে এই ত্যাগের পরাকাষ্ঠার মূলে ছিল এক অদম্য

অটুট সংযমের শক্তি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে সীতাদেবী বলিতেছেন—

'বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিয়াছি পুরুষ ছাওয়ালে।'

বাল্মিকীর রামায়ণে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

'ন ত্বহং মনসা ত্বন্যং দ্রষ্টাস্মি ত্বদৃতেঽনঘ।
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী॥'
—(অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০।৭)

অর্থাৎ—'হে পাপবর্জিত, আমি কুলপাংসনী নারীর মত এমন কি মনে মনেও তোমা-ছাড়া অন্য পুরুষকে দর্শন করি না, সুতরাং আমি তোমার সহিতই যাইব।' সীতাদেবী বিবাহপূর্ব্বে যে কৌমার্য্যব্রতধারিণী ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সংযম-ব্রহ্মচর্য্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহারও কথা তিনি বলিয়াছেন—

'স্বয়ন্তু ভার্য্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।'

মানসিক পবিত্রতা ও নিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য দৈহিক পবিত্রতারও সাধনা প্রয়োজন। ভারতীয় নারী-আদর্শের এই দৈহিক পবিত্রতারক্ষার সংস্কার পাশ্চাত্য নারীর প্রশংসাকারী স্বামী বিবেকানন্দেরও বিশেষ প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করিয়াছে। সতী হওয়ার অর্থ শুধু একটি স্বামীকে লইয়া সহজ 'স্বামী-সেবা' করা ও খাওয়া-পরা-আমোদ-আহ্লাদের স্বার্থপর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র জীবনযাপন করা নয়। 'স্ত্রীপুরুষের ভগবৎ-লক্ষ্য হইলে তাঁহারা সতী ও সৎ। যথার্থ সতী অতি দুর্লভ। সতী হইলে তবে

পতিব্রতা'—(শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১)। আজকাল সতীত্বের ঠাট্‌ মাত্র আছে, সেজন্য সতীত্বে এযুগে নরনারীর বিশেষ আস্থাও নাই। ভারতীয় সতীত্বের আদর্শ কিন্তু নারীচরিত্রের সংযমব্রহ্মচর্য্যমূলক ব্যক্তিত্বের তেজ ও প্রেমের নিষ্ঠা। ইহাই শাশ্বত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় আদর্শ। অবশ্য এই সতীত্বের আদর্শের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সংযম-ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সৎ-পুরুষের আদর্শ। সৎ-লোক বলিতে এখন বুঝায় 'ভালমানুষ', কিন্তু রামায়ণেই মহাসতী সীতাদেবীর পার্শ্বে আমরা যে সৎ-পুরুষকে দেখিতে পাই তিনি মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র যাহার সম্বন্ধে রামায়ণে বহুবার জিতেন্দ্রিয় ও অনঘ (পাপশূন্য) কথা দুইটি প্রযুক্ত হইয়াছে। পৌরাণিক সাবিত্রীর পাশে সত্যবানের আদর্শও স্মরণীয়। 'সাবিত্রী' ও 'সত্যবান্'—নাম দুইটিও গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ।

কুমারী জীবনেই এই নারীত্বের মহান্ আদর্শ অধিগত হওয়া দরকার। কিন্তু প্রায় কোনও পরিবারেই আজ সে শিক্ষালাভ সহজ নয়। নারীশিক্ষার বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে ত নয়ই। হাজার হাজার কুমারী আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ করিতেছে। কিন্তু নারীচরিত্রের কোনও শিক্ষাই সেখানে দেওয়া হয় না, সম্ভবও নয়। এখনকার বিপুল স্ত্রীশিক্ষা হয় চাকরীর জন্য, না হয় বিবাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষার জন্য। যেমন পুরুষদের ক্ষেত্রে তেমনি নারীদের ক্ষেত্রেও আদর্শ শিক্ষার কোনও বালাই নাই, আদর্শ জাতিগঠনের শিক্ষা ত ঢের দূরের কথা। সুতরাং সমাজের বিবেকসম্পন্ন, সদিচ্ছাপরায়ণ অংশকেই আজ সঙ্ঘবদ্ধ-

ভাবে নারীচরিত্রের এই জাতীয় আদর্শকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার ও প্রচার-প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যদেশে আজ নারীত্বের ও কুমারীত্বের আদর্শ অত্যন্ত নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে। এই দ্রুত অবনতির কারণ পারিবারিক জীবনের বিপর্যয় এবং সাধারণভাবে ধর্ম্মনীতিতে অবিশ্বাস ও রাজনীতি-অর্থনীতির উন্মাদনা। পুরুষের সহিত সমান অধিকারই যেন এক পরমকাম্য। কি উদ্দেশ্যে সমান অধিকার তাহার প্রশ্ন যেন অবান্তর। পুরুষ ও নারী উভয়েই যে আজ আদর্শবিচ্যুত এই সহজ সত্যটি এই সব প্রগতির আন্দোলনের তলায় চাপা পড়িয়া থাকিতেছে। ফলে চতুর্দ্দিকেই দুর্গতির চিত্র। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন—'Modern feminists are no longer so anxious as the feminists of thirty years ago to curtail the vices of men; they ask rather that what is permitted to men shall be permitted also to them. Their predecessors sought equality in moral slavery, whereas they seek equality in moral freedom.', অর্থাৎ—'আধুনিক স্ত্রীস্বাধীনতাবাদিনীগণ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের আন্দোলনকারিণীদের মত পুরুষের পাপাচার নিবারণ করিবার জন্য তেমন আগ্রহান্বিতা নহেন। তাঁহারা বরং ইহাই চাহেন যে পুরুষদের যে (পাপাচরণের) স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাঁহাদেরও তাহা দেওয়া হউক। ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিনীগণ চাহিতেন সমান নৈতিক বাঁধনকষণ, আর ইঁহারা চাহেন সমান নৈতিক স্বাধীনতা

(স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার) । Marriage and Morals গ্রন্থের আর একটি চমকপ্রদ উক্তি এইরূপ—'Very many girls of respectable families have ceased to think it worth while to preserve their 'virtue', and young men, instead of finding an outlet with prostitutes, have had affairs with girls of the kind whom, if they were richer, they would wish to marry.'—(Pg 124), অর্থাৎ—'সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহু বহু তরুণী তাহাদের 'ধর্ম্ম' (কুমারীত্ব) রক্ষা করা আর প্রয়োজন মনে করে না, এবং যুবকেরা বেশ্যাসংসর্গের পরিবর্ত্তে এমন মেয়েদের সঙ্গে প্রণয়ব্যাপারে লিপ্ত হয় যাহাদের তাহারা ধন থাকিলে বিবাহ করিতে চাহিত।' শ্রীরাসেল যে উদ্দেশ্যেই এই উক্তি করুন ইহা হইতে বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজে কুমারীদের মধ্যে যৌন অসংযমের প্রবল স্রোত যেভাবে বহিতে সুরু করিয়াছে তাহার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এই স্রোত ভারতীয় সমাজে দ্রুত ভাঙ্গন ধরাইবে ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। একমাত্র প্রতিকার, সমাজের সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা। ভারতে আদর্শ সমাজ ও নূতন জাতিগঠনের জন্য ইহার অনিবার্য্য প্রয়োজন।

স্ত্রীস্বাধীনতার নামে স্ত্রীপ্রাধান্যের যুগের কথা এবং তাহার অস্বাভাবিকতার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও স্বাধীনতাই ক্ষতিকর নহে যদি তাহা সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু অসংযমের স্রোতে যখন উভয়েই

স্বেচ্ছায় ভাসিতে সুরু করে, তখন পুরুষ তাহার পৌরুষ এবং নারী তাহার নারীত্ব হারায়। ফলে পরস্পর পরস্পরের জীবনে অতৃপ্তির বোঝাই বাড়াইয়া দেয়। এইরূপ নিষ্প্রেম, অস্বাভাবিক জীবনে স্বভাবতঃই নারীশক্তি পুরুষশক্তির উপর গৃহে, পরিবারে, সমাজে সর্ব্বত্র প্রাধান্য বিস্তার করিয়া একটা অনৈসর্গিক প্রভুত্বপিপাসার চরিতার্থতা লাভ করে। এক প্রকার উৎকট তৃপ্তি ইহাতে অবশ্যই আছে, কিন্তু ইহাতে নারী বা পুরুষ কাহারও অন্তরের স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি নাই। অথচ পশ্চিমের দেখাদেখি আমরা উন্মাদের মত এই পরিস্থিতিকেও সাগ্রহে বরণ করিয়া দেশের প্রগতির সূচনা করিতেছি ভাবিতেছি। খাস্ আমেরিকায় এই স্ত্রীপ্রাধান্য কি যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে—'Dr. Joshua Bierer, Editor-in-Chief of the International Journal of Social Psychiatry and Director of a London Hospital, said in an interview that prosperity and women are the root of most Americans' troubles. 'American women are ruling the American Society.......But when men become goody-goodies—like Americans so often do—the women have nothing to look up to. She then becomes unhappy and makes the man unhappy.' As he views it 'the whole American Society is in danger.'—(A. B. Patrika, Tuesday,

19th April, 1966), অর্থাৎ—'সামাজিক মনোবিকার-চিকিৎসা বিষয়ে আন্তর্জাতিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও একটি লণ্ডন হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ Joshua Bierer এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঐশ্বর্য্য এবং নারীই আমেরিকার অধিকাংশ অশান্তির মূল। আমেরিকান নারীরাই আমেরিকান সমাজকে শাসন করিতেছে। ....কিন্তু পুরুষেরা যখন পৌরুষহীন হয়, যেমন আমেরিকায় প্রায়ই ঘটে, তখন নারীর আর কোন আশাভরসার স্থান থাকে না। সে তখন অসুখী হইয়া পড়ে এবং পুরুষকেও অসুখী করে।' তিনি মনে করেন 'সমগ্র আমেরিকান সমাজ আজ বিপন্ন।'

কুমারী মেয়েরা এখন দলে দলে স্কুল-কলেজে পড়িতেছে। ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ভারতে দুই-তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। নচেৎ পাণিনির ব্যাকরণেও 'ছাত্রীশালা' বা Girls' Hostel এর উল্লেখ থাকিত না (Agarwala)। বহু প্রতিষ্ঠা-নেই সহশিক্ষা চলিতেছে। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াও অবশ্য ভারতে একেবারে নূতন কথা নয়। প্রাচীন ভারতে ইহারও প্রচলন ছিল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কখনও কখনও কিছু গোলযোগও হয়ত যে না ঘটিত তাহা নহে। নিন্দনীয় ছাত্রদের মধ্যে একশ্রেণীকে বলা হইত 'কুমারীদাক্ষাঃ', অর্থাৎ যাহারা সহপাঠিনী ছাত্রীদের সহিত মিশিবার সুযোগের আশায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হইত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই সব হাল্‌কা ভাব ও নৈতিক আদর্শ হইতে চ্যুতি ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। সংযমপবিত্রতার তপস্যা লইয়া বিদ্যানুশীলনই ছিল নিয়ম!

শিক্ষিতা স্কুল-কলেজে পড়া কুমারীদের লইয়া নানা হাল্‌কা সমালোচনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত এবং সাহিত্যেও প্রতিফলিত। কি ছেলেদের সহিত, কি মেয়েদের সহিত শিক্ষাদানসূত্রে যাঁহারা মিশিয়াছেন তাঁহারাই জানেন এটি কেমন একটি কল্পনার বাড়াবাড়ি। আসলে ছাত্র ছাত্রী সমানভাবে আজ অসহায়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপ্রদ আদর্শ তাহাদের কাছে তুলিয়া ধরিবার লোকের একান্ত অভাব। সুতরাং রুচি-বিকৃতি ও বুদ্ধিবিকৃতি খুবই স্বাভাবিক।

বিধবাদের লইয়া যেমন বিরাট্ সমাজসেবিকাদল গঠনের কথা আমরা বলিয়াছি, কুমারীদের লইয়াও সেইরূপ বাহিনীগঠন একটি আদর্শ পরিকল্পনা। এখন আমরা মেয়েদের N. C. C.-দল স্কুল-কলেজে গড়িতে সুরু করিয়াছি, ইহা নিশ্চয় অগ্রগতির এক ধাপ। কিন্তু অতঃপর আমাদের এক কার্য্যকরী পন্থায় ভারতীয় আদর্শে কুমারী-সেবিকাদল গঠন করিতে হইবে যাহারা নিজেদের জীবনগঠনের সহিত ভারতীয় সমাজসংগঠন ও সমাজ-সেবার ব্রত লইবে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের অস্ত্রশিক্ষা বা সামরিক শিক্ষা অজ্ঞাত ছিল না। পতঞ্জলি 'শাক্তিকী' বা বর্শাধারিণী নারীদের উল্লেখ করিয়াছেন। অস্ত্রসজ্জিতা নারী-বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলেও শিকারাদিতে রাজার অনুগামিনী হইতে শোনা যায়। 'অর্থশাস্ত্রে' রাজার সশস্ত্র দেহরক্ষিণীদের কথাও আছে—(R. C. Mazumdar, History and Culture of the Indian People, B. V. B., Vol II)। তাহা ছাড়া বীরপুত্রের জননী বীররমণীগণের কাহিনী রামায়ণ-

মহাভারতাদিতে যথেষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং এই প্রাচীন ঐতিহ্য লইয়া যুগোপযোগী পরিবেশে নারীদের কিছু 'সামরিক' শিক্ষাদান অশোভন বা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তবুও একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল পারিবারিক জীবনে ভারতীয় আদর্শে জননী, ভার্য্যা, ভগিনী ও কন্যার দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করাই কুমারীদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। পুত্র, পতি, ভ্রাতা ও পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নারীশক্তি জাতীয় জীবনের ও আন্তর্জাতীয় জীবনের রাজনীতি-অর্থনীতি-শিক্ষানীতি-সমাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক কিছু কল্যাণজনক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

Divorce বা বিবাহ-বিচ্ছেদ আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই স্বীকৃত ও প্রচলিত। ভারতেও ইহার দ্রুত প্রচলন ঘটিতেছে। ইহার পরিণতি যে কোথায় তাহা কেহই বলিতে পারে না। প্রাচীন ভারতীয় সমাজধর্ম্মে কতকগুলি কারণে স্ত্রীপরিত্যাগ এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে স্বামীপরিত্যাগ যে অপ্রচলিত ছিল তাহা নহে। নারদসংহিতা, পরাশরসংহিতা ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। এই সমাজব্যবস্থার জের আমরা প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বের শ্রীচৈতন্যযুগের একটি উক্তির মধ্যেও দেখিতে পাই। বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া জামাতার অন্যায় ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া বলিতেছেন—

'ষাঠীকে কহ ছাড়ুক সেহ হইল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা তাজিতে উচিত॥'

—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৫।৯৬)

কিন্তু সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিবার বিষয় কোনও স্বার্থপর কামনা-বাসনার তাড়নায় পতিপত্নীত্যাগ ভারতীয় সমাজধর্ম্ম কোনও দিন সমর্থন করে নাই। এজন্য একদিকে দেখি দুর্দ্দশাপন্ন স্বামীর প্রতিও প্রেমের নিষ্ঠার কথা (মনুসংহিতা, ৫।১৫৪), অপরদিকে দেখি অকারণ পত্নীত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে রাজদণ্ড-প্রয়োগের বিধান (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১।৭৬)। ইহা ছাড়া 'অধিবিন্না', অর্থাৎ পূর্ব্বপরিণীতা অথচ পরিত্যক্তা স্ত্রীকে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পরও পূর্ব্ববৎ দান, মান, ভরণ-পোষণ করিবার বিধান ভারতীয় ধর্ম্মব্যবস্থায় এক অপূর্ব্ব মানবিকতার নিদর্শন, (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১।৭৪ দ্রষ্টব্য)। সে যাহা হউক, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথম, পাশ্চাত্যজগতে বিবাহবিচ্ছেদের ভয়াবহ পরিণতি, যাহার ফলে বিবাহ সেখানে ছেলেখেলায় পরিণত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়, বিবাহিত জীবনের আধ্যাত্মিক প্রেম-মিলনের আদর্শ, যাহা বাদ দিলে ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির মূল ছেদন করা হয়। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্তকণ্ঠের বাণী আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাইবে—'হে ভারত, ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে'—
—(স্বদেশমন্ত্র, স্বামী বিবেকানন্দ)।

খ্রীষ্টীয় সমাজে ও ধর্ম্মে স্বামীস্ত্রীর মিলনকে ঈশ্বরবিহিত বলিয়া বিশ্বাস করা হইত এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বিবাহবিচ্ছেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন—ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি দাম্পত্য জীবনের এই নিষ্ঠা বজায় রাখিবার মত

সামাজিক শিক্ষাসাধনা পাশ্চাত্য জগতে নাই। সেজন্য খ্রীষ্টীয় দেশগুলিতেই আজ এত বিবাহবিচ্ছেদের ছড়াছড়ি। ভারতের সমাজধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইলে ভারতে ও বহির্বিশ্বে এ আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

কিন্তু একথা অতি সত্য যে বিবাহিত জীবনের এবং নরনারীর প্রেমমিলিত জীবনের এই সুমহান্ দায়িত্ব ও উচ্চ আদর্শ ব্যষ্টিজীবনে কোনও জীবন্ত সাড়া জাগাইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত ভগ্নজীর্ণ ভারতের জাতীয়জীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয়-জীবন একই আধ্যাত্মিক আদর্শের সুরে নূতন করিয়া বাঁধা না হয়। কারণ সমাজধর্ম্ম রাষ্ট্রধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

নরনারীর প্রেমসম্পর্ক এবং দাম্পত্যজীবনের সূত্রে আমরা 'প্রাচীন' ভারতের কথা অনেকবার বলিলাম। কিন্তু এই 'প্রাচীন' ভারত আধুনিক মানদণ্ডেই কত সুসভ্য, মার্জ্জিতরুচি, শিল্প-কলায় সমৃদ্ধ, বিত্তবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকদের বিবরণ হইতে এবং প্রাচীন গ্রীক-চৈনিকাদি পর্য্যটকদের লিপি হইতেও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সুতরাং নরনারীর জীবনে প্রেমপ্রণয়, লীলাবিলাস, চারুকলা, ও ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনও স্থান ছিল না একথা সত্য নয়। প্রাচীন ও 'গুপ্ত' যুগের সাহিত্য ও শিল্পকলাই তাহার প্রমাণ।

রাষ্ট্র (State):—

সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের দ্বিতীয় এক রূপ State বা রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের Government বা শাসব্যবস্থা। বর্ত্তমান যুগে

অল্পবিস্তর সমাজতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্রবাদ সকল রাষ্ট্রেই স্বীকৃত, ভারতেও তাহাই।

এই রাজনৈতিক কাঠামোর বিষয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ে 'রাজনীতি ও অর্থনীতি'র প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানে বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় জীবনে জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনের কি সার্থকতা থাকিতে পারে তাহারই আমরা আলোচনা করিব।

এ যুগ 'Party System' বা দলীয় রাজনীতির যুগ। জাতির জীবনে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খাকে প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন দলের উৎপত্তি। এই সব দলের মধ্যে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহাই সরকার গঠন ও পরিচালনা করে। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আশা-আকাঙ্খাই জাতীয় সরকারের রূপ গ্রহণ করে। সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য থাকে বিশেষ সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। বিরোধী দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের, অর্থাৎ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা বা একদেশদর্শিতার সংশোধনে বা প্রতিরোধে সহায়তা করে। দেশের সংবিধান সাধারণ ভাবে রাষ্ট্রের মূলকে দৃঢ় করিয়া রাখে। নীতির দিক্ দিয়া এই সব ব্যবস্থায় ত্রুটীর কিছুই নাই। ইহাই গণতন্ত্র। দেশের সম্পদ্‌কে জনসাধারণের কল্যাণে লাগাইবার ইচ্ছা ও ব্যবস্থাই মোটামুটি সমাজতন্ত্র। নীতির দিক্ দিয়া ইহাও ত্রুটিমুক্ত।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতে পাই? সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জনসমাজের অস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুট চাহিদাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতার দলাদলি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ

সরকারী দলেরও নিজ ক্ষমতা বজায় রাখিবার আপ্রাণ চেষ্টা বা অপচেষ্টা। ফলে জনসাধারণের চাহিদা বা আশা-আকাঙ্খার অজুহাতে প্রত্যেক দল এবং দলীয় সভ্য-সমর্থকগণ একপ্রক'র প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করেন যাহাকে আমরা বলিয়াছি 'লোককাম' বা প্রভুত্ব-পিপাসা। আধুনিক মনস্তত্বেও যে সব আদিম প্রবৃত্তি মানুষের মনকে আন্দোলিত করে তাহার মধ্যে 'Instinct of Possession' ও 'Instinct of Pugnacity' অর্থাৎ, অপরকে আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি, এবং অপরের সঙ্গে লড়াই করিবার প্রবৃত্তি দুইটি মুখ্য বৃত্তি। এই দুই প্রবৃত্তি 'Love of Power' বা ক্ষমতাপ্রিয়তার রূপে দেখা দেয়। এবং মূলতঃ ইহা 'Sex Instinct' বা যৌনকাম এবং 'Self-regarding Instinct' বা অহম্মন্যতাবৃত্তির সহিত সংযুক্ত। অতি-আধুনিক মনস্তত্ব-অনুযায়ী আবার এসকলের পিছনে ক্রিয়া করে 'Inferiority Complex' বা হীনম্মন্যতা বৃত্তি এবং তাহাও আবার চরিতার্থতা লাভ করে 'Sadism' বা পরপীড়ন-বৃত্তি রূপে। একথাও অবশ্য সত্য যে এই সব আদিম বৃত্তি বা ভাব লইয়াই নানা মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া মানুষের নানা 'স্বাভাবিক' ইচ্ছা, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি বিবর্ত্তিত হয় এবং ইহারাই নানাভাবে 'সভ্য' মানবের রাষ্ট্র-সমাজ-সাহিত্য-শিল্প-কলার জীবন গড়িয়া তোলে।

কিন্তু তবুও মূলে একটি বিরাট্ প্রশ্ন থাকিয়া যায়। তাহা এই যে এই সমস্ত প্রবৃত্তি, ভাব ও আবেগ 'সংস্কৃত' বা পরি-শোধিত না হইলে যে 'সভ্য' মানুষ বা 'সভ্য' সমাজের আবির্ভাব

ঘটে তাহাতে প্রচ্ছন্ন বর্ব্বরতা ও হিংস্র পাশবিকতাই ক্রিয়া করিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই 'ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা' বলিয়া পঙ্কশয্যাশায়ী অতিকায় জীবের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহাই আধুনিক সভ্যতার ব্যর্থতার মূলে লুকায়িত রহিয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর সাহিত্যে ও দর্শনে এই ব্যর্থতার নৈরাশ্যই প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাই এযুগের মানুষের 'Cynicism' বা মনুষ্যদ্বেষিতার জনক।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই সব আদিম প্রবৃত্তির ক্রিয়া কত প্রবল তাহা এযুগের রাজনীতির ধারা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। Diplomacy বা কূটনৈতিক চাতুরীই এযুগে রাষ্ট্র-নীতির মূলমন্ত্র। ইহাকে Policy নামেও অভিহিত করা হয় এবং এই রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা আজ গণজীবনে এত সহজে প্রভাব বিস্তার করে যে সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনেও আজ ক্ষণে ক্ষণে 'পলিসি'র কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আদর্শ মানবধর্মী রাজনীতিতে কি এসব কিছুই থাকিবে না, অথবা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রে কি ইহার কিছুই ছিল না? উত্তর—অবশ্যই থাকিবে এবং অবশ্যই ছিল। কিন্তু একটা বিরাট ও মৌলিক পার্থক্য সেখানে নজরে পড়ে।

আমরা 'সমাজ-সংস্কৃতি' অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি কেমন করিয়া ত্যাগী ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ক্ষত্রিয় ও ব্যবসায়ী বৈশ্য—সমাজের ও রাষ্ট্রের এই বিরাট তিন শ্রেণীকেই নিজ নিজ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে মানবধর্মী সমাজসেবক ও রাষ্ট্রসেবকে পরিণত হইতে

হইত। চাতুর্ব্বর্ণ্যের চতুর্থ বর্ণ শূদ্র সম্বন্ধেও ঐ একই ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যায় যে শূদ্রও সচ্চরিত্র হইলে সমাজে প্রশংসনীয়, এবং ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-সন্ন্যাসাদি সংস্কার ও যজ্ঞাদিতে অধিকারী হইতেন এরূপ বিধানও সংহিতা-মহাভারতাদি গ্রন্থে রহিয়াছে (মনু, ১০।১২৭, ১২৮, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৬০; ৬৩।১২, ১৩; ১৮৮)। 'সমাজসেবক' ও 'রাষ্ট্র-সেবক' এই দুইটি কথা আজকাল এতই প্রচলিত যে সে যুগের প্রসঙ্গে যখন এই শব্দগুলির ব্যবহার করা হয়, তখন কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বস্তুতঃ সেযুগে সমাজসেবক ও রাষ্ট্রসেবক বলিয়া কোনও কথাও প্রচলিত ছিল না; কারণ, দেশের সমগ্র জনসাধারণ এক মানবধর্ম্মের নিয়মে ও অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করিত। ইহাই ছিল সেযুগের Public Work বা লোকহিতকর কার্য্য (শান্তিপর্ব্ব, ১৯১।৮)। এই শাশ্বত মানবধর্ম্ম আজিকার কোনও Religion বা সম্প্রদায়ধর্ম্ম নয়, অথবা জ্ঞান, ভক্তি বা তন্ত্র ইত্যাদি মতবাদের কোনও বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মচর্চ্চাও নয়। ইহা ছিল দেশ-জাতি-সমাজ-রাষ্ট্র ও গৃহ-পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব-কর্ত্তব্যকে আধ্যাত্মিক মুক্তজীবন বা মহাজীবনের নিয়মে প্রতিপালন করা। সুতরাং ইহা সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, বীরত্ব, মনুষ্যত্ব, দয়া, অহিংসা, অনাসক্ত কর্ম্ম ও যাগযজ্ঞাদির মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে মহাজীবনের সহিত যুক্ত করাই ছিল এই ধর্ম্মের রূপ। সমস্ত দেশবাসীকে এই ধর্ম্মসাধনার জন্য

ধাপে ধাপে শিক্ষাদান করিয়া সমষ্টিসাধনার জন্য প্রস্তুত করা হইত। সুতরাং সেকালের রাষ্ট্রও ছিল ধর্ম্মরাষ্ট্র। যুদ্ধক্ষেত্রও ছিল ধর্ম্মক্ষেত্র। ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিপশুপালন, কায়িক শ্রম ইত্যাদি সবই ছিল ধর্ম্মসাধনা, সংক্ষেপে যাহাকে বলা হইত স্বধর্ম্ম। এবং এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়া দলে দলে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া পরমজ্ঞান বা মহামুক্তির পথে অগ্রসর হইত। এ সব কথাও আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মের বহু আলোচনা রহিয়াছে। কি রামায়ণ-মহাভারতে, কি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' আমরা যে রাজধর্ম্মের পরিচয় পাই তাহা শক্তিমান্, প্রভুত্ব-পরায়ণ, বিজিগীষু শত্রুদমনকারী, প্রজাকল্যাণব্রতী, দেশরক্ষক রাজার মধ্যে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে। সুতরাং এ যুগের পরি-ভাষায় প্রথমেই আমরা একটী প্রশ্নের সম্মুখীন হইতেছি— 'Love of Power' বা প্রভুত্বপিপাসার রাজশক্তির মধ্যে স্থান কতখানি? বলা বাহুল্য, ভারতীয় শাস্ত্রে প্রভুত্বশক্তি ক্ষাত্রধর্ম্মের বা রাজধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা পাই— ক্ষাত্রধর্ম্মের কয়েকটী গুণের মধ্যে বীরত্ব (শৌর্য্য) এবং 'ঈশ্বরভাব' বা প্রভুত্বভাবের কথা। কিন্তু এই প্রভুত্বের ভাব ও প্রভুত্বপিপাসা সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। রাষ্ট্রের শাসনদণ্ড পরিচালনার উপযুক্ত শক্তিমান্ ব্যক্তিত্বকে বলা হইয়াছে 'ঈশ্বরভাব'। কিন্তু ইহা যে ক্ষমতাপ্রিয়তা বা Love of Power নয় তাহা বহু শাস্ত্রের মর্ম্মবাণী অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। প্রথমতঃ,

সেযুগে রাজার অভিষেক-ব্যাপারে ও রাজকার্য্য-পরিচালনায় আদর্শ মানবত্তার প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। প্রজাসাধারণের ইচ্ছাও ছিল বিশেষ বলবৎ। নিম্নলিখিত উক্তি তাহার প্রমাণ:—

'দাতারং সংবিভক্তারং মার্দ্দবোপগতং শুচিম্।
অসন্ত্যক্তমনুষ্যঞ্চ তং জনাঃ কুর্ব্বতে নৃপম্॥'

—(শান্তিপর্ব্ব, ৯৩ অধ্যায়)

অর্থাৎ—'যিনি দাতা, ন্যায়সঙ্গত ধনবণ্টনকারী, ঔদ্ধত্যহীন, পবিত্রস্বভাব, এবং কোনও অবস্থাতেই প্রজাদের ত্যাগ করেন না, তাঁহাকেই লোকে রাজা মনোনীত করে।' দ্বিতীয়তঃ, দেশজাতিসমাজের জীবনে যাবতীয় কাজের মত রাষ্ট্রপরিচালনার কার্য্য বা রাজকার্য্যও ছিল একটি প্রধান ধর্ম্মকার্য্য। এই ধর্ম্মকার্য্যবাদের মূলকথা ছিল স্বধর্ম্মপালনের ভিত্তিতে প্রজা-পালন এবং এই উদ্দেশ্যে রাজদণ্ডের প্রয়োগ। এজন্য রাজার শাসন কার্য্যকেও অনেক সময় যজ্ঞের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

—(৯৮ অধ্যায়)

রাজনীতিতে চরনিয়োগ, আত্মদুর্ব্বলতা গোপন, শত্রুদুর্ব্বল-তার সন্ধান, ভেদনীতি, নির্ম্মমভাবে শত্রুদলন, ইত্যাদির প্রয়োগ বিহিত হইলেও, রাজনীতি ছিল ধর্ম্মনীতি। অন্যায়যুদ্ধ নিষেধ, এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যকে ধরিয়া চলিবার নির্দ্দেশ হইতে মানবিকতার আদর্শ বোধগম্য হয়। মানবকল্যাণের জন্য শত্রুদমনের উদ্দেশ্যেই সেকালের রাজনীতিতে প্রয়োজন-

মত 'কূটনীতি' বা 'Policy' প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু স্বার্থপর ভাবে কূটনীতির প্রয়োগ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি মানিয়া লয় নাই। এজন্য পররাজ্য জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হওয়া রাজার আদর্শ হইলেও নিছক স্বার্থপরতা, দম্ভ ও অধর্ম্মের আশ্রয়ে পররাজ্যজয়কে ভারত কোনও দিন নৈতিক স্বীকৃতি দেয় নাই। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৯৬ অধ্যায়ে (চিত্রশালা প্রকাশন, পুণা) আমরা পাই –

'নাধর্ম্মেণ মহীং জেতুং লিপ্সেত জগতীপতিঃ।
অধর্ম্মযুক্তো বিজয়ো হ্যধ্রুবোহস্বর্গ্য এবচ।
সর্ব্ববিদ্যাতিরেকেণ জয়মিচ্ছেন্মহীপতিঃ।
ন মায়য়া ন দম্ভেন য ইচ্ছেদ্‌ভূতিমাত্মনঃ॥'

অর্থাৎ–'অধর্ম্মানুসারে বিজয়বাসনা করা নরপতির কদাপি কর্ত্তব্য নহে।.........অধর্ম্মানুসারে জয়লাভ নিতান্ত নিন্দনীয় ও অকিঞ্চিৎকর। ....ভূপালগণের বিজয়বাসনা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যিনি আপনার মঙ্গল কামনা করেন, তিনি মায়া বা দর্পসহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিবেন না।'

(কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এই মানবিক আদর্শ ভারতের ইতিহাসে প্রতিপালিত হইলেও ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনের বিরোধীশক্তির দমন-উৎসাদনের যে আদর্শ বেদ-রামায়ণ-মহাভারতে রহিয়াছে তাহা সমান ভাবে কার্য্য-করী হয় নাই। যাহা হউক উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় যে দম্ভ-দর্প-অহঙ্কার-অধর্ম্মমূলক ক্ষমতাপ্রিয়তা ভারতের রাজধর্ম্মে

ছিল না। শুধু পররাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে নয়, স্বরাষ্ট্রেও জোর-জবরদস্তি করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা রাজধর্ম্মে বিশেষ নিন্দনীয় ছিল। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৯২ অধ্যায়ে আমরা পাই—

অধর্ম্মদর্শী যো রাজা বলাদেব প্রবর্ত্ততে।
ক্ষিপ্রমেবাপযাতোঽস্মাদুভৌ প্রথমমধ্যমৌ॥

....

অসৎপাপিষ্ঠসচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্ম্মহা।
অর্থানামননুষ্ঠাতা কামচারী বিকত্থনঃ।
অপি সর্ব্বাং মহীং লব্ধা ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥'

অর্থাৎ—'যে অধার্ম্মিক রাজা বলপ্রকাশপূর্ব্বক ফললাভের চেষ্টা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, উভয়ই অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ধর্ম্মঘাতক নরপতি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সকলের বধ্য। ......গর্ব্বিত, কার্য্যানুষ্ঠান-পরাঙ্মুখ, যথেচ্ছাচারী ভূপতি এই অখণ্ডভূমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হয়েন।' (পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এখানে অধর্ম্মাচারী ক্ষমতাপ্রিয় রাজাকে বধ করিবারও বিধান দেওয়া হইয়াছে। রাজাকে বিতাড়িত বা ক্ষমতাচ্যুত করার নিদর্শনও প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আদর্শপরায়ণ রাজাকে দেবতার সহিতও তুলনা করা হইয়াছে এবং দস্যু-দলনে, শত্রুবিনাশে, অন্যায়কারীর দণ্ডবিধানে রাজাকে কঠোর হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধে বীরত্বের

সহিত প্রাণদানকে প্রজাপালনের ন্যায় রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা হইয়াছে—(অধ্যায় ৬০, ৬৮, ৮৯, ৯১, ৯৭, ৯৮, ১২১)।

অপিচ নৈসর্গিক কারণে কোনও ক্ষয়ক্ষতি ঘটিলে রাজাকে দায়ী করা চলেনা— এরূপ ন্যায়সঙ্গত সমর্থনও রাজাকে দেওয়া হইয়াছে (শান্তিপর্ব্ব)। আবার অধর্ম্মাচারী প্রজাগণের বিদ্রোহকেও প্রাচীন ভারতে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। বস্তুতঃ, কি রাজা কি প্রজা, কাহারও ক্ষেত্রে এযুগের মত রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ব করার দুর্নীতি সে যুগে স্থান পায় নাই। ধর্ম্মই ছিল উভয়ের নিয়ন্তা। এজন্য শান্তিপর্ব্বে ৯০ অধ্যায়ে আমরা এমন উক্তিও পাই—

'ধর্ম্মে বর্ধতি বর্ধন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদা।'

অর্থাৎ—'ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইলে সমস্ত প্রজা পরিবর্দ্ধিত হয়।' এজন্য অধর্ম্মাচারী প্রজাগণ বিদ্রোহী হইলেও দেশে সর্ব্ববর্ণের জনসাধারণকে ধর্ম্মাচরণ দ্বারা 'ব্রহ্মবল' ও ক্ষাত্র-শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইতে বলা হইয়াছে।

'দানেন তপসা যজ্ঞৈরদ্রোহেণ দমেন চ।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ ক্ষেমমিচ্ছেয়ুরাত্মনঃ ॥
রাজ্ঞোঽপি ক্ষীয়মাণস্য ব্রহ্মৈবাহুঃ পরায়ণম্।'

—(শান্তিপর্ব্ব, ৭৮ অধ্যায়)

অর্থাৎ— 'ঐ সময় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণ দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অদ্রোহ ও দমগুণ দ্বারা আপন আপন মঙ্গল-চেষ্টা করিবেন। রাজার ক্ষয়দশা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবলই

একমাত্র আশ্রয়।' সুতরাং রাষ্ট্রবিশৃঙ্খলার সময়ে সদিচ্ছাপরায়ণ মানবধর্মে বিশ্বাসী জনগণই ভারতে কল্যাণরাষ্ট্র স্থাপনের মূলশক্তি। বর্তমান যুগেও যখন রাষ্ট্রশক্তি বা Government ও প্রজাশক্তি বা Public নানাসূত্রে চিরন্তন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তখন সর্ব্বত্র যে অকল্যাণ ও অশান্তির ঢেউ নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে—তাহাকে নিরস্ত করিতে গেলে দেশের সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষদের মনুষ্যত্বসাধনার মধ্য দিয়া সুস্থ স্বাভাবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরাইয়া আনা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আজ Party System বা দলীয় রাজনীতিকে স্বীকার করিয়া আমরা পাশ্চাত্য Democracy বা গণতন্ত্রের আলেয়ার পিছনে ছুটিতেছি। কিন্তু দেশে ও বিশ্বে যে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় বারে বারে দেখা দিতেছে তাহার হাত হইতে ভারতরাষ্ট্রকে ও বিশ্বকে মুক্ত করিতে গেলে মানবধর্ম্মপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রবাদের প্রয়োজন এবং উহা একমাত্র মানবধর্ম্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মধ্য হইতেই আবির্ভূত হইতে পারে। এজন্য দেশব্যাপী মনুষ্যত্বের উদ্বোধক জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলন অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন, যাহার সহায়ে গণজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে যৌনকাম, ধনকাম ও জনকাম বা প্রভুত্বকামের বিষাক্ত প্রভাব বিদূরিত করা সম্ভব হইবে।

এরূপ রাষ্ট্রে ধনলাভ, ধনবৃদ্ধি, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, এমনকি ভোগসুখ থাকিবে না এমন অলীক কল্পনা যাঁহারা করেন তাঁহারা ভারতের ইতিহাস এবং বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ বলিতে হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্র প্রধানতঃ ত্রিবর্গসাধনের জন্যই, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম

ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগের জন্যই বিহিত হইয়াছিল। ধনহীনতাকে এজন্য যথেষ্ট নিন্দা করা হইয়াছে এবং আপৎকালে যে কোনও উপায়ে ধনাহরণও আপদ্ধর্ম হিসাবে সমর্থিত হইয়াছে (অধ্যায় ১৩০, ১৩৪)। অবশ্য সর্ব্বোপরি ছিল মোক্ষ বা মহামুক্তির আদর্শ। এরূপ রাষ্ট্রে সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সুষম ধনবণ্টনের ব্যবস্থা থাকিবে না ইহাও অজ্ঞতার কল্পনা মাত্র। প্রথম অধ্যায়ে এবিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। মহাভারতে রাজধর্মানুশাসনের স্থানে স্থানে আমরা যে 'সংবিভাগ' বা ন্যায়সঙ্গত ধনবণ্টনের নীতির কথা শুনিতে পাই—তাহা এযুগের 'ধনসাম্যবাদ' না হইতে পারে, কিন্তু তাহা সেযুগের পরিবেশে ও আদর্শে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানবধর্মের ভিত্তিতে সাম্যের নীতি সূচিত করে এবিষয়ে সন্দেহ নাই (অধ্যায় ৬০, ৯১, ৯৩)। ইহা ছাড়া প্রাচীন ভারতের নীতিশাস্ত্রে—যাহাতে ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি ইত্যাদি সমস্ত বাস্তবজীবননীতির বিরাট্ সমবায় ঘটিয়াছিল—তাহার মধ্যে 'অভৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ' অর্থাৎ বেকারের কর্মসংস্থানও একটি বিশেষ কর্ত্তব্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও রাজাকে প্রজাগণের জীবিকার সংস্থানকর্ত্তা বলা হইয়াছে (৪।২১।২২)। প্রজা বা জনসাধারণের প্রতি রাজা বা রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধ এত গভীর ছিল যে তাহা এযুগের গণতন্ত্রের মধ্যেও বিস্ময়ের বস্তু। কোনও প্রজার ধন চুরি গেলে এবং তাহার পুনরুদ্ধার সম্ভব না হইলে রাজা বা রাষ্ট্রই ঐ প্রজাকে ঐ ধন দিতে বাধ্য ছিলেন (অধ্যায় ৭৫)। এজন্য রাজকোষ

হইতে দেওয়া সম্ভব না হইলে ঐ ধন ধনী বণিক্‌দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইত। সুতরাং দেশে ধনী থাকিলেও শোষক ধনতন্ত্রী ছিল না ইহা বুঝা যায়। ধনবান্ ব্যক্তিরা ধার্মিক, তপস্বী ও সত্যনিষ্ঠ হওয়াই ছিল নিয়ম (অধ্যায় ৮৮)। ধনার্জ্জনকারী বৈশ্যের ধর্মনিষ্ঠার কথা আমরা মনুসংহিতা হইতে দেখাইয়াছি। হারীতসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়েও আমরা পাই ধনিক বৈশ্য-শ্রেণী প্রভুত্বকাম, যৌনকাম ও ধনকামের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবেন। জনসাধারণের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলতার এগুলি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনিভাবে নিরপেক্ষ-বিচারে দেখা যাইবে মানবধর্মহীন আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতি নানা সমস্যাসমাধানের নামে যে হৈ-হিল্লোড় সৃষ্টি করিয়া এযুগে বিশ্বমানবের জীবনে দুর্ব্বিষহ বিপর্য্যয় ঘনাইয়া তুলিতেছে, তাহার স্থায়ী, সুস্থ প্রতিকার ভারতীয় মানবধর্মরাষ্ট্রের আদর্শেই সুচারুরূপে সব দিক্ দিয়া সম্ভব। আমরা 'সমাজ-সংস্কৃতি' অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে এই ধর্মরাষ্ট্রের আদর্শ এযুগের উপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ কোনও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-মতবাদ এখানে আসল কথা নয়। এই দৃষ্টিতে ইহা মানবধর্মবাদী নূতন ভারতরাষ্ট্রের উপযোগী রাষ্ট্রবাদ। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শ প্রধানতঃ ধর্মবাদী ও নীতিবাদী হইলেও আজ পর্য্যন্ত এই মানবধর্মরাষ্ট্রের আদর্শকে জাতির সম্মুখে স্পষ্টভাবে স্থাপন না করাতেই নবীন ভারতের জাতীয় জীবনে যাবতীয় গোলযোগ-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি

হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতার অমূলক ভীতির কুসংস্কারে ভারত-রাষ্ট্রের সত্য আদর্শকে চাপা দিবার যে প্রচেষ্টা তাহা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ ইহা অসত্য ও অবাস্তব, এবং জাতির শাশ্বত ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কচ্যুত।

দেশের ধনসম্পদ্-বৃদ্ধি, দারিদ্র্যদূরীকরণ, বিত্তবান্ ও বলবানের Exploitation বা শোষণ হইতে দুর্ব্বল ও দরিদ্র জনগণ রক্ষা করা এ সবই ভারতীয় রাজধর্মে কোনও নূতন কথা নয়। এগুলি রাষ্ট্রের প্রাথমিক ও অবশ্যপালনীয় ধর্ম ছিল। দেশে ধনাগম ও ধনবৃদ্ধি ও প্রজাসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধিও ভারতীয় রাষ্ট্রের চিরদিনের স্বীকৃত আদর্শ। শান্তিপর্ব্বে ৯০ অধ্যায়ে এমন কথাও পাই—

'ধনাৎ স্রবতি ধর্ম্মোহি ধারণাদ্বেতি নিশ্চয়ঃ।

অর্থাৎ— 'ধনাগম ও ধনবৃদ্ধি করে বলিয়াই ধর্মের ধর্মনাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।' কিন্তু এই ধনবৃদ্ধি সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ স্বধর্ম বা জাতীয় কর্ত্তব্য মাত্র ছিল। তাহা ন্যায়সঙ্গত ভাবে অর্জিত ও জনকল্যাণে ব্যয়িত হওয়ার নীতিও আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং ধনকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকার করিয়াও তাহার বিষাক্ত প্রভাব সেযুগে ছড়াইয়া পড়িতে দেওয়া হয় নাই, স্বার্থপর ধনসঞ্চয় ছিল রাষ্ট্রধর্মবিরোধী। অথচ এই আদর্শের ভিত্তিতেই গ্রীক-শক-হুন-পাঠান-মোগল ইত্যাদির আক্রমণযুগেও ভারত কত ঐশ্বর্য্যশালী ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ দেশ ছিল ইতিহাস ও বিদেশী পর্য্যটক-

গণের বিবরণ তাহার সাক্ষ্য দেয়। অসহায় এবং দুর্ব্বলদের Exploitation বা শোষণ নিরস্ত করাও ভারতীয় রাজধর্মের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। ৯১ অধ্যায়ে আমরা পাই—

'বিমানিতো হতঃ ক্রুষ্টস্ত্রাতারং চেন্ন বিন্দতি।
অমানুষকৃতস্তত্র দণ্ডো হন্তি নরাধিপম্ ॥'

অর্থাৎ— 'অবমানিত, আহত ও আর্ত্ত ব্যক্তি যদি রাজার কাছে পরিত্রাণের উপায় না পায় তবে অমানুষী দৈব দণ্ডে নৃপতিকে নিহত করে।' দুর্ব্বল, অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সংবিভাগ বা ন্যায়সঙ্গত অন্নাদিবণ্টনও রাজধর্মের অঙ্গীভূত ছিল।

'সংবিভজ্য যদা ভুঙ্ক্তে নৃপতির্দুর্ব্বলান্নরান্।
তদা ভবন্তি বলিনঃ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥'

—(৯১ অধ্যায়)

অর্থাৎ—'রাজা যখন দুর্ব্বল প্রজাগণকে সংবিভাগ বা ন্যায়সঙ্গত অন্নাদিবণ্টন দ্বারা সেবা করিয়া নিজে ভোজন করেন এবং দুর্ব্বলেরা বল লাভ করে, তখনি রাজধর্ম প্রতিপালিত হয়।' অপরদিকে লোভী রাজকর্মচারীগণের দ্বারা প্রজা-উৎপীড়নও সেযুগের দৃষ্টি এড়ায় নাই—এমনি সূক্ষ্ম ও সম্যগ্‌দর্শী ছিল রাষ্ট্রধর্মের ব্যবস্থা (অধ্যায় ৮৯, ৯১)। সাধারণ-ভাবে সে যুগে দেশে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ অনেক কম থাকিলেও— অসহায় প্রজাগণের সেবা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। মহা-ভারতের বিরাট্‌পর্ব্বে ১৮শ অধ্যায়ে আমরা পাই—'যুধিষ্ঠির রাষ্ট্রমধ্যে অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, বালক ইত্যাদি দুরবস্থাগ্রস্ত লোক-

দের সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতেন।' (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) কিন্তু এইসব দৈহিক অভাবমোচন ছাড়া রাজাকে দেশের জনসাধারণের স্বভাব-চরিত্র শুদ্ধ করার দিকে বিশেষ অবহিত হইতে হইত। উক্ত ৯১ অধ্যায়ে আর একটি শ্লোক এইরূপ—

'তেষাং যঃ ক্ষত্রিয়ো বেদ বস্ত্রাণামিব শোধনম্।
শীলদোষান্‌বিনির্হর্ত্তুং স পিতা স প্রজাপতিঃ॥

অর্থাৎ—'তাঁহাদের মধ্যে যে ক্ষত্রিয় লোকের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাগণের পিতা।' পুনশ্চ, ঐ অধ্যায়েই বলা হইয়াছে যে উচ্ছৃঙ্খল, অর্থলোভী, পশুতুল্য মানুষেরা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ধর্মের দ্বারাই নীতির পথে পরিচালিত হয়। রাজা নিজে সুনীতিপরায়ণ চরিত্রবান্ না হইলে ইহা অসম্ভব। সেইজন্য ক্ষত্রিয়ধর্মে জিতেন্দ্রিয়তা ও চরিত্রবত্তার প্রাধান্য রাজধর্মানুশাসন অধ্যায়ের সর্ব্বত্র সূচিত হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র-নায়ক ও রাষ্ট্রশাসক তথা রাজনীতিচর্চ্চাকারী 'দেশসেবক'দের মধ্যে আজ মনুষ্যত্বের শিক্ষাসাধনা কোথায়? আজ আমরা কথায় কথায় সম্রাট্ অশোকের গুণগান করি, ভারতরাষ্ট্রের শীল-মোহর হিসাবে অশোকস্তম্ভের 'ধর্ম্মচক্র'ই আজ গৃহীত হইয়াছে। অথচ সম্রাট্ অশোক ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্যের অনুসরণেই কেমন করিয়া নিজে সপরিবারে ধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রজাসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া প্রজাগণের চারিত্রিক উৎকর্ষসাধনে তৎপর ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত শিলালিপি হইতে বুঝা যাইবে—

'এতৎ চ অন্যৎ চ বহুবিধং ধর্ম্মাচরণং বর্দ্ধিতম্। বর্দ্ধয়িষ্যতি

চ এব দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ইদং ধর্ম্মচরণম্ । পুত্রা চ কে নপ্তারঃ চ প্রনপ্তারঃ চ দেবানাং প্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ প্রবর্দ্ধয়িষ্যন্তি চ এব ধর্ম্মচরণং ইদং যাবৎকল্পং, ধর্ম্মে শীলে চ স্থিতা ধর্ম্মং অনুশাসিষ্যন্তি। এতৎ হি শ্রেষ্ঠং ধর্ম্ম যৎ ধর্ম্মানুশাসনম্ । ধর্ম্মচরণং অপি চ ন ভবতি অশীলস্য। '—(Rock Edict IV, Asokan Inscriptions, Ed. Dr. R. G. Basak.)

(বাংলা অনুবাদ)—'ইহা এবং অন্যান্য বহুবিধ ধর্ম্মাচরণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী ধর্ম্মের আচরণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন। দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শির পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং প্রপৌত্রগণ কল্পান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মের আচরণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন এবং ধর্ম্মে ও শীলে (নৈতিক আচরণে) স্থির হইয়া ধর্ম্ম অনুশাসন করিবেন। কারণ, যাহাকে ধর্ম্মানুশাসন (ধর্ম্মশিক্ষাদান) বলে তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তির পক্ষে ধর্মাচরণ সম্ভব নয়।' ভারতের রাষ্ট্রশক্তি আজ Secular অর্থাৎ ঐহিক উন্নতির জন্যই বদ্ধপরিকর। কিন্তু একটা মহান্ জাতিকে পুনর্গঠিত করিতে গেলে তাহার চিরন্তন মানবধর্মপ্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কি তাহা সম্ভব? আজ ভারতীয়েরা, স্বাধীন হইয়া, বিলাতী ছাঁদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি এবং তাহারই অনুগামী সমাজব্যবস্থা ও সমাজনীতিরই প্রচলন করিতেছেন, ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। ইহাতে ভবিষ্যতে কোনও জাতীয় মহাজাগরণ ও মহাসংহতির আশা করা যায় না। আমরা এরূপ আশা করি না যে এখনই এক মানবীয় ধর্ম্মনীতির আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হইবে, সে

কার্যপদ্ধতি অবশ্যই নানা জটিলতায় সমাকীর্ণ। কিন্তু পূর্বেই আমরা বলিয়াছি ভারতীয় সমাজধর্ম্মের মহাজাগরণের যুগ আসিয়াছে। বহু বৎসরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই তাহার পথ প্রস্তুত হইবে। কিন্তু তথাপি সেই ভাবী মহা-জাগরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আজ ভাবিবার, বুঝিবার ও পথ প্রস্তুত করিবারও সময় আসিয়াছে। এই পথ রাজনীতি-অর্থনীতিরই পথ নহে, ইহা জাতীয় জীবনের মূলে সমাজধর্ম্ম-চেতনার পুনর্জাগরণের পথ।

'স্বাধীনতা' লাভের পর হইতে আমরা সম্পূর্ণ বৈদেশিক রাজনীতি - অর্থনীতি - ধনতন্ত্র - গণতন্ত্র - সমাজতন্ত্র-সাম্যতন্ত্রেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। বৈদেশিক সংঘাতে যে নব জাগরণ আসিয়াছে তাহাতে ইহা স্বাভাবিক। এযুগে পশ্চিমের রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের আন্দোলনকে বাদ দিয়া চলার প্রশ্নই উঠেনা। কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়া ক্রমশঃ ভারতের নিজস্ব সমাজধর্ম্ম-প্রতিভার পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ভারতের সংবিধানে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবাদ হইতে সংগৃহীত সাম্য-ন্যায়-স্বাধীনতার বহু কথা থাকিলেও কোনও নিজস্ব মৌলিক মানবীয় নীতিসাধনার কথা নাই। অথচ রাশিয়ার সংবিধান সমাজকল্যাণে স্বার্থত্যাগী শ্রমের মর্য্যাদা এক নূতন ও অবশ্যপালনীয় নীতিবাদরূপে যথেষ্ট জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছে। ভারত এখনও তাহার শাশ্বত ধর্ম্মের নিজস্ব নীতিবাদ খুঁজিয়া পায় নাই।

ভবিষ্যতের ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে যে দিন এক মানবিক চরিত্রসাধনার সমাজধর্ম্ম অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে—যে সমাজধর্ম্ম অন্তরের 'বৈজ্ঞানিক' সংযমে তথা বাহিরের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে সুপ্রতিষ্ঠিত—সেইদিন মানবধর্ম্মী ভারতীয় রাজনীতির সংযতশুদ্ধ চরিত্র সাধনার আদর্শ নূতনরূপে আবির্ভূত হইবে। জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনার তাহাও হইবে অঙ্গীভূত। দেশসেবক-রাষ্ট্রসেবক তথা জনসাধারণকেও তখন তাহার অনুশীলনে অবহিত হইতে হইবে, কারণ রাজধর্ম্ম ও প্রজাধর্ম্ম পরস্পরের অনুপূরক।

কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজা বা রাষ্ট্রশাসকের চরিত্রসাধনায় বার্ত্তা (অর্থনীতি), আন্বিক্ষিকী (দর্শন ও ন্যায শাস্ত্র), দণ্ডনীতি (রাজনীতি) ইত্যাদি বিদ্যাশিক্ষার সহিত রিপু-ইন্দ্রিয় জয় ও 'বৃদ্ধ' (প্রাজ্ঞ) - সেবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে— 'বিদ্যাবিনয় - হেতুরিন্দ্রিয়জয়: কামক্রোধলোভমানমদহর্ষত্যাগাৎ-কার্যঃ। - - কৃৎস্নং হি শাস্ত্রমিদমিন্দ্রিয় জয়ঃ।'(অর্থশাস্ত্র, ২য় অধ্যায়, ৩য় প্রকরণ)। ইহা জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যেরই চরিত্রসাধনা। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বেও ইহার বর্ণনা আছে। প্রজারঞ্জকতা আজকালকার জনপ্রিয়তা বা popularity নহে। এজন্য ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিষ্ঠ হইতে হয় (অধ্যায় ৫৬, ৮৪)। সুতরাং সে যুগের রাজনীতি ছিল মনুষ্যত্বসাধনার নীতি – রাজা ও প্রজা

যাহার সহসাধক। মানুষ হিসাবে রাজায়-প্রজায় ভেদ নাই—একথাও আমরা সে যুগে শুনিতে পাই (অধ্যায় ৮৯)। প্রজা-গণের রাষ্ট্রের উপর প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমনকি ভৃত্যদের প্রতিও সঙ্গত সম্মানদানের বিধান আছে (অধ্যায় ৮৭, ৯১)। রাষ্ট্রে বা সমাজে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের প্রশ্নই ছিল না। রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্তা 'ব্রাহ্মণ'শ্রেণীর ধর্ম্মই ছিল ধনসঞ্চয়বর্জ্জন (মনু, অধ্যায় ৪), 'ক্ষত্রিয়' শাসকশ্রেণীর ধর্ম্ম ছিল রাষ্ট্রকল্যাণে ধনব্যয় ও অন্যায় ধনসঞ্চয়ের নিবারণ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১ | ৩৩৭—৪১), 'বৈশ্য' ব্যবসায়ী শ্রেণীর ধর্ম্ম ছিল ধনপ্রভুত্বত্যাগ (হারীত সংহিতা, ২ | ৭-৮) এবং 'শূদ্র' শ্রমিকশ্রেণীরও ধর্ম্ম ছিল ধন-লোভবর্জ্জিত দ্বিজাতিদের কাজে সাহায্য করা। বেকার শূদ্রের বৃত্তিব্যবস্থা দ্বিজাতির অবশ্যকরণীয় ছিল। এই স্বাভাবিক সমাজ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রাষ্ট্রবাদ সুদীর্ঘ কয়েক সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া শুধু নানা খণ্ডরাজ্যের জন্ম দেয় নাই, বহু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পন্ন বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রনেতা - সমরনেতারও আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। ইউরোপের ইতিহাসেও ইহার বেশী কিছু ঘটে নাই। (Political Philosophies, C. C. Maxey এবং Hindu Political Philosophy, B. K. Sarkar দ্রষ্টব্য)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এ যুগে সেই শ্রেণীবিভাগ বা জাতিবিভাগ বাদ দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের নিঃস্বার্থ সেবায় স্বভাবস্বাধীন 'স্বকর্ম্ম'-সাধনার ভাব ও আদর্শ গৃহীত হইতে পারে এবং আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেও তাহা সম্ভব।

এই আদর্শের পথেই ভারতের জাতীয় জীবনকে তাহার নিজস্ব গণধর্ম্ম-সমাজধর্ম্ম-সাম্যধর্ম্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। জাতীয় জীবনে সেই নষ্ট ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত এযুগের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-চাঞ্চল্য-অনিশ্চয়তা দূর হওয়া অসম্ভব। আঞ্চলিকতা-প্রাদেশিকতা-সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্তিরও ইহাই পথ। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এ যুগেও প্রত্যেক বৃহৎ জাতি তাহার নিজস্ব প্রতিভা-পরিবেশ-ঐতিহ্যমতই জাতীয় জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেরও পরানুকরণ-দুর্ব্বলতা ও মোহ এখনও কাটে নাই। জাতিকে এবার আত্মস্থ হইতে হইবে। নচেৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়—'যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করেনা, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না'। ভারতের সমস্ত মহাপুরুষ ও মহামানব ভারতের জাতীয় মহাজাগরণে ভারতাত্মার পুনরুদ্বোধনের উপরই এজন্য জোর দিয়াছেন।

এই সমাজধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক নয় ও হইতে পারেনা। এ জন্য হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়কেই আজ নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ ও

সহযোগিতা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ধর্ম্মানুষ্ঠান যেমন চলিতেছে তেমনি চলিতে পারে। কিন্তু সমাজজীবন ও জাতীয়জীবনে মনুষ্যত্বসাধনার মহান্ ধর্ম্মের নীতি ও পদ্ধতিকে আজ ধীরে ধীরে কাজে লাগাইতে হইবে। এমনকি পাশ্চাত্য ঐহিক সভ্যতার সহিতও ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতার সংমিশ্রণ তাহার মধ্যে ঘটাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণীয়—'ভারতের ধর্ম্ম লইয়া ইউরোপের সমাজের মতো একটি সমাজ গড়িতে পারো ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর এরূপ হইবেই হইবে।' —(আনন্দ বাজার পত্রিকা, দিনের বাণী)।

ফল কথা যে রাষ্ট্রাদর্শ ও সমাজধর্ম্ম ভারতে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহা কোনও বিশেষ ধর্ম্মমত বা তাহার রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান লইয়া হইবে না। সেজন্য ভারতীয় 'হিন্দু' ধর্ম্মের যে বিশেষ অবদান জাতি ও সমাজের জীবনে উন্নতির সহায়ক হইবে বলিয়া আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি, তাহাকেও প্রাচীন রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান হইতে যুগোপযোগীভাবে মুক্ত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের যে মিশ্র-সংস্কৃতি (Composite Culture)-র কথা অনেকে বলেন তাঁহাদের অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় সমাজ ও জাতির প্রাচীনতম ও প্রধানতম সংস্কৃতিকে বাদ দিয়া বা গৌণ করিয়া ইহা গড়িয়া উঠিতে পারে না। এমন কি যে মিশ্রসংস্কৃতি ও সর্ব্বধর্ম্মের বিশেষ অবদান লইয়া নবজাতীয়তা-গঠনের কথা হইতেছে তাহার আদর্শ প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম

হইতেই গৃহীত। ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির যে বিশেষ ধারা, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বধর্মসাধনার কথা আমরা বলিতেছি তাহা অবশ্যই জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবে জাতীয় জীবনে গ্রহণীয়। ব্রহ্ম-চর্য্যের আদর্শ সবধর্মে সমানভাবে না থাকিলেও, অর্থপিপাসা, প্রভুত্বপিপাসা ও যৌনকামপিপাসার ন্যায়সঙ্গত সংযম এবং এবং ঈশ্বর বা পরমসত্যের নিয়ন্ত্রণে কাজ করা— এগুলি সকল ধর্মেরই গ্রহণযোগ্য আদর্শ। ভারতের জাতীয় জীবনকে ঐ দিব্যভাবের দৃষ্টিতেই সেবা করিতে হইবে। এই সেবাই 'স্বধর্মসাধনা',— ভারতের শাশ্বত ও ভাবী নব-জাতীয়তার মহামন্ত্র।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—যেই হউক—এই মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের আদর্শকে গ্রহণ না করিয়া পৃথক্ হইয়া থাকিতে চাহিলে তাহা নবজাতীয়তার পরিপন্থী হইবে। "পূর্ব্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন— 'ভারতবর্ষের যে অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না…… ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে………অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জ্জন করিবেন।' ইহার পূর্ব্বে তিনি বলিয়া-ছেন—'এই পরিপূর্ণতার প্রতিমাগঠনে হিন্দু, মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্ত্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।' এই মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের অর্থ কোনও বিশেষ ধর্ম ও

সম্প্রদায়ের আত্মবিলোপ নয়, পরন্তু সকল সম্প্রদায়েরই জাতীয় জীবনধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, পরদ্বেষী, পরগ্রাসী মনোভাবের শোধন। ভারতরাষ্ট্রকে এজন্য নিরপেক্ষভাবে সকল সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। মনুষ্যত্বসাধনায় ভারত সাম্প্রদায়িক পার্থক্য স্বীকার করেনা। মনুসংহিতায় ১৪।৪৫-এ মনুষ্যত্বসাধনার 'সংস্কার'-বর্জ্জিত আর্যভাষী ও ম্লেচ্ছ-ভাষী উভয়েরই নিন্দা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে আধুনিক গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের কিছু বিশদ আলোচনায় আমরা পরে আসিতেছি।* এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে এই সমস্ত আধুনিক মতবাদে যে ধর্ম্মকে বাদ দিয়া চলা হয় তাহা মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। কিন্তু 'বিজ্ঞানসম্মত' মানবীয় সমাজধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে সমন্বয় নিশ্চয় অসম্ভব বা অবাঞ্ছিত হইবে না।† সুতরাং যে বৈদেশিক গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের আদর্শ আজ দেশে-বিদেশে জটিলতা ও বিপর্যয় বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে তাহাদিগকেও ভারতে ভারতীয় আদর্শে পরিশুদ্ধ ও সমন্বিত করিয়া বিশ্বকল্যাণে নিয়োগ করিতে হইবে। এই সমন্বয়েরই ভিত্তি শাশ্বত সমাজধর্ম্ম ও যৌনকাম-ধনকাম-জনকামের নিয়ন্ত্রণের উপর প্রতিষ্ঠিত মানবীয় ধর্মরাষ্ট্রবাদ। ইহার জন্য কর্ম্ম করা এযুগের "ধর্মযোগ"-সাধনা এবং ইহাই এযুগের মানুষের শান্তি-শক্তি-মুক্তিলাভেরও প্রশস্ত পথ।

---

*—ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৬৪২-৭৯ দ্রষ্টব্য।

†— ঐ, পৃঃ ৬৫৪-৫৮ দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদেশের এককালীন প্রধানমন্ত্রী U. Nu যে বলিয়াছিলেন কমিউনিজ্‌মের প্রভাব এড়াইতে দুর্নীতি, ঘুষ, মদ্যপান ও নারীবিলাস (corruptions, bribery, drink and womanizing) বন্ধ করিতে হইবে * ইহা তাৎপর্যপূর্ণ। বলা বাহুল্য, কমিউনিজ্‌ম (সাম্যবাদ) বা সোশ্যালিজ্‌ম (সমাজতন্ত্রবাদ) এড়ান আজ আসল প্রশ্ন নয়, ভারতের মাটিতে ইহাদের ভ্রমসংশোধন ও ভারতীয় জীবন-ধর্মের সহিত সমন্বয়ই আসল কথা। এখানে আমরা যে জাতীয় জীবনধর্ম্ম বা সমাজধর্ম্মের কথা বলিতেছি তাহা প্রাচীন ভারতীয় সমাজধর্ম্মের প্রাচীন রূপ একেবারেই নয়।§

এই শাশ্বত সমাজধর্ম্মের আদর্শ মাত্র ব্যক্তিগত জীবনে 'ধর্মোপদেশ' ও 'ধর্ম্মসাধনার' মধ্য দিয়া কার্যকরী করা যাইবে না। এই বাস্তব রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের যুগে ভারতে নূতন মানবধর্ম্মী রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানেরও বাস্তব প্রয়োগ করিতে হইবে।ঞ অপর দিকে ভারতের নবযুগের এই আদর্শবাদকে ভবিষ্যতে বৈদেশিক বহিরাক্রমণের হাত হইতেও সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। একটা বিশ্ব-আদর্শবাদী দেশের বিরুদ্ধে এরূপ বহিরাক্রমণের সমস্যা

---

*—Caux (Switzerland) M. R. A. সম্মেলনে ভাষণ দ্রষ্টব্য

§—ভূমিকা, পৃঃ [ঝ], [ভ] ও বিভিন্ন অধ্যায়, পৃঃ ৭০, ১০২, ১০৪, ১১৭, ১১৩, ১১৪, ২০২, ২০৩, ২৩৯-৪০, ৩১১, ৬৫৯, অনু (২) পৃঃ ১৫, ২৪—২৬ দ্রষ্টব্য।

ঞ—অনুযোজনাপত্র (২), পৃঃ ২৪-২৬ দ্রষ্টব্য।

দেখা দিবেই। এই জাতীয়-আদর্শবিরোধী শক্রদলকেই বেদ-রামায়ণ-মহাভারতের সর্ব্বত্র 'রাক্ষস' 'দস্যু' বলা হইয়াছে এবং যে কোনও প্রকারে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাদের উৎসাদন ও জাতীয় আদর্শরক্ষা রাষ্ট্রধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ যুদ্ধকে যজ্ঞের সহিতও তুলনা করা হইয়াছে —(অধ্যায় ৬০, ৮৯, ৯৮)। অহিংসা, উদারতা, নিরপেক্ষতার কোনও স্থান সেখানে ভারতীয় শাস্ত্রে দেওয়া হয় নাই। এই Positive (ভাববাদী) আদর্শ ছাড়া ভারতরাষ্ট্র কখনও সামরিকভাবে শক্তিশালী হইতে পারে না।

আমরা প্রাচীন ভারতরাষ্ট্রে মানবধর্মী ব্রহ্মচর্য্যসাধনার পাশাপাশি যে ক্ষাত্রধর্মী বীরত্বসাধনার আদর্শ দেখিতে পাই তাহাও জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। মহাভারতে যেমন একদিকে পাই যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় সহস্র ঋষি সভাসদের কথা এবং তাঁহার দ্বারা দশসহস্র উর্দ্ধরেতাঃ যতিগণের তথা অষ্টাশীসহস্র গৃহধর্মী স্নাতকগণের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা (বিরাট পর্ব্ব, ১৮শ অধ্যায়), অপর দিকে তেমনি পাই মহর্ষিগণের যুধিষ্ঠিরকে ক্ষাত্র-ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাঁহার চারি ভ্রাতা এমনকি দ্রৌপদীকর্ত্তৃক তাঁহাকে ক্ষাত্রভাবহীনতার জন্য তীব্র ভৎসনার কথা (শান্তি-পর্ব্ব)। সেই সঙ্গে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে যথা, রামায়ণ-মহাভারত-স্মৃতি-সংহিতা-পুরাণাদিতে রাজধর্ম্মের বা রাষ্ট্রনীতির আলোচনা ও যুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্র, দুর্গ, যুদ্ধকাল ও যুদ্ধনীতির বহু বাস্তব আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এমনকি যুদ্ধকাল ছাড়াও নগরে ও নগর-প্রাসাদে যুদ্ধের জন্ত যাবতীয় ব্যবস্থা থাকিত তাহা আমরা

জানিতে পারি রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চমসর্গে অযোধ্যানগরীর বর্ণনায়। সেখানে বলা হইয়াছে—'সেই নগরীর উন্নত অট্টালিকা-শিখরে পতাকা সকল শোভা পাইত। সেখানে শত শত শতঘ্নী নামক যন্ত্র স্থাপিত ছিল।......... এই নগরীতে অস্ত্রবিদ্যানিপুণ মহাবীরগণ অবস্থান করিতেন ('আর্য্যশাস্ত্র' অনুবাদ)। আমরা এখানে যে বর্ণনা পাইতেছি তাহা একান্তই বাস্তব, পৌরাণিক যুদ্ধকাহিনীর মত কিছু নয়। 'শতঘ্নী' নামক যন্ত্র আসলে একটি ভীষণ মারণাস্ত্র। ইহার সম্বন্ধে Monier Williams তাঁহার বিখ্যাত অভিধানে লিখিয়াছেন—'A particularly deadly weapon (used as a missile, supposed by some to be a sort of fire-arm or rocket......), অর্থাৎ—'একটি অতি ভয়ঙ্কর ক্ষেপণাস্ত্র যাহা একপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র অথবা রকেট বলিয়া অনেকে মনে করেন ....।' আমরা একথা বলিতে চাই না যে আধুনিক কালের মত অস্ত্র-শস্ত্রাদি সে যুগে ছিল। অপরপক্ষে আমরা যেরূপ অস্ত্রের উদাহরণ দিলাম তাহা 'অগ্নিবান' 'বরুণবান' 'সর্পবান' ইত্যাদির মত পৌরাণিক কিছু নয়। কিন্তু আমরা ইহা অবশ্যই বলিব যে মানব-ধর্মী প্রাচীন ভারতে দেশব্যাপী যুদ্ধব্যবস্থা ও যোদ্ধৃমনোবৃত্তির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরভক্তিবাদী গীতার মধ্যেও অষ্টাদশ অধ্যায়ের অজস্র জ্ঞানভক্তির উপদেশের মধ্য দিয়া পরমভক্ত অর্জ্জুনকে ভগবান্ যুদ্ধকার্য্যেই নিযুক্ত করিয়াছেন। মহাভারতের মোক্ষধর্মের উপদেশের সঙ্গেই রাজধর্ম্মের অজস্র যুদ্ধনীতি-শাসন-নীতি-দণ্ডনীতির বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাই আদর্শ শাশ্বত ভারতের

আদর্শ শাশ্বত ধর্ম্ম। পরবর্ত্তীকালে সমাজ ও রাষ্ট্র যখন ছিন্নভিন্ন বিপর্য্যস্ত, তখনই সেই মানবধর্মী জীবন্ত সমাজরাষ্ট্রের বিপর্যায়ের যুগে ভারতে নিছক জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ, তন্ত্রবাদ ইত্যাদি সম্প্রদায়সাধনা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে।

এযুগে পুনরায় দুইজন মহাপুরুষের মুখে সেই শাশ্বত ভারতের বাণী আমরা শুনিতে পাইয়াছি। একজন বিশ্ববিখ্যাত বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যিনি বলিয়াছেন—'Wanted ক্ষাত্রবীর্য্য Plus ব্রহ্মতেজঃ,' এবং অপরজন ভারতবিশ্রুত আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ যিনি জাতীয় জীবনে ব্রহ্মচর্য্য ও ক্ষাত্রবীর্য্যের বাস্তব সাধনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

রাষ্ট্রনীতির এতখানি আলোচনায় আমরা আসিলাম কেন? ইহার একমাত্র কারণ, যে জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য বা জাতীয় চরিত্রগঠনের কথা আমরা বলিতেছি তাহা নিছক ব্যক্তিগত সাধনা হিসাবে কখনও সম্ভব বা সার্থক হইতে পারে না। শাস্ত্রগ্রন্থে এজন্য জ্ঞান বা ভক্তির স্রোতে ইন্দ্রিয়জয়ের সাধনা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত আচার্য্য সমীপে 'উপনীত' হইয়া শিক্ষাপ্রাপ্তির মধ্য দিয়া মানবধর্মী দেশ-জাতি-সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গের স্রোতে সমগ্র জাতির জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাকে সফল, সম্ভব, সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল প্রাচীন ভারত।

রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গের পরিশেষে বক্তব্য এই যে আদর্শবিপর্য্যয়ের প্রশ্নটি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। ভারতে ও পৃথিবীতে আজ প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই জড়বাদ

দেহবাদ ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগবাদে বিশ্বাসী। প্রাচীন ধর্ম্মমত ছাড়া যে একটি সংযমের, সত্যের, পবিত্রতার, ত্যাগের ধর্ম্ম আছে যাহা মানুষকে যুগপৎ শক্তি ও শান্তির সন্ধান এবং জীবন-রহস্যের সমাধান দেয়—তাহা তাহারা বিশ্বাস করে না। এরূপ আদর্শ-বাদ মানবকল্যাণের নামে অনিবার্য্যভাবেই সমাজতন্ত্রবাদ বা ধনসাম্যবাদের দিকে কোনও না কোনও আকারে ঝুঁকিতে বাধ্য। আজিকার ধনতন্ত্রী জাতিও জনকল্যাণের নামে সব কিছু করিতে চায়। 'কমিউনিজম্' নীতিগত ভাবে মানুষের আত্মার ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, শ্রেণীসংগ্রামই তাহার দৃষ্টিতে জীবনের সার সত্য। কিন্তু বিশ্বব্যাপী আজ ধনতন্ত্রবাদের সহিত ধনসাম্যবাদের যে সংঘর্ষ তাহা জড়বাদের সহিত অধ্যাত্মবাদের সংঘর্ষ নয়। তাহা একই ভাবরাজ্যের মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সংগ্রাম একদিকে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (যথা আমেরিকা, ইংলণ্ড), অপরদিকে রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য (যথা রাশিয়া, চীন)। কিন্তু আমরা এখানে যে আদর্শ-বিপর্য্যয়ের কথা বলিতেছি তাহা মানুষের আত্মার স্বাতন্ত্র্যের উপর আঘাত। সে আঘাত সব দিক্ হইতেই আসিতেছে। সেজন্য বিশ্বের সর্ব্বত্র আজ রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নামে মানুষের মনুষ্যত্বের মহিমা ধূল্যবলুণ্ঠিত, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও শাসকগোষ্ঠীর প্রভুত্বই আজ সব কিছু। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁহার 'Role of Individuality'তে বলিয়াছেন ইহারই জন্য এযুগে পূর্ব্বযুগের মত শক্তিশালী ধর্ম্মনেতা বা ধর্মান্দোলন অথবা নৈতিক আদর্শবাদের আবির্ভাব ঘটে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির আন্দোলনও ঐ একই কর্তৃত্ব ও

প্রভুত্বলাভের খেলা মাত্র। ইহার উপর এই আণবিক বোমার যুগে ঐ কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব আরও উত্তেজক হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব-বিখ্যাত মনীষী ও লেখক Aldous Huxley তাঁহার Brave New World গ্রন্থের ভূমিকায় যে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিছু অংশের অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন কেমন করিয়া বর্ত্তমান আণবিক শক্তির যুগ মানুষকে সম্পূর্ণ যন্ত্রদাস ও রাষ্ট্রদাসে পরিণত করিতে চলিয়াছে।

—'ইতিমধ্যে আমরা (মনুষ্যসমাজে) প্রাক্-চরমবিপ্লবের প্রথম ধাপে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহার পরবর্ত্তী ধাপ আণবিক যুদ্ধ হওয়াই সম্ভব।.....................কিন্তু ইহা মনে করা যাইতে পারে যে যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করিতে না পারিলেও অন্ততঃ আমাদের (ইউরোপীয়দের) অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বপুরুষদের মত যুক্তিবাদী পথে চলিবার সুবুদ্ধিটুকু আমাদের আসিবে।......... তাঁহারা অবশ্য আর্থিক লাভ এবং পদগৌরবের লোভের বশে আক্রমণাত্মক যুদ্ধই চাহিতেন; কিন্তু তাঁহারা সংরক্ষণবাদীও ছিলেন, যেজন্য তাঁহাদের পরিচিত জগৎটিকে তাঁহারা চালু ব্যবসার মত অক্ষত রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। গত ত্রিশ বৎসরে কিন্তু কোথাও কোনও সংরক্ষণবাদীদের দেখা মিলিতেছে না; কেবল মাত্র চরমবাদী জাতীয় দক্ষিণপন্থী ও চরমবাদী জাতীয় বামপন্থী-দেরই দেখা যাইতেছে।.........ইহাদেরই জয়জয়কারের ফলে যাহা আসিয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই জানা—বলশেভিজ্‌ম, ফ্যাসিজ্‌ম, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাসংকোচ, হিট্‌লার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইউরোপের ধ্বংস এবং প্রায় সর্ব্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ।

সুতরাং যদি ধরিয়া লই যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা Magdenburg হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, আমরা Hiroshima (হিরোশিমা) হইতে সেই শিক্ষা লইতে সক্ষম, তাহা হইলে আমরা ভবিষ্যতে এমন একটি সময়ের প্রত্যাশা করিতে পারি যখন সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত না হইলেও আংশিক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সীমাবদ্ধ আকারে চলিবে মাত্র। ঐ সময়ের মধ্যে, ইহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে আণবিক শক্তি শিল্পের কাজে লাগান হইবে। তাহার ফল সুনিশ্চিতভাবে ইহাই হইবে যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব্ব কতকগুলি পরিবর্ত্তন দ্রুত ও সম্পূর্ণ আকারে স্তরে স্তরে আসিতে থাকিবে। বর্ত্তমান মনুষ্যজীবনের ছাঁদই বদ্‌লাইয়া যাইবে এবং নূতন নূতন জীবনের ছাঁদ খাড়া করিয়া মানবিকতাবর্জ্জিত আণবিক শক্তির সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ....এইরূপ প্রক্রিয়া নিশ্চয় যন্ত্রণামুক্ত হইবে না এবং এগুলি পরিচালনা করিবে অতি-মাত্রায় কেন্দ্রীভূত সামগ্রিক-শক্তিশালী সরকার (Highly Centralised Totalitarian Governments)। ইহা অনিবার্য্য, কারণ.........এই যুগেরই ঠিক আগে যন্ত্রবিজ্ঞানের সৃষ্ট দ্রুত পরিবর্ত্তনের ফলে...... .. সব সময়েই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই বিশৃঙ্খলা দমন করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে এবং সরকারী কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ আণবিক শক্তি কাজে লাগাইবার আগেই পৃথিবীর সমস্ত সরকার, কমবেশী পরিমাণে সম্পূর্ণ Totalitarian বা 'সর্ব্বেসর্ব্বা' রাষ্ট্রে পরিণত হইবে,

এবং আণবিক শক্তি কাজে লাগিলে বা তাহার পরে যে রাষ্ট্রের ঐরূপ পরিণতি ঘটিবে ইহা একরূপ সুনিশ্চিত।'

ইহার পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে শ্রীহাক্‌সলী তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলিতেছেন এই নূতন রাষ্ট্রীয় সামগ্রিক শক্তি পুরাতনের মত শুধু দলবদ্ধভাবে গুলি ছুঁড়িয়া বা লাঠি চালাইয়া (by clubs and firing squads), কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া বা দলে দলে লোককে জেলে পুরিয়া কার্য্য করিবে না। নূতন কার্য্যকরী পন্থায় রাষ্ট্রের সর্ব্বশক্তিমান্ মাতব্বরগণ এবং তাঁহাদের অধীনস্থ শাসক-পরিচালকগোষ্ঠী জনসাধারণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবেন যেন তাহারা রাষ্ট্রদাসরূপেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসে। বর্ত্তমানে এই কার্য্য করিবার জন্য প্রচার-মন্ত্রক (Ministries of Propaganda), সংবাদপত্র ইত্যাদি রহিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আরও বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইবে। জনসাধারণকে 'সুখী' অর্থাৎ 'রাষ্ট্রদাসত্বে সন্তুষ্ট' করিয়া রাখিবার জন্য 'বৈজ্ঞানিক' ও 'রাজনীতিক' মিলিয়া 'গবেষণা' করিবেন। খাওয়া-পরার সমস্যা হয়ত সমাধান করিয়া কিছুদিন কাজ চলিবে, কিন্তু তাহার পরও মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহা থাকিয়া যাইবে। তখন তাঁহারা মানুষের রাষ্ট্রদাসত্বে সন্তুষ্টির ভাব চিরস্থায়ী করার জন্য নানা কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের দেহে ও মনে পরিবর্ত্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদের কাজ সহজ করিবার জন্য মানুষকে নানা বিশেষ আরামদায়ক মাদকদ্রব্যের আবিষ্কার করিয়া সম্মোহিত করিয়া রাখা হইবে অথবা মানুষের প্রজনন-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া ফরমাস-মত 'মানুষ-মাল' উৎপন্ন করা হইবে

(Standardization of Human Product)। তাহার পর ভাবী যুগের চরম যৌনবিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন—'Nor does the sexual promiscuity of Brave New World seem so very distant. There are already certain American cities in which the number of divorces is equal to the number of marriages. In a few years, no doubt, marriage licences will be sold like dog licences good for a period of twelve months, with no law against changing dog or keeping more than one animal at a time As political and economic freedom dimi shes, sexual freedom tends compensatingly to increase. And the dictator...........will do well to encourage that freedom. In conjunction with the freedom to day-dream under the influence of dope and movies and the radio, it will help to reconcile his subjects to the servitude which is their fate' অর্থাৎ—'Brave New World এর যৌন যথেচ্ছাচারিতাও খুব দূরে বলিয়া মনে হয় না। ইতিমধ্যেই আমেরিকায় এমন কতকগুলি সহর রহিয়াছে যেখানে বিবাহের সংখ্যা ও বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা সমান। কয়েক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয় কুকুর-রাখার লাইসেন্সের মত বিবাহের লাইসেন্স বিক্রয় হইবে, যাহা এক বৎসরের জন্য কার্য্য-

করা হইবে, অথচ কুকুর বদ্‌লান অথবা একাধিক কুকুর রাখার বিরুদ্ধে কোনও আইন থাকিবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যত কমিয়া যায়, যৌন স্বাধীনতা (স্বেচ্ছাচারিতা) তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপে তত বাড়িতে থাকে। এবং রাষ্ট্রের এক-নায়ক (Dictator) .... ঐ (যৌন) স্বাধীনতাকে উৎসাহ দান করিলে তাঁহার সুবিধাই হইবে। ঝিমাইবার 'নেশার ওষুধ', 'সিনেমা' এবং রেডিওর প্রভাবে যথেচ্ছ দিবাস্বপ্ন দেখার সহিত এই যৌনস্বাধীনতা তাঁহার প্রজাবর্গকে তাহাদের দাসত্বের দুর্ভাগ্য মানিয়া লইতে সাহায্য করিবে।

ইহার পর শ্রী হাক্‌সলী ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতেছেন যে এই ভীতিপূর্ণ অবস্থা আগামী একশতাব্দীর মধ্যে আসিতে পারে যদি ইতিমধ্যে আণবিক বোমার যুদ্ধে আমরা চূর্ণ হইয়া উড়িয়া না যাই। কিন্তু কি ইহার প্রতিকার? শ্রী হাক্‌সলীর মতে মানুষের জীবনকে জড়বিজ্ঞানের প্রভাব হইতে মুক্ত করা এবং স্বাধীন মানুষের সমাজ গড়িয়া তোলাই ইহার প্রতিকার। নচেৎ আণ-বিক বোমার আতঙ্কে দেশে দেশে যুদ্ধবাদী 'সর্ব্বেসর্ব্বা' রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে, যাহার ফলে, হয় মানবসভ্যতার ধ্বংস সাধিত হইবে অথবা সুদীর্ঘকাল যুদ্ধবাদী মনোভাব রাজত্ব করিবে। আবার এমনও হইতে পারে যে যন্ত্রবিজ্ঞানের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে, বিশেষে আণবিক বিপ্লবের ফলে, মনুষ্যসমাজে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে যাহার ফলে এক বিশ্বব্যাপী 'সর্ব্বেসর্ব্বা' রাষ্ট্রবাদ (supra-national totalitarianism) গড়িয়া উঠিবে এবং দক্ষতার সহিত রাষ্ট্রপরিচালনা এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিধানের অজুহাতে

জনকল্যাণের জবরদস্তি দেখা দিবে। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন—'Only a large-scale popular movement toward decentralization and self-help can arrest the present tendency toward statism', অর্থাৎ—একটি ব্যাপক গণ আন্দোলন যাহা জনগণকে বিকেন্দ্রীকৃত আত্মনির্ভতার অভিমুখে লইয়া যাইবে, তাহাই বর্ত্তমান রাষ্ট্র-সর্ব্বস্বতার প্রবণতা রোধ করিতে পারে।'

শ্রী হাক্সলীর পুস্তকটি একটি ব্যঙ্গ-সমালোচনামূলক উপন্যাস হইলেও ইহার যে ভূমিকা হইতে আমরা উদ্ধৃতি দিলাম তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতে ইহার অনেকখানিই ঠিক্। কিন্তু যে অবাধ রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে তাহার বীজ শুধু রাষ্ট্রে নয় বা কোনও বিশেষ দলে নয়, তাহার বীজ রহিয়াছে জনগণেরই মনে প্রসুপ্ত যৌনকাম, ধনকাম ও প্রভুত্বকামের মধ্যে। এই কামের ব্যাধি দূর না করিলে কোনও সত্যকার উন্নতি বা সংস্কার রাজনীতিক্ষেত্রে সম্ভব নয় ইহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। জনসাধারণের মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বিতা বাঞ্ছনীয় হইলেও, তাহা কোন্ জনসাধারণ? জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রের পরিবর্ত্তন এবং মানবধর্ম্মিতার সৃষ্টি না হইলে হাজার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে কোনও ফল হইবে না। যে অবাধ রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বের মধ্যে ক্ষমতা-প্রিয়তা বা প্রভুত্বকামের ঘনীভূত বিষ ঢুকিয়া আছে তাহাই তরল অথচ সমান মারাত্মক আকারে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে ছড়াইয়া পড়িবে। বিশ্বের সর্ব্বত্র গণতন্ত্র

বা সমাজতন্ত্রের উৎকট ব্যর্থতা দেখিয়াও আমাদের চেতনা হয় না, আমরা এখনও কথায় কথায় উদ্‌ভ্রান্ত পশ্চিমী দেশগুলিরই নকল করিয়া কৃতার্থ হইতে চাই।

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র বড় কথা ছিল না বড় কথা ছিল রাজধর্ম্ম। মানবধর্ম্মের কাছে রাজা-প্রজা সমানভাবে আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পশুমানবের কখনও কল্যাণরাষ্ট্র থাকিতে পারে না, সে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র যাহাই হউক না কেন। সুতরাঃ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সমস্যাসমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মূল মানবিক চরিত্রের সমস্যাসমাধান অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। নচেৎ Mathew Arnold-এর ভাষায় আমরা বলিতে পারি অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদ সমস্তই machinery বা যন্ত্র মাত্র, মানুষের আত্মার 'Sweetness and Light', 'জ্ঞান ও প্রেম, বিকশিত না হইলে ইহাদের মানবিক সার্থকতা থাকে না। যে শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত-দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে জন-আন্দোলন ও রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁহাদের এই মানবধর্ম্ম-সাধনায় অগ্রণী হইতে বাধা কোথায়? মানবধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া জন-কল্যাণের সাধনা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। এই মানবধর্ম্মের মূল কথা যৌনকাম, ধনকাম ও লোককাম (প্রভুত্বপিপাসা) হইতে মুক্ত হওয়া। এই মানবীয় আদর্শবাদই প্রকৃত সমাজতন্ত্রের জন্ম দিতে পারে।

শ্রী হাক্‌সলী স্বাধীন মানুষের সমাজ গড়িবার জন্য

বিজ্ঞানের দাসত্ব এবং রাষ্ট্রের দাসত্ব হইতে মুক্তি ছাড়া বিকারমুক্ত (sane) মানুষসৃষ্টির উপরও জোর দিয়াছেন। এ জন্য মানুষের জীবনে 'মহালক্ষ্য' (Final End)-সাধনাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। এই 'মহালক্ষ্য' কোনও সাময়িক প্রয়োজন-মেটানোর নীতি নয়। তাই তিনি বলিয়াছেন— 'And the prevailing philosophy of life would be a kind of High Utilitarianism, in which the Greatest Happiness principle would be secondary to the Final End principle'। বলা বাহুল্য, এই 'মহালক্ষ্য' তাঁহার মতে কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মও নয়, ইহা ব্রহ্মজ্ঞান বা মহামুক্তি।

কিন্তু এই মুক্ত মানুষের সমাজসৃষ্টির কোনও লক্ষণ তিনি বর্ত্তমানে দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছেন—'At present there is no sign that such a movement will take place.'

আমরা বলিব ভারতে সে লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভারতের ঋষি তাহার পথ ও পদ্ধতি দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভারতের মহাপুরুষেরা সেই পথেই চলিতেছেন। ভাবী ভারতের জনগণও সেই পথে চলিবে।

শিক্ষায়তন (Academy) ঃ—

সমাজজীবনের তৃতীয় গোষ্ঠীরূপে দেখা দেয় দেশ-ব্যাপী বহু স্কুল-কলেজ—বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীদের শিক্ষায়তন। এই স্কুল-কলেজগুলিই এক দিক দিয়া জাতীয়

ব্রহ্মচর্য্যসাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থল হওয়া উচিৎ। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ পৃথক্‌ভাবে ছাত্রদের জন্য। আমাদের এ যাবৎ আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য সমগ্র দেশবাসীর একটি অখণ্ড আদর্শবাদ। ছাত্রগণ যে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র সেই সমাজ ও রাষ্ট্র মনুষ্যত্বসাধনাকে জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ছাত্র-সমাজে এই আদর্শের সাধনা কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ইহার জন্য ছাত্রসমাজে যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে বলিয়া আমরা অভিযোগ করি তাহার মূল দায়িত্ব ছাত্রদের নয় আমাদের, অর্থাৎ বয়স্ক সমাজ ও রাষ্ট্রের। ভারতীয় জীবনের আদর্শ ও ধারাকে আজিও ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র গ্রহণ করিতে পারে নাই, বর্ত্তমান যুগে তাহার সার্থকতা এখনও বুঝিতে পারে নাই। দেশের নৈতিক আবহাওয়ায় ইহা একটি vacuum বা শূন্যমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, এবং এই শূন্যমণ্ডলকে দখল করিবার জন্য সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশেষে তরুণ ছাত্রসমাজে বিশৃঙ্খলার ঘূর্ণিঝড় (cyclone) অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে।

ভারতের সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবন বলিতে এখন যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিদেশী অর্থনীতিবাদের ও জড় ভোগবাদের প্রতিচ্ছবি মাত্র। অথচ ভারতে এমন এক দিন ছিল যখন অর্থের জন্যই কর্ত্তব্যকর্ম্ম করাকে পাপ গণ্য করা হইত (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, ১৮৭।৪৬)। যৌনকামলালসা ও প্রভুত্বপিপাসার পাপ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

এই উত্তেজনাগর্ভ সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলে রহিয়াছে রিপু-ইন্দ্রিয়ের জীবন। সুতরাং এরূপ বিকৃত পরিবেশে কেমন করিয়া আশা করা যায় যে ছাত্রেরা মানবীয় চরিত্রের অনুশীলন করিবে?

বস্তুতঃ ছাত্রেরা আজ একান্তই অসহায় ও বিভ্রান্ত। বাড়ীতে একরূপ সাংস্কৃতিক পরিবেশ, খেলার মাঠে অন্যরূপ, সিনেমা-থিয়েটারে আর একরূপ, কাব্যে-সাহিত্যে অন্য এক প্রকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন একপ্রকার। এই বিপর্য্যস্ত সমাজ-সংস্কৃতির জীবনে ছাত্রদের নিকট সুসংহত নৈতিক জীবন-সাধনার আশা করা যায় না। সেই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যসাধনার জন্য আজ যুগপৎ সব দিক্ দিয়া অভিযান চালাইতে হইবে। ছাত্রেরাই অবশ্য থাকিবে তাহার পুরোভাগে।

ছাত্রদের রাজনীতি-অর্থনীতির প্রভাব হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার কৃত্রিম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। রাষ্ট্রনায়কগণ ভুলিয়া যান যে ছাত্রদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন অগ্রসর হইয়াছিল। তাহা ছাড়া রাজনীতি, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদের উত্তেজনায় যখন বয়স্ক ব্যক্তিরা ডুবিয়া আছেন, তখন উত্তেজনাপ্রবণ ছাত্রসমাজ প্রশান্তমনে নির্ব্বিকারচিত্তে পড়াশুনা করিয়া ভবিষ্যতে দেশের সেবার জন্য প্রস্তুত হইবে ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। ভবিষ্যতে দেশের সেবার মনোভাব লইয়া পড়াশুনা করার কোনও ঐতিহ্য দেশে সৃষ্টি হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

বর্ত্তমানে চাকরী-বাকরী, শিল্প-বাণিজ্য, সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় পেশার মধ্যে সজ্ঞানে জাতীয় সেবার কোনও আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবামূলক কর্ম্ম এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পেশামূলক (professional) কর্ম্ম করা সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। প্রথমটিকে প্রাচীন ভারতে বলা হইত 'স্বধর্ম্ম' বা 'স্বকর্ম্ম' একথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ছাড়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল রাষ্ট্রেই নানা রাজনৈতিক অনাচার কেমন করিয়া ছাত্র-আন্দোলনের সম্মুখে বিপর্য্যস্ত হইতেছে তাহার প্রমাণ আধুনিক কালে দুর্লভ নয়। এই ভাঙ্গনের লীলার মধ্যে একালের ছাত্রসমাজ একটা কল্যাণকর্ম্মের তৃপ্তি খুঁজিয়া পায় ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ কি ? এক দিক্ দিয়া এই মরণের রাজ্যে ইহা একটি জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ যে ছাত্রদের আত্মত্যাগের আদর্শমুখিতা আজিও মরিয়া যায় নাই। তরুণ ছাত্রসমাজের মধ্যে আদর্শের জন্য যে ত্যাগের শক্তি তাহার বন্দনা গাহিয়াছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' এ তিনি বলিয়াছেন—'উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্ব্বিচারে আত্ম-বিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমা-দের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ

করে!' কিন্তু এই 'যৌবনজলতরঙ্গ' হইতে নবজাতীয়তাবাদের আন্দোলন সৃষ্টি করার নেতৃত্ব ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা কোথায়? আত্মবিস্মৃত ভারতের মহীয়ান্ বিশ্ব-আদর্শ আজ কেমন করিয়া দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে রেখাপাত করিতে পারে—তাহাই এ যুগের প্রধান সমস্যা। চিন্তায়, ভাবে, কাজে, কথায় ভারতের তরুণ আজ এ দেশের বিরাট্ ঐতিহ্যের চিরন্তন প্রাণস্পর্শ হইতে বঞ্চিত। অথচ ভারতের জাতীয়তা তাহার ঐতিহ্যের উপরই দাঁড়াইয়া আছে তাহা আমরা প্রায় সকলেই স্বীকার করি। আজ তাই প্রথম ও প্রধান কাজ ধীরে ধীরে সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা লইয়া দেশের ছাত্রসম্প্রদায়ের সম্মুখে শাশ্বত ভারতের বাস্তব আদর্শবাদকে উপস্থাপিত করা। আন্তরিক শুভেচ্ছাসম্পন্ন ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক-অধ্যাপক-জনসাধারণ মিলিয়া এক-একটি 'গোষ্ঠী' রচনা করিয়া এই দুরূহ কাজে হাত লাগাইতে হইবে।

দেশের জীবনসমস্যার সহিত সংযোগ শিক্ষাজগতে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় নীতি। এই সংযোগকে কার্য্যকরী ভাবে সত্যপথে ও সুপথে পরিচালিত করাই আসল সমস্যা। আজ আমাদের শিক্ষাবিদ্গণ চিন্তা করিতেছেন কেমন করিয়া শিক্ষা-ক্ষেত্রে national orientation বা জাতীয় অভিমুখিতা সৃষ্টি করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা scientific and technical bias বা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ঝুঁকি দিবার প্রচেষ্টা করিতে-ছেন। ক্রমশঃ এই চেষ্টা প্রবলতর হইয়া উঠিবে, কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার যুগ। কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে ভাবিতে হইবে ভারত কি শুধু জড়বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায়

দেশ? অথবা ভারতের কোনও উচ্চতর মহত্তর আদর্শবাদ আছে? আমরা যে আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি সেখানে কি মানুষের বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের আদর্শকেই আমরা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই না? তাহাই যদি হয়, তবে মাত্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার সম্প্রসারণ করিয়া ভাবী ভারতের জাতীয় জীবন গঠন করা যাইবে না।

ভারতের দারিদ্র্য দূর করা অবশ্যই একটি প্রধান করণীয় কাজ এবং তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার শুধু দারিদ্র্য দূর করাই একমাত্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হইতে পারে না। ধনী দেশেও আজ অজস্র ভয়ঙ্কর সমস্যা। আমরা আমেরিকান প্রেসিডেণ্টের উক্তি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি কেমন করিয়া তাঁহারাও ধনের ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্ত্তে একটা সামাজিক আদর্শবাদের সন্ধান করিয়া তাঁহাদের জাতীয় জীবনকে টেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাশিয়া ও চীনের ক্ষেত্রেও তাই। মাত্র দারিদ্র্য দূর করিবার জন্যই এই দুই দেশে জাতীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে ইহা ভুল কথা। 'Dialectical Materialism' বা 'দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ' এর মত একটি দার্শনিক চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়াই 'কমিউনিষ্ট'-জাতীয়তা মাথা তুলিতেছে। আমেরিকা-ইংলণ্ড ইত্যাদি ধনতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক দেশের সহিত রাশিয়া-চীন ইত্যাদি সাম্যতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক দেশের শত্রুতা আসলে ভাবপ্রবণ 'দারিদ্র্য-দূর-করা'-র ভিত্তিতে নয়। ইহা দুইটি আদর্শবাদের সংগ্রাম—একটি জড়বাদী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, অপরটি জড়বাদী গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য। 'কমিউনিষ্ট' আন্দোলনের

'বেদ', Karl Marx এর Communist Manifesto, পাঠ করিলেই বুঝা যায় কেমন করিয়া একটি প্রাকৃতিক নিয়মের আদর্শকে ঐতিহাসিক শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার লক্ষ্য। দারিদ্র্য-দূরীকরণ তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রও ঐরূপ একটা প্রাকৃতিক নিয়মের আদর্শের অনুবর্ত্তন। যন্ত্রশিল্পের যুগে এই নিয়মের আদর্শ একটা অর্থ-নৈতিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যন্ত্রশিল্পযুগের সৃষ্ট অজস্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিল সমস্যাও মানুষের সভ্যতাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। নানা নূতন চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতেছে। মানবসভ্যতার এই যুগসঙ্কটে কোনও নূতন উচ্চতর প্রাকৃতিক নিয়মের আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা, যাহা মনুষ্যত্বকে সমাজসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, ইহাই আজিকার সব চেয়ে বড় কথা। আমরা পূর্ব্বেই দেখাই-য়াছি ভারত ও ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যে ইহার উপাদান রহিয়াছে। সুতরাং ভারতের সত্যকার জাতীয়তা গঠন করিয়া ছাত্রসমাজকে সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। জাতীয় ব্রহ্ম-চর্য্যসাধনার ভিত্তিতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং জাতীয় 'স্বধর্ম্ম' সাধনার ভিত্তিতে যুগোপযোগী সমাজসাম্যের প্রতিষ্ঠা ইহাই আজ ভারতের একমাত্র শিক্ষানীতি হওয়া উচিত। হইতে পারে ইহা এযুগে অতিমাত্রায় একটি 'বৈপ্লবিক' পন্থা, কিন্তু ভারতের নিজস্ব জাতীয়তা যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে তাহার নিজস্ব 'বিপ্লব'-পন্থা জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা এই মূল মানবিক বিপ্লব হইতে এখনও বহু

দূরে। অথচ ইহাই ভারতের বিশ্ব-আদর্শবাদ। প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণণের পূর্ব্ব-উদ্ধৃত বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা হইতে আমরা তাঁহার ভাষায় বলিতে পারি—'নূতন মানুষকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে সে একটি মানুষ ও বিশ্বনাগরিক এবং বিশ্বের রূপান্তর ও যে লক্ষ্যপথে মানবজাতি চলিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম।' —(দৈনিক বসুমতী, ১১।১০।৬৫)। বলা বাহুল্য, এই বিশ্ব-আদর্শবাদই তরুণ ছাত্রসমাজকে সত্যকার জাতীয়তার প্রেরণা দিতে পারে। এই নূতন আদর্শবাদের জন্য, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণেরই ভাষায়, 'এক নূতন মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে,.........মানুষের এই পরিবর্ত্তন করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন ও সুশৃঙ্খল মন প্রয়োজন।' ইহাই ভারতের জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যসাধনা।

'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ' বলিয়া ছাত্রদের সহজেই প্রাচীন আদর্শের দোহাই দিয়া বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। এই কথাগুলির পিছনেও দুরভিসন্ধি রহিয়াছে, এগুলি আসলে শয়তানের শাস্ত্র-আওড়ানর মত। যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহারা 'তপঃ' কি জানেন না, এবং তপস্যার আদর্শে বিশ্বাসও করেন না, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার খেলার বাহিরে জাতীয় জীবনের স্বরূপ এবং তাহার সংগঠন-বিষয়ে কোনও দিন চিন্তাও করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা যদি মনে-প্রাণে বলিতে পারিতেন 'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ' তাহা হইলে ভারতের জাতীয়জীবনের নূতন প্রকাশ ঘটিতে বিলম্ব হইত না। কারণ, যে 'অধ্যয়ন' ছাত্রদের 'তপস্যা' তাহা কোন্ অধ্যয়ন? তাহা নিশ্চয় এযুগের মনুষ্যত্বহীন

যান্ত্রিকতা, জ্ঞানহীন যুক্তিবাদিতা, অথবা প্রাণহীন ভাবুকতার চর্চ্চার জন্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের অধ্যয়ন নয়। সর্ব্বোপরি তাহা কল্যাণবোধহীন রাজনীতি-অর্থনীতির চর্চ্চা নয়। প্রাচীন সুসভ্য ভারতে ঠিক্ ইহার বিপরীত ভাবে অধ্যয়ন-অধ্যাপন করা হইত এবং তাহাই ছিল 'তপঃ', কারণ উহা ছিল সত্যজীবন-সাধনার সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। এইরূপ অধ্যয়ন সমাজজীবন ও জাতীয়জীবন হইতেও এতটুকু বিচ্ছিন্ন ছিল না, বরং ভারতের রাষ্ট্রসাধনা ও সমাজসাধনার সহিত তাহা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল এবং তাহারই প্রস্তুতিরূপে পরিগণিত হইত।

এযুগের ছাত্রসম্প্রদায়েরও জানা প্রয়োজন কত উচ্চ জাতীয় ও সামাজিক দায়িত্ব সে যুগের ছাত্রসম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। এই উচ্চ গৌরবের স্বীকৃতিরূপেই সেযুগে রাজা ও ছাত্র (স্নাতক) একসঙ্গে পথ দিয়া যাইলে রাজা ছাত্রের জন্য পথ ছাড়িয়া দিতেন (মনুসংহিতা—২।১৩৯)। ইহা কোনও রাজনৈতিক কৌশল নয়, ইহা ছিল মানবধর্মী কল্যাণব্রতের সম্মান। ইহাই শাশ্বত ভারতসংস্কৃতির রূপ। অপর দিকে আজিকার Students' Federation বা ছাত্রসংসদের মত সঙ্ঘবদ্ধ ছাত্রদলও সেযুগে ছিল যাহারা একই কল্যাণব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রশক্তির উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। 'There were the Associations of Brahmacharis called 'Mekhalinam Mahasamgha'. This Students' Federation is mentioned as approaching the king with statements of their views on public

questions and grievances.' * অর্থাৎ—'সেযুগে 'মেখলীনাং মহাসঙ্ঘ' নামে ব্রহ্মচারী (ছাত্র)দের সমিতিসমূহ ছিল। এইরূপ ছাত্রসঙ্ঘ জনসাধারণের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের অথবা অভিযোগের ব্যাপারে রাজার নিকটে তাহাদের মতামত উপস্থাপিত করিত।'

শিক্ষাক্ষেত্রে চরিত্রগঠনের কথা প্রায়ই শোনা যায়, এমনকি আধুনিক কালের পাঠশালার শিক্ষক হইতে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষকতা-শিক্ষণের পুস্তকাদিতে এই চরিত্রগঠনের মামুলী আলোচনা প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর ছাত্রদের 'নাগরিক' (citizen) হিসাবে গড়িয়া তোলার বিলাতী বুলি ও চিন্তার রোমন্থনও হইয়া থাকে। সর্ব্বোপরি দেখা যায় শৈশবের মনস্তত্ত্ব লইয়া অজস্র সিদ্ধান্তবিহীন আলোচনা। অথচ চরিত্রগঠনের যাহা মূল কথা, অর্থাৎ গঠিত-চরিত্র ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে শিশুকে লইয়া যাওয়া, তাহারই একান্ত অভাব। সুতরাং যে বয়সে শিশুকে সংযতেন্দ্রিয়, শুদ্ধচেতাঃ, ত্যাগী আচার্য্যের সমীপে লইয়া যাওয়ার কথা এবং গুরুসেবার মধ্য দিয়া তাহার আদিম অহঙ্কার চূর্ণীকৃত এবং তাহার চরিত্র শোধিত হইয়া মানবধর্মী রাষ্ট্র ও সমাজের সেবায় নিয়োজিত হইবার কথা, আজ তখন পাঠশালার শিক্ষকের কাছে শিশুর অর্থকরী স্বার্থলাভেরই 'হাতে খড়ি' হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি একা শিক্ষকই এজন্য দায়ী নহেন, কারণ মানবতাহীন

* —(Ancient Indian Education, by Dr. Radha Kumud Mukherjee, Pg. 343).

যন্ত্রযুগে তিনিও রাষ্ট্রযন্ত্রের একপাশে একটি ক্ষুদ্র চাকা মাত্র— বৃহৎ যন্ত্রের নিয়মেই যাহাকে আবর্ত্তিত হইতে হয়। পাঠক, ইহার সহিত তুলনা করুন সে যুগের মানুষগঠনের শিক্ষায়তন যেখানে গুরু কিশোর ছাত্রকে দিব্যভাবে মাতার মত 'গর্ভে' ধারণ করিয়া নূতন দিব্যজন্ম দিতেছেন—'আচার্য্যঃ উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণম্ কৃণুতে গর্ভমন্তঃ তম্ রাত্রীস্তিস্রঃ উদরে বিভর্ত্তি।' *

পাঠক মনে রাখিবেন ইহা 'মাষ্টার-মহাশয়'দের ছাত্রকে ভালবাসিবার প্রশ্নমাত্র নহে। এরূপ ভাবপ্রবণতার প্রাচীন ভারত-ধর্ম্মে কোনও স্থান ছিল না। ভালবাসা ইহা অবশ্যই বটে কিন্তু এই দিব্য ভালবাসার স্পর্শ শিশুকে মনুষ্যত্বধর্মী সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় গঠিত করিয়া উৎসর্গ করিতে পারিত।

ইহার পরিবর্ত্তে আজ আমরা পাই শিশু-বালক-কিশোর-দের লইয়া 'play-method' বা শিক্ষায় ছেলেখেলার সাধনা। শিশুদের লইয়া 'শিশুদিবস' করার মধ্যেও আজ বয়স্কদের কিছু 'ছেলে-ভুলান' বৃত্তির তৃপ্তিসাধন এবং শিশুদের কিছু সাময়িক চিত্তবিনোদন অবশ্যই ঘটে। আনন্দহীন জীবনে এইগুলিই আজ হইয়া উঠিয়াছে আমাদের মূলধন। শৈশবের পর কৈশোরে ও যৌবনে স্কুল-কলেজেও নানা লৌকিক বিদ্যার স্রোতে ছাত্রেরা ভাসিয়া যাইতে থাকে। সমাহিত ভাবে আত্মানুশীলন ও চরিত্র-গঠনের কোনও সুদূর সম্ভাবনাও সেখানে থাকে না।

---

* —(অথর্ব্ববেদ ১১।৫, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জির পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে)

বলা বাহুল্য, এরূপ শিক্ষার পরিণামে স্কুল-কলেজের সীমানা পার হইয়া ছাত্রেরা চাকরী অথবা চাকরীর সন্ধান এবং সিনেমা-তরলসাহিত্য-রাজনীতি-খেলাধূলার অনুশীলন ছাড়া দেশজাতিসমাজের সত্যকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার কোনও প্রেরণাই খুঁজিয়া পায় না। কি অসহায় অবস্থায় আমরা তাহাদের জীবনসমুদ্রে ভাসাইয়া দিই ভাবিলেও শিহরিত হইতে হয়। সাধারণ আত্মসংযম, আত্মবিশ্বাস, কর্ম্মদক্ষতা পর্য্যন্ত তাহাদের অনেকেরই থাকে না। ইহারাই নব্য ভারতের ধারক-বাহক। কে ভাবিবে? কে চিন্তা করিবে? অভিভাবক ব্যস্ত, শিক্ষক বিভ্রান্ত, সমাজ বিপর্য্যস্ত, রাষ্ট্র বিক্ষিপ্ত। সুতরাং নবজাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক-জনসাধারণকেই মিলিত প্রচেষ্টায় এই মহান্ জাতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা যে মানুষগঠনের শিক্ষার কথা বলিতেছি তাহার সহিত কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং ভারতের ছাত্রজীবনগঠনে নীতিশিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতেও যে প্রশ্ন বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, সেই সাম্প্রদায়ি-কতার প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না। রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযম ছাড়া মানুষ হওয়া যায় না এবং মানুষ না হইলে প্রকৃত দেশ জাতির ও বিশ্বের সেবা করা যায় না, ইহাই ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ স্মরণীয় বিষয়।

পরিশেষে, ছাত্রসমাজের মধ্যেই আজ ভারতীয় সংস্কৃতির

আলোকে জাতীয় ও বিশ্বজনীন সমস্যাগুলির আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় ছাত্রসমাজের ইহা নিছক আত্মসম্মানের প্রশ্ন। ভারতের ছাত্র কি 'বীট্‌ল'দের অনুকরণ করিবে? 'অ্যাংরী ইয়ং মেন'দের অভিনয় করিবে? সাহিত্য-শিল্প-কলার নামে যৌন অসংযমের স্রোতে ভাসিতে থাকিবে? বিদেশী রাজনীতির হিল্লোড়ে মাতামাতি করিবে? অথবা, জিতেন্দ্রিয় হইয়া দেশের সত্যকার সেবায় ত্যাগ ও বীরত্বের পরিচয় দিবে, জীবনকে সত্যভাবে ভোগ করার পথ দেখাইবে, রাজনীতিতে নূতন মোচড় দিয়া তাহার মোড় ঘুরাইয়া দিবে, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন বিশ্ব গঠিত করিবে? শাশ্বত ভারত ও ভাবী জগৎ তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

ভারতের ছাত্রসমাজে ক্রমবর্দ্ধমান চারিত্রিক অধঃপতন লইয়া সরকারী বা আধা সরকারীভাবে বিলাতী কায়দায় সমীক্ষা চালাইয়া Statistics (পরিসংখ্যান) গ্রহণ করার কথাও আজকাল শোনা যায়। ফলও বিস্ময়ের কারণ হইয়া পড়ে (—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪।৮।৬৬, ইত্যাদি)। কিন্তু সমস্ত সমাজ যেখানে জাতীয় নীতিধর্ম্মবোধ বিসর্জ্জন দিয়া বিলাতী জীবনের পিছনে পাগলের মত ছুটিতেছে, সেখানে ছাত্রসমাজের দোষ ধরিয়া কি ফল হইবে? আর আসল ব্যাধি এই সব বাহিরের লক্ষণে নয়, অন্তরে— জাতীয়সংস্কৃতিহীন জাতীয়জীবনে। দেশের শিক্ষাধিকরণের ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। জাতীয় সরকারের এই বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সমাজ (Society) ঃ—

সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের মূল ও প্রধান গোষ্ঠী সমাজ নিজে। অতীতে এই সমাজ একটি জীবন্ত পদার্থ ছিল। আজকাল রাজনৈতিক-চেতনা, নাগরিক-চেতনা, শ্রেণী-চেতনা, সাম্প্রদায়িক-চেতনা, আন্তর্জাতিক-চেতনা ইত্যাদির তলায় সমাজ-চেতনা চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

ইহার কারণ, প্রাচীন সমাজচেতনার মধ্যে উত্তেজনার কোনও খোরাক ছিল না। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যেমন কতকগুলি দায়িত্ব-কর্ত্তব্যের মধ্য দিয়া মানুষকে উন্নতি ও সুখ-শান্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়, তেমনি ভাবেই কতকগুলি মানবোচিত দায়িত্ব-কর্ত্তব্যই ছিল সমাজধর্ম্মের মূল কথা, এবং এই সমাজধর্ম্মই ছিল সমাজচেতনার ধারক-বাহক। যাঁহারা পশ্চিমী ভাবের বুলি আওড়াইয়া সমাজচেতনাকে Tribal Consciousness বা আদিমযুগের উপজাতি-চেতনার বর্দ্ধিত সংস্করণ বলিয়া মনে করেন তাঁহারা খাওয়া-পরা-বংশবৃদ্ধি ও লড়াই করার স্বার্থ ছাড়া মনুষ্যজীবনে উচ্চতর দায়িত্ব-কর্ত্তব্যের কথা ভাবিতেই পারেন না। এই উচ্চতর দায়িত্ব-কর্ত্তব্যের চেতনার অভাবে সমাজধর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে সমাজচেতনাও ভারতে লোপ পাইয়াছে। আজ রাজনৈতিক-চেতনা, নাগরিক-চেতনা, শ্রেণী-চেতনা, সাম্প্রদায়িক-চেতনা ইত্যাদির মধ্যে অধিকার ও দাবীর প্রশ্নই বড়, কিন্তু প্রাচীন সমাজচেতনায় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যই ছিল প্রাণবস্তু। এজন্য আজ যেখানে গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে সর্ব্বত্রই ভোগের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, প্রাচীন

ভারতে সেখানে ছিল ত্যাগের মিলন ও সমন্বয়। এযুগের রাজনীতি-অর্থনীতির আওতায় গণতন্ত্রের মুখে যে 'স্বাধীন সমাজ' এর কথা এবং সাম্যবাদের মুখে যে 'শ্রেণীহীন সমাজ' এর কথা তাহা ব্যক্তির এই ভোগস্বার্থেই পরিকল্পিত। সেজন্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব-কর্ত্তব্য যাহা কিছু তাহা রাষ্ট্রের জবরদস্তিতেই স্বীকৃত, স্বেচ্ছায় ত্যাগের মহিমা সেখানে নাই। প্রাচীন ভারতে কি সমাজে কি রাষ্ট্রে রাজা-প্রজা, উন্নত-অনুন্নত সকলের মধ্যে কিসে ধর্ম্মহানি ঘটিবে সেটাই ছিল স্বতঃপ্রণোদিত চিন্তনীয় বিষয়। আজ সে স্থলে কিসে স্বার্থহানি ঘটিবে সেই দিকেই সকলের নজর। এজন্য রাষ্ট্র-জনসাধারণ-উন্নত-অনুন্নত সকলের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই আজ প্রধান কথা। সেজন্য ভিয়েৎনাম-ইন্দোনেশিয়া-তিব্বত আফ্রিকা সর্ব্বত্রই আজ মোহভঙ্গের হুঁসিয়ারীর লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র অথবা একচ্ছত্র সমাজতন্ত্র আজ কোনও মানবীয় স্বাধীন আদর্শের পরিতৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। মানবিক আদর্শবাদের নামে দেশে দেশে বিশ্বের সর্ব্বত্র আজ আণবিক যুদ্ধের 'সাজ-সাজ' রব। নানা জোট সৃষ্টির জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি। অথচ চারিদিকেই তাসের ঘরের মত সমস্ত আশা ও আদর্শবাদ মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্বেই এই অবস্থার আভাস দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—'য়ুরোপীয় সভ্যতার হিংসার আলোতে অদ্য পৃথিবীর চারি মহাদেশ ও দুই মহাসমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার মহাজনদের সহিত মজুরদের, বিলাসের সহিত দুর্ভিক্ষের, দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির সহিত সোস্যালিজম্ ও নাইহিলি-

জম্‌-এর দ্বন্দ্ব য়ুরোপের সর্ব্বত্রই আসন্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তির প্রবলতা, প্রভুত্বের মমতা, স্বার্থের উত্তেজনা, কোনোকালেই শান্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইতে পারে না; তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত, একটা ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই। অতএব য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনা পূর্ব্বক তদ্দারা ভারতবর্ষকে মাপিয়া খাটো করিবার প্রয়োজন নাই।' —(নববর্ষ, সংকলন, পৃঃ ৪৯) অথচ এই বিশ্বব্যাপী পাশ্চাত্য রাজনীতির ব্যর্থতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজও ভারত পাশ্চাত্যেরই দুইটা অসার নীতিকে মিশাইয়া একটি সারবান্‌ পদার্থ সৃষ্টির আশায় রাসায়নিক গবেষণা করিতেছে। ইহাই ভারতের অত্যাধুনিক Democratic Socialism বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ। এই কথার খেলা দিয়া কি শাশ্বত ভারতের জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করা যাইবে? ইহার পরিবর্ত্তে যদি আমরা ভারতের মানবধর্ম্ম-রাষ্ট্রবাদ প্রচার করিতে পারিতাম তবে জাতি নড়িয়া উঠিত, সেই সঙ্গে পৃথিবীও উৎকর্ণ হইয়া এই দুঃসাহসী নূতন আদর্শবাদের কথা সসম্ভ্রমে শুনিতে বাধ্য হইত।

কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে, যেজন্য এখনি ইহা সম্ভব নয়। নবজাগ্রত ভারতকে যদি পৃথিবীর বুকে এক নূতন পথের সন্ধান দিতে হয়, তবে তৎপূর্ব্বে ভারতের সমাজচেতনাকে তাহার এক নিজস্ব জাগ্রত-জীবন্ত মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে মহত্ত্ব, যে মুক্তি ভারতের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি,

অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হইবে।' *

ভারতের সত্যকার নবজাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার জন্য যে সর্ব্বাগ্রে এক নূতন জাগ্রত-জীবন্ত ভারতীয় সমাজ গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন, এই সত্যটি পরিষ্কার করিয়া ধরিবার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথ হইতে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিতেছি। '—'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। .... য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। ....এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই আমরা য়ুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ....নেশনই যে সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, সে কথার চরম পরীক্ষা হয় নাই। ....এই ন্যাশনাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিথ্যার প্রভাব স্থান পাই নাই? আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানাপ্রকার মিথ্যা, চাতুরী ও আত্মগোপনের প্রাদুর্ভাব নাই?' †

পুনশ্চ—'হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য... ...হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে

* —নববর্ষ। † —প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা।

পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।' অন্যত্র—'আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। ......কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।' *

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাশ্বতধর্ম্ম বা মানবধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশে সমাজগঠনকেই যে প্রাধান্য দিয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উদ্ধৃতির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় 'হিন্দু' সভ্যতার কথা রহিয়াছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে এখানে সাম্প্রদায়িকভাবের কথা হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতার দোষ রবীন্দ্র-চিন্তাধারায় কল্পনাও করা যায় না। বস্তুতঃ 'সংকলন' গ্রন্থের বহুস্থলে ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতীয়তার কথাই আলোচিত হইয়াছে। ভারতে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রীষ্টান সভ্যতার মধ্যে ঐক্য, মিলন ও সমন্বয় স্থাপিত হইবে ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য। কিন্তু তথাপি এই ঐক্য, মিলন ও সমন্বয়ের মূলশক্তি ভারতের নিজস্ব প্রাচীন সভ্যতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তাই তিনি একথাও বলিয়াছেন—'আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। ......হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না। এইখানে তাহারা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। এই

---

* —প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা।

সামঞ্জস্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।' *

পুনশ্চ—'যদি ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে যদি ধর্ম্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকে শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।' † পুনরায়—'যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্ব্বাক্‌, তাহারই জয় হইবে; আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষেঃ মিলি মিলি যাওব সাগরলহরীসমানা। তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না।' §

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরবর্ত্তী বিকৃত অবস্থাকে সমালোচনা করিলেও রবীন্দ্রনাথ ঋষির অনুশাসন এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সংযম-তপস্যামূলক সমাজধর্ম্মের আদর্শকে কখনো অবজ্ঞা করেন নাই। অনেকেরই ধারণা রবীন্দ্রনাথ সংযম-তপস্যা-বৈরাগ্যের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা 'সাহিত্য'-প্রসঙ্গে ইহার কিছু আভাস দিব।

সুতরাং ভারতে আজ সমাজধর্ম্মকে জাগাইতে হইবে এবং ভারতের নিজস্ব মানবধর্ম্ম-সংস্কৃতির ভিত্তিতেই তাহা সম্ভব হইবে। এ পথে সমাজ-সংস্কারের নামে রাজনীতি-অর্থনীতি-ঘেঁষা মতবাদকে ভারতীয় জনগণের উপর চাপাইয়া দিবার প্রচেষ্টা সার্থক হওয়া অসম্ভব। পূর্ব্বে এগুলির দ্বারা কোনও লাভই হয়

* —স্বদেশী সমাজ। † —ভারতবর্ষের ইতিহাস। § —নববর্ষ।

নাই এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িক ও সীমাবদ্ধ। কারণ ভারতের সমাজধর্ম্ম বলিয়া একটা ধর্ম্ম আছে, সমাজনীতি বলিয়া একটা নীতি আছে, যাহ নিদ্রিত থাকিলেও জাতীয় চেতনার গভীরে জাগ্রত। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, তাহাকে শ্রদ্ধার আবেদনে নবভাবে উদ্বুদ্ধ না করিয়া নূতন সমাজ-সংগঠন ও নূতন জাতিগঠন অসম্ভব। সেই ধর্ম্ম এবং সেই নীতির বর্ত্তমান রাষ্ট্রজীবনেও বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে, একথা আমরা 'রাষ্ট্র'-বিষয়ক অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং বাহির হইতে কিছু না চাপাইয়া ধীরে ধীরে এই সমাজের মিলিত আত্ম-চেতনাকে তাহার নিজস্ব আদর্শবাদের আত্মবিশ্বাসে উদ্বোধিত করা একান্ত প্রয়োজন। তখন তাহা নিজেই নিজের যুগোপযোগী জীবনধারার প্রবর্ত্তন করিবে, লিখিত বা অলিখিত নূতন 'স্মৃতি' রচিত হইবে, ভারতের জাতীয়তা আবার ভারতের মাটী হইতে মাথা তুলিয়া বাহির হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ এই আদর্শের বিশেষ প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, আচার্য প্রণবানন্দ-প্রবর্ত্তিত সমাজসমন্বয় ও সমাজসংগঠন পরিকল্পনার মধ্যেও আমরা সেই আদর্শের রূপায়ণ-প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার জন্য সমাজের বক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ মনুষ্যত্বের মহাশক্তি উদ্বোধিত হওয়া প্রয়োজন এবং তাহাই জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য সাধনার মূল কথা। উক্ত দুই মহাত্মা এবং আরও অনেক সাধুপুরুষ এই আদর্শ ও কার্য্য-ক্রমের কথাই বলিয়াছেন এবং বলিতেছেন, ইহা বিশেষ আশার লক্ষণ সন্দেহ নাই। কাজটি সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কারণ, সহস্রাধিক বৎসরের প্রাণশক্তি রহিত, জটিলতায় সমাচ্ছন্ন,

পুরাতনের কুসংস্কারে অবসন্ন, নূতনের উন্মাদনায় অভিভূত এই সমাজের আত্মসম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতে গেলে বহুদিকের বহুমুখী সংশয়ের নিরসন এবং সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ, ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার কথা ধরিতে পারা যায়। সমগ্র 'হিন্দু' সমাজকে ইহা যেমন ছিন্নভিন্ন ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে তেমনিই ভারতের জাতীয়জীবনের অগ্রগতিকেও অনেক দিক্ দিয়া ইহা পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রতিকার কি? সংস্কারের প্রচেষ্টা ত অনেক হইয়াছে। 'স্বাধীন' ভারতে অস্পৃশ্যতাকে বে-আইনীও করা হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় জীবনে এই বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ কি দূর হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে নূতন করিয়া এ সমস্যার বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে।

জাতিবিভাগ (জাতিভেদ বলিলে ঠিক্ বলা হয় না) ছিল একটি জীবন্ত সমাজধর্ম্মের কর্মবিভাগের নীতি। মনুষ্যত্বের সাধনাই ছিল তাহার প্রাণ। একথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। কালক্রমে এই সাধনার আদর্শ ম্লান হইতে থাকিলে ইহার কাঠামোটিকে রক্ষা করিবার নানা বাঁধন-কষণ হইতে থাকে, নানাবিধ পরিবর্ত্তনও সাধিত হয় নূতন নূতন সময়োপযোগী স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা। জাতিবিভাগের বিধান লইয়া বিভিন্ন স্মৃতির মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্যও দেখা দিয়াছে। এক মহাভারতেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিধান রহিয়াছে। একটা জীবন্ত সমাজবিধান এভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য, যদিও তাহার মূলনীতি ঠিক্ থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা যে 'জাতিভেদ' দেখিতেছি ইহা জীবন্ত নয়। আধুনিক যুগের দ্রুত পরিবর্ত্তনের সম্মুখে ইহা উত্তরোত্তর নানাভাবে অস্বীকৃতও হইতেছে। কিন্তু তথাপি জাতিবিভাগের প্রাচীন মহিমার স্মৃতি আজিও জাতীয় জীবনে জীবিত। বহু মহাপুরুষ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে ইহার সমর্থক। ইহার শাশ্বত মূল্যায়নই ইহার কারণ। জন্মগত ও গুণকর্ম্মগত উভয় প্রকার জাতিবিভাগের আদর্শকেই শাস্ত্র ও বিচারে সমর্থন করা যায়। এইখানেই সমস্যাটীর মূল নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং সমস্যাটীকে আজ নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার সত্য সমাধানের উপায় বাহির করিতে হইবে। বর্ণাশ্রমের জীবন্ত জাতিবিভাগের পুনরাবির্ভাব এযুগে সম্ভব নয়, স্বাভাবিক নয়, হয়ত বা বাঞ্ছনীয়ও নয়। অপর পক্ষে তাহার সামাজিক সংস্কারও জাতির মন হইতে মুছিয়া যাইবার নয়। তাহারই জের টানিয়া যে কৃত্রিম জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সমাজকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, সংস্কারপন্থী বহু আন্দোলন তাহার কিছু সমাধান করিলেও বিশাল সমাজের তুলনায় তাহা নগণ্য। আপনা হইতে যুগপরিবেশে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা শিথিল হইতেছে ইহাও লক্ষণীয়। কিন্তু এভাবে ইহা সম্পূর্ণ তিরোহিত না হওয়ার কারণও আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং সমস্যাটিকে সমাধানের জন্য সমাজের প্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করাই স্বাভাবিক পন্থা। আমরা বলি ইহা সম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী এবং বর্ণাশ্রম-সমাজধর্ম্মের মূল দুইটী নীতির মধ্যে তাহার জীবন্ত উপাদান রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্যের শক্তিতে সমাজের প্রাণ-

প্রতিষ্ঠা এবং 'স্বধর্ম্ম'-সাধনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সংহতিসাধন, সেই দুই অমোঘ বীর্যশালী নীতি। বহু ঋষি-মহর্ষি-আচার্য-কুলপতি থাকা সত্বেও প্রাচীন ভারতে যে সমাজধর্ম্মের শাশ্বত জীবননীতি সমগ্র সমাজকে পরিচালিত করিত এবং সকলেই যাহার কাছে মাথা নোয়াইতেন, সেই সমাজধর্ম্মের প্রচার-প্রসার আজ একান্ত আবশ্যক। এই সাধনা এযুগে কিভাবে আসিবে বা কতটি আসিবে, জন্মগত হইবে না গুণকর্ম্মগত হইবে, অথবা কতটা জন্মগত ও কতটা গুণকর্মগত হইবে, নূতন যুগে কিভাবে তাহার ক্রমবিকাশ ঘটিবে, এ সব প্রশ্নের আলোচনা নিরর্থক। কারণ, ভারতের সমাজধর্ম্ম-সাধনার বৃক্ষটি পুনরুজ্জীবিত হইলে তাহা শাখা-পল্লব বিস্তার করিবে মহাপ্রকৃতিরই নিয়মে। তখন তাহাই হইবে স্বাভাবিক এবং সুফলপ্রসূ, সুতরাং সহজেই সকলেরই গ্রহণীয়। কিন্তু জাতীয় কল্যাণে ইহা যে আজ একান্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে 'প্রাচীন-পন্থী' ও 'নবীন-পন্থী' মহাপুরুষদের মধ্যেও দ্বিমত নাই। * এই প্রয়োজন শুধু হিন্দু সমাজের জন্য নয়, ভারতীয় মহাজাতিগঠনের জন্যও বটে। হিন্দুসমাজে ধর্মের আদর্শ স্থাপিত না হইলে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে মহামিলনের আদর্শও প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ বারংবার একথা বলিয়াছেন। ভারতীয় মানবধর্মের মূল 'হিন্দু'-ধর্মকে আজ একান্তই ব্যক্তিগত সাধনা করিয়া রাখার ফলে 'হিন্দু'-ধর্ম

---

* শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্র, 'শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্গল' (ঠাকুর বরদাকান্ত প্রণীত) এবং স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দ্রষ্টব্য।

ও সমাজের সহিত অন্যান্য ধর্ম ও সমাজের স্বাভাবিক মিলন-সমন্বয় ঘটিতেছে না, একথা আমরা 'সমাজ-সংস্কৃতি' অধ্যায়ে বলিয়াছি। (পৃঃ ১০৫-৬)।

কিন্তু হিন্দুসমাজের এই 'সংস্কার' যাঁহারা রাজনৈতিক একতার তাগিদে করিতে যাইবেন তাঁহাদের আমরা রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী স্মরণ করাইয়া দিব। 'পূর্ব্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানা জাতি যে একত্রে মিলিবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিক্যাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে জিনিষটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্ব্বত্রই বাধা পাইতেছে; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতেছে। ......সেই ধর্মবুদ্ধি হইতে এই মিলনচেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে।' পুনশ্চ—'ভারত-বর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকে সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্‌বোধিত করিতেছে না, এই জন্য অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না।' তাই তিনি বলিয়াছেন—'সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে

হইবে।' আমরা বলি জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনা ও জাতীয় 'স্বধর্ম' সাধনা, প্রাচীন সমাজধর্মের এই দুইটি মূল নীতির ভিত্তিতে নূতন সমাজসংগঠনই সেই শক্তি-উদ্বোধনের উপায়।

এতক্ষণ আমরা পরিবার, রাষ্ট্র, শিক্ষায়তন ও সমাজ এই চারিটী গোষ্ঠীজীবনের (group-life) আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করিলাম যে, ব্রহ্মচর্যভিত্তিক সমাজধর্ম্মই ভারতের জাতীয়জীবনের পুনরুজ্জীবনে সমর্থ। কিন্তু এই 'ব্রহ্মচর্যভিত্তিক সমাজধর্ম্ম' বলিতে কেহ যেন একটা অসম্ভব, অবাস্তব, অজাগতিক ধর্মীয় আদর্শবাদের কথা না ভাবেন। বস্তুতঃ বৈদিক যুগ হইতে 'গুপ্ত' যুগের শেষ পর্য্যন্ত সহস্রাধিক বর্ষকাল যে জীবন্ত ভারতীয় সমাজধর্ম্মের ধারা জাতীয়জীবনের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আমরা প্রবাহিত দেখিতে পাই, তাহাতে কোনও অপার্থিব ধর্মীয় আদর্শবাদই সব কিছুকে স্বর্গীয় ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল একথা অলীক কল্পনা মাত্র। জীবন জীবনই এবং সমাজজীবন চিরদিনই ভালমন্দের সংমিশ্রণে গঠিত। জাতীয় জীবনে আধ্যাত্মিক আদর্শের অর্থ এই নয় যে সকলেই 'দেব-দেবী' হইয়া মর্ত্ত্যধামে বিচরণ করিবে। এইরূপ কাল্পনিক আদর্শবাদ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে যুগের মানুষেরও একটা বিরাট অংশ নানাবিধ মানবীয় ভোগস্পৃহা, কামকামনা, এমনকি অনাচার-ব্যভিচার ইত্যাদির মধ্য দিয়াই সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করিত। ধন-মান-শিল্প-কাব্য-প্রমোদ-বিলাস-নৃত্যগীত-যুদ্ধ-বিগ্রহ এই সবই সেযুগের জীবনকেও নানাভাবে আজিকার মতই বেদনাময় বৈচিত্র্যের রসে রসায়িত

করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তবুও একথা অভ্রান্ত সত্য যে সব কিছু সত্বেও একটি ঊর্দ্ধগামী ব্রহ্মমুখী স্রোত সমাজজীবনের মধ্য দিয়া অনন্তের মুখে উৎসারিত হইয়াছিল। একটা ব্যাপক মনুষ্যত্বের ও পবিত্রতার আদর্শ গৃহে-পরিবারে, বিদ্যায়তনে, রাষ্ট্রে ও সমাজে চিরভাস্বররূপে বিরাজমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা 'গুপ্ত যুগের' কথাই ধরিতে পারি যাহাকে, Dr. K. M. Munshi, 'The Golden Prime of India' বা 'ভারতের উজ্জ্বলতম সুবর্ণ যুগ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। * তিনি বলিয়াছেন—The Gupta Emperors became the symbols of a tremendous national upsurge. Life was never happier, our culture never more creative than during the Golden Prime of India', অর্থাৎ—'গুপ্ত সম্রাট্গণ একটা বিরাট্ জাতীয় মহাজাগরণের প্রতিভূরূপে দেখা দিয়াছিলেন। ভারতের এই উজ্জ্বলতম সুবর্ণ যুগ অপেক্ষা আর কোনও সময়ে জীবন এত সুখী, আমাদের সংস্কৃতি এত সৃজনীশক্তিসম্পন্ন ছিল না।' বস্তুতঃ এই যুগে ভারতীয় জাতীয়জীবন ও সমাজজীবনের যে ঐতিহাসিক চিত্র আমরা পাই তাহা এই সহস্রাধিক বৎসর পরেও যে কোনও আধুনিক সভ্যজীবনের আনন্দমুখরতা ও প্রাণোচ্ছলতাকে ম্লান করিয়া দেয়। উক্ত ইতিহাস গ্রন্থে Dr. U. N. Ghoshal ভারতীয় সমাজজীবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন আধুনিক ভারতের

*—Foreward : History and Culture of the Indian People —Vol III.

নাগরিক জীবনের চিত্র তাহারই ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হয়। প্রাণশক্তিতে ভরপুর স্বাধীন জাতির সমাজজীবনে ইহাই স্বাভাবিক। বৈদিক ও রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগেও ইহার অপ্রতুলতা ছিল না। কিন্তু তাহা সত্বেও এই যুগে ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদির বিধিবিধানকে গুরুত্ব দিয়া অনুসরণ করা হইত। ব্যতিক্রম সেই নীতিকেই প্রমাণিত করে মাত্র। এই যুগের ভারতীয় জনসাধারণের বর্ণনা দিতে গিয়া নির্ভরযোগ্য চৈনিক পরিব্রাজক Hiuen Tsang বলিয়াছেন—'ইহারা ব্যস্তবাগীশ, ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক, কিন্তু নৈতিক চরিত্র ইহাদের পবিত্র। ইহারা প্রবঞ্চনা জানে না এবং প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পালন করে।' 'অন্যত্র তিনি ব্রাহ্মণদিগকে পবিত্রতম জাতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণদের সংযম-ব্রহ্মচর্যময় জীবন এবং ক্ষত্রিয়দের পরকল্যাণ ব্রত এবং দয়া ও ক্ষমাশীলতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।' * অথচ এই যুগেই ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল, ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিল এবং 'বৃহত্তর ভারতে' রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারসাধন করিয়াছিল। এই যুগে বিভিন্ন ধর্ম্মের ও ধর্ম্মমতের মধ্যে ভারতীয় সমাজজীবন ও সংস্কৃতি এক জীবন্ত সমন্বয়ের দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছিল। § সুতরাং ঐহিক জীবনের মধ্যেই ভারত আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে সক্ষম, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

---

* —History and Culture of the Indian People, Vol III.

§ —Ibid, Chapters XVIII, XXII, XXIV, by Dr. R. C. Majumdar.

পঞ্চম অধ্যায়

শাস্ত্র ও সাহিত্য।

মানবীয় ধর্ম্মসাধনায় ব্রহ্মচর্যের সার্থকতার প্রসঙ্গে এইবার আমরা ভারতীয় আধ্যাত্মিক শাস্ত্র এবং ইতিহাস-পুরাণ ও কাব্য-সাহিত্য গ্রন্থাদির আলোচনা করিব। ইহার সহিত অন্যান্য ধর্ম্মমতের সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যেরও কিছু সমাবেশ থাকিবে।

প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মস্রোতের মূল উৎসব বেদ। অনেকের ধারণা বেদের মধ্যে শুধুই যাগযজ্ঞ-স্তবস্তুতির কথা, ব্রহ্মচর্যের কোনও কথা সেখানে নাই। এমনকি আধুনিক শিক্ষিত-উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি 'হিন্দু' ধর্ম্মের সার উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের কথা নাই, আছে শুধু উচ্চাঙ্গের তত্ত্বালোচনা। এই সব মারাত্মক ভ্রমের সর্ব্বাগ্রে নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

প্রথম কথা, ব্রহ্মচর্য কথাটির উৎপত্তিই বেদকে লইয়া। যে বেদের মধ্যে সুমহান্ আধ্যাত্মিক জীবনের স্রোত উৎসারিত হইয়াছে এবং যজ্ঞক্রিয়া ও স্তবস্তুতির মধ্য দিয়া সেই মহাজীবনের স্রোতকে জাগতিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রবাহিত করা হইয়াছে, সেই বেদেরই অপর নাম ব্রহ্ম। জীবনরহস্যের মূলেও যে মহাসত্য বিরাজ করিতেছেন তিনিও ব্রহ্ম। সুতরাং জীবনের মূল সত্যকে আশ্রয় করিয়া জীবন পথে চলিবার কথাই বেদে রহিয়াছে এবং এই বেদব্রহ্মকে ধরিয়া চলাই ব্রহ্মচর্য। এজন্য সমস্ত বৈদিক

সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'তান্ সর্ব্বান্ ব্রহ্ম রক্ষতি ব্রহ্মচারিণি আভৃতম্ ।' অর্থাৎ—'তাহাদের সকলকে ব্রহ্মচারীর মধ্যে সমুৎপন্ন ব্রহ্ম (ব্রহ্মজ্ঞান) রক্ষা করেন ।' ব্রহ্মচর্যের ইহা অপেক্ষা আর কি উচ্চতর প্রশংসা হইতে পারে ? ছাত্রের এই ব্রহ্মচর্যের তপস্যা এমন কি আচার্যকেও ধারণ করিয়া থাকে—'তপসা পিপর্ত্তি ।' এখানেও আমরা প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য-মূলক শিক্ষানীতির উদার আত্মিক ভাবটী দেখিতে পাই—ইহা গুরু-শিষ্যের মিলিত জীবনসাধনা । ১৯।৪১ এ ব্রহ্মচর্যকে 'তপোদীক্ষা' বলা হইয়াছে । ১৯।৬৪ তে শ্রদ্ধা, মেধা, প্রজ্ঞা, ধন, আয়ু এবং অমৃতত্বের জন্য ব্রহ্মচারীর প্রার্থনা রহিয়াছে । বেদে এবং উপনিষদেও আধ্যাত্মিকতার সহিত জাগতিক জীবনের এই সমন্বয় এক মহাজীবনের ইঙ্গিত বহন করে । ১০।৫।১৮ তে কুমারীদেরও ব্রহ্মচর্যের কথা রহিয়াছে । বিবাহিত জীবনের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ পিতৃগৃহে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়া তাহারা উপযুক্ত জ্ঞানবান্ বর লাভ করিত । * ডাঃ মুখার্জি ঋগ্বেদের মধ্যে ২৩ জন ব্রহ্মবাদিনীর নাম করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'The *Brahmavadinis* were the products of the educational discipline of *Brahmacharya* for which women also were eligible', অর্থাৎ—'ব্রহ্মচর্যরূপ শিক্ষা-সংস্কারের ফলেই ব্রহ্মবাদিনীগণের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল, কারণ নারীরাও ইহা লাভ করিতে পারিতেন ।' যজুর্ব্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬।৩।১০।৫) ব্রহ্মচর্যসহায়ে

* —ঋগ্বেদ ৫।৭।৯; ৩।৫৫।১৬; যজুর্ব্বেদ ৮।১; অথর্ব্ববেদ ১১।৬

বৈদিক অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মধ্য দিয়া ঋষিঋণ পরিশোধের কথা পাই। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতির ব্রহ্মচর্যশিক্ষার সম্বন্ধে আমরা 'সমাজ ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সকলেই যে এই মূল মনুষ্যত্বসাধনার আদর্শকে (যাহাকে ব্রাহ্মণ্যসাধনা বলা হইত) অনুসরণ করিত সে কথাও আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যজুর্ব্বেদে (২৬।২) এই বৈদিক জ্ঞান সমাজের সকল স্তরের সকল জাতির মধ্যে বিতরণের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। § ঋগ্বেদে (১০।১০৯।৪ ইত্যাদি) মুনি এবং ঋষিগণের কঠোর তপঃসাধনার কথা রহিয়াছে। এই তপস্যার ফলেই 'সত্য ও ঋত'কে লাভ করা সম্ভব হইত। ইহাই ব্রহ্মচর্য।

অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মচর্যের প্রাধান্যতঃ বর্ণনা থাকা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে ইহা ত্রয়ীর বাহিরে অভিচারক্রিয়াদির বেদ হইলেও বহু উচ্চাঙ্গের চিন্তারও ধারক। প্রামাণ্য ও প্রাচীন প্রধান-প্রধান উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে মুণ্ডক, প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। সুতরাং অথর্ব্ববেদের ব্রহ্মচর্যপ্রশংসা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

এখন আমরা উপনিষদে ব্রহ্মচর্য এবং প্রাসঙ্গিক যৌন-সম্পর্কের যে সন্ধান পাওয়া যায় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্তি হইতেছি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনাসূত্রে স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের মূল যে আত্মার বা আদিপুরুষের মানসক্রিয়া সে কথা

§ —'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ....ইত্যাদি।'

শুনিতে পাই (১।৪।৩)। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও পাই—'মন এবাস্য আত্মা, বাগ্ জায়া, প্রাণঃ প্রজা, চক্ষুর্মানুষং বিত্তম্........', অর্থাৎ – 'মনই প্রকৃতপক্ষে ইহার (পূর্ণতাকামী মানুষের) আত্মা, বাক্শক্তি ইহার স্ত্রী, প্রাণ ইহার সন্তান, চক্ষু ইহার মানুষী সম্পদ্.........' (১।৪।১৭)। Dr. Radhakrishnan ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'The ignorant man thinks that he is incomplete without wife, children and possessions.' * অর্থাৎ—'অজ্ঞান ব্যক্তি স্ত্রী, সন্তান, ধন-সম্পদ্ না থাকিলে নিজেকে অপূর্ণ মনে করে।' এইরূপ চিন্তাধারার মধ্যে আমরা জাগতিক কাম-কামনার আধ্যাত্মিক রূপের ইঙ্গিত পাই। ইহাই ঔপনিষদিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য—ইহা স্থূল জীবনকে অস্বীকার করে না, কিন্তু সূক্ষ্ম জীবনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। এজন্য স্ত্রীপুত্রবিত্তাদির প্রতি ভালবাসার পিছনে যে আত্মার প্রতি ভালবাসাই আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেছে ইহা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। § যৌনকাম, ধনকাম ইত্যাদির মধ্যে এই অন্তর্ম্মুখী বুদ্ধিই ব্রহ্মচর্যের গোড়ার কথা। উপনিষদে যে স্ত্রীবর্জ্জনকেই ব্রহ্মচর্য বলা হয় নাই তাহারও কারণ এইখানে। কিন্তু ঐ যুগে মানুষের জীবন ও চেতনা এমন সহজ ও স্বাভাবিক ছিল যে ব্রহ্মমুখী উর্দ্ধগতির জন্য ব্রহ্মচর্য এবং সন্তানপ্রজননের মধ্যে কোনও বিরোধের প্রশ্ন ছিল না। যৌনমিলন ছিল মহা-

* —The Principal Upanishads, by S. Radhakrishnan : Pg. 173. § —বৃহদারণ্যক, ১।৪।৮; ২।৪।৫।

প্রকৃতির নিয়মের আনুগত্য। আজিকার জগতে কৃত্রিমতা এবং আত্মসচেতনতা (self-consciousness) যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে যৌননীতি বা ব্রহ্মচর্যের প্রশ্নও রূপান্তরিত আকারে দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু সে যুগে কেন নরনারীর যৌনমিলনের কথা স্বচ্ছন্দে বর্ণিত হইতে পারিয়াছে, তাহার উত্তর এইখানে। সুতরাং এ যুগে অ-সত্যদর্শী বুদ্ধিবাদিগণের হস্তে উপনিষদের এবং সাধারণভাবে ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের যৌনবর্ণনার অপব্যাখ্যার সম্বন্ধেও সজাগ থাকিতে হইবে। তারপর এই উপনিষদেই (৪।৪।২২) আমরা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা 'ব্রাহ্মণ'ত্ব লাভ করার কথাও পাই। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহসা গৃহত্যাগের কথাও আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, প্রাচীন ভারতের জাতীয়জীবনের মূল ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্যসাধনার মধ্যেও আমরা প্রকারান্তরে এই তিনটি জিনিষই পাই, অর্থাৎ—আচার্যসেবা, মৈথুনবর্জ্জন এবং ভিক্ষাহরণের মধ্য দিয়া প্রভুত্বকাম, যৌনকাম এবং ধনকামের নিবৃত্তিসাধনা। ইহার পর বৃহদারণ্যকে রেতঃপদার্থের সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক তত্ত্বদৃষ্টির বিষয় (৩।৭।২৩) আমরা 'জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব' অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৩৪)। অমৃতস্বরূপ আত্মাই সব কিছুর মধ্যে নির্লিপ্তরূপে ও অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান, এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিই উপনিষদের সার। যৌনজীবনের ক্ষেত্রেও ইহা সমান সত্য। অন্য যে কোনও দৃষ্টিই দুঃখের কারণ—'অতোঽন্যদার্তম।' এই উপনিষদেই (৬।৪।৩) নরনারীর

যৌনমিলনের সম্বন্ধে একটি অসাধারণ যজ্ঞীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কথাও রহিয়াছে। এবিষয়েও আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। বস্তুত, বলিষ্ঠ স্বভাবচেতনা বা সহজচেতনা ছাড়া এরূপ ধারণা ও তাহার বর্ণনা অসম্ভব। এ যুগের আত্মসচেতন নীতিবাগীশতা (self-conscious morality)-সম্বন্ধে যাঁহারা বীতস্পৃহ এবং যৌনজীবনকে যাঁহারা সহজ, স্বাভাবিক জীবনরূপে গ্রহণ করিতে চান্ তাঁহাদের ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সহজ-স্বাভাবিক 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রই একমাত্র ধর্মীয় শাস্ত্র যাহাতে বাস্তব দৃষ্টি লইয়া যৌনকামনাকে সত্যকার সহজ-স্বাভাবিক করার সাধনা এবং ক্রমশঃ তাহার নিবৃত্তির সাধনাও বিহিত হইয়াছে—'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।' এই যজ্ঞীয় দৃষ্টিতে যৌনক্রিয়াকে 'বাজপেয়' যজ্ঞের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং সমান মহাফলপ্রদ বলা হইয়াছে। Dr. Radhakrishnan-এর ভাষায়—'The sexual act is explained as a kind of ritual performance, the elements of which are indentified with the parts of the woman's body.', অর্থাৎ—'যৌনক্রিয়াকে একপ্রকার যজ্ঞক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং যজ্ঞাঙ্গগুলিকে নারী-অঙ্গের সহিত অভিন্নরূপে দেখা হইয়াছে।' এই যজ্ঞদৃষ্টিবর্জিত ভাবে স্ত্রীসংসর্গের ফলে লোকে আদর্শমানুষোচিত (ব্রাহ্মণোচিত) জ্ঞান-কর্ম্ম বল হারাইয়া থাকে ইহা বলা হইয়াছে—'বহবো মর্যা ব্রাহ্মণায়না নিরিন্দ্রিয়া বিসুকৃতো.........' (৬।৪।৪)। ইহারই

পরে ৬।৪।৫-এ আমরা সে যুগের মনুষ্যত্বসাধনায় জাগ্রত বা সুপ্ত অবস্থায় রেতঃ স্কন্দিত হইলে তাহাকে 'আদান' বা পুনরাহরণের সংকল্প এবং মন্ত্রপ্রক্রিয়া দেখিতে পাই। গ্রহণপ্রক্রিয়ার সহিত এই মন্ত্রপাঠের বিধান রহিয়াছে—'যন্মেহদ্য রেতঃ পৃথিবীমস্কান্ৎসীৎ যদোষধিরপ্যসরৎ যদপঃ। ইদমহং তদ্রেত আদদে পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ম্ পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ।' এই মন্ত্রে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—রেতঃপদার্থকে স্কন্দিত অবস্থায় পৃথিবী, ওষধি, জল ইত্যাদি প্রাকৃতিক তত্ত্বে মিলিত হওয়ার কল্পনা এবং 'তেজঃ ও জ্যোতি'কে ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা। সমস্ত ব্যাপারটিতে সে যুগের জীবনদর্শন ও রহস্যবাদ সুপরিস্ফুট। বিশ্বের প্রাকৃতিক জীবন এবং মানুষের দৈহিক জীবন, এই দুই-এর মধ্যে একটি গভীর ঐক্য বা সমসূত্রতা সে যুগের চিন্তাধারায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। পরবর্ত্তী যুগের যোগসাধনা বা তন্ত্র-সাধনাদিতে মনুষ্যদেহের বিভিন্ন অংশে বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন তত্ত্বের সন্নিবেশের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যাহা হউক, এই রহস্যের উপর নির্ভর করিয়াই মন্ত্রে স্কন্দিত রেতঃকে আদানের সংকল্প ব্যক্ত হইয়াছে। ভারতের জনজীবনে ব্রহ্মচর্যসাধনায় এই মন্ত্র বৈদিক যুগ হইতে সুপ্রচলিত (মনুসংহিতা, ২।১৮১ ইত্যাদি)। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে বর্ত্তমান কালে আমরা সাহিত্যে ও কাব্যে এবং বাস্তব জীবনে প্রকৃতির সান্নিধ্য বজায় রাখিয়া চলি, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করি কিন্তু প্রকৃতির মধ্য হইতে এই বিপুল প্রাণশক্তি আহরণের উপায়ের কথা ভাবি না। বর্ত্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আরও বক্তব্য এই যে প্রাচীন কাল হইতে

জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনায় জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃস্খলনের সম্ভাবনা ও সমস্যা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু এই জাতীয় জীবন-সাধনায় বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়া রিপু-ইন্দ্রিয়ের সহিত সংগ্রামের সংকল্প ও মনোভাবের উপরই জোর দেওয়া হইত। পরিপূর্ণ বীর্যসংযম চরম লক্ষ্য হইলেও তাহার জন্য ক্রমাগত সাধনাই ছিল আদর্শ নীতি। নচেৎ, স্মৃতি বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদিতে এই উপনিষদের অনুসরণে অবকীর্ণী-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকিত না। এই সাধনার পথে ক্রমসাফল্য ছিল সুনিশ্চিত এবং তাহাই ভারতীয় সমাজজীবনে ব্রহ্মচর্যসাধনার বাস্তবরূপ। ব্রহ্মচর্যের নামে জাতীয় জীবনে ধর্ম্মভাবপ্রবণ অতিশয়োক্তি প্রচারিত হইলে তাহার অবাস্তবতাই সমধিক প্রতিপন্ন হইবে এবং তাহার ফলে ব্রহ্মচর্যবিষয়ে একটা নৈরাশ্য-বাদী মনোভাবই গজাইয়া উঠিবে। অথবা বীর্যসংযমের প্রচেষ্টা একটা মানসিক বিকৃত-বিভীষিকা (Hypochondria) উৎপন্ন করিবে। ব্রহ্মচর্যসাধনার পক্ষে ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। গান্ধীজী জাতীয়জীবনে ব্রহ্মচর্যসাধনেচ্ছু তরুণদের এবিষয়ে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—Those who believe in self-restraint must not become hypochondriacs', অর্থাৎ—যাহারা রিপুদমন-ইন্দ্রিয়সংযমে বিশ্বাস করে তাহাদের অযথা আতঙ্ক-নৈরাশ্যগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।' * ব্রহ্মচর্য-সাধনায় এইরূপ কল্পনাবাদী মানসিক বিকারই আধুনিক যুগে Havelock Ellis, Freud ইত্যাদির যৌনসংযমবিরোধী

* —Preface : Self-Restraint V. Self-Indulgence.

তত্ত্ব-প্রচারকে সম্ভব করিয়াছে। এই দৃষ্টিতে তাঁহারা কতকটা ঠিক্ ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মচর্যসাধনা ভারতের প্রাচীন যুগে একটি বাস্তব জীবনাদর্শ ছিল, সুতরাং যৌনজীবনে সংযমসাধনায় প্রাকৃতিক বাধাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই দেখা হইত। সমগ্র বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত-গৃহ্যসূত্র-স্মৃতি-পুরাণাদিতে স্বাভাবিক জাগতিক জীবনেও ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের চতুর্ব্বর্গ ফললাভের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক সংযমের উপায় হিসাবে ব্রহ্মচর্য বিহিত হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই সংযমসাধনা ইন্দ্রিয়জীবনের সহিত রফা করিয়া চলা নয়, ইহা ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব জৈব চেতনার আমূল রূপান্তরের সাধনা। ইহা রিপু ইন্দ্রিয়ের জীবনের উপর সংযমের প্রবল প্রভাব বিস্তার। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আজীবন সংযমের সংগ্রামশীলতাই ইহার প্রাণ। সাধনাই এখানে সিদ্ধি, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।' ব্রহ্মচর্যের মহাসিদ্ধসাধক আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ এজন্য সংগ্রামের উপর জোর দিয়া বলিয়াছেন—'দুর্ব্বলতা আসাই অপরাধ নয়, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়াই অপরাধ', অথবা 'যেখানে সংগ্রাম নাই, সেখানে সাধনাও নাই' এবং অপ্রত্যাশিত কামভাবের আক্রমণে বিব্রত-বিচলিত না হইবার জন্যই উপদেশ দিয়াছেন। সকল মহাপুরুষেরই এই একই কথা। পরবর্ত্তীযুগের সাধনায় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ঘৃণার ভাবও বৃহদারণ্যকের যুগে দেখা যায় না। ৩।৯।১১এ আমরা দেখি 'সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়ণম্' অর্থাৎ সমস্ত জীবাত্মার পরম অবলম্বনরূপে যে 'পুরুষ'-এর ধারণা দেওয়া হইয়াছে সেখানে 'কামময় পুরুষ'-এর উল্লেখ করিয়া

স্ত্রীলোককে তাহার দেবতা বলা হইয়াছে—'তস্য কা দেবতা ইতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ।' উপনিষদের সর্ব্বত্র এই স্বাভাবিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে এই স্বাভাবিক বাস্তব জীবনকে রূপায়িত করিবার সাধনারূপে ব্রহ্মচর্যও সেখানে বিহিত। অসংযত ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবন উপনিষদের মতে আত্ম-ঘাতী, অস্বাভাবিক জীবন। বৃহদারণ্যকে ৬।৪ এর কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে যজ্ঞদৃষ্টিতে যৌনমিলনের নিঃসঙ্কোচ বর্ণনা রহিয়াছে শুধু তাহা নহে, আকাঙ্খিত গুণসম্পন্ন পুত্রকন্যা প্রজননের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এখানে বীর্যবান্ সংযমশক্তিসম্পন্ন পুরুষের যৌনজীবনের যে বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কারণ, ব্রহ্মচর্যভিত্তিক সে যুগের জীবনে নরনারীর যৌনসম্পর্কে পরবর্ত্তী-যুগের বা আধুনিক কালের লালসা বা বিতৃষ্ণা কোনওটার স্থান ছিল না। আজ স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ যৌনজীবনের আশায় দেশে-বিদেশে যে নানা অসংযত-উদ্‌ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারিত হইতেছে ও নির্ব্বিচারে অনুসৃত হইতেছে, বৃহদারণ্যকের বাস্তব, স্বস্থ দৃষ্টিভঙ্গী সেক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। প্রসঙ্গক্রমে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে যৌনমিলনে স্ত্রীলোকের উপর যে নিপীড়নের তত্ত্ব ইঙ্গিতে সেখানে সন্নিবেশিত হইয়াছে (৬।৪।৭), তাহাও আজ বিশ্ববিখ্যাত যৌনমনস্তত্ত্ববিৎ Havelock Ellis-এর সমর্থন পাইতে পারে। ঔপনিষদিক ধর্ম্ম সবদিকে কতখানি বাস্তবনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ ইহা তাহারই প্রমাণ। অথচ সব কিছুর পিছনে ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যের অভিমুখী জীবনই উপনিষদের প্রাণ-

বস্তু। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহিত 'শান্ত-দান্ত-উপরত-সমাহিত' হওয়ার নিবিড় সম্পর্কের কথাও আমরা এই উপনিষদে (৪।৪।২২) পাই। বলা বাহুল্য উহাই ব্রহ্মচর্যের লক্ষণ। তারপর ৫।২ 'ব্রাহ্মণে' আমরা বিখ্যাত 'দেবাসুরমনুষ্য'গণের কাহিনীতে 'দাম্যত-দত্ত-দয়ধ্বম্' এই তিন 'দ' এর শিক্ষা শুনিতে পাই। তাহারও মধ্যে 'দাম্যত', অর্থাৎ রিপু-ইন্দ্রিয়ের সংযমই দিব্যজীবনের উপযুক্ত সাধনা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ 'ব্রাহ্মণ'-এর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেখানে অথর্ব্ববেদের উপযুক্ত বশীকরণ-প্রজননাদির ক্রিয়া বিবৃত হইলেও যৌনব্যাপারে একটা আসক্তিহীন, লালসাহীন তেজস্বী ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। যৌনসংযোগের পূর্ব্বে যে অপূর্ব্ব বিশ্বকল্পনা এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ দিব্য-প্রার্থনার পরিচয় আমরা পাই (৬।৪।২০, ২১, ২২) তাহা সন্তানপ্রজনন-ক্রিয়াকে এক লোকোত্তর মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তোলে। —'সামোহমস্মি ঋক্ ত্বম্, দ্যৌরহম্ পৃথিবী ত্বম্ .....তাবেহি সংরভাবহৈ, সহ রেতো দধাবহৈ......বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু, ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু..... আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ, ধাতা গর্ভং দধাতু তে .....' ইত্যাদি। অর্থাৎ—'আমি সাম তুমি ঋক্, আমি আকাশ তুমি পৃথিবী,...... এস, আমরা দুইজনে রেতোমিলনে নিযুক্ত হই। ......বিষ্ণু গর্ভ প্রস্তুত করুন, ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) রূপ নির্ম্মাণ করুন......প্রজাপতি (ব্রহ্মা) সিঞ্চন করুন, বিধাতা তোমার জন্য বীজ স্থাপন করুন......'এবং অবশেষে গর্ভিণী মাতার মহতী প্রশংসা—'বীরে বীরমজীজনৎ', 'বীরনারী তুমি, বীরের জন্ম দিয়াছ।'

বৃহদারণ্যকের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে একবার আমরা নরনারীর মিলিত ভাবের যে বর্ণনাচিত্র এখানে এবং অন্যত্র স্থানে স্থানে পাই, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চাই। যৌনমিলনের ক্রিয়াকে কিরূপ ঋজু ও বলিষ্ঠভাবে সে যুগে গ্রহণ করা হইত সে কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু নরনারীর কামমিলিত 'যুগনদ্ধ'-রূপের মধ্যে যে 'সামরস্যের সাধনা'র উপাদান তান্ত্রিকগণ পাইয়া থাকেন তাহাকে এই সব উপমাচিত্রের সহিত সংশিষ্ট করার কোনও যৌক্তিকতা নাই। পরবর্ত্তী যুগে বৌদ্ধতন্ত্র বা হিন্দুতন্ত্র বা সহযজান ইত্যাদি মার্গের সাধনা বৈদিক বা ঔপনিষদিক যুগের ঋজুজীবনের শক্তিসাধনা হইতে পৃথক্। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরবর্ত্তী যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মানুষ উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে আত্ম-সচেতন (self-conscious) হইয়াছে। এজন্য যৌনব্যাপার লইয়া অতিকামসাধনার যে প্রবণতা অথবা প্রয়োজনীয়তা পরবর্ত্তীযুগে দেখা দিয়াছে অথবা যে অতিকামভাব অতীন্দ্রিয় সত্যের রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে (যথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায়, মধ্যযুগের কোনও কোনও খৃষ্টীয় অথবা স্থফী সম্প্রদায়ে) তাহাদের সহিত বেদ-উপনিষদ্‌যুগের ঋজুচেতনার অতীন্দ্রিয়ভাবুকতার কোনও সাদৃশ্য নাই। বেদের মধ্যে অনেক জায়গায় দেবোদ্দেশে যজ্ঞকারীর অথবা দেবতাদের নিজস্ব ব্যাপারে চিত্তের তন্ময়তা বা ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করার জন্য নরনারীর কামাকর্ষণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। * কিন্তু

* —ঋগ্বেদ১।১১৫।২; ৩।৩৩।১০; ৪।৩২।১৬; ৪।৫৮।৮, ৯; ৯।৯৩।২ ইত্যাদি

এগুলি গভীর ঐকান্তিকতার উপমা মাত্র, যৌনভাবুকতা বা কামভাবুকতার লক্ষণ নহে। এজন্য, এরূপস্থলে আমরা অন্যান্য ভাবের উপমাও দেখিতে পাই, * এমনকি পাশাপাশি দুই প্রকার ভাবের, যথা সন্তানের প্রতি মাতার আকুল স্নেহ এবং নরের প্রতি নারীর আকর্ষণের কথা, § অথবা শুধু পুত্রের প্রতি জননীর আকর্ষণের কথাও পাই। † বিশেষতঃ যে মহীয়ান্ দিব্যজীবনের অভিমুখে বেদ-উপনিষদের জীবনধারা প্রবাহিত তাহার মধ্যে আধুনিক যুগের যৌনভাবুকতা বা কামভাবুকতা এমনকি মধ্যযুগীয় বামাচারী তন্ত্রসাধনার সাদৃশ্যও কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য-উপনিষদের বামদেব্য সামটির কথায় আমরা এখনি আসিতেছি। বৃহদারণ্যকে (১।৪।৩) 'স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ' এবং 'অয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যাত', অথবা ৩।৯।১১-এ নারীর কথা, অথবা ৪।৩।২১-এ 'প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো' এ-সবের মধ্যে এযুগের বা মধ্যযুগের যৌনমানসিকতার সন্ধান করা চলে না। ৪।৩।২১ একান্তভাবেই যাবতীয় কামনানিবৃত্তির অনুভূতি, যে অনুভূতিতে 'ন কঞ্চন কামং কাময়তে' (৪।৩।১৯), 'কোনও কামের কামনাই থাকে না।'

ইহার পর আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।৪) সর্ব্বদুঃখ-মুক্ত চিরজ্যোতিষ্মান্ ব্রহ্মলোকের বর্ণনায় পাইতেছি—'তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যেনানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ,

---

* —ঋগ্বেদ ৩।৩৬।৭; ৪।১৯।২; ৪।৪১।৮ ইত্যাদি

§ —ঐ ৩।৩৩।১০ † —ঐ ৪।১৯।৫

তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।', অর্থাৎ -'কিন্তু কেবলমাত্র তাহারাই ব্রহ্মলোক লাভ করে যাহারা ব্রহ্মচর্য পালন করে। তাহারা সর্ব্বলোকে স্বাধীন।' ছান্দোগ্য ৮।৫-এ ব্রহ্মচর্যের ব্যাপক মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ ও তপস্যাকে মূলতঃ ব্রহ্মচর্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে— 'ব্রহ্মচর্যমেব তৎ।' এই অংশটীর কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই পথে অমর আত্মাকে লাভ করা যায়—'এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্যেনানুবিন্দতে।' লক্ষ্য করিবার বিষয় এই সব উপনিষদের সর্ব্বত্র যে আত্মলোক বা ব্রহ্মলোকের কথা বলা হইয়াছে তাহা সর্ব্ববিধ মানুষী কামনারও পূর্ণস্বরূপতা, নিত্যতা ও স্বাধীনতার অতীন্দ্রিয় ভূমি। ইহাকে যাঁহারা লাভ করেন—'তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।' বৈদিক ধর্ম্ম এভাবে পূর্ণজীবনের ধর্ম্ম, মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা বা মহা-মুক্তির ধর্ম্ম। 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্'—সেখানে পূর্ণ এখানে পূর্ণ। ব্রহ্মচর্যেই এই ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। এই ব্রহ্মলোকে সমস্ত কামনা বা সংকল্পই সত্যস্বরূপে নিত্যপূর্ণতায় বিরাজ করে। ছান্দোগ্যে 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা' তেও (৩।১৪।২) আমরা এই কথাই পাই। আত্মাকে বলা হইয়াছে—'সত্যসংকল্পঃ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ।' তিনি 'অবাকী, অনাদরঃ'—'নীরব, নির্লিপ্ত' হইলেও সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামনার আধার। ইহাই প্রাচীন ভারতীয় বেদ-উপনিষদ্‌যুগের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-ধারণার বৈশিষ্ট্য। উহা জগৎ ও জীবনকে স্বীকার করিয়া ঊর্দ্ধজগতে ও ঊর্দ্ধজীবনে উঠিতে চায়। ইহা ঈশোপনিষদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে', যাহার বিষয় ইতিপূর্ব্বে আমরা একবার উল্লেখ করিয়াছি। অবিদ্যা এবং বিদ্যা, উভয়কে লইয়া বেদোপনিষদের সাধনা। এই অবিদ্যার জীবন মানুষকে মৃত্যুর ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া রাখে এবং বিদ্যার সাহায্যে অমৃত-জীবনে প্রবেশলাভ করা যায়। কিন্তু ঈশোপনিষদেও এই মহাজীবনলাভের জন্য প্রথমেই সেই একই ব্যবস্থা, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ'—'কামনাত্যাগের মধ্য দিয়া সত্যভাবে ভোগ কর, লোভের চঞ্চলতা রাখিও না।' উপরিলিখিত 'শাণ্ডিল্য-বিদ্যা'র মধ্যেও সেই একই কথা, 'শান্ত উপাসীত'—অশান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া আত্মার বা ব্রহ্মের উপাসনা কর। এই সমস্তই ব্রহ্মচর্যের মূল কথা—রিপু-ইন্দ্রিয়সংযম। ছান্দোগ্য ২।২৩।১-এও অমৃতত্বলাভের জন্য তপস্যা-ব্রহ্মচর্যের কথাই বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞ আচার্যের সমীপে ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভের সামর্থ্য জন্মে একথাও ইন্দ্রবিরোচনের কাহিনীতে (৮।৭) ও অন্যত্র পাওয়া যায়।

এখন আমরা ছান্দোগ্যের বামদেব্য সাম (২।১৩)-এর প্রসঙ্গ দিয়া এই উপনিষদের কথা শেষ করিতেছি। এই সামটী নরনারীর যৌনসঙ্গমে প্রযুক্ত হইয়াছে—'মিথুনে প্রোতম্।' এই ব্যাপারে অনেক সুধীব্যক্তিও তান্ত্রিক বামাচার বা সহজিয়া সাধনপন্থার বীজ বা আভাস খুঁজিয়া পান। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা অযৌক্তিক। এই সামটীর ধারণার সহিত বৃহদারণ্যকের পূর্ব্বকথিত ৬।৪।৩-ইত্যাদিতে যৌনক্রিয়ায় যজ্ঞদৃষ্টির মূলতঃ কোনও পার্থক্য নাই। একটী যজ্ঞাঙ্গ সম্বন্ধীয়, অপরটী

সামগানের (প্রস্তাবাদি) পঞ্চাঙ্গ-সম্বন্ধীয়—এই যা পার্থক্য। মূলতঃ ইহা বৈদিক-ঔপনিষদিক যুগের চিন্তার সাধারণ ধারারই অনুবর্তন। ছান্দোগ্যে (৩।১৭) ক্ষুধ-তৃষ্ণা-আহার-বিহার-হাস্য-মৈথুন-তপস্যা-দান-সত্য-অহিংসা-জন্ম-মৃত্যু সব কিছুকে মিলাইয়া একটী অপূর্ব্ব যজ্ঞানুষ্ঠানের ধারণা করা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, সামগান সম্বন্ধীয় এই দৃষ্টিভঙ্গী যৌনব্যাপার ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক ব্যাপারেও প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা :—পঞ্চবিধ সামোপাসনা লোক, বৃষ্টি, জল, ঋতু, পশু ও প্রাণে প্রযুক্ত হইয়াছে। * সেইরূপ গায়ত্র-সাম প্রাণে, রথন্তর-সাম অগ্নিতে, বামদেব্য-সাম মিথুনে, বৃহৎ-সাম আদিত্যে, বৈরূপ্য-সাম পর্জ্জন্যে, বৈরাজ-সাম ঋতুতে, শকরী-সাম লোকে, রেবতী-সাম পশুতে যজ্ঞাযজ্ঞীয়-সাম দেহাঙ্গে, রাজন-সাম দেবতায় এবং 'তিন-তিন' করিয়া 'সব-কিছুতে' সাধারণভাবে সাম প্রযুক্ত হইয়াছে। § লক্ষ্য করিবার বিষয় এই সব ক্ষেত্রেই যে যে বিষয়ে সামের প্রয়োগে নানাবিধ জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক মহাফল লাভের কথা বলা হইয়াছে সেই সেই বিষয়ে অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের আচরণ না করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বামদেব্য-সামটীও ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সেজন্য ঐ সাম মিথুনে প্রযুক্ত বলিয়া উহাতে কোনও স্ত্রীলোককে অশ্রদ্ধা করার সম্বন্ধেও নিষেধ-সূচক নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বড়ই দুঃখের কথা, এযুগের কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এই সহজ-সরল অর্থ না দেখিয়া ইহাতে যৌনমানসিকতার সন্ধান করিতে তৎপর হন এবং তাহার সমর্থনে

* —ছান্দোগ্য ২।৩, ৪, ৫, ৬, ৭। § — ছান্দোগ্য ২।১১-২১।

পরবর্ত্তীযুগের তন্ত্র বা সহজিয়া মতের সাধনার সহিত ইহার সংযোগ স্থাপন করিতে আগ্রহশীল হন। তাঁহারা বলিতে চান ঐ সামে 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' এর অর্থ—'কোনও স্ত্রীলোককেই বর্জন করিবে না।' আমরা মনে করি বিখ্যাত দার্শনিক ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ইহার সঠিক অনুবাদ করিয়াছেন—'One should not despise any woman', অর্থাৎ—কোনও নারীকেই অবজ্ঞা করিবে না।' বৈদিক যুগের উর্দ্ধমুখী ঋজু জীবনে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত প্রজননকে যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হইত সেই দৃষ্টিতেই বিষয়টীর বিচার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া তন্ত্র-সহজিয়া মতের আলোচনায় আমরা দেখাইব সেখানেও রিপু-ইন্দ্রিয়ের সংযম, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, কত বড় নীতি।

ইহার পর তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথা। সে যুগের সমাজজীবনে ব্রহ্মচর্যের ব্যাপকতা ও প্রাধান্য বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই আমরা সেযুগের আচার্যের বহু ব্রহ্মচারী ছাত্রের আগমন-প্রার্থনায় (১।৪)। এবিষয়ে আমরা উদ্ধৃতি-সহযোগে 'সমাজ ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ে (৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা) বিশদ আলোচনা করিয়াছি। সেখানেও ঐহিক এবং আধ্যাত্মিকের যোগ লক্ষণীয়। ভারতের জাতীয় ব্রহ্মচর্য সাধনা চিরদিন ঐহিক জীবনকে লইয়াই মহাজীবনের সাধনা। ইহারই আমরা বিশেষ নিদর্শন পাই তৈত্তিরীয় ১।৯।১-এ। সেখানে ব্রহ্মচর্য সহায়ে বেদপাঠ এবং বেদপ্রচারের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনগঠনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই। 'স্বাধ্যায়প্রবচনে চ' অর্থাৎ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত একটী একটী করিয়া জাতীয় জীবনপ্রসারের নীতিগুলিকে

সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই জাতীয় জীবনের নীতিগুলি কি? ঋত, সত্য, তপঃ, দম, শম, যজ্ঞাগ্নি অগ্নিহোত্র, অতিথি, মানবতা, প্রজা, প্রজন ও প্রজাতি। অর্থাৎ—খাঁটী হওয়া ও ধর্ম্মপথে চলা, চিন্তাবাক্যকার্যে সত্যপালন করা, তপস্যা বা শারীরিক কঠোরতা, রিপু-ইন্দ্রিয়দমন, মনের প্রশান্তভাব বা সাম্য, দেবোদ্দেশে ত্যাগের জন্য যজ্ঞাগ্নি ও অগ্নিহোত্রে আহুতি, অতিথিসেবা, মানবতার সাধনা, সন্তানসন্ততি, প্রজনন এবং জাতীয় জীবনের বিস্তার। তাহার সহিত (১।১০)-এ রহিয়াছে সংসারবৃক্ষের পরিচালকরূপে নিজের অমৃত আত্মার অনুভূতি—'অহং বৃক্ষস্য রেরিবা .... স্বমৃতমস্মি।' এই বাস্তবধর্ম্মিতাই ভারতের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ যুগে অধ্যাত্মসাধনার একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ীর সহিত প্রীতিপূর্ণভাবে আত্মতত্ত্বের আলোচনা এবং আলোচনান্তে গৃহত্যাগ, ঋষি বশিষ্ঠের সহিত অরুন্ধতী এবং ঋষি অত্রির সহিত অনসূয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সন্তানের অনেক সময় পিতার নিকট বেদজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ (উদ্দালক-শ্বেতকেতু), জননী মদালসার নিজ পুত্রদের 'তত্ত্বমসি'-জ্ঞানদান এবং সংসারত্যাগে উৎসাহদান—এ সবই সেযুগের এক দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত বাস্তব জীবনের সাক্ষ্য। কিন্তু এ সবই ব্রহ্মচর্যহীন সংসারে সম্ভব নয়। তারপর পাই অন্তেবাসী ছাত্রের প্রতি পাঠসমাপনে আচার্যের বিখ্যাত অনুশাসন (১।১১)। এখানেও সেই একই কথা—'সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর.........প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সত্যান্ন প্রমদিব্যম্, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্, কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্'—'সত্য বলিবে, ধর্ম্ম আচরণ করিবে,

সন্তানধারা রক্ষা করিবে, সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না, কুশল হইতে বিচ্যুত হইবে না।' অপিচ 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব, যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি,' অর্থাৎ—'মাতা তোমার দেবতা হউন, পিতা তোমার দেবতা হউন, আচার্য তোমার দেবতা হউন, অতিথি তোমার দেবতা হউন, যে সমস্ত কাজ অনিন্দনীয় তাহাই করিবে, অন্য কিছু (নিন্দনীয় কাজ) করিবে না।' মনে রাখিতে হইবে যে যুগে পিতা-মাতাও আচার্যের মত সন্তানের উর্দ্ধজীবন কামনা করিতেন ইহা সেই যুগের কথা। সংযমহীন যুগে পিতা-মাতা-শিক্ষক এ শ্রদ্ধা দাবী করিতে পারেন না, কার্যতঃ তাহা পাওয়াও যায় না। তারপর, গুরু-আচার্যগণের সেই অনুপম নিরভিমান উদারতার কথা, 'যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি'—'যাহা কিছু আমাদের উত্তম আচরণ তাহাই তুমি অনুসরণ করিবে, অন্য কিছু (দোষনীয় আচরণ) অনুসরণ করিবে না।' বলা বাহুল্য দেশব্যাপী বিভিন্ন গুরু-আচার্যগণের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে আদর্শের আনুগত্য সে যুগে জাতীয় জীবনের সংহতি-শক্তির উৎস ছিল। এ বিষয়ে আমরা 'সমাজ ও সংস্কৃতি' অধ্যায়েও কিছু আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ৮১-৮২)।

কেনোপনিষদে (৪।৮) তপস্যা ও আত্মসংযম; কঠোপনিষদে বালক নচিকেতার ধন-মান-নারীবিষয়ে স্পৃহাশূন্যতা (১।১২৬); এবং 'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি' (১।২।১৫),

এই বাক্যে সত্যলাভের জন্য ব্রহ্মচর্যপালনের কথা এবং (১।২।২৪)-এ 'দুশ্চরিত' অর্থাৎ দুর্নীতিপূর্ণ কাজ বর্জ্জন না করিলে আত্মজ্ঞান লাভ অসম্ভব এই কথা আমরা শুনিতে পাই। এ বিষয়ে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের টীকা শিক্ষাপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন—'So long as we are indulgent to our vices......we cannot get at true knowledge......This verse gives the lie direct to the suggestion sometimes made that the spiritual and the ethical are not organically connected. If we wish to attain the spiritual, we cannot bypass the ethical.', অর্থাৎ—'যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা পাপকে প্রশ্রয় দিই ততক্ষণ পর্যান্ত আমরা সত্যজ্ঞানের নিকট পৌঁছিতে পারি না। ....এই শ্লোকটী, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জীবনের মধ্যে কোনও জীবন্ত যোগাযোগ নাই বলিয়া যে মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়, তাহাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নৈতিক চরিত্রকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।' * মনে রাখিতে হইবে এই শ্লোকেরই অব্যবহিত পূর্ব্বে (১।২।২৩) কৃপাবাদের কথা রহিয়াছে, সুতরাং কৃপাশ্রিত জীবনেও আধ্যাত্মিক সাফল্যের জন্য নৈতিক জীবন বা সংযম-ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তার কথা এখানে রহিয়াছে। বাহ্যিক ইন্দ্রিয়জীবনের পিছনে আনন্দের সন্ধানকে ক্ষুদ্রজনোচিত কাজ এবং মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে

* —The Principal Upanishads : Pg 620.

পড়া বলা হইয়াছে (২।১।২)-এ—'পরাচঃ কামানমুযান্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যান্তি বিততস্য পাশম্।'

ইহার পর আমরা প্রশ্নোপনিষদে আসিলাম। এখানে কয়েকজন তরুণ সত্যান্বেষী ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইল। ঋষি প্রথমেই তাহাদের 'তপসা, ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া'—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কাছে আরও এক বৎসর থাকিতে আদেশ দিলেন, তারপর তাঁহার জ্ঞানমত তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন বলিলেন। রঙ্গরামানুজ § এখানে 'ব্রহ্মচর্যেণ' শব্দের পরিষ্কার প্রচলিত ব্যাখ্যাই দিয়াছেন—'যোষিৎস্মরণ-কীর্তন-কেলি-প্রেক্ষণ-গুহ্যভাষণ-সংকল্পাধ্যবসায়-ক্রিয়ানির্বৃত্তিলক্ষণাষ্টবিধমৈথুনবর্জ্জনরূপ-ব্রহ্মচর্যেণ।' সত্যজ্ঞানলাভেচ্ছুর প্রাথমিক প্রস্তুতিতে সর্ব্ববিধ যৌনসঙ্গবর্জ্জন যে একান্ত প্রয়োজন এখানে তাহা সুপরিস্ফুট। ১।১০-এ পুনরায় 'অমৃতম্ অভয়ম্'-কে লাভ করিবার জন্য 'আত্মবিদ্যা'র ব্যাখ্যাসূত্রে তিনি বলিয়াছেন—'কায়ক্লেশাদিলক্ষণেন তপসা, স্ত্রীসঙ্গরাহিত্যলক্ষণেন ব্রহ্মচর্যেণ, আস্তিক্যবুদ্ধিলক্ষণয়া শ্রদ্ধয়া প্রত্যগাত্মবিদ্যয়া।' সুতরাং স্ত্রীসঙ্গরাহিত্য যে ব্রহ্মচর্যের বিশেষ অঙ্গ এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ১।১৩-তে দিনকে 'প্রাণ' ও রাত্রিকে 'রয়ি' বলা হইয়াছে। সেজন্য দিনে যৌনসঙ্গমে প্রাণের স্খলন ঘটে ('প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দতি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্'), অপরপক্ষে রাত্রিতে বিহিত-কাল হিসাবে এরূপ প্রাণস্কন্দন ঘটে না, সেজন্য উহা ব্রহ্মচর্যেরই সদৃশ ('তে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্‌যদ্ রাত্রৌ

§ —The Principal Upanishads : Pg 651, 654.

রত্যা সংযুজ্যন্তে')। ব্রহ্মচারীর পক্ষে যেমন দিনে না-ঘুমানর বিধান, বিবাহিত গৃহীগণের পক্ষেও সেরূপ দিনে যৌনসঙ্গম না করার বিধান। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখানে বিবাহিত জীবনে স্বাভাবিক-ভাবে সন্তানপ্রজননের ক্রিয়ায় রেতঃ উৎসর্জ্জনকে ব্রহ্মচর্যবিরোধী ধরা হয় নাই। কিন্তু দিবাভাগে তাহা প্রাণস্কন্দনে পরিণত হয় বলিয়া ব্রহ্মচর্যবিরোধী কার্য। স্বাভাবিক সংযত যৌনসঙ্গম যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বাহিরে ব্রহ্মচর্য বলিয়াই গণ্য হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে মনুসংহিতা হইতেও আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১৫৫)। এখানে ইহাও লক্ষণীয় যে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে ব্রহ্মচর্যের মূল দৈহিক স্থূলবস্তুর সংযম মাত্র নয়, প্রধানতঃ তাহা মানসিক সূক্ষ্মভাবের সংযম। এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য, কারণ, দৈহিক স্থূল ধারণার দিকেই অধিকতর মনোযোগ পড়ায় ব্রহ্মচর্য-বিষয়ে এযুগে প্রতিক্রিয়ামূলক সংশয়-নৈরাশ্যের ভাবই প্রবল। বিবাহিত জীবনে এই অস্বাভাবিক মানসিকতা বর্জ্জনের জন্যই প্রশ্নোপনিষদের এই শিক্ষা। মনে রাখিতে হইবে অসংযত অস্বাভাবিক যৌনজীবন এখানের আলোচ্য নয়। কারণ ব্রহ্মচর্যের মহিমা ইহারই কিছু পূর্ব্বে ১।২, ১।১০-এ এই উপনিষদেরই ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মচর্যকে রক্ষার জন্যই বিবাহিত জীবনে কালনিয়ম হিসাবে রাত্রিকালের বিধান দেওয়া হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রশ্নোপনিষদের এই অংশটী লইয়াও এযুগের বুদ্ধিবিপর্যয়ের ফলে কেহ কেহ ইহার অপপ্রয়োগ করেন। কার্যতঃ গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে সমালোচনা করিতে যাইয়া প্রশ্নোপনিষদের এই অংশটীকে

একবার ব্যবহার করা হইয়াছিল। *

প্রধান কয়েকটি উপনিষদ্ হইতে আমরা ভারতের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠযুগে ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। ইহা ছাড়া সাধারণভাবে বলা যায় যে সমস্ত উপনিষদেই আত্ম-সংযমের তপস্যা মনুষ্যজীবনের লক্ষ্যলাভের জন্য বিশেষভাবে বিহিত হইয়াছে।

বেদ-উপনিষদ্ ছাড়া রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-স্মৃতি-সংহিতা-গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি সর্ব্বত্র বেদ-উপনিষদের এই মৌলিক আদর্শ ও নীতি এত ছড়ান রহিয়াছে এবং সেগুলি এত সহজলভ্য যে তাহাদের বিস্তৃত আলোচনা হইতে, একই জিনিষের পুনরুক্তি-বোধে, আমরা বিরত রহিলাম। ঐ সমস্ত শাস্ত্রগুলিকেই মূল বেদ ও উপনিষদের ভাষ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনাসূত্রে ইহা বলা যায় যে রামায়ণের মহা-নায়ক শ্রীরামচন্দ্রকেও বাল্যে গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতে, সুতরাং ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইয়াছিল। § এবং মহাভারতের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও সেই কথা। † ছান্দোগ্য-উপনিষদের 'দেবকীপুত্র কৃষ্ণ'কে যদি আমরা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ধরি তাহা হইলেও তিনি ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন একথা পাই। রামায়ণের কাহিনীতে এবং চরিত্রচিত্রণেও

* —Self-Restraint V. Self-Indulgence : Pg 104.

§ —রামায়ণ ঃ আদিকাণ্ড ২৮।৩৬। † —মহাভারত ঃ সভাপর্ব্ব, ৩৮ অধ্যায় (বঙ্কিমরচনাবলীতে উদ্ধৃত ঃ কৃষ্ণচরিত্র)।

সংযম-ব্রহ্মচর্যের মহিমা এবং নরনারীর কামসম্পর্কের পবিত্রতারক্ষা শাশ্বত মানবধর্ম্মরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কামুক রাবণ ও বালীর পরিণাম এবং পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি সীতা ও লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-পুরাণাদির ও মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কাব্যের কিছু কিছু সমস্যামূলক বিষয়ে আমরা পরে সাহিত্য-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। কিন্তু মহাভারতে ব্রহ্মচর্যসাধনার সম্বন্ধে যাহা আছে তাহার কিছু অংশের এখানে সারসঙ্কলন করিতেছি।

রামায়ণ-মহাভারতের সর্ব্বত্র স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে একটা নির্লিপ্ত পবিত্রতার ও তপস্যার আদর্শ চোখে পড়ে। নরনারীর আসক্ত প্রেম যাহা আজিকার উপজীব্য—তাহা সে যুগের আদর্শের বিপরীত। রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ৪৯ অধ্যায়ে আমরা ভৃগুনন্দন ঋচীকের কাহিনীতে পাই, তিনি স্বীয় পত্নী সত্যবতীর পবিত্রতাগুণে প্রীত হইয়া ('তস্যাঃ প্রীতঃ স শৌচেন') তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে যথাক্রমে ক্ষমতাসম্পন্ন তপস্বী পুত্র এবং দীপ্তিমান্ ক্ষাত্রনিসূদন পুত্র লাভের জন্য যজ্ঞীয় 'চরু' দান করিয়া তপস্যার জন্য অরণ্যে গেলেন। এখানে আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্যের প্রব্রজ্যার কথা মনে পড়ে। প্রীতি ও বৈরাগ্য সবই যেন সে যুগে স্বাভাবিক, কারণ, উভয়ই তপস্যা ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যত্র আমরা পাই ব্রহ্মচারীর আদর্শ সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও 'যাহাতে পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প' সেইরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত, কারণ, 'কি গৃহী, কি রাজা, কি ব্রহ্মচারী কেহই নির্দ্দোষে

ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না' এবং 'এককালে পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ অপেক্ষা অল্পপরিমাণেও উহা করা শ্রেয়স্কর।' * ১৬০ অধ্যায়ে আমরা পাই ইন্দ্রিয়সংযমের প্রশস্তি। পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

'ধর্ম্মস্য বিধয়ো নৈকে যে বৈ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
স্বং স্বং বিজ্ঞানমাশ্রিত্য দমস্তেষাং পরায়ণম্॥'

অর্থাৎ—'ধর্ম্মের যে বিবিধ রূপ মহর্ষিগণ নিজ নিজ বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযমই তাঁহাদের মতে প্রধান।' ইহার পর এই অধ্যায়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমরা মূল সংস্কৃতে না দিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুবাদকের ভাষাতেই দিতেছি: 'দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই,...... দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারা যায়।' আমরা দেখিলাম মহাভারতের মতে ইহকালে ও পরকালে সর্ব্ববিধ সুখ ও সাফল্যের কারণ ইন্দ্রিয়সংযম। ১৬২ অধ্যায়ে আমরা আর একটি অপূর্ব্ব শিক্ষা পাই। তাহা এই যে সত্য ত্রের প্রকার: 'অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা।' ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে সমস্ত নীতিধর্ম্মই সত্যের অন্তর্গত, সুতরাং ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য একই সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু বাল্যযৌবনে ব্রহ্মচর্যসাধনার সময় যে কঠোরতা লইয়া চলিতে হয়, বিবাহিত গৃহস্থজীবনে তাহার স্থলে

*—শান্তিপর্ব্ব ৭৫ অধ্যায় (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)।

বেশভূষা, গন্ধমাল্য, নৃত্যগীত, নানাবিধ আহার-বিহার ইত্যাদি সাংসারিক বা জাগতিক 'অসীম সুখলাভ' বিহিত, একথাও আমরা এই অধ্যায়ে শুনিতে পাই। মনুসংহিতাও বলেন স্নাতক গৃহধর্মী অকারণ কঠোরতা বা বেশভূষায় দীনতা অবলম্বন করিবেন না। এভাবে ব্রহ্মচর্যের পর সংযত চরিত্র হইয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের চরিতার্থতা মহাভারতের সম্মত। অবশ্য, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ইহার ব্যতিক্রম এবং পরবর্ত্তী বানপ্রস্থ-প্রব্রজ্যাদির অবস্থায় পুনরায় সংযমের রাশ টানিয়া ধরিতে হয়, ইহাই বিধান। যাঁহারা ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে অবাস্তব 'সাধু-সন্ন্যাসী'-র আদর্শ বলিয়া মনে করেন, মহাভারতের এই অধ্যায় তাঁহাদের ভ্রমের অপনোদন করিতে পারে। তাহার পর শান্তিপর্ব্বের ২১৪ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু চিত্তাকর্ষক কথা রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্যকে এখানে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থা বলা হইয়াছে। 'পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়-সংঘাত'-এর সহিত ইহা সংযোগহীন।* লক্ষণীয় যে বিরাটপর্ব্বে ৬ অধ্যায়ে দেবী দুর্গাকে যুধিষ্ঠিরের স্তবে 'ব্রহ্মচর্যস্বরূপা' বলা হইয়াছে। ইহার উপায় সম্বন্ধে পিতামহ ভীষ্ম বলিতেছেন—'রজোগুণ উৎপন্ন বা পরিবর্দ্ধিত হইবামাত্র উহা পরিত্যাগ করিবেন।' মনে কামানুরাগ জাগ্রত হইলে কৃচ্ছ্র ব্রত বা কঠোরতার বিধানও দেওয়া হইয়াছে। স্বপ্নস্খলনে জলমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণমন্ত্র

---

* —'যদিদং ব্রহ্মণো রূপং ব্রহ্মচর্যমিতি স্মৃতম্।'
'লিঙ্গসংযোগহীনং যচ্ছব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্।'
—শ্রীমন্মহাভারতম্, 'শঙ্কর নরহর জোশী' প্রকাশিত, পুণা।

জপের ব্যবস্থা রহিয়াছে। 'বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জ্ঞানযুক্ত মনদ্বারা অন্তর্গত রজোময় পাপকে নিরন্তর দগ্ধ করিয়া থাকেন' বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে মনুসংহিতাতেও কামসংযমে এই জ্ঞানপ্রক্রিয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। তারপর সে যুগের যৌগিক বিশ্বাসমত কামক্রিয়ায় শুক্রোৎপত্তি ও শুক্র-বিসৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু Physiological বা দেহতাত্ত্বিক বর্ণনাও রহিয়াছে। 'মনুষ্যদিগের দেহে বাতাদি-বাহিনী দশটী নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়; অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া শরীর মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। .....মানবগণের হৃদয়মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়।' মহর্ষি অত্রির নাম এই শুক্রতত্ত্বের সহিত জড়িত। কামসঙ্কল্পজ শুক্রের উদ্রেকেই সংসারে যত অবৈধ যৌনসঙ্গম (promiscuity) ঘটিয়া থাকে বলা হইয়াছে। সুতরাং কামসঙ্কল্পকে ক্রমে ক্রমে গুণসাম্যের মধ্য দিয়া জয় করিতে হয়। 'অতএব মানুষ মনকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত রজঃ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিমিত্তরূপে কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরমগতি লাভ করিবে।' * দুইটি জিনিষ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। প্রথম, শুক্রসংযম বা ব্রহ্মচর্য প্রধানতঃ ও মূলতঃ একটি 'mental attitude' বা সংকল্পের ব্যাপার। দ্বিতীয়, সংকল্পসংযমের জন্য গুণসাম্য, ও গুণসাম্যের জন্য অনাসক্ত কর্ম্মযোগের কার্যকারিতা। আর একটী কথা

* —উদ্ধৃতিচিহ্নযুক্ত অংশগুলি পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ হইতে গৃহীত।

অবশ্যই স্মরণীয়। তাহা এই যে, এখানে মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বেই সর্ব্বসাধারণের জন্যও সংযমসাধনার তপস্যা বিহিত হইয়াছে (২১৫।১৪)। যথা পরাশর বলিতেছেন—

'তপঃ সর্ব্বগতং তাত হীনস্যাপি বিধীয়তে।
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য স্বর্গমার্গপ্রবর্ত্তকম্ ॥'

অর্থাৎ—'হে তাত, তপস্যা সর্ব্বসাধারণের জন্য, এমনকি হীন (শমদম-দয়াদানাদিহীন) ব্যক্তিরও জন্য। এই তপস্যায় রিপু-ইন্দ্রিয়দমনকারী আত্মসংযত ব্যক্তি স্বর্গমার্গ লাভ করিয়া থাকে।' § ভোগীগণের ভোগও পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফল। 'লোভ হইতে ইন্দ্রিয়-সম্ভ্রম (ইন্দ্রিয়ের মূঢ়ভাব) এবং ইন্দ্রিয়সম্ভ্রম নিবন্ধন অভ্যাস-বর্জ্জিত বিদ্যার ন্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের হ্রাস হইয়া থাকে। প্রজ্ঞানাশ হইলে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা থাকে না। যাহা হউক, লোকের দুঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপোনুষ্ঠান করাই তাহার কর্ত্তব্য। ....তপস্যার ফল সুখ, আর তপস্যা না করিলে অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হয়। ....নিষ্পাপ তপোনুষ্ঠান করিতে পারিলে প্রতিনিয়ত বিবিধ মঙ্গলদর্শন, বিষয়সম্ভোগ ও খ্যাতিলাভ হইয়া থাকে। (উদ্ধৃতিচিহ্নযুক্ত অংশগুলি পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ হইতে)। পাঠক, এখানে দেখিতে পাইবেন স্বাভাবিক, সাধারণ জীবনেও 'সুখী' হইবার জন্য সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন কতখানি তাহা মহাভারতকারের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহাই ভারতের শাশ্বতধর্ম্মের বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গী।

§—'শ্রীমন্মহাভারতম্' (পূর্ব্বোক্ত প্রকাশন, পুণা), ৫ম ভাগ, পৃঃ ৫৮৪।

এখন আমরা মনুসংহিতায় সংযম-ব্রহ্মচর্যের কথায় আসিলাম। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ে কিছু ফল-দায়ক আলোচনা রহিয়াছে। মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তকস্বরূপ বিবেচনা করিয়া ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য মনেরই সংযমের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এখানেই বিখ্যাত—

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥'

অর্থাৎ—'কাম কখনও উপভোগের দ্বারা শান্ত হয় না, পরন্তু ঘৃতাহুতিতে অগ্নির ন্যায় ইহা আরও বাড়িয়া যায়,' এই শ্লোকটী আছে। এখানে 'কাম' অর্থে ইন্দ্রিয়বাসনা বুঝিতে হইবে, কারণ ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রসঙ্গেই (২।১৩) ইহা বলা হইয়াছে। ২।৯৬ এ জোর করিয়া ইন্দ্রিয়দমনে যতটা ফল পাওয়া যায় তদপেক্ষা অনেক বেশী ফল পাওয়া যায় জ্ঞান-বিচারের দ্বারা, এই মনস্তাত্ত্বিক নীতিটী ঘোষণা করা হইয়াছে। আধুনিক মনোবিশ্লেষক (psycho-analytic) চিকিৎসাতেও স্নায়বিক-মানসিক বিকারে রোগীদের চেতনার বিস্তার সাধন করিয়া ('increasing the sphere of their consciousness') চিকিৎসার কথা রহিয়াছে (পৃঃ ৫৬)। তারপর ২।৯৮ শ্লোকে জিতেন্দ্রিয়তার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাও সংযমসাধনার ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্মনীতি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। তাহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে রাগদ্বেষ উভয়ই বর্জ্জন করা—'ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ।' পরবর্ত্তী শ্লোকে যে কোনও একটি ইন্দ্রিয়বিষয়ে অসংযত হইলে

সমগ্র ইন্দ্রিয়বিষয়ে অসংযমের কুফল পাইতে হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য যে কেবলমাত্র যৌনসংযম নয় পরন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়-লালসার সংযম এই তত্ত্বের আভাস আমরা এখানে পাই। এখানে আমরা গান্ধীজীর একটি কথাও স্মরণ করিতে পারি—'*Brahmacharya* does not mean mere physical control. It means much more. It means complete control over all the senses,' অর্থাৎ—'ব্রহ্মচর্যের অর্থ শুধু শারীরিক সংযম নয়। ইহার অর্থ আরও ব্যাপক। ইহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্যক্ সংযমকে বুঝায়।' * সংযম-সাধনায় আর একটী মনস্তাত্ত্বিক নীতির কথা আছে—তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোগে আসক্ত না হওয়া এবং অত্যাসক্তির ক্ষেত্রে জোর করিয়া নিবৃত্ত হওয়া (৪।১৬)। তারপর ১০০ শ্লোকে ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়া সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ-সাধন (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) করার কথা রহিয়াছে এবং অকারণ দেহকে পীড়া না-দেওয়ার উপায় অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে। আজকাল 'asceticism' বা তপস্যার নামে কঠোর শরীর-পীড়নের নিন্দা করা একটী ফ্যাসানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সাধনশাস্ত্রে তপস্যার অবশ্যপ্রয়োজ-নীয়তা স্বীকার করিলেও অকারণ আত্মপীড়নবিলাস (maso-chism) সমর্থন করা হয় নাই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতাতেও আমরা এরূপ কথা পাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই আধ্যাত্মিক জীবনের ন্যায় জাগতিক জীবনেও সফলতা ও সার্থকতা লাভের জন্য

* —পূর্ব্বোক্ত 'Ancient Indian Education' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

সংযমব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় সাধনশাস্ত্রের নীতি। ১৮০।৮১ শ্লোকে স্বেচ্ছায় ও নিদ্রায় রেতঃ-স্কন্দনের প্রতিকার বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বেচ্ছাস্কন্দন বা আত্মরতিকে অত্যন্ত দূষণীয় ব্রতনাশ বলা হইয়াছে। টীকাকার সেখানে বিশেষ অবকীর্ণি-প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্নস্খলনে 'পুনর্মামিত্যাচং জপেৎ' বলিয়া মাত্র জপের বিধান দেওয়া হইয়াছে, যাহার কথা আমরা উপনিষদে ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ২৫৩)। ইহা ছাড়া ব্রহ্মচারীর পক্ষে বৃথাকলহ, পরনিন্দা, মিথ্যাকথন, অক্ষক্রীড়া ইত্যাদি বর্জ্জনের বিধান হইতে (২।১৭৯) বুঝা যায় মানবীয় নৈতিক চরিত্র বা মনুষ্যত্বগঠন করাই ব্রহ্মচর্যের লক্ষ্য। ইহা শুধু স্থূলভাবে যৌনসংযম নয়। বিভিন্ন স্মৃতি-সূত্রাদিতে সে যুগের ব্রহ্মচারীর পালনীয় যে সব খুঁটিনাটী বিধি-ব্যবস্থার কথা আছে এযুগে সেগুলি বাদ দিয়াও চারিত্রিক মূল নীতিগুলি অবশ্যই পালন করা যায়। ব্রহ্মচর্যসাধনা যে কোনও অহঙ্কারমূলক প্রচেষ্টা নয় তাহাও আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই। সরলতা ও আচার্যসেবা ইহার প্রাণ। পরুষবাক্য, অবজ্ঞা, দম্ভ সকল আশ্রমেই বর্জ্জনীয়। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের কথা মনে পড়ে (ছান্দোগ্য ৬।১), যেখানে উদ্দালক, পুত্র শ্বেত-কেতুর দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্যের পর দাম্ভিকতার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। সংযম ব্রহ্মচর্যের ফলে—সমদর্শিতা (impartiality), দক্ষতা (efficiency), অদীনতা (freedom from inferiority complex), সত্য (truthfulness), আর্জ্জব (sincerity), তেজঃ (spirit), স্তুতিনিন্দাবিসর্জ্জন (freedom

from flattery or censoriousness) ইত্যাদি বহু এযুগের আকাঙ্খিত গুণ লাভ করা যাইতে পারে। *

এখন আমরা পুরাণের ভক্তিসাধনার যুগেও ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথায় আসিতেছি। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত 'অর্থ এবাভিজনহেতুঃ' ইত্যাদি অংশটীর দার্শনিক, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ-প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—'The society decays when property confers rank, wealth becomes the only basis of virtue, passion the sole bond of union between man and woman, falsehood the source of success in life, sex the sole means of enjoyment, when the outer trappings are mistaken for the inner spirit, such a state of society calls for a redeemer', অর্থাৎ—'সম্পত্তি যখন আভিজাত্য প্রদান করে, ধন যখন ধর্ম্মের একমাত্র ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়, প্রবৃত্তি যখন নরনারীর মধ্যে বন্ধনের একমাত্র সূত্র হয়, মিথ্যা যখন জীবনে সফলতার কারণ হয়, যৌনসঙ্গম যখন একমাত্র আনন্দের উপায় হয়, বাহ্যিক উপকরণকে যখন অন্তরের সত্যবস্তু বলিয়া ভ্রান্তি হয়, সমাজের তখন অধঃপতন ও ক্ষয় ঘটে। সমাজের এইরূপ অবস্থায় একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন হয়।' §

* —শান্তিপর্ব্ব : ১৬০ অধ্যায়।

§ —Indian Philosophy, Vol II, Pg : 665.

বিভিন্ন পুরাণে কৃষ্ণ-শিব-শক্তিউপাসনার ও জ্ঞান-ভক্তির প্রাধান্যের তারতম্য থাকিলেও সংযম-পবিত্রতার বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই। বিষ্ণুপুরাণের একাংশের অনুবাদ—'The aspirant should renounce desires, practise non-injury, truthfulness, non-stealing, sex-restraint and greedlessness or non-acceptance of gifts and make his *manas* fit for meditating on God', অর্থাৎ—'সাধক কামনাত্যাগ, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং নির্লোভতা বা অপরিগ্রহ অভ্যাস করিবেন এবং নিজ মনকে (পরব্রহ্ম) ঈশ্বরের ধ্যানের উপযুক্ত করিবেন।' * অন্যান্য পুরাণ সম্বন্ধেও মোটামুটী ঐ একই কথা বলা যায়, যদিও পৌরাণিক সাধনায় কঠোর তপস্যা অপেক্ষা প্রেমভক্তিই প্রধান কথা। ইহার ফলে রিপু-ইন্দ্রিয়ের অসংযম মধ্যে মধ্যে প্রশ্রয় পাইলেও তাহা ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। এবিষয়ে দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের মত—'......it cannot be denied that there were abuses of it, but such abuses were deviations from the normal path', অর্থাৎ—'......ইহা অস্বীকার করা যায় না যে ইহার (মধুরভাবযুক্ত প্রেমভক্তির) বিকৃত অপব্যবহার হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ অপব্যবহার স্বাভাবিক পথ হইতে বিচ্যুতি মাত্র।' § আমাদের

* —Dr. Jadunath Sinha, History of Indian Philosophy, Vol I, Pg : 135.

§ —Indian Philosophy, Radhakrishnan, Pg : 708.

মতেও জ্ঞানবাদ ও তন্ত্রবাদের মত এই প্রেমভক্তিবাদ বর্ত্তমান সমাজ ও জাতীয়জীবনে অনেকক্ষেত্রে অপব্যবহৃত হইতেছে। ব্যাপক ব্রহ্মচর্যহীনতাই এই ব্যর্থতার কারণ। অপরদিকে বিখ্যাত ভাগবতপুরাণে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লীলারসের বিশেষ বর্ণনা থাকিলেও ধ্যানযোগ-জ্ঞানযোগ ও আশ্রমধর্ম্ম-সমাজ-রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় বহু কথাও পাই। ১০।৪৫।২৯-৩২এ আমরা পাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ইন্দ্রিয়সংযমাদি ব্রত ভালভাবে পালন করিয়া (সুব্রতৌ) যদুকুলাচার্য্য গর্গমুনির নিকট ব্রহ্মচর্য-সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তারপর রিপু-ইন্দ্রিয়দমনে অভ্যস্ত হইয়া (দান্তৌ) তাঁহারা সান্দীপনি মুনির নিকট যাইয়া বেদ-উপনিষদাদি এবং—

'সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথাচান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্‌বিধাম্ ॥'

শিক্ষা করিলেন। অবশ্য অতিমানব প্রতিভার জন্য তাঁহারা অতি অল্পকালেই এসব আয়ত্ব করিয়াছিলেন। ৭।১১।৮-এও আমরা দেবর্ষি নারদের মুখে মানুষের ত্রিংশপ্রকার পরমধর্ম্মের বর্ণনাসূত্রে ত্যাগ, সত্য ও ব্রহ্মচর্যের কথাও পাই। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি ঐস্থলে সকলের মধ্যে অন্নাদি প্রয়োজনীয় ভোগ্য-পদার্থ ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করিয়া দিবার কথাও ('অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো') আমরা পাই, যাহার সম্বন্ধে রাজধর্ম্মের ও রাজ-নীতির আলোচনাসূত্রে আমরা পূর্ব্বেই চতুর্থ অধ্যায়ে মহাভারত হইতে আলোচনা করিয়াছি। মধ্যযুগে পৌরাণিক ভক্তিমতবাদের প্রাধান্যের সময়েও অনেক পুরাণে বর্ণাশ্রমের কর্ত্তব্যপালনকে

সমাজধর্ম্মরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে মোটামুটী ষষ্ঠশতাব্দীর পর হইতে ভারতের সমাজধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাষ্ট্রবাদের মূল যথেষ্ট শিথিল হইতে থাকে ও পৌরাণিক ভক্তিমূলক পূজা-উপাসনা-ব্রত অনুষ্ঠানের ধর্ম্ম জনসমাজে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। কিন্তু তথাপি প্রাচীন বর্ণাশ্রম সমাজধর্ম্মের মহিমাকে স্বীকার করিয়া 'স্মার্ত্ত-বৈষ্ণব' ও 'স্মার্ত্ত-শৈব' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এইভাবে আধুনিক 'হিন্দু'সমাজের উদ্ভব।* মধ্যযুগের এই পৌরাণিক 'হিন্দু'ধর্ম্মের মূলে ব্রহ্মচর্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মহিমাই স্বীকৃত।

ইহার পর প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানগুলির কথা। পূর্ব্বমীমাংসা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের দর্শন। ঈশ্বরতত্ত্ব বা জ্ঞান-ভক্তির স্থান ইহাতে নাই। অথচ এরূপ দর্শনেও সংযম-ব্রহ্মচর্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনের সাধনা সম্বন্ধে Dr. J. N. Sinha বলিয়াছেন—'But its doctrine of the combination of action and knowledge of the self with emphasis on control of passions, tranquillity of mind and sex-restraint as the means of release strikes a right note,' অর্থাৎ—'কিন্তু ইহা (মীমাংসাদর্শন) জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ এবং তাহার সহিত দম, শম ও ব্রহ্মচর্যের মোক্ষসাধকত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ

---

* —The History and Culture of the Indian People (B. V. B.), Vol II, Pg : 297-98 দ্রষ্টব্য।

করিয়া একটী যথার্থ কথাই বলিয়াছেন।' * 'শমদমব্রহ্মচর্যাদি-কাঙ্গোপবৃংহিতেনাত্মজ্ঞানেন', অর্থাৎ রিপু-ইন্দ্রিয়দমন ও সংযম-ব্রহ্মচর্যাদি সহায়ে পুষ্ট আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা মানুষ ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্জ্জন ও 'আত্যন্তিক দেহোচ্ছেদে' মুক্তিলাভ করিতে পারে। § সুপ্রাচীন সাংখ্যদর্শনও প্রধানতঃ নিরীশ্বর ও জ্ঞানবাদী, এবং প্রকৃতি-পুরুষবিবেকই এই দর্শনের মতে মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ উপায়। তথাপি ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধি ইহারও সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সেশ্বর সাংখ্য বা পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে ইহাই সুপরিস্ফুট। যোগসাধনায় চিত্তশুদ্ধি ও একাগ্রতা লাভ করার জন্য যে 'পরিকর্ম্ম' বিহিত হইয়াছে তাহাতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহের প্রাথমিক প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক সম্পুর্ণ যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দর্শন হইলেও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা অপবর্গই ইহার লক্ষ্য। এখানেও রাগদ্বেষাদি 'দোষ' হইতে মুক্তির জন্য সত্য-ব্রহ্মচর্য-সংযম-অহিংসা ইত্যাদি যৌগিক পন্থার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে মিথ্যাজ্ঞান ও প্রবৃত্তি নিরস্ত হইলে পুনর্জন্ম ও দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে। বেদান্ত-সাধনাতেও আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য শমদমাদি-সাধনসম্পদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া বহুস্থলে তিনি সংযম-ব্রহ্মচর্যমূলক বৈরাগ্যের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ

---

* —History of Indian Philosophy, Vol II, Pg : 862.

§ —Indian Philosophy Vol II, Radhakrishnan, Pg : 423.

উপরিলিখিত যৌগিক মার্গ প্রায় সকল দর্শনেই স্বীকৃত হইয়াছে। দার্শনিক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন—'As might be expected, the Indian systems are all agreed upon the general principles of ethical conduct. That all passions are to be controlled, no injury to life in any form should be done, and that all desires for pleasures should be checked, are principles which are almost universally acknowledged............the means to be adopted for purification are almost everywhere essentially the same as those advocated by the Yoga system', অর্থাৎ—'যেরূপ আশা করা স্বাভাবিক, সমস্ত ভারতীয় দর্শনই নৈতিক আচরণের সাধারণ বিধানগুলি সম্বন্ধে একমত। সমস্ত রিপুকে সংযত করিতে হইবে, কোনও আকারেই প্রাণীহিংসা করা চলিবে না, সমস্ত বাহ্যিক আমোদের আকাঙ্খা দমন করিতে হইবে—এই নীতিগুলি প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত। ....শুদ্ধিলাভের উপায় হিসাবে প্রায় সর্ব্বত্রই মূলতঃ যৌগিক পন্থাই অনুমোদন লাভ করিয়াছে।' * যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধ্যান-ধারণা-সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের প্রথমেই 'যম' বা অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহের স্থান। সুতরাং ভারতীয় দর্শনে সর্ব্বত্রই মানবিক চরিত্রগঠনের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে।

*—History of Indian Philosophy, Vol I, Dasgupta, Pg: 77.

ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতির অন্তর্গত বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্মে সংযমসাধনা এবং যৌন পবিত্রতার প্রাধান্য সুপরিচিত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রধানতঃ নীতিবাদী পৌরুষের ধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্মে নবাগত তরুণ সাধক (শ্রমণ)-দের জন্য যে দশটী সংযমসাধনার নীতি বিনয়পিটকে পাওয়া যায় তাহা মূলতঃ যোগমার্গের 'ধর্ম্ম' এবং বর্ণনাশ্রমের ব্রহ্মচারীর সাধনা ব্যতীত কিছুই নহে। ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত বলেন—'There is nothing particularly Buddhistic in seven of the eight practices. (অষ্টাঙ্গ মার্গ).........By observance of *Sila* (moral rules codified in the Vinaya) the adept becomes a perfect *Brahmachari*...... ..', অর্থাৎ—'অষ্টাঙ্গ মার্গের সাতটী মার্গে 'বৌদ্ধ' বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। ....'শীল' (বিনয়পিটকে প্রদত্ত চরিত্রনীতি) পালনের দ্বারা সাধক পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারীতে পরিণত হন.........।' * সুতরাং বৌদ্ধসাধনায় 'মধ্যপন্থা' বলিতে পরিমিত ইন্দ্রিয়সম্ভোগ বুঝায় না, ইহা 'হিন্দু' সাধনার অনাসক্ত সংযতভোগ, যাহা ত্যাগজীবনেরই একটী রূপ। জৈনধর্ম্মে সংযম-ব্রহ্মচর্যের সাধনা আরও কঠোরতর। জৈন সাধনায় যে 'ব্রত' পালনের কথা রহিয়াছে তাহা অষ্টাঙ্গযোগের 'যম' বা অহিংসা-সত্য-অস্তেয় ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহেরই সাধনা। বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম্মের সমসাময়িক 'আজীবিক' সম্প্রদায়েও কঠোর রিপু-ইন্দ্রিয়সংযমের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। §

---

* —History and Culture of the Indian People (B. V. B.) Vol. II, Pg : 371. § —Ibid, Pg : 463.

গীতা উপনিষদের সার। সুতরাং সেখানেও আমরা উপনিষদের ত্যাগ সত্য-ব্রহ্মচর্যের সাধনার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। গীতা হইতে কামজীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষতি-কারিতা সম্বন্ধে আমরা এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে (পৃঃ ১৩৩-৩৪) আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়া গীতার স্থানে স্থানে স্পষ্টভাবে ব্রহ্মচর্যব্রতের কথা রহিয়াছে। অভ্যাসযোগ-সাধনায় (৬।১৪) ঈশ্বরগতপ্রাণ হইতে গেলে 'প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারীব্রতে স্থিতঃ' হইতে বলা হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ব্রহ্মচর্য-সাধনার জন্য প্রশান্তচিত্ত এবং ভয়হীন হইতে বলা হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায়েও দৈবী সম্পদ্ হিসাবে রিপু-ইন্দ্রিয়সংযম (শমদম) সহ নির্ভীকতার কথাও রহিয়াছে (১৬।১)। দম্ভ ও অহঙ্কারের সহিত তপস্যায় শরীরপীড়নকে অজ্ঞান (অচেতাঃ) আসুর-স্বভাবের কাজ বলা হইয়াছে। ১৭।১৪-এ অহিংসা ও ব্রহ্মচর্যকে 'শরীরং তপঃ' বলা হইয়াছে। ১৮।৫৩-তে কামক্রোধাদিবর্জ্জনের কথা রহিয়াছে। ৮।১১-এ যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি' কঠো-পনিষদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যের 'নয়ানমার' এবং 'আলবার' যথাক্রমে এই দুই বিখ্যাত শৈব এবং বৈষ্ণব ভক্তসম্প্রদায়ে প্রেমভক্তির প্রাধান্য থাকিলেও দৈহিক রিপু-ইন্দ্রিয়ের জীবনকে তীব্রভাবে পাপ বলিয়াই গণ্য করা হইত। বর্ণাশ্রমসাধনার ব্রহ্মচর্যের সহিত ইহার একমাত্র পার্থক্য এই যে এখানে ঈশ্বরের 'কৃপা'কেই পাপমুক্তির উপায়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই

কৃপাবাদ আমরা উপনিষদ্‌যুগের সংযম-ব্রহ্মচর্যের সূত্রেও পাইয়াছি (পৃঃ ২৬৬)। ইহাতে নূতন বা পৃথক্ কিছু নাই, কেবল জ্ঞান বা কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় মানবধর্ম্মে এইভাবের আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন ঘটীয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূল ধারা অর্থাৎ দৈহিক জীবনকে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করার ব্রহ্মচর্যের ধারা অপরিবর্ত্তিতই আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং তন্ত্রমার্গের আলোচনায় আমরা ইহা দেখিতে পাইব। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা আলবারদের উচ্ছ্বসিত প্রেমভক্তির গীতি হইতে দুই-এক লাইন তুলিয়া ধরিতেছি—

'Should men live one hundred years
as the Vedas say,
One half will be wasted in sleep; the fifty
remaining will be likewise wasted
In childhood, boyhood, sensuality, hunger,
disease and old age.........'

অর্থাৎ—'মানুষ যদি একশত বৎসর বাঁচে (বেদে যেরূপ বলে), তবে তাহার অর্দ্ধেক নষ্ট হইবে নিদ্রায়, বাকী পঞ্চাশও নষ্ট হইবে শৈশবে, বাল্যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণতায়, ক্ষুধায়, রোগে ও জরায়...।' § দেহসর্ব্বস্ব জীবন হইতে মানুষ রক্ষা পায় ঈশ্বরের কৃপাশক্তিতে,

---

§ —History and Culture of the Indian People, Vol II, Pg : 339.

ইহাই এই যুগের ভক্তিগাথার সারকথা। এই দেহসর্ব্বস্ব জীবনের উর্দ্ধগতিই ব্রহ্মচর্য। অল্লমপ্রভু, বসব ইত্যাদির বীর-শৈববাদেও বায়ুর বা প্রাণশক্তির নিরোধ ব্যতীত শিবাদ্বৈতবোধ ও ভক্তি লাভ হয় না। 'বায়ু সংযমে বা প্রাণায়ামে দেহাত্মবোধ লয় করা ব্রহ্মচর্যেরই রূপান্তর। ইহাদের 'ষট্স্থল' তত্ত্ব ও গোরক্ষনাথের 'চক্র'সাধনা-তত্ত্ব এই সকলই মধ্যযুগের ভারতে দেহাত্মবোধকে শিবাত্মবোধে রূপান্তরিত করার সাধনা। * এগুলি মূলতঃ পাতঞ্জল যোগসাধনারই সগোত্র। এই সমস্ত সাধনার মূলে সংযম-ব্রহ্মচর্যের নীতিই প্রকারান্তরে স্বীকৃত। এই ব্যাপক শৈবসাধনার যুগে নানাভাবে প্রাচীন বৈদিক বর্ণাশ্রমের মহিমাও স্বীকৃত ছিল। এই যুগের বীরশৈব ও পাশুপত-মতাবলম্বীগণও বর্ণাশ্রম অল্পবিস্তর স্বীকার করিতেন। এমনকি কাপালিকগণের মধ্যেও বৈদিক; অবৈদিক দুই শ্রেণী ছিল। মধ্যযুগের পরিবর্ত্তন-শীল ধর্ম্মীয় পটভূমিকাতেও বর্ণাশ্রমের এই মহিমার স্বীকৃতি তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাই ভারতের সাধারণ জাতীয় ধর্ম্ম এবং ইহা ব্রহ্মচর্য-ভিত্তিক তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আচার্য শঙ্করের দর্শনে সংযম-ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষদের (৪।১৫।১) ব্যাখ্যায় তিনি 'ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসম্পন্নৈঃ শান্তৈঃ বিবেকিভিঃ' বলিয়া ব্রহ্মচর্যের গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ৭।২২।১ এর ব্যাখ্যায় তিনি 'ইন্দ্রিয়সংযমশ্চিত্তৈকাগ্রতাকরণঞ্চ' বলিয়া প্রাচীন

* —Indian Philosophy, Vol II, S. N. Dasgupta.

ভারতীয় ব্রহ্মচারীগণের ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও আচার্য শঙ্করের যুগে বহু ধর্ম্মমতে ও বৈদিক ভাবাক্রমণে বিপর্যস্ত ভারতের সমাজজীবনে ধর্ম্মসমাজ ও ধর্ম্মরাষ্ট্রের আদর্শের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেজন্য বর্ণাশ্রমের বিশেষ সমর্থক হইয়াও তিনি সমাজজীবন ও গার্হস্থ্য-জীবনকে নূতন রূপ দিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই, সরাসরি সন্ন্যাসাশ্রমকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার যুগপরিবেশের ধর্ম্মসংস্থাপন।

এই যুগেই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডপ্রচারকারী মীমাংসকগণের (ভট্ট কুমারিল-প্রভাকর) দর্শনের আলোচনায় সংযম-ব্রহ্মচর্যের স্থান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী যুগেও আচার্য রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য ইত্যাদির মতেও নৈতিক সংযত জীবনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করি। ধর্ম্মরাষ্ট্র ও সমাজধর্ম্মের এই অবক্ষয়ের যুগে জাতীয় চেতনা স্বভাবতঃই জ্ঞান বা কর্ম্মমার্গকে পরিত্যাগ করিয়া নিছক ভাবভক্তির মার্গে নিজের সত্বাকে উপলব্ধির চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তথাপি বর্ণাশ্রম সমাজধর্ম্মের মহিমা অস্বীকৃত হয় নাই একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীমধ্বাচার্যের ন্যায় খ্যাতনামা এই যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম ধর্ম্মনেতা ভক্তি ও বর্ণাশ্রমের এক সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। তাঁহার সাধনপন্থায় বর্ণাশ্রম সাধনাকে ভগবানে সমর্পণের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। * কিন্তু

* —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯।১২৬ দ্রষ্টব্য।

জাতীয় ব্রহ্মচর্য-সাধনাই বর্ণাশ্রমের ভিত্তি। সুতরাং এই ভিত্তিকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যান্তও একটা স্বীকৃতি দিবার আকুল প্রবণতা আমরা এই দিক্ দিয়াও লক্ষ্য করি। তাহার পর হইতে যে পূজাপার্ব্বণ-বারব্রত-গ্রহশান্তি-'মঙ্গল'-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সমাজধর্ম্ম বিভিন্ন পুরাণের মধ্য দিয়া প্রবর্ত্তিত হওয়ার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাই জাতীয়জীবনে 'হিন্দু' ধর্ম্ম নামে প্রচলিত হইতে থাকে। আর সেই সঙ্গে এই আধ্যাত্মি-কতা-সর্ব্বস্ব জাতি মুক্তির আনন্দ আস্বাদ করিবার জন্য উত্তরোত্তর প্রেমভক্তিবাদের মধ্যে আত্মনিমগ্ন হইতে থাকে। প্রধানত: এই প্রেমভক্তিবাদই এই যুগসঙ্কটে ভারতের জাতীয় জীবনসত্বাকে অধ্যাত্মরসের সঞ্জীবনীশক্তিতে বাঁচাইয়া রাখে। ক্রমশঃ, প্রাচীন সমাজধর্ম্ম যখন আরও দূরে সরিয়া গেল, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যখন বৈদেশিক রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ আরও ওলটপালট ঘটাইল, তখন জাতীয় সত্বা আরও অধিক পরিমাণে নিছক ভাবরাজ্যের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। নারায়ণ-বিষ্ণুর উপাসনা হইতে লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা এবং তাহা হইতে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা এবং ক্রমশঃ অতীন্দ্রিয় আদি-রসাত্মক গোপীলীলা বা রাসলীলার মহাভাবের দিকে প্রবণতা দেখা দিল। ইহা প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। অথচ এই প্রেমভক্তিবাদের উৎসমুখে প্রায় সাত-আট শত বৎসর পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যের অপূর্ব্ব শিবভক্তির রসধারায় অধিকতর পৌরুষ ও বীর্য্যের আভাস পাওয়া যায়—'The devotion of the Saivas is more virile and masculine than that

of the Vaishnavas.', * যদিও সমসাময়িক বৈষ্ণব 'আলবার'দের মধ্যে কান্তভাবাশ্রিত ভক্তি-সাধনাও পরিলক্ষিত হয়।

এই যুগ পরিবেশেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহান্ ধর্ম্মনেতা শ্রীচৈতন্যদেব সরাসরি প্রাচীন ভারতীয় সমাজধর্ম্মের (বর্ণাশ্রমের) কর্ম্মসাধনাকে অস্বীকার করিলেন। ভারতীয় ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চতই একটী ভাবসঙ্কটের ইঙ্গিত বহন করে। তথাপি একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে এই নূতন পথে সাহসের সহিত পা না বাড়াইলে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার ধারা শুকাইয়া যাইতে পারিত। আন্তরিকতাহীন শুষ্ক জ্ঞানবাদ বা কর্মবাদ অথবা প্রাণহীন তান্ত্রিক-পৌরাণিক লোকাচারধর্ম্মের অনুষ্ঠান যখন দেশে নৈতিক অরাজকতা ঘটাইয়াছে, ধর্ম্মভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র যখন নিশ্চিহ্নপ্রায়, তখন জাতীয় ধর্ম্মচেতনাকে সঞ্জীবিত করিবার একটি মাত্র পথ খোলা ছিল, তাহা অতীন্দ্রিয় মহাজীবনরসের প্রকাশ। ইহাই চৈতন্যযুগের 'ব্রজের সাধনা' বা 'গোপীভাবের সাধনা।' এজন্যই বর্ণাশ্রমের কর্ম্মযোগের আদর্শ শ্রীচৈতন্যদেবকে অস্বীকার করিতে হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণের সময় মধ্বপন্থী বৈষ্ণবদিগের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন—

'কর্ম্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে ॥' §

* —Indian Philosophy, Radhakrishnan, Vol II, Pg : 729.

§ —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ঃ ৯।১৩১।

অবশ্য সমাজধর্ম্মী ও জাতীয়জীবনধর্ম্মী বর্ণাশ্রমের কর্ম্মসাধনা ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহার কার্যকারিতা হারাইয়া নিছক জ্ঞান-ভক্তি-তন্ত্র সাধনার পথ সুগম করিতেছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈতজ্ঞানবাদ, তৎপরবর্ত্তী শ্রীরামানুজাদির ভক্তিবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে শিবজ্ঞান ও শিবভক্তির প্রসার এবং সর্ব্বত্র তন্ত্রশাস্ত্রাদির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ঐ জাতীয় কর্ম্মসাধনার আদর্শ ম্লান হওয়ার কথাই ঘোষণা করে। সে যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যের জীবনে দেখিতে পাই এই আদিরসাত্মক আধ্যাত্মিক ভাবের লীলা সম্ভব হইয়াছিল একমাত্র তাঁহার অলৌকিক তপস্যাপূত ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া। যাঁহারাই 'মহাপ্রভু'র দিব্য চরিত্রের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন কি কঠোর বৈরাগ্য ও ইন্দ্রিয়-সংযম তাঁহার জীবনের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদিকে যেমন তাঁহার মধ্যে শৃঙ্গাররসের চিন্তা ও ভাব অলৌকিক মহাভাবের অপ্রাকৃতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যাহার তুলনা বিশ্বধর্মে বিরল, অপর দিকে তেমনি তাঁহারই দ্বারা উচ্চারিত হইয়াছিল এই সাবধান বাণী—

'দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥'

—(অন্ত্যলীলা, ২।৫১)।

এই প্রসঙ্গে প্রিয় অনুচর ছোটহরিদাসকে নারী-সম্ভাষণের ত্রুটীতে তাঁহার অতি কঠোর শাসনও স্মরণে রাখিবার মত। স্ত্রীসঙ্গ ও রাজসঙ্গ বিষয়ে 'মহাপ্রভু'র ছিল তীব্র বিতৃষ্ণা—

'প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারীস্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥'

— (মধ্যলীলা, ১১।৮)।

প্রকারান্তরে ইহা আমাদের কথিত যৌনকাম এবং প্রভুত্বকামের তীব্র বিরোধিতা। ধনকাম বিষয়েও তাঁহার তীব্র antipathy বা বিরাগ সুবিদিত। যে যাহা হউক, এতখানি সংযম-কঠোরতার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে অতীন্দ্রিয় কামতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নয়। এখানে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই মতে সাধুসঙ্গ ও ভগবানের নামকীর্ত্তনের মত ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসশ্রবণে যৌনকামের প্রভাব ক্ষয় হয়, কারণ এখানে নিজ ইন্দ্রিয়সুখের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়প্রীতিসাধনই লক্ষ্য। কামকে অতিকামে উন্নীত করার এ এক অভিনব পন্থা।

'ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস।
যেই ইহা শুনে কহে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকাল হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নাহি মহাধীর হয়॥'

— (অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ)।

ইহা কামসংযম বা ব্রহ্মচর্যেরই এক নূতন সাধনার ধারা। আরও বহু উদ্ধৃতি দিয়া সহজেই প্রমাণ করা যায় কামের সংযম শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে কতখানি কঠোর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধনকামের দিক্ দিয়াও দেখি ধনীর সন্তান বা পদস্থ ব্যক্তিকে ধনাভিমান বা পদাভিমান সমূলে বিসর্জ্জন দিয়া দীন অকিঞ্চনভাবে

চলিতে দেখিলে তিনি গভীর সন্তোষ লাভ করিতেন। রূপ-সনাতন ও রঘুনাথের বৈরাগ্যের বিবরণ হইতে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। * বিশেষে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় তরুণ শিষ্য রঘুনাথের জীবনে কঠোর বিষয়ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়সংযম হইতে বুঝা যায় যে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ 'মহাপ্রভু'র কত প্রিয় বস্তু। অবশ্য সাক্ষাৎ-ভাবে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা তিনি প্রচার করেন নাই, কিন্তু রঘুনাথকে তিনি যে সংযমের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ হইতে পৃথক্ নহে। তথাপি একথা সত্য যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের, বিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের, মধ্য দিয়া মাত্রাতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় আদিরসের চর্চ্চার ফলে বৈষ্ণবসাধনার মধ্যে সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের চিত্র জনমানসে অত্যন্ত ঝাপ্‌সা হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে—

'সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রিয়াসাম্যে তারে কহে কাম নাম ॥'

— (মধ্যলীলা, ৮১৪৫),

প্রেমের এই উচ্চতর সংজ্ঞাও খুব কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা কতকটা সমসাময়িক আর একটী ধর্ম্ম আন্দোলনের বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহা মধ্যযুগের মানবতাবাদী সাধকগণের ধর্ম্ম। ইঁহারাও প্রাচীন বর্ণাশ্রমের অধঃপতনের পরবর্ত্তী। মুসলমান ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের প্রভাবের যুগে ইঁহাদের বিশেষ আবির্ভাব। হিন্দু-মুসলমানের বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও রীতিনীতির পরিবর্ত্তে ইঁহারা

* —মধ্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ ও অন্ত্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরপ্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করেন। রামানন্দ-কবীর-নানক-দাদু ইত্যাদির ধর্ম্মে আমরা এই সাধনার কথা শুনি। ভারতের সমাজধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাষ্ট্রবাদ নষ্ট হওয়ার যুগে জ্ঞান-ভক্তি আন্দোলনের মত এই প্রেমধর্ম্মের প্রচারও খুবই স্বাভাবিক ও ও সুসঙ্গত। বিশেষতঃ তৎকালীন বিজেতা মুসলমানগণের সহিত ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে এই সাম্য ও সমন্বয়ের ভাবপ্রচার শক্তিরই পরিচয়। কিন্তু ইঁহারা প্রাচীন সমাজধর্ম্মকে অস্বীকার করিলেও রিপু-ইন্দ্রিয়ের সংযম এবং চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। ইঁহারাও ধমকাম, প্রভুত্বকাম ও যৌনকাম হইতে বহু দূরে থাকিতেন। বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তি-আন্দোলনের ইঁহারা সগোত্র। বৃথা কৃচ্ছ্রসাধনা না চাহিলেও (প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনাতেও বৃথা কৃচ্ছ্রসাধনা সমর্থিত ছিল না তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, পৃঃ ২৭৫, ২৮৫) ইঁহারা সংযম-পবিত্রতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন বলেন—'প্রেমের পথের পথিক বলে তাঁরা কায়াকে বৃথা ক্লিষ্ট করতে চান নি। অথচ প্রেমের জন্যই দেহ-মনের সর্ব্বপ্রকার কলুষ সযত্নে তাঁদের পরিহার করতে হয়েছে। দেহকে তাঁরা দেবালয় মনে করেছেন।' * পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের 'বৌদ্ধ দোহা' গুলিতেও সহজ-সাধনা, সমরস-সাধনা ইত্যাদির সূত্রে সেই একই কথা। শ্রীযুক্ত সেন বলেন—'চঞ্চল মনকে স্থির করাই হল সাধনার সবচেয়ে বড়ো কথা। মধ্যযুগেরও

* —ভারতের সংস্কৃতি, পৃঃ ৭৫।

বৌদ্ধদোহার সাধকেরা এখানে একমত।' § গুরু নানকের সাধনায় 'সত্যনাম' (এক ওঁকার) যেমন গুরুত্বপূর্ণ, 'সদাচার' বা রিপু-ইন্দ্রিয় দমন ও পবিত্রতার সাধনা তাহা অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী।

'Sat (Truth) was bound up with Sat-nam, the holy name of the highest being and with Sat-acar or the right conduct. ... Writes Guru Nanak : 'Truth is higher than everything but higher still is true conduct.'', অর্থাৎ— 'সৎ (সত্য) সৎ-নামের সহিত —পরমসত্যের পবিত্র নামের সহিত এবং সদাচার বা নীতিসঙ্গত আচরণের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ...... গুরু নানক লিখিয়াছেন— 'সত্য সকলের উপরে কিন্তু সত্য চরিত্র বা আচরণ তাহারও উপরে।" * মধ্যযুগের সমস্ত সাধকগণের ক্ষেত্রে প্রায় ঐ একই কথা। উপায় এক না হইলেও উপাদান অর্থাৎ রিপু-ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধির বিষয়ে দ্বিমত নাই। ঐ যুগের বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তগণের ভক্তি-সহায়ে সংযমসাধনা ইহার সহিত তুলনীয়।

'সুফী' সম্প্রদায়ের যে প্রভাব এই যুগ হইতে ভারতীয়

---

§ —ভারতের সংস্কৃতি, পৃঃ ৪০।

* —History of Philosophy Eastern and Western Vol. I (Ministry of Education, Govt. of India), Pg : 515.

ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'বাউল'-'সহজিয়া' ইত্যাদি সম্প্রদায়ে গৃহীত হইয়াছে সেই 'সুফী'দের প্রেম-ভাবুক মরমিয়া সাধনায় রিপু-ইন্দ্রিয়ের সংযম কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে—

'......Abu Bakr al Kalabadhi thinks that it at the same time has all the (necessary) meanings such as withdrawal from the world ......denying the soul its carnal pleasures, purifying the conduct ...", অর্থাৎ—'আবু বকর্ আল্ কলাবধির মত এই যে ইহার ('সুফী' কথাটীর সংজ্ঞার) মধ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অর্থও রহিয়াছে, যথা,—বৈরাগ্য,.... স্থূল ইন্দ্রিয়সম্ভোগবর্জ্জন, চরিত্রের পবিত্রতা-সাধন... ।" পুনশ্চ— '.. in their eyes gold and mud were of equal value ,' অর্থাৎ— '.. তাঁহাদের চক্ষে সোনা ও মাটী সমান।' আলি আল্ হ্রধ্বারির মতে 'সুফী' 'gives his lust the taste of tyranny', অর্থাৎ— 'তাহার কামভাবকে নির্য্যাতন করিয়া নিরোধ করেন'। বিখ্যাত সুফী, ইমাম কোশেরী মনে করেন 'সুফী' কথাটীর অর্থ 'পবিত্র'। সুফী আবুল হুসেন আল্ নূরী 'সুফী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'রক্তমাংসের দেহাত্মবোধকে সম্যক্ বর্জ্জন।' * ইহা ব্রহ্মচর্য্যেরই সগোত্র সাধনা।

---

* —পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭১।

এখন আমরা তন্ত্রসাধনার কথায় আসিতেছি। তন্ত্রসাধনার এক প্রাচীন ঐতিহ্য থাকিলেও প্রাচীন ভারতের সমাজ-ধর্ম্মের ব্যাপক বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার স্থান ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভারতের মধ্যযুগের সমাজজীবনে খণ্ড বিচ্ছিন্ন নানা স্বাধীন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটার সময় স্বভাবতঃই তন্ত্রসাধনাও দেশের নানাস্থানে গুহ্যসাধনারূপে ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধতন্ত্র ও 'হিন্দু'তন্ত্র মিলিয়া নানা রহস্যময় আচার-অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয় যাহাতে পরমশূন্য, নির্ব্বাণ বা পরমশিবকে লাভ করিবার জন্য শক্তিসাধনা, যন্ত্রসাধনা ও মন্ত্রসাধনার প্রবর্ত্তন ঘটে। ইহাদের জটিলতার মধ্যে না যাইয়া আমরা এখানে দেশে ব্যাপক ব্রহ্মচর্য্য-সাধনার প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের দিক্ দিয়াই বিষয়টী বিবেচনা করিব।

তন্ত্রসাধনার মধ্যেও আমরা স্পষ্টতঃ প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি একটা প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদের ভাবই লক্ষ্য করি। যেমন জ্ঞান-ভক্তিমার্গের ক্ষেত্রে তেমনি তন্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রাচীন বেদ-উপনিষদ্-সূত্র-স্মৃতিযুগের বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে ধরিয়া চলার কোনও বিশেষ সার্থকতা ছিল না। অথচ কি জ্ঞান-ভক্তিবাদে, কি তন্ত্রবাদে প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রমের মহিমাময় ঐতিহ্যকে একেবারে অস্বীকার করিবারও উপায় ছিল না। এজন্য তন্ত্রের মধ্যেও আমরা নানাস্থানে প্রাচীন বৈদিক আদর্শ ও সমাজসাধনার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিদ্রোহ দুইই একসঙ্গে দেখিতে পাই। নির্ব্বাণতন্ত্রে পাই 'ব্রহ্মচারী তপোধনঃ' বলিয়া ব্রহ্মচারীর প্রশংসা। ব্রাহ্মণ এবং আশ্রমধর্ম্মের দায়িত্ব-কর্ত্তব্যের প্রতি

কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধালু পক্ষপাতিত্বও স্থানে স্থানে নজরে পড়ে। নির্ব্বাণতন্ত্রে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সন্ন্যাসের অধিকার নাই এরূপও বলা হইয়াছে— 'ব্রাহ্মণেন বিনাঽন্যত্র সন্ন্যাসো নাস্তি...'। তন্ত্রসারে 'গুরুলক্ষণম্' প্রকরণে গুরু শান্ত, দান্ত (ইন্দ্রিয়সংযত) ও আশ্রমী হইবেন একথা রহিয়াছে। অথচ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে পাই—'কলৌ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমনিষেধঃ।

'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গৃহস্থো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে ॥'

অর্থাৎ— 'কলিকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নিষিদ্ধ।' .. .. 'হে প্রিয়ে, কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রম নাই। গৃহস্থ ও ভিক্ষুক (সন্ন্যাসী) এই দুইটী আশ্রমই আছে।' পাঠক লক্ষ্য করিবেন এখানে চতুরাশ্রম ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তিত আকারে সময়োপযোগী ভাবে গ্রহণ করা হইতেছে। বস্তুতঃ ভারতীয় 'হিন্দু'ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই এইরূপ। নানাভাবে যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী নানা পরিবর্ত্তন। সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতেও নানা কালোপযোগী পরিবর্ত্তিত বিধান দেখা যায়। কিন্তু যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় তাহা এই যে প্রাচীন ভারতের মূল আদর্শ-বাদকে— অর্থাৎ ব্রহ্মমুখী মনুষ্যত্বসাধনার ধারাকে কেহই অস্বীকার করেন নাই। সেজন্য ব্রহ্মচর্য্য সাধনার গুরুত্ব ভারতীয় ধর্ম্মসাধনায় সমানে রহিয়া গিয়াছে, কেবল বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবধারার সহিত তাহাকে যুক্ত করা হইয়াছে। তন্ত্রে গৃহস্থা-শ্রমের উপযোগিতার উল্লেখ রহিয়াছে এবং গৃহস্থাশ্রমে 'ঋতু-

কালে স্বদারনিরত' থাকিলে ব্রহ্মচারীভাবেই থাকা হয় এ কথাও রহিয়াছে (নির্ব্বাণতন্ত্র)। ইহা আমাদিগকে মনুসংহিতা ও উপনিষদে কথিত সংযমপ্রতিষ্ঠ-যৌনমিলনে ব্রহ্মচর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ফলকথা জ্ঞানবাদীগণের অদ্বৈতবিচার, ভক্তিবাদী-গণের ঈশ্বরসেবা ও তন্ত্রবাদীগণের শক্তিসাধন— সর্ব্বত্রই সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত।

তন্ত্রসাধনার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, কারণ পঞ্চমকার বা মৈথুন, মদ্য ইত্যাদি লইয়া সাধনার ব্যবস্থা তন্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু এখানেও দেখা যায় রিপু-ইন্দ্রিয়সংযমই তন্ত্রের লক্ষ্য এবং ইহার মধ্য দিয়া নির্ব্বাণ বা আত্মজ্ঞান লাভই পরম লক্ষ্য। প্রথমতঃ অনেক স্থলে মৈথুনাদি পঞ্চমকার-সাধনাকে স্থূলতাবর্জ্জিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে, যথা—কুলকুণ্ডলিনী-(কাম) শক্তির ও সহস্রারে শিবের মিলনই মৈথুন, ইত্যাদি। তাহা সত্ত্বেও তন্ত্রের বহুস্থলে, পঞ্চমকার লইয়া সাধনও বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কঠোর রিপু-ইন্দ্রিয় সংযমকে ভিত্তি করিয়াই এই সাধনায় অগ্রসর হইতে বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, তন্ত্রমতে দিব্য, বীর, পশু এইরূপ সাধক-স্তরের ভেদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণ, প্রচলিত আনুষ্ঠানিক (formal) ধর্ম্মসাধনাদিতে যাঁহারা বিশ্বাসী এবং তন্ত্রের চরমপন্থী সাধনার যাঁহারা উপযুক্ত নহেন তাঁহাদের 'পশু' বলা হইয়াছে। এজন্য তন্ত্রমতে 'পশু' আসলে নিম্নস্তরের সাধারণ সাধক—যাঁহারা প্রচলিত পূজা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি

লইয়া চলেন। রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে পশুভাবাদি নির্ণয়সূত্রে বলা হইয়াছে—

'দুর্গাপূজাং, বিষ্ণুপূজাং, শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ॥',

অর্থাৎ— 'যিনি নিত্য দুর্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা অবশ্যই করেন, তিনি উত্তম পশু বলিয়া পরিচিত।' কিন্তু পশুভাবে সাধনায় ফল অতি মন্দগতি। সেজন্য দ্রুত ও সুনিশ্চিত ফললাভের জন্য তন্ত্রমতে বীরভাবাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

'পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিনঃ।
কর্তব্যঞ্চ মহেশানি দেবতাভাববোধনম্॥,

অর্থাৎ— 'পশুভাবে স্থিত মন্ত্রসমূহ কেবলমাত্র বর্ণরূপী। সুতরাং হে মহেশানি, দেবতাভাব জাগ্রত করা প্রয়োজন।' 'তস্মাৎ...... বীরভাবেন সাধয়েৎ।' —সুতরাং বীরভাবে সাধনা করিবে। এই বীরভাবের সাধনাদিতে লক্ষ্য করা যায় জৈব জীবনের মূল ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির শক্তিকে গুরূপদেশে সাধনার কাজে লাগান। কিন্তু সংযতস্বভাব বিশেষ অধিকারী ছাড়া এই ইন্দ্রিয়শক্তিকে লইয়া খেলা করা যায় না। সময়াচারতন্ত্রে বলা হইয়াছে—

'মোহাদ্ বা কামতো বাপি যঃ কশ্চিদিহ বর্ত্ততে।
সোহধমঃ সাধকানাঞ্চ নারকী ভবতি ধ্রুবম্॥'

(তন্ত্রসার),

অর্থাৎ— 'মোহ বা কামের বশে যে কেহ এই সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই অধম সাধক নিশ্চয় নরকে গমন করে।' তন্ত্রের

বহুস্থানেই এইজাতীয় সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। কুলার্ণবে বলা হইয়াছে—

'স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ব্রজন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ ॥'

—(তন্ত্রসার),

অর্থাৎ— 'হে দেবেশি, যদি স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারা মোক্ষলাভ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে সমস্ত জন্তুই স্ত্রীসংগমের ফলে মুক্ত হইয়া যাইত।' অন্যান্য 'ম'কার সম্বন্ধেও ঐরূপ। পশুভাবাশ্রিত সাধকদের স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা নিষিদ্ধ হইয়াছে— 'পশুভাবাশ্রিতো মন্ত্রী কলাং নৈব প্রপূজয়েৎ' (নিরুত্তরতন্ত্র)। মনের অনেকখানি সংযত-প্রশান্ত দৃঢ়ভাব ছাড়া এ সাধনা করা যায় না। মনুষ্যবুদ্ধিতেও ইহা করা চলে না। যথা—

'শক্তৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু যঃ করোতি বরাননে।
ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্বিপরীতফলং লভেৎ ॥

* * * *

পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্ যস্য ঘৃণাস্যাদ্রক্তরেতসোঃ।
তমালোক্য বরারোহে কুলীনঃ পশুতামিয়াৎ ॥

— (উত্তরতন্ত্র, ২য় পটল; তন্ত্রসার)।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে 'বেশ্যা' কথাটিরও তন্ত্রে বিশেষ সংজ্ঞা রহিয়াছে। তাহার বাহিরে সাধারণ বেশ্যাসংসর্গে রৌরব নরকে পতিত হইতে হয়,— কুলটাসংগমাদেব রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।'

এমন কি বীরভাবে সাধনার ক্ষেত্রেও বীরসাধক নিজভৈরবী ছাড়া অন্য কোনও নারীর স্মরণও করিতে পারেন না, ভৈরবীর পক্ষেও একই নিয়ম, উভয়ত্র ঐ সংযম না মানিলে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়। সুতরাং সব দিক্ দিয়াই দেখিতে পাওয়া যায় তন্ত্রসাধনায় রিপু-ইন্দ্রিয়সংযমের গভীর তাৎপর্য্য। তন্ত্রসাধনায় সমস্ত স্ত্রীলোকের প্রতি গভীর ভক্তিভাব লক্ষণীয়— 'বৃদ্ধাং বা যুবতীং বাপি নমস্কুর্য্যাদ্বরাননে।' নিগমকল্পদ্রুমে পাই স্ত্রীলোকের যাবতীয় অঙ্গদর্শনমাত্র পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া মন্ত্ররাজ জপ করিতে হইবে।

সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মতই বৈদিক বর্ণাশ্রমকর্ম্মকে অনেকটা অস্বীকার করিলেও তন্ত্র ব্রহ্মচর্য্যের মূল ভাবকে বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। কুলার্ণবে স্পষ্টই ব্রহ্মচর্যের উল্লেখও রহিয়াছে—

'ভূশয্যা ব্রহ্মচারিত্বং মৌনঞ্চাচার্য্যসেবিতা।

* * * *

জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধর্ম্মাঃ স্যুর্মন্ত্রসিদ্ধিদাঃ॥'

অর্থাৎ— 'ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্য্যপালন, মৌন, আচার্যসেবা, জপনিষ্ঠা (ইত্যাদি) বারটি ধর্ম্ম মন্ত্রসিদ্ধি দান করে।' রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় মৈথুন, মৈথুনবিষয়ক আলাপ এবং তদ্গোষ্ঠী অর্থাৎ লম্পটগোষ্ঠী (গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকারীর প্রসঙ্গ তুলনীয়) ঋতুকালে (শাস্ত্রীয় ভাবে) ছাড়া নিজস্ত্রীকেও কামভাবে স্পর্শ করা, কুটিলতা, সংকল্পবিহীন কাজ

ইত্যাদি মন্ত্রসাধকের পক্ষে নিষেধ করা হইয়াছে। নারদীয় তন্ত্রে গুরুভোজন ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক খাদ্য ভোজনও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কুলার্ণবতন্ত্রে— 'মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ' বলিয়া পরস্ত্রীসম্ভোগের প্রবৃত্তিকে বিশেষ নিন্দনীয় বলা হইয়াছে।

সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্র যে মূলতঃ ব্রহ্মচর্য্যসাধনার বিশেষ পক্ষপাতী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে যে কলিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নিষেধ বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মচর্য্যের নিষেধ নয়, পরন্তু প্রাচীনকালের মত সমাজধর্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম্মের অধীনে সুনিয়ন্ত্রিত বর্ণাশ্রম-সাধনার ব্যবস্থা না থাকায় এবং লোকের দেহমন সেইরূপ তপস্যার উপযুক্ত না হওয়ায়— স্বভাবতঃই সময়ের অনুপযোগিবোধে উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ ইহা বলা প্রয়োজন যে নবযুগে নবজাতীয়তার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আজ আমাদের পুনরায় নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা ও তন্ত্রসাধনার এই আলোচনায় আমরা কি পাইলাম ? উভয়েই বৈদিক বর্ণাশ্রমের কর্ম্মসাধনার প্রাণহীন অনুষ্ঠানকে বন্ধন জ্ঞান করিয়া এক এক ভাবে এক এক দিকে নূতন পথ কাটিয়া লইয়াছে। পরমতত্ত্বের সাধনায় জীবন্ত ভাবরসের সঞ্চার করিয়া সাধনাকে প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ করিবার চেষ্টাই করা হইয়াছে।

তাহার পর 'সহজিয়া', 'বাউল' ইত্যাদি মতের সাধনা। এই সাধনপন্থাগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের 'রাগমার্গে সাধন'-এর

বৌদ্ধতন্ত্র-হিন্দুতন্ত্র-সহজিয়া-বাউল ইত্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা মধ্যযুগের অনেকগুলি সাধনপন্থা ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের (ইহার মধ্যে শৈবধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, নাথযোগীদের ধর্ম্ম ইত্যাদি সকলই পড়ে) কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের মধ্যে গিয়া পড়ি। এগুলি 'শূন্য', 'বোধিচিত্ত' 'বিন্দু' 'পুরুষ' 'শিব' ইত্যাদি। এই শব্দগুলি এবং ইহাদের সহিত সংযুক্ত 'করুণা', 'নাদ' 'প্রকৃতি' 'শক্তি' ইত্যাদি শব্দগুলি এবং তাহাদের দার্শনিক ও যৌগিক তাৎপর্যের আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ সাধনদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে দেহমনোবুদ্ধির কাম-চাঞ্চল্যকে নিবারিত করিয়া একটা দৃঢ়, স্থির, প্রশান্ত ভূমিকে লাভ করাই এ সকলের উদ্দেশ্য। বজ্রযানের গুরুও 'প্রজ্ঞোপায়-বিনিশ্চয়-সিদ্ধি' গ্রন্থে এই কথাটাই সরলভাবে বলিয়াছেন, 'রাগাদিদুর্ব্বারমলাবলিপ্তং, চিত্তং হি সংসারমুবাচ বজ্রী'। অর্থাৎ, রিপু-ইন্দ্রিয়ের আসক্তিতে অবলিপ্ত মনই সংসার—বজ্রী (বজ্রযান-গুরু) ইহা বলিয়াছেন'। বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন সাধনমার্গে এই সাধনাই স্বভাবসংস্কারানুযায়ী নানা আকার ধারণ করিয়াছিল। মূলে ইহা ভারতের সনাতন ব্রহ্মচর্য্যেরই সাধনা। ব্যাপক অর্থে ইহা সুসংযত দৃঢ় চরিত্রের সাধনা। কিন্তু মধ্যযুগের প্রথম হইতেই জাতীয় ও সমাজজীবনে এই ব্রহ্মচর্য্যসাধনার ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মধ্যযুগের অবসানে তাহা একরূপ মৃতকল্প হইয়া পড়ে। আজও তাহার সেই অবস্থা। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের সঙ্কটমুহূর্ত্তে মাত্র ঐ

মধ্যযুগীয় রহস্যসাধনার আলোচনা খুব বেশী কাজে লাগিবে না। সহজ-সরল-যুগোপযোগী পথে, জাতীয়জীবনে ও সমাজ-জীবনে রিপু-ইন্দ্রিয়ের ব্যাপক অসংযম হইতে মুক্তির কোনও পথ আছে কি না তাহাই আজ আসল কথা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের যাবতীয় সাধনার মূল নীতি নির্ণয় করিয়া আধুনিক বাস্তবজীবনে মানবিকতার প্রতিষ্ঠাই আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। ইহা কোনও শান্তি মুক্তির আন্দোলন নয় একথা একেবারে ভুল। ইহাই ভাবী যুগের বিরাট ও ব্যাপক মহাশান্তি-মহামুক্তির আন্দোলনের প্রস্তুতি ও অগ্রগতি।

এখন আমরা স্বামী নিগমানন্দের 'যোগীগুরু' গ্রন্থ হইতে মধ্যযুগের হিন্দুশাস্ত্রের কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতেছি।

— ব্রহ্মচারী মিতাহারী ত্যাগী যোগপরায়ণঃ।
অব্দাদূর্দ্ধং ভবেৎ সিদ্ধো নাত্রকার্যবিচারণা॥'

—(গোরক্ষসংহিতা)

অর্থাৎ—'ব্রহ্মচারী, মিতাহারী, ত্যাগী, যোগপরায়ণ ব্যক্তি এক বৎসরে সিদ্ধিলাভ করেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই।' এই গ্রন্থে রহিয়াছে যোগমার্গানুযায়ী বিবাহিত ব্যক্তি মাসে মাত্র একদিন স্ত্রীর ঋতুরক্ষা করিবেন।

—'যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আত্মক্ষয়ো বিন্দুহানাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥'

—(দত্তাত্রেয়সংহিতা),

অর্থাৎ—'যৌনসঙ্গ করিলে বিন্দুনাশ হয় এবং বিন্দুনাশের ফলে আত্মক্ষয় ও অসামর্থ্য সৃষ্টি হয়।'

—'ভগাদিকুচপর্যন্তং সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্।
যে রমন্তে পুনস্তত্র তরন্তি নরকং কথম্ ॥'

—(অবধূতগীতা).

অর্থাৎ—'স্ত্রীযোনি হইতে স্তনপর্য্যন্ত (স্ত্রীদেহের সমস্ত) নরকার্ণব বলিয়া জানিবে। তাহাতে যাহারা আনন্দ পায় (বা আনন্দ করে) তাহারা কেমন করিয়া নরক উত্তীর্ণ হইবে?'

এই জাতীয় উক্তিগুলিও মধ্যযুগের তীব্র কামবিতৃষ্ণামূলক সংযমসাধনারই স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মধ্যযুগের ধর্ম্মভিত্তিক সমাজরাষ্ট্রসাধনার আদর্শহীন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়সাধনা ও ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনারই এই স্বাক্ষর। ইহা সমাজধর্ম্মের অবক্ষয়ের যুগসাধনা, সেজন্য স্বাভাবিক, সুস্থ যৌনসংযমের ভিত্তিতে ব্যাপক ভোগ ও ত্যাগের শিক্ষাসাধনা এখানে নাই। প্রতিক্রিয়া মূলক (reactionary) ইন্দ্রিয়সংযমই ইহার প্রাণ। সেজন্য জাতীয়জীবনে ইহার spirit (ভাব) গ্রহণ করিয়া ইহার form (আকার) পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তখনই আমরা পুনরায় বেদ-উপনিষদ্-স্মৃতি-রামায়ণ-মহাভারতের মহাযুগের সহিত নূতন সংযোগ স্থাপন করিতে পারিব।

এখন আমরা আধুনিক যুগে আসিতেছি। একদিকে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের ভাবধারার সহিত পরবর্ত্তী যুগধারাগুলি মিলিয়া

মিশিয়া প্রাণশক্তিহীন যজ্ঞহোম-জ্ঞানভক্তি—তন্ত্রমন্ত্র-আচারবিচার-ব্রতপূজা-মাঙ্গলিকানুষ্ঠান ইত্যাদি বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে, অপর দিকে ইংরাজরাজত্বের সময় হইতে যন্ত্রসভ্যতার স্পর্শ পাইয়া সমাজজীবনে এক নূতন ঐহিক জীবনস্পন্দন অনুভূত হইয়াছে। একদিকে মৃতকল্প আধ্যাত্মিক, অপরদিকে নবস্ফুরিত ঐহিক—এই উভয়ের সংঘাতে ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজকে ছাড়িয়া ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে আশ্রয় করিয়া কোনওক্রমে টিকিয়া আছে। জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় জীবনের সহিত তো বহুপূর্ব্বেই সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। এই অবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে একদিকে আসিয়াছে জড় ভোগবাদ ও স্বার্থপর ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ এবং অপরদিকে আসিয়াছে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের জনসেবাবাদ। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি (পৃঃ ১১২) প্রাচীন ভারতীয় সমাজধর্ম্মে মানবকল্যাণ এত বিরাট্ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল যে পৃথক্ সেবা-প্রতিষ্ঠানের তত প্রয়োজনীয়তা ছিল না। পরবর্ত্তী জ্ঞান-ভক্তির যুগে সমাজধর্ম্ম ক্ষীণ হইলেও মোটামুটী সমাজ স্বাবলম্বী ও স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে সমাজ ও সমাজধর্ম্ম মৃতপ্রায় বলিয়া পাশ্চাত্য জনসেবাবাদই অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। এই জনসেবাবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ তথা ভোগবাদ মিলিয়া আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন। ইহাই এ যুগের জনহিতৈষণার ধর্ম্ম। কিন্তু এই ভোগসর্ব্বস্ব জন-হিতৈষণার ক্ষেত্রেও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা আত্মপ্রকাশ করিতে ছাড়ে নাই। এজন্য একদিকে আমরা পাইয়াছি নবযুগের জাতীয়তায় উদ্গাতা নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রেরণা,

অপরদিকে আধুনিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জনসেবার প্রচেষ্টা। ইহার ফলে চিরগতিশীল ভারতীয় ধর্ম্মচেতনা রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নূতন ভারতীয় জীবনগঠনের দিকে ঝুঁকি দিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় পরিবেশ। এই অবস্থায় ইস্লামের সমাজসাম্যও ভারতীয় জনজীবনে একটা নূতন প্রয়োজনীয়তারূপে দেখা দিয়াছে। ইস্লামের নিষ্ঠা ও ভক্তি এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রেম ও সেবা ইতিপূর্ব্বেই ভারতীয় জাতীয়জীবনে একটা প্রভাব ফেলিয়াছে একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

কিন্তু মূল কথা হইতেছে যে এই জটিল যুগপরিবেশে ভারতের জাতীয় জীবনে 'ধর্ম্ম' হইয়া উঠিয়াছে একান্তভাবেই একটা 'ব্যক্তিগত' ব্যাপার। ভারতের সমাজধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাষ্ট্রবাদের স্মৃতি মুছিয়া যাওয়ার ফলেই এই নূতন মতবাদের উদ্ভব। ভারতের মানবধর্ম্মসাধনারও যে একটা 'আকার-প্রকার' আছে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়), তাহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। ইহারই জন্য ভারতীয় 'হিন্দু'ধর্ম্ম বহিরাগত খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের সহিত এখনও মিলিত হইতে পারিতেছে না, একথাও আমরা পূর্ব্বে (পৃঃ ১০৬) আলোচনা করিয়াছি।

এই পরিবর্ত্তনেরও পশ্চাতে সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি সমাজধর্ম্মবিরোধী অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-অস্বীকারী ভাবধারার প্লাবন ভারতীয় সমাজের বক্ষে স্তরে স্তরে যে পলি ফেলিয়াছে তাহাতে জাতীয়জীবনে ব্রহ্মচর্য্যসাধনার বীজভূমি

বহুপূর্ব্বেই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু নূতন যুগের সন্ধিক্ষণে শাশ্বত-প্রাণবান্ ঐ বীজভূমি হইতে প্রাচীন বর্ণাশ্রমের বাহ্যিক রূপ বর্জ্জিত হইয়া তাহার সমাজধর্ম্মী মনুষ্যত্বসাধনা নূতনরূপে দেখা দিবে। যে আধ্যাত্মিক জীবনবাদ দেশ-জাতি-সমাজ-রাষ্ট্রকে ও তৎসহ বিশ্বজীবনকে মহাকল্যাণমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া একদিন বলিয়াছিল—

'সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ॥'

—'সকলের মঙ্গল হোক্, সকলে ক্লেশমুক্ত হোক্, সকলে কল্যাণ লাভ করুক, কেউ যেন দুঃখভোগ না করে', সেই আধ্যাত্মিক জীবনবাদের যুগ আজ ফিরিয়া আসিতে উন্মুখ হইয়াছে। যে সংশয়-সংঘর্ষ আমরা চারিদিকে অহরহঃ দেখিতেছি তাহা এই নূতন মহাজীবনেরই প্রসববেদনা মাত্র। ভারতের জাতীয় ধর্ম্মকে আজ এক নূতন প্রাণবান্ রূপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহারই প্রস্তুতি চারিদিকে চলিতেছে এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ভারতের জাতীয় জীবনকে যে আজ ভিতর হইতে সাম্প্রদায়িকতা-আঞ্চলিকতা এবং বাহির হইতে ভোগবাদ ও সাম্যবাদ এত প্রভাবিত করিতেছে ইহারও পশ্চাতে সর্ব্বনিয়ন্তা ভারতভাগ্যবিধাতার অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত রহিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্প্রদায়ধর্ম্মের ক্ষেত্রে এক জাতিগত সমাজধর্ম্মের সাধনা, স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত যৌনকাম-ধনকাম-প্রভুত্বকামের স্থলে সমাজগত ও রাষ্ট্রগত কামনিয়ন্ত্রণযুগের এগুলি পূর্ব সূচনা।

এজন্য ভারতের শাশ্বত সমাজধর্ম্মবাদকে আজ সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তবক্ষেত্রে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। ইহা শুধু ভারতের সমস্যাসমাধানের প্রশ্ন নয়। ইহা নূতন যুগে এক নূতন বিশ্বজীবনগঠনের প্রশ্ন। আমরা এতদূর পর্য্যন্ত বিভিন্ন অধ্যায়ের সুদীর্ঘ আলোচনার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে ভারতের চিরন্তন ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সেই নূতন মহাপ্রকাশের যথেষ্ট শক্তিশালী উপাদান রহিয়াছে। এই নূতন জাতীয়তার জন্য আজ চাই যৌনকাম-ধনকাম-প্রভুত্বকামের জাতীয় নিয়ন্ত্রণ, বা জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনা।

আধুনিক যুগে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ হইতেই জাতীয় পুনর্জাগরণের সূত্রপাত। সুতরাং ঐ সময় হইতেই সহস্রাধিক বৎসরের 'মৃত' সমাজে জীবনের স্পন্দন দেখা দিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম্মসাধনার ব্যর্থতা তখন হইতেই নানাভাবে অনুভূত হইয়াছে। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশে প্রথমেই পাশ্চাত্যশিক্ষিত সমাজে সংশয় ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকোপ দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত সমাজের একাংশে আসে নিজেদের প্রাচীন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও সমালোচনা। ঐযুগেরই শিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণেরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নাম লইয়া 'মৃত' হিন্দু সমাজ'কে অবজ্ঞা করিয়া আত্ম-তৃপ্তি বোধ করিত। এই সবই স্বাভাবিক, কারণ প্রাণহীন সমাজের ধর্ম্ম'কে মানিয়া লওয়া অপেক্ষা অস্বীকার করাতেই একপ্রকার আত্মাভিমানের স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে। সে যাহা হউক, ইহা যে ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের যুগরূপে দেখা দিয়াছিল ইহাও

ভারতের শাশ্বত ধর্ম্ম ও সমাজের অমর প্রাণবত্তারই লক্ষণ। বাংলায় ব্রহ্মসমাজ ও বোম্বাইয়ে প্রার্থনাসমাজ এই সংস্কার-আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে। ইহাদের সহিত আর্যসমাজ ও আধা-বিদেশী থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়েরও নাম করা যায়। একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার মত। তাহা এই যে ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা-সমাজ, আর্যসমাজ, এমনকি থিওজফিষ্ট আন্দোলনগুলি প্রচলিত 'হিন্দু' ধর্ম্মকে কতকটা অস্বীকার করিলেও প্রকৃত 'হিন্দু' ধর্ম্ম ও 'হিন্দু' সমাজের জাগরণ ও সংগঠন ইহাদের লক্ষ্য ছিল। এজন্য বেদ বা উপনিষদ্ অথবা তন্ত্রাদি হইতে প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জন বা নূতন ব্যাখ্যা সহ এই আন্দোলনগুলি প্রবর্ত্তিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হিন্দু' ধর্ম্ম ও 'হিন্দু' সমাজের রক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। * এমনকি রাজা রামমোহনের সময়ে প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম উপাসনাগৃহে বৈদিক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদপাঠের ব্যবস্থা ছিল। রামমোহন বরাবর ব্রাহ্মণের যজ্ঞো-পবীত ধারণ করিতেন। এ সবই প্রকারান্তরে ভারতের প্রাচীন সমাজধর্ম্মের প্রতি আনুগত্য। মহারাষ্ট্রের প্রার্থনাসমাজ আরও বেশী 'হিন্দু' ধর্ম্মের অনুসরণে উৎসুক ছিল এবং মহাত্মা নামদেব, তুকারাম, রামদাস ইত্যাদির ঐতিহ্যকে বহন করিতেছিল। আর্যসমাজ মূল বৈদিক ধর্ম্মকে দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্যাখ্যামত তুলিয়া ধরিতেছিল। এমনকি থিওসফিষ্ট আন্দোলনও 'from the very start allied itself to the Hindu Revival movement', অর্থাৎ— 'প্রারম্ভ হইতেই হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জাগ-

* —মহর্ষির আত্মজীবনী, ১৩শ ও ১৪শ পরিচ্ছেদ।

রণের আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল।' § বস্তুতঃ মধ্যযুগে শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তি-আন্দোলনগুলি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজকে রাজকীয় ধর্ম্ম ইস্‌লামের সংঘাত হইতে আত্মরক্ষায় যেমন সহায়তা করিয়াছিল, এই শতাব্দীতে এই সংস্কার আন্দোলনগুলিও রাজকীয় খ্রীষ্টধর্ম্মের সংঘাতের সম্মুখে সেই সহায়তাই দিয়াছিল। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই ইস্‌লাম এবং খৃষ্টধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ও গ্রহণীয় জিনিষ গ্রহণ করিয়া এই সব আন্দোলনগুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের ধর্ম্মান্দোলনের ন্যায় এযুগের এই আন্দোলনেও ইস্‌লামী ও খৃষ্টীয় প্রভাব অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রাচীন যুগের মত বহিরাগত সমাজকে গ্রহণ করিয়া মিলাইয়া লইবার শক্তি 'হিন্দু' সমাজের এ সময় ছিল না। কারণ ভারতের সমাজধর্ম্ম তখন কালপ্রভাবে অতি ক্ষীণ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সে যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক্ দিয়া যাহা লক্ষণীয় তাহা এই যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজধর্ম্মের শাস্ত্রাদির (যথা—মনুসংহিতা, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, এবং বেদ-উপনিষদ্) মধ্য হইতেই মূল উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইত্যাদি প্রকারান্তরে ভারতীয় ধর্ম্মের সমস্ত ধারাকেই স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের যে 'অনুশাসন' গ্রন্থ (code of conduct) প্রস্তুত করেন তাহাতে দশম অধ্যায়ে রিপুদমন ও

---

§ —'An Advanced History of India', Majumdar, Raychowdhuri and Datta, Pg : 886.

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়সংযম বিহিত হইয়াছে। * তাঁহার প্রবর্ত্তিত স্তোত্রের মধ্যেও রহিয়াছে—'......যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনাদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে, তাহারা তোমাকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায় না...... ।' সুতরাং এই সব আধুনিক যুগের প্রারম্ভিক ধর্ম্ম-আন্দোলনেও ভারতের ব্রহ্মচর্যমূলক সমাজধর্ম্মের ধারার ক্ষীণস্রোত শতবাধার তলায় প্রবাহিত হইতেছিল।

কিন্তু তথাপি ইহা প্রধানতঃ সমাজসংস্কারের যুগ। নূতন জাতীয়চেতনা ক্রমশঃ জাগ্রত হওয়ার সহিত এবং রাজনৈতিক আন্দোলন অগ্রসর হওয়ার সহিত সমাজসংস্কারেরও অগ্রগতি হইতে থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পরই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাণাডে (Justice Ranade) জাতীয় সমাজসম্মেলন স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার বোম্বাই বক্তৃতায় বলেন— 'Our political subjection was the direct result of our social incoherence and our social dissensions.', —অর্থাৎ 'আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক অসামঞ্জস্য এবং ভেদবিবাদেরই প্রত্যক্ষ ফলরূপে দেখা দিয়াছিল।' § পরবর্ত্তী জাতীয় নেতৃবৃন্দও এই সমাজসংস্কার ও সমাজসংঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ বালগঙ্গাধর

* —মহর্ষির আত্মজীবনী, ২৩শ পরিচ্ছেদ।

§ President Radhakrishnan's Speeches and Writings (Govt. of India Publication), Pg : 337.

তিলক এবং মহাত্মা গান্ধী। ইঁহাদের সামাজিক উন্নয়ন ও সংগঠন-আন্দোলনের পিছনেও ছিল ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতি এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। ইহারই আনুষঙ্গিক প্রচেষ্টারূপে জাতির নৈতিক চরিত্রগঠনের উপরও তাঁহারা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর দীর্ঘকালব্যাপী ব্রহ্মচর্যপ্রচার সুবিদিত। বাংলায় শ্রদ্ধেয় জননায়কগণও, যথা বিপিন চন্দ্র পাল, আনন্দমোহন বসু (সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী) অশ্বিনী কুমার দত্ত ইত্যাদি, দেশের সেবায় চরিত্রগঠন ও সংযম-পবিত্রতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' ব্রহ্মচর্যসাধনার বার্ত্তা দেশে ঘোষণা করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতির যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা পাশ্চাত্ত্য মিল্‌-বেন্থাম্‌-লক্‌-কোম্‌ৎ-এর সম্মুখে হিন্দুধর্ম্মকে বিভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার 'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসী বিপ্লবীদের 'বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীত ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছিল। এই 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদের অন্যতম প্রধান ব্রত ছিল রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযম—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য। বস্তুতঃ এই যুগে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতিই নূতন দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অ্যানি বেশান্ট (Annie Besant) তাঁহার আত্মজীবনীতে লেখেন— The Indian work is, first of all, the revival, strengthening and uplifting of the ancient religions. This has brought with it a new self-respect, a pride in the past, a belief in

the future, and, as an inevitable result, a great wave of patriotic life, the beginning of the rebuilding of a nation.', অর্থাৎ—'ভারতের কার্য্য হইল সর্ব্বপ্রথমেই প্রাচীন ধর্ম্মসমূহের পুনর্জ্জাগরণ, বলবিধান এবং উন্নয়ন। ইহার সহিত আসিল এক নূতন আত্মমর্যাদাবোধ, অতীতের সম্বন্ধে গর্ব্ববোধ, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলরূপে দেখা দিল দেশাত্মবোধের এক বিপুল ঢেউ এবং তাহাই হইল এই জাতির পুনর্গঠনের সূত্রপাত।' মিসেস্ বেশান্টের প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও স্মরণে রাখিবার মত। 'Mrs. Beasant held that the present problems of India could be solved by the revival and re-introduction of her ancient ideals and institutions.', অর্থাৎ—'মিসেস্ বেশান্টের বিশ্বাস ছিল যে ভারতের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান দেশের প্রাচীন আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুদ্বোধন ও পুনঃপ্রবর্ত্তনের দ্বারা সম্ভব হইবে।' আমাদের প্রতিপাদ্য জাতীয় ব্রহ্মচর্য সাধনা এবং মনুষ্যত্বগঠনের সমাজব্যবস্থা (বর্ণাশ্রম) এই মনস্বিনী ভারত-প্রেমিকা বিদেশীমহিলার দ্বারা সমর্থিত। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী থিওসফিষ্ট আন্দোলনের এই নেত্রীকে নিশ্চয় কেহই সাম্প্রদায়িকতার দোষ দিতে পারিবে না। সমসাময়িক-কালে রাণাডে (Justice Ranade)-কর্ত্তৃক স্থাপিত 'দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতি' (The Deccan Education Society) দেশের যুবকদের দেশসেবার ব্রত লইয়া চরিত্রগঠনে

উদ্বুদ্ধ করে এবং ইহার কিছু পরে মহামতি গোখেল (Gokhale) যে 'ভারত সেবক সমিতি' (Servants of India Society) গঠন করেন তাহারও লক্ষ্য ছিল ভারতের সেবায় 'National Missionaries' বা জাতীয় ধর্ম্মপ্রচারকদল গঠন করা, দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ হইবে যাহাদের ধর্ম্মসাধনা। * স্বভাবতঃই সে যুগের 'স্বদেশী' গুপ্তসমিতির বিপ্লবী আন্দোলনেও গীতা ও চরিত্র-সাধনা গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। বাংলায় ঠাকুর-পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি 'হিন্দু' মেলার মধ্য দিয়া দেশাত্ম-বোধ প্রচারে উদ্যোগী হন্ এবং রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু' ধর্ম্ম ও সমাজের পুনর্জ্জাগরণের মধ্য দিয়া এক নূতন মানবধর্ম্মী জাতিগঠন ও বিশ্বগঠনের স্বপ্ন দেখেন। এগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রগতিশীল সমাজ-ও-জাতিগঠনের আদর্শবাদেরই ফল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মেও প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতির প্রতি আনুগত্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

অপরদিকে এই নবজাতীয়তার জাগরণক্ষণে ভারতধর্ম্মের মহিমা উচ্চকণ্ঠে বিদেশে ঘোষণা করিলেন উত্তর ভারত হইতে স্বামী রামতীর্থ এবং পূর্ব্বভারত হইতে স্বামী বিবেকানন্দ। বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃপ্রভাবে 'স্বামীজী'র সুমহান্ ব্যক্তিত্ব যে বিরাট ধর্ম্মান্দোলনের সৃষ্টি করিল তাহাতে ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মসংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া দেশ-জাতি-সমাজ নূতন প্রেরণায়

* —An Advanced History of India, Majumdar, Raychoudhuri and Datta, Pgg: 886, 887 হইতে অ্যানি বেশাণ্ট, রাণাডে ও গোখেল সম্বন্ধীয় উদ্ধৃতি সংকলিত।

আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই সময়ে 'স্বামীজী'র যোগ্য উত্তরসাধিকা ভগিনী নিবেদিতা (Sister Nivedita) ভারতের নূতন জাতীয়তার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করিলেন—'India is evolving a new civilization... the great danger of such an era is the loss of moral stability', অর্থাৎ—'ভারত এক নূতন সভ্যতার পথে পা বাড়াইতেছে.........এরূপ যুগের মহাবিপদ্ হইতেছে নৈতিক দৃঢ়তার অবক্ষয়।' তিনি নৈতিক জীবনের সংজ্ঞা দিলেন—'True morality is a fire of will, of purity, of character, of sacrifice', অর্থাৎ—'সত্যকার নৈতিক জীবন হইতেছে জ্বলন্ত ইচ্ছাশক্তি, পবিত্রতা, চরিত্র ও ত্যাগের অগ্নিময়ী প্রেরণা।' বলা বাহুল্য এসবই মূলতঃ ব্রহ্মচর্যের অগ্নিমন্ত্র। ভারতে ধর্ম্মের সংজ্ঞা দিয়া ভগিনী নিবেদিতা ইহাকে 'National Righteousness' বলিলেন, অর্থাৎ—জাতীয় জীবনে সাধুতাই ভারতের ধর্ম্ম। আজিকার জাতীয় দুর্নীতির দিনে ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সংজ্ঞা আমাদের জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনার প্রসঙ্গেও অর্থপূর্ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ নানাদিকে সংস্কারকামী হইলেও তাঁহার মহান্ গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় সনাতন ভারতের সমাজধর্ম্মকেই জাতির সামনে তুলিয়া ধরিলেন। প্রাচীন বর্ণাশ্রমের মূল আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং তাহার ভিত্তিস্বরূপ জাতীয় জীবনে ব্রহ্মচর্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা 'স্বামীজী'

বহুস্থানে ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি উক্তি এখানে সন্নিবেশিত হইল—

'Modern system of education-এ (বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে) ব্রহ্মবিদ্যা-বিকাশের সুযোগ বিন্দুমাত্র নেই। পূর্ব্বের মতো ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ......আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিৎ একই কথা। ......এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।'

'দেখ্ বাবা, ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্ম্মজীবন লাভ করতে ব্রহ্মচর্যই তার একমাত্র সহায়। ....আমার ভেতরের কথা তোদের বলছি। ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকুও ধর্ম্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবি।'

'Absolute (অখণ্ড) ব্রহ্মচর্য করাতে হবে প্রত্যেক ছেলেটাকে, তবে না শ্রদ্ধাবিশ্বাস জাগবে ? নইলে যার শ্রদ্ধাবিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না ?'

'আমাদের দেশে যথার্থ কল্যাণের জন্য এই রকম কতকগুলি পবিত্র জীবন ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী দরকার হয়ে পড়েছে। ....তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উলটে যাবে। *

'জগতের ধর্ম্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে

* —স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫-৪২৭।

পর্য্যবসিত। জগতের এখন একান্ত প্রয়োজন হ'ল—চরিত্র।'

'সমগ্র ভারতসন্তানগণের এক্ষণে কর্ত্তব্য—তাহারা যেন সমগ্র জগৎকে মানবজীবন সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে উপযুক্ত করে। তাহারা সমগ্র জগৎকে ধর্ম্ম শিখাইতে ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ বাধ্য।'

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ তাঁহার জাতিগঠন-কর্ম্ম-পদ্ধতিতে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে এইরূপ প্রেরণাময়ী উক্তি করিয়াছেন—

'ভারত! ভুলিও না তুমি ঋষির বংশধর; তোমার ধর্ম্ম ও সমাজ ঋষির হস্তে গঠিত। ....ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যই তোমার সনাতন আদর্শ, তোমার জাতীয় জীবনের মূল মন্ত্র। ....ব্রহ্মচর্য অবলম্বন কর। সমাজ ও জাতির জীবনে সংযম ও ব্রহ্মচর্যের অমোঘ বীর্য ও অক্ষয় ওজঃ বিদ্যুৎগতিতে সঞ্চরণ করিতে দাও, ভারত আবার সোণার ভারতে পরিণত হইবে।'

'কায়মনোবাক্যে বীর্য্যধারণ করিবে। বীর্যই জীবন, বীর্য্যই প্রাণ, বীর্যই মানুষের যথাসর্ব্বস্ব। বীর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়। আর এই বীর্য্য নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।'

'আজকাল ছাত্রসমাজের অধঃপতনের মূল কারণ এই ব্রহ্মচর্য্যহীনতা। ....তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য আজ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। ......আজ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব মানুষের। দেশ-গঠন, জাতি-গঠন,

সমাজ-গঠন—যাহা কিছু বল না কেন সর্ব্বাগ্রে চাই মানুষ-গঠন।'

'রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের ভিতর দিয়া যাহারা মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী তাহারা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর।'

'এযুগ মহাজাগরণের যুগ, এযুগ মহামিলনের যুগ, এযুগ মহাসমন্বয়ের যুগ, এযুগ মহামুক্তির যুগ। ...... ভারত আবার জাগিবে আবার উঠিবে, আধ্যাত্মিকতাকে অবলম্বন করিয়া আবার জগদ্গুরুর আসন অবলম্বন করিবে।' *

বাংলার গৃহস্থজীবনে সুপরিচিত 'সদ্গুরু' বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও সংযম-ব্রহ্মচর্যের একজন বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'সত্যপালন এবং বীর্যরক্ষার মধ্য দিয়াই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।'

'ইন্দ্রিয়দমন না হইলে কিছুই হইল না বুঝিবে। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মকর্ম কিছু নয়।'

'বীর্য্য রক্ষা লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। .... যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহাদের দুই তিনটি সন্তান হইলেই বীর্য্যরক্ষা করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।'

'ধর্মের চরিত্রই প্রধান। চরিত্র নির্মল রাখিতে যত্ন করিব, তাহাতে ত্রুটী না হইলে ক্ষমা আছে।'

* —'সঙ্ঘবাণী' ও 'শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ উপদেশ।'

'বীর্য্য ও সত্য রক্ষা না হইলে যোগলাভ হয় না।'

'প্রকৃত সাধন শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা। তাহা অভ্যাস হইলে বীর্য্যস্থির হয়.........তথাপি বীর্য্যরক্ষার জন্য যত্ন করিতে হইবে।' *

আমরা উপরে তিনজন মহাপুরুষের নাম করিলাম। ইঁহারা ছাড়া ভারতের সমস্ত সাধক-সম্প্রদায় এবং স্বামী নিগমানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, ঠাকুর ওঁকারনাথ, স্বামী বিরজানন্দ ইত্যাদি সুপরিচিত বা অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত বহু সাধু-সন্তই দেশ-জাতি-সমাজের কল্যাণার্থে ব্রহ্মচর্যের ও নরনারীর যৌন-সম্পর্কের পবিত্রতারক্ষার বিশেষ গুরুত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে সমস্ত মহাপুরুষ ও সম্প্রদায়ই ইহার বিশেষ সমর্থক।

কিছুকালপূর্ব্বে উত্তর ভারতে বিখ্যাত সমাজসংস্কারক ডাঃ ভগবান দাস শাশ্বত ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতের সমাজসংগঠনে নীতি, ধর্ম্ম ও চরিত্র অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত 'রমণ মহর্ষি' আত্ম-জ্ঞানকেই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য বলিয়া মনে করিলেও, সংযম-পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের বিশিষ্ট যোগ-সাধনাপদ্ধতিতেও যৌনকামসংযমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। § বর্ত্তমানে বিখ্যাত সাধক সুপণ্ডিত মহামহো-

* —শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ (কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী) এবং শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্গল (ঠাকুর বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)।

§ —শ্রীঅরবিন্দের 'যোগসাধনার ভিত্তি', পৃঃ ৮৮—৯১।

পাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ বিন্দুসাধনার রহস্য নির্ণয় করিয়া পুস্তকবিশেষের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'যোগৈশ্বর্য্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, অমরতা – সবই ব্রহ্মচর্যমূলক।' ভারতীয় বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু তাঁহার স্বাধীন ভারতগঠনের ও ভারতীয় সৈন্য-দল গঠনের পদ্ধতিতে যে কয়েকটি চারিত্রিক গুণের উপর জোর দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নারীজাতিকে নিজের মাতৃসম জ্ঞান, সত্যরক্ষা এবং প্রলোভনদমন অথবা তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার কথা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির অধোগতির কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। * উত্তরকালে তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্রও আবাল্য স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য চরিত্রের ত্যাগ-সংযম-বীরত্বের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা সুবিদিত।

এখন আমরা বহির্ভারতে উদ্ভূত ধর্ম্মসাধনার কথায় আসিলাম। মধ্যযুগের ব্যাপক খৃষ্টীয় সাধনায় ইউরোপে যৌন-সংযম বা ব্রহ্মচর্য কত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা সুবিদিত। যদিও পরবর্ত্তীকালে বিবাহিত জীবনে নরনারীর প্রেমই খৃষ্টধর্ম্মে ও সমাজে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, তবুও মূল খৃষ্টধর্ম্মে নিম্ন-লিখিত উক্তিগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

'(Luke 20/34-36)......Jesus contrasts the 'sons of the resurrection' with the 'sons of this

* —Rashbehari Basu, His Struggle for India's Independence; Pgg: 280—82; 293; 316—24.

world' by saying that the former, unlike the latter, do not marry but are equal unto the angels'...... .', অর্থাৎ—'.........যীশু 'মহাপুনর্জ্জীবনের সন্তান'গণের সহিত 'ইহজগতের সন্তান'দের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—ঐ প্রথম শ্রেণীর সন্তানেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্তান হইতে বিভিন্ন, কারণ তাহারা বিবাহ করে না এবং তাহারা 'দেবদূতগণের সমপর্য্যায়ভুক্ত' .' অথবা—'St. Paul's answer (1 Cor. 7/1—40), whilst granting the general necessity of marriage, does so on the comparatively low ground of its value as a preventive of fornication (v. v. 2 5. 9)', অর্থাৎ—'সেণ্ট পল, তাঁহার উত্তরে, সাধারণ ব্যবস্থা হিসাবে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও তাহার মূল্য একটি নিম্নতর কারণে—অর্থাৎ যৌন ব্যভিচারের প্রতিষেধক হিসাবে—স্বীকার করিয়াছেন।' পুনশ্চ—'Some of the apostles of Jesus were married and their conjugal relations are endorsed by St. Paul (1 Cor 9/2-5). For himself and others who can preserv continence, whether unmarried or widowed, the unmarried state is preferable (v v 8, 40)', সেণ্ট পল সম্বন্ধে এই উক্তিটি বিবাহিত জীবনেরও উর্দ্ধে ব্রহ্মচর্যরক্ষার আদর্শের দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে। § বিখ্যাত খৃষ্টীয় মহাপুরুষ অগাষ্টাইনের

§—উদ্ধৃতিগুলি Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 3, Pg: 272 হইতে সংকলিত।

রিপু-ইন্দ্রিয়জয়ের সাধনার ব্যাকুলতা ও তীব্রতা সুপরিচিত। অগাষ্টাইন (Augustine) নরনারীর 'Celibacy and Virginity' অর্থাৎ ব্রহ্মচারিত্ব ও ব্রহ্মচারিণীত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। প্রভু যীশুখৃষ্ট নরনারীর বিবাহিত জীবনকে পবিত্র আত্মার মিলন রূপে বিচার করিতেন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের তীব্র বিরোধী ছিলেন একথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি পারিবারিক জীবনের কামকামনা বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। * খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শ যৌনকাম, ধনকাম ও প্রভুত্বকাম বর্জন (Chastity, Poverty, Humility) আমাদের পূর্ব্বালোচিত উপনিষদের বাণী স্মরণ করাইয়া দেয় (পৃঃ ২০, ২১)। প্রোটেষ্টাণ্ট মতে অবিবাহিত যাজকজীবন বাঞ্ছনীয় নয় কিন্তু গ্রীক্ চার্চ্চ সম্প্রদায়ে 'Bishops are always celibates', অর্থাৎ—'বিশপেরা সর্ব্বক্ষেত্রেই কৌমার্যব্রতধারী। ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জে আদিকালের খৃষ্টগোষ্ঠীতে সন্ন্যাসী-সুলভ কৃচ্ছ্র সাধনার প্রাধান্য ছিল এবং বিখ্যাত ব্রিটীশ মিশনারীগণ সকলেই সন্ন্যাসী ছিলেন। §

পবিত্র কোরাণের নির্দ্দেশমত জীবনযাপন করিয়া আল্লা বা পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই ইস্‌লামধর্ম্মের মূল কথা। কোরাণে উপবাসাদি এবং ধনজনপ্রভুত্বের স্বেচ্ছাচারিতাবর্জনসহ নিয়মিত প্রার্থনা-উপাসনা, দান ও সৎকার্য এবং আল্লার প্রত্যাদিষ্ট আদেশ পালনের কথা পাই। প্রার্থনা-উপাসনার সময়ে সংযম-পবিত্রতা রক্ষার কথাও আছে সূরা ২।১৮৭, ৫।৬ ইত্যাদিতে।

* —Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 5, Pg : 727. § —Ibid, Vol 6, Pg : 274.

কোরাণসম্মত বিবাহিত জীবনযাপন ইসলামের বিধান। অবৈধ যৌনকামবাসনা বা সংসারকামবাসনাকে কোথাও সমর্থন করা হয় নাই। ধনকামবাসনা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সূরা ১৬।১৫-এর ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ—'Your wealth and your children are only a temptation, whereas Allah! with him is an immense reward.', অর্থাৎ—'তোমাদের ধন এবং সন্তানসন্ততি কেবলমাত্র প্রলোভন, পরন্তু আল্লা! তাঁহার নিকটে রহিয়াছে এক বিরাট পুরস্কার।' আল্লা বা পরমেশ্বরের স্মরণ-মনন হইতে কোনও সাংসারিক কামকামনাই যেন চিত্তকে বিচলিত না করে একথা পাই সূরা ৬৩।৯-এ—'O ye who believe! Let not your wealth nor your children distract you from remembrance of Allah. Those who do so, they are the losers'। স্ত্রীদেহের আবরণ সম্বন্ধে সাবধানতা লক্ষণীয় (সূরা ২৪।৬০)। ব্যভিচারবর্জন এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও মর্যাদারক্ষার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশও পাই —(সূরা ২৪।২, ৩, ৩১, ৩৩)। বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়েও অনেক ধর্ম্মসঙ্গত বিধি রহিয়াছে। * পুনশ্চ—'In several verses of the Qu'ran, chastity is recommended to followers of Islam as one of the greatest virtues

* —The Meaning of the Glorious Koran—An Explanatory Translation, by Mohammed Marmaduke Pickthall, গ্রন্থ হইতে অনুবাদ ও উপাদান সংগৃহীত।

of a Muslim.', অর্থাৎ—'কোরাণের কতকগুলি সূরাতে নরনারীর সম্পর্কের সংযমপবিত্রতা ইস্‌লামের অনুবর্ত্তিগণের জন্য মুসলমানের একটি উচ্চতম আদর্শগুণরূপে বিহিত হইয়াছে।' চোখের দৃষ্টিতেও যৌন ব্যভিচার ইস্‌লামে নিষিদ্ধ। *

খৃষ্টধর্মের পরবর্ত্তী 'মানি'ধর্ম্মমত (Manichaeism) এক কালে ব্যাবিলনিয়া হইতে পাশ্চাত্য জগতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মহান্ ধর্ম্মনেতা সেণ্ট অগষ্টাইন (St. Augustine) যৌবনে কিছুকাল এই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই মতেও সংযম-ব্রহ্মচর্যের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়। —'The prohibitions which he (Mani) issued are based upon the belief that certain acts, such as the destruction of life and the intercourse of the sexes, are essentially Satanic, and therefore retard the liberation of the light.' অর্থাৎ—'তিনি (মানি) যে বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সেগুলি এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কতকগুলি কাজ, যথা প্রাণীহিংসা এবং নরনারীর যৌনসঙ্গম, মূলতঃ পাপ (সয়তান) প্রবৃত্তি, সুতরাং 'আলোক'-এর মুক্তির পথে তাহারা বাধাস্বরূপ।' §

---

* —The Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 3, Pg : 495.

§ —Ibid. Vol 8, Pg : 399.

খৃষ্টধর্ম্মের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রজ্ঞারহস্যবাদী জ্ঞষ্টিক্ (Gnostic) সম্প্রদায়ও এক সময়ে পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। এই মতে আধ্যাত্মিক শুদ্ধসত্বার জগৎ ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের জগৎ—এই দুই-এর মিশ্রণের ফলেই জগতে যত দুঃখদুর্দ্দশার উদ্ভব। এজন্য, 'In most of the systems it is strongly ascetic in character. The soul is required to free itself from earthly conditions by holding aloof from all sensual pleasures and reducing the needs of the body to the barest minimum', অর্থাৎ—'এই ধর্ম্মের অধিকাংশ সম্প্রদায়ে ইহা (Gnosticism) বিশেষভাবে কঠোর সংযমতপস্যার ভাবাপন্ন। এই মতানুসারে আত্মাকে জাগতিক অবস্থার অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্ভোগসুখ হইতে দূরে থাকিতে বলা হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় দৈহিক প্রয়োজনকে নিম্নতম মানে নামাইতে বলা হইয়াছে।' * লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পূর্ব্বোক্ত 'মানি' ধর্ম্মেও 'food for one day and clothing for one year,' অর্থাৎ—'এক দিনের খাদ্য ও এক বৎসরের বস্ত্র' ছিল আদর্শ নীতি। বলা বাহুল্য পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্মেই রিপু-ইন্দ্রিয়সংযম বা ব্রহ্মচর্য-সাধনার সহিত এই ত্যাগসাধনা বা ধনসঞ্চয়বিরোধী মনোভাব জড়িত। এই

---

* —Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 6, Pg : 237.

প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের (আদর্শ মানুষের) অন্ন-বস্ত্র-ধন-সঞ্চয়ে উদাসীনতার বিধান স্মরণীয় (মনু ৪।৪, ৭, ৮)।

প্রাচীন চীনদেশীয় ধর্ম্মেও রিপু-ইন্দ্রিয়সংযমের নীতি পাওয়া যায়। Confucius (কংফুচে)-প্রবর্ত্তিত ধারায় সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের দিকে ঝোঁক থাকিলেও প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্মের দেবতাপ্রীত্যর্থে যাগযজ্ঞাদি করার মত আধ্যাত্মিক প্রবণতা দেখা যায়। প্রাচীন চৈনিক ধর্ম্মে এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান-প্রবণতার সঙ্গে নৈতিক চরিত্রগঠনের আদর্শ শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করে। —'The co-operation of the spiritual beings was essential to the welfare of man. ....It was to be secured......by right ethical conduct', 'অর্থাৎ—'মানুষের কল্যাণের জন্য দেবতাদের সহযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল......ইহা শুদ্ধ নৈতিক চরিত্রের মধ্য দিয়া লাভ করিতে হইত।' * Lao-Tse-র ধর্ম্মসাধনায় ইন্দ্রিয়সংযম ও বৈরাগ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। Confucius-এর ধর্ম্মসাধনায় ইহাদের এতখানি প্রাধান্য না থাকিলেও শুদ্ধ-সংযত চরিত্রের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে Lao-Tse-প্রবর্ত্তিত Tao বা সত্যপথ Confucius-এর বাস্তববাদী ধর্ম্মে অনেকখানি মিশিয়া গিয়াছিল। Confucius-এর পৌত্রকর্ত্তৃক লিখিত The Golden Mean বা মধ্যপন্থার সাধনার বর্ণনায় আমরা পাই—'What is God-given is called nature,

* —The Chinese; their History and Culture—by Kenneth Scott Lattouratte, Vol I, Pg : 53.

to follow nature is called Tao (the Way), to cultivate the Way is called culture. ....The innerself is the correct foundation of the world, and harmony is the illustrious Way. When a man has achieved the innerself and harmony, the heaven and earth are orderly and the myriad things are nourished and grow thereby.', অর্থাৎ—'ঈশ্বরের দেওয়া জিনিষই স্বভাব এবং স্বভাবের অনুবর্ত্তনই 'তাও' বা পন্থা। পন্থার অনুশীলনই সাধনা। ....অন্তরাত্মাই বিশ্বের ভ্রান্তিহীন ভিত্তি এবং সমতানতাই মহীয়ান্ সত্যপথ। যখন মানুষ অন্তরাত্মা এবং সমতানতাকে লাভ করে, তখন স্বর্গে ও মর্ত্তে শৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং বিশ্ববস্তু তাহা হইতে পুষ্টি লাভ করে ও বর্দ্ধিত হয়।' * বিবাহই ছিল পিতৃপুরুষ-উপাসনার ও কংফুচের ধর্ম্মনীতির অঙ্গ। তথাপি প্রাচীন এবং প্রাক্-আধুনিক চৈনিক সমাজে ও ধর্ম্মে নারীর একপতিত্ব (একবার মাত্র বিবাহ), বিধবার ব্রহ্মচর্য, এবং এমনকি বাগ্দত্তা কুমারীদের বিবাহ না হইলে আজীবন কৌমার্য, বিপত্নীক পুরুষেরও সম্ভবমত অবিবাহিত জীবন, স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা বিষয়ে সাবধানতা—এই সব আদর্শ, সর্ব্বথা প্রতিপালিত না হইলেও, যৌনসংযমের সাক্ষ্য বহন করে। §

* —The Importance of Living, by Lin Yutang, গ্রন্থ হইতে সংকলিত (পৃঃ ১২৮)।

§ —Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 3, Pg : 490-91.

প্রাচীন মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় ধর্ম্মে ও সমাজে যৌন-বিলাসকাহিনীর সঙ্গে সংযম-পবিত্রতার নানা বিধানও লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক ঐতিহাসিক Herodotus লিখিয়াছেন যে প্রাচীন মিশরীয়গণ ধর্ম্মমন্দিরকে যৌনকলুষ হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। সেমিটিক (Semitic) রাষ্ট্রে দেবদাসী-প্রথার প্রসঙ্গে Herodotus ব্যাবিলন (Babylonia)-সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে অ্যাফ্রোডাইটী (Aphrodite)-দেবীর মন্দিরে দেশের প্রত্যেক রমণীকে জীবনে একবার আত্মদান করিতে হইত। কিন্তু এই কাহিনীর সঙ্গে একথাও আছে যে 'absolute continence on the part of the woman followed this fulfilment of what was regarded as a religious duty', অর্থাৎ—'এই ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তির পর ঐ নারী অখণ্ড সংযমব্রহ্মচর্য পালন করিয়া চলিত।' * এইরূপ ঐতিহ্যের পিছনে দেশে ও সমাজে সংযম-ব্রহ্মচর্যের নীতি ও আদর্শের স্বীকৃতি প্রকট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে সহজেই অনুমেয়। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে দেবদাসী-প্রথার সহিত উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মানুশীলনের স্মৃতিও জড়িত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের বিশেষ প্রশংসাভাজন ভক্ত-অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। § বিশেষত: প্রাচীন ব্যাবিলনে—'A break of chastity was regarded not only as a great

* —Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 3, Pg : 498.

§ —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

wickedness, but also as a sin against God.', অর্থাৎ—'নরনারীর যৌন সম্পর্কের সংযমপবিত্রতা ভঙ্গ করা শুধু মাত্র একটি বিশেষ অন্যায় কার্যরূপে নহে, পরন্তু ঈশ্বরের বিরোধী পাপাচাররূপে পরিগণিত হইত।'

ইহুদী ধর্মেও সংযমপবিত্রতার অনুশাসন ছিল কঠোর। শাস্ত্রসম্মত বিবাহিত জীবনই ইহুদী ধর্মের অভিপ্রেত। কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্কের সংযমপবিত্রতার সম্বন্ধে পাই—'With their laws to enforce chastity, there is but little doubt that the Hebrews were first in the exercise of that virtue......,' অর্থাৎ—'হিব্রু (ইহুদী) জাতির দাম্পত্য সংযমপবিত্রতা রক্ষার সমস্ত বিধান দেখিয়া সুনিশ্চিত ধারণা হয় যে তাহারা ঐ ধর্মভাবটীর অনুশীলনে ছিল প্রথম......... ।' *

পারসিক জরথুষ্ট্রধর্মেও সংযত চরিত্র এবং সৎ আচরণের উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং ধর্মসম্মত বিবাহিত জীবনেরও মহিমা প্রকাশ করা হইয়াছে। বিবাহিত জীবনে তরুণ-তরুণীকে অনুপ্রাণিত করিয়া বলা হইয়াছে—'তোমাদের পার্থিব জীবনে 'বোহুমন্' বা শুদ্ধচিত্তের প্রতিষ্ঠা কর।' § পুনশ্চ—Scrupulous purity is demanded,

---

* —Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 3, Pg : 498-99. § —The Gathas of Zarathustra, by Taraporewala (Fifth Gatha) দ্রষ্টব্য।

and this consists not only in abstinence from rape, unnatural vice and the like, but in all manner of performances relating to sexual relations.........', অর্থাৎ –'(ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনায়) পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারশীলতার সহিত পবিত্রতা রক্ষা করার অনুশাসন দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা শুধু ব্যভিচার, বলাৎকার, অস্বাভাবিক যৌনতা ইত্যাদির বর্জনে নয়, পরন্তু যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে সর্ববিধ আচার-অনুষ্ঠান পালনে .... ।' এই প্রাচীন সমাজধর্ম্মে কতকটা ভারতীয় বৈদিক সমাজধর্ম্মের মতই বাল্যকালে মেখলা (girdle) ও বহির্ব্বসন (shirt) দিয়া গুরুবরণ ও উপনয়নের মত অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। মেষলোমনির্মিত এই মেখলা ছিল পবিত্রতার প্রতীক। এই সূত্রে 'nao jot' বা আধ্যাত্মিক নবজন্মের কথাও পাওয়া যায়। *

পৃথিবীর আদিম জাতিদের সম্বন্ধে আধুনিক 'রোমান্টিক' দৃষ্টি লইয়া অনেক লেখক মানুষের 'প্রাকৃতিক' জীবনে যৌন স্বাধীনতা-উচ্ছৃঙ্খলতারই কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। আধুনিক গবেষণায় অবশ্য ইহার অনেক অতিশয়োক্তি ও ভ্রান্তি ধরা পড়িয়াছে। বাস্তব সত্য এই যে বন্য আদিম জাতিদের মধ্যে কামচাঞ্চল্য একটা সহজলভ্য মানসিকতা নয় এবং অনেক উপলক্ষ্যে তাহারা যৌনসংযমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে

*— Encyclopaedia of Religion and Ethics, Volume 12, Pg : 865.

এবং তাহা পালনও করে। —'A certain degree of self-restraint especially in marital relations,... is found on particular occasions among lower races. ......Examples of continence are most marked during war or hunting......A religious motive is also to be seen in those cases where such continence has become a binding form of tabu, as among the Maoris, with whom not only during war but also on other important occasions women are strictly tabu to men...... This rule of continence is practically universal among savages. ......Even among savages chastity on the part of the priesthood is sometimes a necessity.', অর্থাৎ—'কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে নিম্নজাতিদের মধ্যে কতক পরিমাণে আত্মসংযম (বিশেষতঃ বিবাহিত সম্পর্কে) দেখিতে পাওয়া যায়। ..... সম্পূর্ণ যৌন সংযমের উদাহরণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায় যুদ্ধ অথবা শিকারের সময়......যে সব ক্ষেত্রে এরূপ সংযম অবশ্যপালনীয় রূপে দেখা দিয়াছে সেখানে একটি ধর্ম্মীয় উদ্দেশ্যও রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়—যথা, মাওরীদের মধ্যে, যুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সময় পুরুষের নিকট নারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ......... যৌনসংযমের এই নিয়ম বস্তুতঃ বন্যজাতিদের মধ্যে সর্ব্বব্যাপক ......এমনকি বন্যদের মধ্যে পুরোহিতের পক্ষে যৌনসংযম ও

পবিত্রতা কখনও কখনও প্রয়োজনীয় ।'* পুনশ্চ—'The practice of celibacy was not uncommonly incumbent upon the priests and shamans of pre-Columbian America......অর্থাৎ—'কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে তথাকার (আদিম জাতিদের) পুরোহিত এবং 'শামান্'গণের পক্ষে সম্পূর্ণ যৌনসংযম প্রায়ই বাধ্যবাধক ছিল ।' §

প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে জীবনরসসম্ভোগ যাহাকে হেলেনিজ্‌ম (Hellenism) আখ্যা দেওয়া হয় এবং যাহাকে আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা হয়—তাহার প্রাধান্য থাকিলেও রিপু-ইন্দ্রিয়সংযমের আদর্শ ও নীতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । সুপ্রাচীন অধ্যাত্মদার্শনিক ও 'বৈজ্ঞানিক' পাইথাগোরাস্ (Pythagoras) এবং তাঁহার সম্প্রদায় কঠোর সংযমতপস্যার জীবন যাপন করিতেন। প্লেটো (Plato) এবং তাঁহার গুরু সক্রেটীস (Socrates) উদারমতাবলম্বী সত্যান্বেষী হইলেও দৈহিক প্রবৃত্তির সংযমের উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করিতেন তাহা প্লেটো-লিখিত Phaedo-গ্রন্থের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে—'And will he think much of the other ways of indulging the body,......does he not rather despise anything more than nature needs? ......for the

* —Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 2, Pg : 235. § —Ibid, Vol 3, Pg : 271.

body is a source of endless trouble to us......it fills us full of loves, and lusts and fears and fancies of all kinds, and endless foolery...... Whence come wars, and fightings, and factions? Whence but from the body and the lusts of the body?', অর্থাৎ—'সে (সত্যান্বেষী) কি শরীরের প্রবৃত্তিচরিতার্থতার অপরাপর উপায়কে কোনও গুরুত্ব দান করিবে,......প্রকৃতির যতটুকু প্রয়োজন তাহার বাহিরে যাইতে সে কি ঘৃণা বোধ করিবে না? ......কারণ, শরীর আমাদের অজস্র কষ্টের কারণ......ইহা আমাদিগকে কাম ও ভালবাসা, নানারূপ ভয় ও অলীক কল্পনা এবং সীমাহীন মূর্খতায় ভরপুর করিয়া রাখে......যুদ্ধবিগ্রহ, লড়াই ও দলাদলি কোথা হইতে আসে? শরীর ও শরীরের নানা কামপ্রবৃত্তি ছাড়া আর কি হইতে?' * বাস্তববাদী ও বিজ্ঞানবাদী অ্যারিষ্টটল্ (Aristotle) সুখস্পৃহার পরিবর্তে well-being (কল্যাণ) ও well living (সুচরিত)-কেই মানুষের 'chiefest good' বা 'নিঃশ্রেয়স্' বলিয়া মনে করিতেন। তিনিও মানুষের moral excellence' বা নৈতিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'the excellence which the appetitive part of soul displays when it is duly obedient to the rational part' অর্থাৎ—'সেই উৎকর্ষ যাহা আত্মার কামনাময় অংশটী যথাযোগ্যভাবে

* —Philosophy of Religion, by John Hick, হইতে সংগৃহীত।

বিচারময় অংশটার আনুগত্য স্বীকার করিলে প্রকাশ পাইয়া থাকে।'* পরবর্ত্তীযুগের সুখবাদী ও জড়বাদী (materialistic) দর্শনেও—যথা এপিকিউরিয়ান্ (Epicurean), ষ্টোয়িক (Stoic), সিনিক্ (Cynic) মতবাদেও সংযত-আত্মস্থ হইবার কথা রহিয়াছে। এমনকি এপিকিউরিয়ান্ মতবাদে—'The wise man will not fall in love, nor will he marry or raise a family unless special circumstances make it prudent to do so.', অর্থাৎ—'বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রেমে পড়িবেন না এবং এমনকি বিবাহ ও বংশবৃদ্ধিও করিবেন না, যদি না বিশেষ কোনও কারণ থাকে যাহার জন্য তাহা করা সুবিবেচিত মনে হয়।' পুনশ্চ—'The Cynics also repudiated the conventions of society for a life according to nature, but to them this meant a disregard of luxury and pleasure, an independence of wealth and passion, and an acceptance of a sort of hobo-asceticism', অর্থাৎ—'সিনিক্-গণও সমাজের প্রচলিত প্রথা ও ধারণাকে অস্বীকার করিয়া স্বভাব-জীবনের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছিল বিলাসিতা এবং আমোদ-প্রমোদের উপেক্ষা, ধন ও কাম হইতে মুক্ত থাকা, এবং একপ্রকার পথচারী কৃচ্ছ্র-

* —Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 1, Pg : 789.

সাধনা।' * সুতরাং ভোগবাদী ও মনুষ্যদ্বেষী বলিয়া যাহাদের ভ্রান্ত পরিচয় তাহাদের মধ্যেও রিপু-ইন্দ্রিয়সংযমের শাশ্বত ধর্ম্মসাধনা বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। আরও পরবর্ত্তীযুগের রহস্যবাদী (mystic) দার্শনিক প্লটিনাস্ (Plotinus)-এর দর্শনে ও সাধনায় সংযম-ব্রহ্মচর্যের যথেষ্ট গুরুত্ব দেখা যায়। এই সাধনার দর্শন নিও-প্ল্যাটনিজম্ (Neo-Platonism) নামে বিশ্বের নানা ধর্ম্মীয় মতবাদে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং অনেকে ইহার মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারার লক্ষণ দেখিতে পান। আত্মশোধনের উপর প্লটিনাস্ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এজন্য এমনকি 'প্রেম' ও বিবাহ সম্পর্কেও—'He sees that sensuous indulgence rivets the chains which bind the soul to earth.', অর্থাৎ—'তাঁহার দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, আত্মাকে যে শৃঙ্খল মাটীতে বাঁধিয়া রাখে তাহাকে দৃঢ়ীভূত করে।' §

গ্রীসের প্রাচীন জনপ্রিয় অরফিক্ (Orphic) ধর্ম্মেও ভারতীয় ধর্ম্মচিন্তার প্রভাব সুস্পষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই ধর্ম্মসাধনাতেও সংযম-তপস্যার বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। এমনকি তান্ত্রিকসাধনার মত এলিউসিয়ান্ মিষ্ট্রীজ্ (Eleusian Mysteries)-গুলির মধ্যেও দীক্ষিত তরুণ সাধকদের চারিত্রিক

* —History of Philosophical Systems, Ed—Vergilius Ferm : Chapter Ten, by G. H. Clark.

§ —Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 9, Pg : 316.

সংযম-শুদ্ধতার উপর জোর দেওয়া হইত। এই সম্প্রদায়ও এক সময় প্রাচীন গ্রীসের জনসাধারণের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রোমান্ (Roman) সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রধানতঃ আইন (Law) ও রাজনীতিপ্রবণ হইলেও তাহার বাস্তব জীবন-বাদে একপ্রকার পৌরুষের ধর্ম্ম জড়িত ছিল। রোমানদের সদ্‌গুণ বা মনুষ্যত্বকে বলা হইত virtus (virtue) বা বীর্যবত্তা এবং পণ্ডিতগণের মতে ইহা শুধু বীরত্ব নয়, যৌন শক্তিমত্তাও বটে। অপরদিকে প্রাচীন জার্ম্মান জাতি সম্বন্ধে বলা যায় যে তাহাদের মধ্যে দৈহিক বলবীর্যের জন্যই হউক বা নৈতিক কারণেই হউক যুবকদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যৌনসংযমের ('long-continued sexual abstinence on the part of youth') বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করা হইত। *

আমরা এই পর্যান্ত মোটামুটি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের দৃষ্টিতে যৌনসংযম ও সাধারণভাবে মনুষ্যত্বসাধক চারিত্রিক গুণগুলির আলোচনা করিলাম। আদিম ও প্রাচীন সমস্ত ধর্ম্মই এক বৃহত্তর দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মচর্যের সমর্থক। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের এই সংযমের আদর্শ সমাজে সমভাবে অনুসৃত হইয়াছিল। নানা প্রতিক্রিয়ামূলক পদস্খলন বা আদর্শচ্যুতি এবং নানা বিকৃতি যে কোনও ক্ষেত্রে দেখা দেয় নাই তাহাও বলা যায় না। বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের সহিত সব সময় আন্তরিক উন্নতি যে সংঘটিত

* —Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 3, Pg : 500.

হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ নাই। কিন্তু আমাদের এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনা হইতে দুইটী জিনিষ সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রথম, পৃথিবীর সর্ব্বকালের সর্ব্বধর্ম্মের মধ্যে এই রিপু-ইন্দ্রিয়-সংযমের সর্ব্বসম্মত নীতি মানবসভ্যতার কয়েকসহস্র বৎসরের সার্থক অভিজ্ঞতার অবদান এবং সেজন্য ইহাকে বর্ত্তমান সভ্যতার সংকটে অবহেলা বা অস্বীকার করা চলে না। সেরূপ করা মানবসভ্যতাকেই অস্বীকার করার সামিল হইবে। অবশ্য মানব-স্বভাবের বিকাশপ্রকাশের ঐ মূল নীতিকে আজ কালোপযোগী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়, এই সংযম-ব্রহ্মচর্যের আদর্শের সহিত 'সন্ন্যাস'-জীবন সব সময় অনিবার্য নয়, বাস্তব জগতের বাস্তবজীবনের সঙ্গেও ইহাকে সার্থকভাবে মিলিত করা যায়. এবং সুখের বিষয় এই যে আমাদের আলোচিত কয়েকটি ধর্ম্মমতের ন্যায় প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতিতেও ব্রহ্মচর্য এবং বাস্তব সমাজ-সংসারের জীবন একযোগে একলক্ষ্যে চলিয়াছিল। এ আদর্শ জ্ঞান-ভক্তি কর্ম্ম-যোগ ও বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসের কোনও বাধা সৃষ্টি করে না, বরং পরম আনুকূল্যই করে।

সাহিত্য ঃ—

এখন আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। মানুষের আধ্যাত্মিক বা নৈতিক উন্নতিসাধন করা সাহিত্যের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য নয় বটে কিন্তু সর্ব্বকালে সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তির ও সমাজের জীবন—তাহার আশা-আকাঙ্খা, সংশয়-সমস্যা, সুখ-দুঃখ, ভাল মন্দ, মহত্ত্ব-নীচতা, নীতি ও আদর্শবাদ এক আবেগময়রূপে রূপায়িত হইয়া উঠে। এজন্য সাহিত্যের প্রভাবও

জনমানসে সুদূরপ্রসারী। সেজন্য সাহিত্যের দৃষ্টিবিচারে জাতীয়-জীবনে তথা বিশ্বমানব জীবনে সংযম-ব্রহ্মচর্যের স্থান ও মূল্য নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষতঃ এযুগের সর্ব্বগ্রাসী আদর্শ-বিভ্রাট, সংশয়বাদিতা, মানসিক অবসাদ ও বুদ্ধিবিপর্যয় যেরূপ ক্রমবর্দ্ধমানভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাতে সাহিত্যের সত্যকার মর্ম্মকথাটি ধরিতে না পারিলে যে কোনও মানবীয় আদর্শবাদ জাতীয় বা বিশ্ব জীবনে কার্যকরী করা দুরূহ।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য দিয়াই আমরা আরম্ভ করিব। বেদ প্রধানতঃ দ্রষ্টা ঋষিদের উপলব্ধ পরম সত্য হইলেও বেদের মধ্যে কাব্যদৃষ্টির প্রখরতা ও প্রাচুর্য দুইই বিদ্যমান। কাব্যদৃষ্টি কথাটি আমরা গভীর অর্থে গ্রহণ করিতেছি। শব্দ এবং অর্থ এখানে এক পরমসত্য মহাজীবনের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক (modern) ও অত্যাধুনিক (recent) সাহিত্যে ও সাহিত্যদর্শনে লব্ধ শব্দরাশিকে জীবন সত্যের ও বাস্তব জগতের সৃষ্টিমূল হইতে উৎসারিত বলিয়া দেখিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহা অবশ্য ভারতীয় কাব্যদর্শনে অতি পুরাতন কথা। শব্দব্রহ্মবাদ, স্ফোটবাদ এবং মন্ত্রবাদ এসবই ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। অবশ্য সর্ব্বদেশেই প্রাচীন 'Mysteries' বা রহস্যানুষ্ঠানধর্ম্মের মধ্যেও ইহার কতকটা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ধর্ম্মদর্শনেও 'Word'-এর মহিমা স্বীকৃত।

সে যাহা হউক, বেদকে সাহিত্য বা কাব্য বলিতে এতটুকুও দ্বিধা হয় না এই ঊর্দ্ধের সত্যদৃষ্টিতে। বৈদিক কাব্য-

সাহিত্যের অপৌরুষেয়' শব্দরাশি এই ঊর্দ্ধজীবনের দ্যোতক শুধু নয়, নিয়ামক। বৈদিক সাহিত্য জড় বিশ্বপ্রকৃতির কাল্পনিক উপাসনা নয়, এগুলি জড়ের জীবনে অধ্যাত্ম চেতনার সক্রিয়তার উপলব্ধি। প্রাচীন জরথুষ্ট্রধর্ম্মের 'গাথা' গুলির মধ্যেও এই জাতীয় প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায়। বেদের এই প্রকৃতি-প্রতীক কাব্য ও সাহিত্য মানুষকে নিজের অগোচরে মহাসত্যের অভিমুখী করিয়া তুলিয়াছে, উপনিষদের চিন্তা ও ধ্যানের মধ্যে যাহা স্পষ্টতররূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বৈদিক কাব্যে ও সাহিত্যে দেবশক্তির ও মন্ত্রশক্তির উপাসনা অধিকাংশক্ষেত্রে ঐহিক বা জাগতিক প্রার্থনাপূরণে নিয়োজিত হইলেও ইহাদের মধ্যে যে গভীরতম অধ্যাত্মযোগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিবিষ্ট ছিল তাহা স্থলে স্থলে বেদের মধ্যেই প্রকাশ্যভাবে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। ঋগ্বেদের প্রখ্যাত নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টিরহস্যের অপূর্ব্ব ধ্যানগম্ভীর বর্ণনা এবং পুরুষ সূক্তের ভাব-গাম্ভীর্য জগতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রে অতুলনীয়।* এগুলির সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক মেটারলিঙ্ক্ (Maurice Maeterlinck) বলিয়াছেন —'Is it possible to find in our human annals, words more majestic, more full of solemn anguish, more august in tone, more devout, more terrible? ....At the very outset, it surpasses all that has been said, and goes further than we shall even dare to go.', অর্থাৎ—

* —ঋগ্বেদ ১০।১২৯ ও ১০।৯০ দ্রষ্টব্য।

'আমাদের মানবীয় ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা অধিক মহিমাময়, অধিক অধ্যাত্মবেদনাকুল, অধিক গুরুগম্ভীর ধ্বনিসংযুক্ত, অধিক ভক্তিসমন্বিত, অথবা অধিক ভয়ঙ্কর বাণী কি আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব? ....প্রারম্ভেই, ইহা আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহার সব কিছুকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এমনকি যতদূর পর্য্যন্ত যাইতে আমাদের সাহসে কুলাইবে তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।' *

বৈদিক সাহিত্যের এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও শক্তি অনুভব করিতে গেলে রিপু-ইন্দ্রিয়ের সংযম বা ব্রহ্মচর্য একান্ত প্রয়োজন। সে যুগে আধ্যাত্মিক ইচ্ছাশক্তির ও 'মেধা'র সাহায্যে যে ঐহিক ও পারত্রিক ঋদ্ধি-সিদ্ধি লাভ করার অনুষ্ঠান বা সাধনা (যজ্ঞ) প্রচলিত ছিল তাহাতে এই স্থূলজীবনের সংযম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রহস্যময় শক্তিতে বিশ্বাসী অথর্ব্ববেদে আমরা এজন্য এই ব্রহ্মচর্যের সুস্পষ্ট ও সুপরিসর স্তুতির কথা শুনিতে পাই, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ২২৮, ২৪৭)। এই প্রসঙ্গে আমরা বৈদিক সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীঅনির্ব্বাণের মত উদ্ধৃত করিতেছি—

(বেদ) বোঝবার জন্য সাধনারও যে প্রয়োজন আছে, সে কথা বৈদিক ঋষিরাও বলে গেছেন। বেদের আর এক নাম ব্রহ্ম; আধুনিক ভাষায় তর্জমা করলে কথাটা দাঁড়ায়, জ্ঞান (বেদ) হল আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ (ব্রহ্ম)। এই ব্রহ্মকে

* —ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জির Ancient Indian Education গ্রন্থ হইতে (Pg: 49)।

বোঝবার জন্যেই 'ব্রহ্মচর্যের' সাধনা। আধারকে শুদ্ধ না করলে (প্রাচীনদের ভাষায় ধাতু প্রসন্ন বা স্বচ্ছ না হলে) বৃহতের চেতনাকে ধারণা করা যায় না। সুতরাং শুধু বুদ্ধি দিয়ে বেদার্থ বোঝবার চেষ্টা করলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ....যাস্ক তাঁর নিঘণ্টু ব্যাখ্যার গোড়াতেই একটী প্রাচীন উক্তি উদ্ধার করে বলেছিলেন, 'বিদ্যা তাকেই দেবে, যে তপস্বী অনসূয়ক ঋজু সংযত শুচি অপ্রমত্ত ব্রহ্মচর্যোপপন্ন এবং মেধাবী।' *

বৈদিক যুগে বা বৈদিক সাহিত্যে কোনও দেবমানববাদের আমরা ব্যাখ্যাপক নই, এবং বাস্তব তথ্যের উপর তাহা স্থাপনও করা যায় না, প্রয়োজনও নাই। মানুষ চিরদিনই মানুষ, এবং বৈদিক মানুষেরও নানা দোষগুণ, সুখদুঃখ ছিল। কিন্তু কি বৈদিক সমাজে কি বৈদিক সাহিত্যে একটা অপূর্ব্ব ঊর্দ্ধগামী (ব্রহ্মমুখী) জীবনের ধারা সুপরিস্ফুট। মরণশীল মর্ত্তের মানব যেন স্বর্গের অমৃতলোকের সহিত সেযুগে একটা স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। ইহারই অভাবে আজ মর্ত্তের মানুষ নিতান্তই মরণশীল। সভ্যতার শত উপকরণের মধ্যেও তাহার হাহাকারের নিবৃত্তি নাই। কারণ অন্তরের ভাবলোকের সত্যকে সে বড় করিয়া দেখে নাই। এই 'অমৃত' ভাবলোকের সন্ধান দিয়াছেন বৈদিক ঋষিরা যাঁরা সে যুগের শ্রেষ্ঠ বরেণ্য কবি ও সাহিত্যিক। এই কাব্য ও সাহিত্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবনের ভার বহন করিয়া প্রাকৃত মনোবুদ্ধিভাবুকতার দণ্ড আশ্রয় করিয়া

* —বেদমীমাংসা—১ম খণ্ড, অনির্ব্বাণ-লিখিত (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ), পৃঃ ৩৫।

খঞ্জের মত চলিয়া বেড়ায় না। তাহা সংযমব্রহ্মচর্যের প্রভাবে ইন্দ্রিয়জীবনের ভারমুক্ত হইয়া অতিপ্রাকৃত মনোবুদ্ধিভাবের মহাযানে চড়িয়া ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে মুক্তির খেলা খেলিতে থাকে। পৃথিবীর অতি আধুনিক সাহিত্যে আমরা জীবনের নগ্ন দিকের কথা নগ্নভাবে বর্ণনা করিবার দক্ষতাকে কবি বা সাহিত্যিকের শিল্পী ক্ষমতা বলিয়া তারিফ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। এই স্বাভাবিকতাবাদ (naturalism) বৈদিক সাহিত্যেও মধ্যে মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সর্ব্বকালের সাহিত্যে শিল্পসুলভ স্বতঃস্ফূর্ত্তির একটা লক্ষণ। উর্ব্বশী ও যযাতির প্রণয় বর্ণনা, যম ও যমীর প্রেমসম্পর্ক, এমনকি উষার পিছনে সূর্যের অনুসরণকে তরুণীর পশ্চাতে তরুণের অনুসরণের উপমা দিয়া বোঝান এসবেরই মধ্যে আধুনিক প্রাণোচ্ছ্বল সাহিত্যের ছোঁয়া পূর্ব্ব হইতে লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আধুনিক বুদ্ধিবাদী ভাবুক সাহিত্য যেখানে নৈরাশ্য ও দ্বন্দ্বসংশয়ের অন্ধকারে প্রেতের মত নরক হাতড়াইয়া মরিতেছে, বৈদিক কবি সেখানে দিব্য লোকের আশার আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া মহাজীবনের জয়গান গাহিতে-ছেন। কোন্ যাদুস্পর্শে ইহা সম্ভব হইয়াছে? তাহা আর কিছুই নহে—সংযম ও ব্রহ্মচর্যের দিব্য প্রভাব। এই মূল কথাটী বুঝিয়া রাখিতে পারিলে ভারতীয় ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী কোনও কোনও আন্দোলনেরও স্বরূপ বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

পরবর্ত্তীকালের রামায়ণ-মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে অজস্র কাব্য ও নাটকের উপাদানরাশি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য সব চেয়ে বড় কথা নয়,

পরন্তু ইহারা যে ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন ধারক-বাহক তাহাই ইহাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, জগতের সাহিত্যে যাহার তুলনা নাই। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান্ উক্তি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। —'রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্য-হর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' *

রামায়ণ-মহাভারতে জাতীয় ব্রহ্মচর্যের মহিমার বর্ণনা আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া এই দুই পুরাণ-ইতিহাস-মহাকাব্যে কয়েকটী মাত্র ঘটনা ও কাহিনীর তাৎপর্য আলোচনা করিব।

ইহা একটী জীবন্ত সত্য যে বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ-মহাভারত এবং পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য-কাব্য-নাটকাদির মধ্যে যৌনজীবনের বা নরনারীর কামসম্পর্কের সম্বন্ধে কোনও কৃত্রিম নৈতিকতার 'খুঁৎখুঁতেমি' বা সঙ্কোচ দেখা যায় না। তান্ত্রিকাদি সাধনশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে, এমনকি উপনিষদের মধ্যেও এই সম্পর্কের স্বচ্ছন্দ আলোচনাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্ত্তীকালে মধ্যযুগেও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কাব্য এবং লৌকিক শৃঙ্গারমূলক নানা কবিতাসংগ্রহ (যথা 'কাব্য-

* —প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ৫০৩।

প্রকাশ') সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। অনেকক্ষেত্রে এগুলি শালীনতা বা শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই শৃঙ্গাররসাত্মক ভাব ও কাব্য কতখানি প্রভাব ফেলিয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত। পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই প্রাচীন কাল হইতেই কাব্যে ও সাহিত্যে (এবং শিল্পে) নরনারীর কাম-সম্পর্ক একটী প্রধান উপজীব্য, সে কথার মধ্যে আমরা যাইতেছি না। কিন্তু ভারতের কাব্য-সাহিত্যের ও পূর্ব্বোক্ত দুই মহা-কাব্যের মধ্যে এই যৌনকামমূলক নানা বর্ণনা অনেক সময়ে কতকটা নগ্নভাবে স্থান পাইলেও তাহাতে সহজ বলিষ্ঠ জীবনের অধ্যাত্ম মানসিকতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

গুপ্তযুগের কাব্য নাটকাদির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলো-চনায় আমরা পরে আসিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভারতের মহাকাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহার আর একটী উদ্ধৃতি আমরা দিতেছি।—'স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে, সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড়ো সমালোচকই হই-না কেন, একটী সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস-প্রবাহিত সমস্তকালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয় তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়। ......মানুষেরই চরম আদর্শ-স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়া-ছেন। ......ইহা স্মরণ রাখিবেন যে কোনো ঐতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ-চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের

সহিত শুনিয়া আসিতেছে। * এজন্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই আদর্শ চরিত্রগুলির মধ্যে যৌনমিলনের কাহিনী দিব্য নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, দিব্য উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত ও দিব্য লক্ষ্যে পরিসমাপ্ত। 'সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপ দৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।' §

এই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলেই আমরা রামায়ণ-মহাভারতেরও অনেক যৌনপ্রণয় ও সন্তানজন্মের কাহিনী সত্যভাবে বুঝিতে পারিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈদিক যুগ হইতে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত মানুষের—বিশেষ করিয়া উচ্চ-স্তরের মানুষের—জীবনে এমন একটা স্বচ্ছন্দ, সহজ, ঋজু, বলিষ্ঠ ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায় যাহার ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী যুগের কৃত্রিম, জটিল, দুর্ব্বল, আত্মসচেতন (self-conscious) জীবনের দ্বিধাগ্রস্ত নীতিপরায়ণতার কোনও অবকাশ ছিল না। এই যুগপরিবেশেই রামায়ণ-মহাভারতে মুনি-ঋষি-তপস্বী অথবা আদর্শ গৃহীপুরুষগণের জীবনে প্রেমপ্রণয়-বিবাহের মধ্য দিয়া সন্তান-সৃজনের বহু কাহিনী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা এযুগের ভাবুকজীবনশিল্প (art) নয়, ইহা সেযুগের সত্যজীবনশিল্প এবং

* —প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫০৩-৭।

§ —'শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৪৬৩।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠ সত্যজীবনের প্রেরণাই ইহার উৎস। ব্রহ্মচর্য-প্রতিষ্ঠ সমাজজীবন ইহার ভিত্তি। সুতরাং ইহা একালের extra-marital relations-এর রিরংসাবৃত্তি নয় অথবা প্রাচীন হোমেরীয় (Homeric) মহাকাব্যের যৌন স্বাধীনতা নয়।

রামায়ণের প্রথমেই (আদিকাণ্ডের দশমসর্গে) আমরা পাই আজন্ম ব্রহ্মচারী তরুণ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কথা। তপস্বী ঋষিপিতার উপযুক্ত সন্তান তিনি। তাঁহাকে আনাইয়া—যজ্ঞ করাইলেই দশরথের যোগ্য পুত্র লাভ হইবে। ইতিপূর্ব্বে অঙ্গ রাজ্যে অনাবৃষ্টির কালে রাজা রোমপাদ বারবণিতাদের দ্বারা প্রলুব্ধ করাইয়া এই তপস্বী ঋষিতনয়কে নিজ রাজ্যে আনামাত্র দেশে বৃষ্টি হইয়া দেশ রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু এই 'প্রলুব্ধ' করার যে বিবরণ আমরা রামায়ণে পাই তাহা কোনও কামাসক্তের 'প্রেমে পড়া' নয়, তাহা 'অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং বিষয়াণাং সুখস্য' —তাহা নারীসুখ ও বিষয়সুখে অনভিজ্ঞ একটী শিশুতুল্য মনে একটা প্রাকৃত কামশক্তির ঝলক সৃজন করিয়া একটী কল্যাণজনক কাজে তাঁহার তপঃশক্তিকে নিয়োগ করা। এজন্য দেখি—'রাজা রোমপাদ অতি বিনীতভাবে অগ্রসর হইলেন এবং ভূপতিত হইয়া ঋষিকে প্রণাম করিলেন। পরে আগ্রহান্বিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ্যদান করিলেন এবং ছলনাপূর্ব্বক আনয়ন করার জন্য ঋষির অন্তরে যেন ক্রোধের উদয় না হয়, সেই জন্য তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন।' § ইহার পর রাজা 'শান্তেন মনসা'—শান্ত-শুদ্ধ মনে বিধিমত স্বীয় কন্যা শান্তাকে ঋষির হস্তে সমর্পন

§—রামায়ণ, আদিকাণ্ড ১০।৩০-৩১, 'আর্যশাস্ত্র' অনুবাদ।

করিলেন। ঋষি শান্তাকে বিবাহ করিলেন। এই মহাতপস্বী ঋষিকেই পরে রাজা দশরথ তাঁহার বিরাট অশ্বমেধসহ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রধান হোতারূপে পরমসম্মানে বরণ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে রাজা দশরথ সভার্য্যা ঋষ্যশৃঙ্গকে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পুরবাসীর বিপুল আনন্দ এবং রাজ-অন্তঃপুরে সভর্ত্তা শান্তার প্রতি অন্তঃপুরিকাদের সাদর অভ্যর্থনা—এই সবই সমাজের চক্ষে একটি মহীয়ান্ অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সহজ চিত্রকে তুলিয়া ধরে। রাজার পুত্রপ্রার্থনায় ঋষি কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া আশ্বাস দিলেন। ফলে ভগবান্ বিষ্ণু, 'বধায় দেবশত্রূণাং', দেবশত্রুগণের বিনাশের জন্য রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাই রামায়ণের কাহিনী। এই মহালক্ষ্যেই ঋষির সাময়িক চিত্তচাঞ্চল্যের মহাপরিণতি। ক্ষুদ্র-দুর্ব্বল স্বেচ্ছাচারী কামলালসার স্থান সেখানে নাই। সাময়িক কামাবেশ সেখানে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। ভারতীয় মহা-জীবন কামদাসত্বের অনেক উর্দ্ধে। ইহাই ছিল সে যুগের 'মুনির বিবাহ।'

এই যে আধ্যাত্মিক ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পৌরুষ ইহাই ছিল বৈদিক যুগের ব্রহ্মচর্যসম্পন্ন বেদাধ্যয়নের ও যজ্ঞক্রিয়ার প্রাণ-বস্তু। ঋষির বিবাহ বা যৌনসঙ্গও ছিল এই মহাপ্রাকৃতিক ইচ্ছাশক্তির অনুবর্ত্তন মাত্র। এই মূল তত্ত্বটী ঠিক্‌মত হৃদয়ঙ্গম হইলে আমরা প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস-মহাকাব্যে যে যৌনমিলন ও সন্তানসৃজনের কাহিনীগুলি পাই সহজেই তাহার

সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাইব। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে জরৎকারু-মুনির কাহিনীও স্মরণীয়। মহাতেজস্বী মুনিবর 'সন্ধ্যা' শেষ করিবার পূর্ব্বে দৈবক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। 'সন্ধ্যা'র সময় উত্তীর্ণ-প্রায় দেখিয়া মুনিপত্নী তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করেন। কিন্তু ইহাতে মুনি জরৎকারু শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধার ভাব দেখিতে পাইলেন, কারণ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত সূর্য অস্ত যাইতে পারে না, এ বিশ্বাস মুনিপত্নীর ছিল না। তপস্যার পৌরুষশক্তিকে এইভাবে অবমাননা করার ফলে মুনি জরৎকারু সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে ইহা হঠকারিতা বা নির্ম্মমতা বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু আজন্মতপস্বী ব্রহ্মচারী জরৎকারু পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে এই বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পত্নীত্যাগ করিয়া পুনরায় কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইবার পূর্ব্বে স্বীয় পত্নীকে গর্ভস্থ পুত্রের (আস্তীক-মুনির) জন্ম সম্বন্ধে মধুর বাক্যে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন। এই বিচ্ছেদ বেদনাজনক হইলেও উভয়পক্ষে শান্তভাবে সমর্যাদায় স্বীকৃত হইয়াছিল, কারণ বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল, মহাজীবনও তাহার নিত্যপথে চলিয়াছিল। এযুগের উদ্দেশ্যহীন, যৌনকামবিলাসিতার ক্ষুদ্রতা প্রাচীন ভারতীয় মহাসাহিত্যে কখনও স্থান পায় নাই। মহাবীর, সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের বনে গমন, সীতার বনবাস ইত্যাদি সবেরই মূলে সত্যজীবনের অবাধগতিই দেখিতে পাই।

কামপ্রেরণাকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য (অথবা শাস্ত্র) কোনও দিন অস্বীকার করে নাই, তাহার বিস্ফোরণশক্তির প্রতি চোখ বুজিয়াও থাকে নাই। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই এই বিস্ফোরক

পদার্থ দিয়া মহামৃত্যুর পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া মহাজীবনের শাশ্বত রাজপথ প্রস্তুত করিবার কাহিনীই সেখানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সর্ব্বগ্রাসী রিপুকে সত্যজীবনের কাজে লাগাইয়া একটা অপূর্ব্ব মহাসামঞ্জস্যের অমৃত জীবনালেখ্য অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই মহাজীবনবিজ্ঞানের বাস্তবদৃষ্টি আজিকার বিভ্রান্ত ক্ষুদ্রজীবন বিজ্ঞানের রাজ্যেও এক অতুলনীয় মহাসম্পদ্। এই ভাবেই মহাপ্রকৃতির প্রেরণায় মুনিশার্দ্দূল পরাশর সহসা ধীবরকন্যা সত্যবতীর গর্ভে ত্রিকালজ্ঞ বেদব্যাসের জন্মদান করেন। এই ভাবেই সাময়িক কামাবেশে মহাতপাঃ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র অপ্সরী মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্মদান করেন এবং এই শকুন্তলাই হইলেন সুবিখ্যাত ভরতকুলের জননী।

কিন্তু মহাতপাঃ বিশ্বামিত্রের ঘটনাটী বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ। ব্রহ্মর্ষিপদ অর্থাৎ উচ্চতম মহামানবত্বার পদবী লাভ করার জন্য তাঁহার সুতীব্র পৌরুষের প্রচেষ্টা দৈব নিয়মে দুইবার বাধাপ্রাপ্ত হয়। দুইবারই দেবতাগণ তাঁহার অমিত তপস্তেজে ভীত হইয়া তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য দিব্যাঙ্গনা অপ্সরাদের প্রেরণ করেন। প্রথমবার বিশ্বামিত্র সাময়িকভাবে মুগ্ধও হইয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই নিজ মোহ উপলব্ধি করিয়া মেনকার প্রতি প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন। সাময়িক মোহের ন্যায় মোহমুক্তিও সহজে, স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হইল। তাঁহার তপস্তেজের প্রতিক্রিয়া দর্শন করিয়া মেনকা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল কিন্তু ঋষি তাহাকে মধুর বাক্যে বিদায় দিলেন এবং পুনরায় কামজিৎ হইবার স্থির সংকল্প লইয়া উত্তর পর্ব্বতে গমন

করিলেন। § এই ব্যবহার, প্রসঙ্গক্রমে, মহর্ষি জরৎকারুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এবং পূর্ব্বে আমরা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছি (পৃঃ ২৬৪) অর্থাৎ সে যুগে 'প্রেম' ও বৈরাগ্য উভয়ই সহজভাবে বাস্তবজীবনে আত্মপ্রকাশ করিত এবং স্বাভাবিক মহাজীবনের গতিরূপেই স্বীকৃত হইত, সেকথাও এই প্রসঙ্গে মনে আসে। যাহা হউক, বিশ্বামিত্র মহর্ষি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন কিন্তু শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিপদ তখনও পাইলেন না। সুতরাং পুনরায় সহস্রবৎসরের কঠোর তপস্যা এবং দ্বিতীয়বার তাঁহার তপোভঙ্গের চেষ্টায় দেবরাজের অপ্সরী রম্ভাকে প্রেরণ। কিন্তু এবার তিনি দৈবচক্রান্ত ধরিয়া ফেলিলেন—'মুনিঃ সন্দেহমাগতঃ।' এবার সাময়িক নারীপ্রেমের প্রশ্নও নাই, কামের মোহ প্রথমেই ধরা গেল। রম্ভা তপস্বীর অভিশাপে শিলীভূতা হইল। কিন্তু এখনও বাকী। বিশ্বামিত্রের ক্রোধজয় হয় নাই। তাই পুনরায় কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়া ক্রোধও বিজিত হইল, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিলেন।

যে কাহিনীগুলির কথা আমরা উল্লেখ করিলাম, এগুলির সহজ শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য একটু শ্রদ্ধালু হৃদয়ে চিন্তা করা দরকার। এই কাহিনীগুলির মধ্যে পৌরাণিক যুগের অপার্থিব অলৌকিক স্তরের চিন্তাধারা সুস্পষ্ট। অধ্যাত্মরাজ্যে এ সবের সত্যতাও যোগসিদ্ধগণ স্বীকার করেন। সে প্রশ্নের মধ্যে না যাইয়া লৌকিক জগতের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কাহিনীগুলির

---

§—রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৬৩।১৩,।১৪।

উপযোগিতা ও কার্যকারিতার দৃষ্টিতে আমরা এগুলির বিচার করিব। প্রথম কথা, এগুলি যদি আক্ষরিক অর্থে হুবহু গ্রহণ করি, তাহা হইলে সমগ্রভাবেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। মহর্ষি পরাশরের ক্ষেত্রে তাঁহার বিরাট্ তপঃশক্তির কথা মনে রাখিতে হইবে। বশিষ্ঠপৌত্র শক্তি্নন্দন পরাশর মাতৃগর্ভেই বেদজ্ঞ হইয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার তীব্র তপস্তেজ মহাভারতের আদিপর্ব্বে—১৭৮-৮১ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি একবার সপ্তলোক এবং আর একবার সমগ্র রাক্ষসকুল নিধন করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রথমবার পিতামহ বশিষ্ঠের অনুরোধে নিরস্ত হন এবং দ্বিতীয়বার রাক্ষসসত্রে অনেক রাক্ষস নিধন করিয়া শেষে পুলস্ত্যাদি ঋষিকুলের অনুরোধে বিরত হন। তথাপি তাঁহার তপঃসঞ্জাত ক্রোধাগ্নি হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর পার্বিক দাবানল এবং আগ্নেয়গিরির সৃজন করে। পরাশর নামটিও তেজস্বিতার দ্যোতক। ধীবরকন্যা সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি বেদব্যাসের সৃজনের সময় তিনি সহসা বিপুল কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সত্যবতীকে তাঁহার কুমারীত্ব দূষিত না হওয়ার এবং অন্য বরও দিয়াছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন এক বৃহত্তর বিশ্বভূমি (Cosmic Plane) হইতে সংঘটিত। সত্যবতীও সাধারণ ধীবরকন্যা নহেন। তিনি ছিলেন তপস্বী রাজা উপরিচর বসুর কন্যা, পালনকারী পিতার শুশ্রূষায় ঋষিদের নদীপারাপার করিতেন এবং মহাভারতে যে বিবরণ আছে তাহাতে পরাশরতেজঃ ধারণে তাঁহার অনিচ্ছা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই সত্যবতীই পুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের

প্রেরণায় শেষজীবনে রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় জীবনপাত করেন। সেযুগের ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠ মহাজীবনে এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাপ্রকৃতিরই লীলা, সাধারণ কামক্রীড়া নহে। বিশ্বামিত্রের ক্ষেত্রেও আমরা জানি অলৌকিক তপস্তেজে তিনি নূতন নক্ষত্রলোক, নূতন সপ্তর্ষিমণ্ডল, এমনকি নূতন দেবলোক এবং নূতন ইন্দ্র সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহাজীবনের মহাতপস্যাকে ত্বরান্বিত ও সার্থক করিবার জন্যই দুইবার তপঃশক্তিবিরোধী কামশক্তির পরীক্ষা আবির্ভূত হইয়াছিল। এগুলি সাধারণ পদস্খলনের অর্থাৎ প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণের লক্ষণ নহে। তবে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে সাময়িক বাধা-ব্যর্থতার উদাহরণ অবশ্যই বটে। ভারতসংস্কৃতি কোনও দিন মনুষ্যত্বসাধনার এই বাস্তব দিক্‌টাকে উপেক্ষা করে নাই, তাহাতে ঐ সাধনার গৌরবও কোনও অংশে কমে নাই। বস্তুতঃ সমগ্র রামায়ণ-মহাভারতে কামচাঞ্চল্যের কথা বহুস্থানেই মহাজীবনের শিল্প (art)-দৃষ্টিতে জীবনসত্যের অংশরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, কিন্তু জিতকাম মহাজীবনের মহিমাই সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছে, নিছক কামলালসার জয়গান কোথাও গাওয়া হয় নাই। স্বাভাবিক আবেগের স্বীকৃতি সে যুগে আমরা যেমন পাই তেমনি দেখিতে পাই তীব্র রিপু-ইন্দ্রিয়সংযম বা ব্রহ্মচর্যের উপর সমগ্র ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের প্রতিষ্ঠা। আধুনিক জীবনের ও সাহিত্যের 'স্বাভাবিক' আবেগের সহিত এইখানেই তাহার স্বর্গ-নরক প্রভেদ। বিশ্বামিত্র-প্রশ্নটার আর একটা দিক্‌ও আছে। কামক্রোধজয়ের জন্য এই কয়েকসহস্রবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায়

যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তবে তাহা সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন্ প্রেরণার সঞ্চার করিতে পারে? উত্তর অতি সহজ। বিশ্বামিত্রের মহাতপস্যা সাধারণ মানুষের সাধারণ তপস্যা নয়। তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণ হইতে চাহিয়াছিলেন। ইহা শুধু স্বাভাবিক মানুষের সংযমসাধনা নয়, ইহা তৎকালীন প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা, প্রকৃতির বিধানকে উল্টাইয়া দিবার অলৌকিক সাধনা। সুতরাং এই অসাধারণ তপস্যা স্বভাবতঃই সুকঠোর ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী। তাঁহার এই মহাকঠোর তপস্যার প্রতিজ্ঞাকে মহর্ষি বাল্মীকিও জগতে অতুলনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—'চকারাপ্রতিমাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দন।' আর 'সহস্রবৎসর' এই কালপরিমিতিটী সে যুগের তাৎপর্যে গ্রহণীয়। বিশ্বামিত্রের নূতন ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পরিকল্পনাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এখন মহাভারতে সাক্ষাৎভাবে কয়েকটী প্রণয়কাহিনীর আলোচনা করা দরকার। অর্জ্জুনের দ্বাদশবর্ষব্যাপী আত্মনির্ব্বাসন-কালে উলূপী ও চিত্রাঙ্গদার সহিত তাঁহার মিলনের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলিও সেকালের জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনার ঐতিহ্য হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রথম ক্ষেত্রে উলূপী নিজেই প্রার্থী, কিন্তু অর্জ্জুন সেখানেও প্রথমে ধরা দেন নাই। স্বেচ্ছাচারী কামবিলাসের লক্ষণ ইহাতে নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন তিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রত অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং সংকল্প ভাঙ্গিতে পারেন না। নাগকন্যার জলতলদেশস্থ রাজ্যে যাইয়া অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দে হোমক্রিয়াদির সুব্যবস্থা পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটীতে একটী প্রসন্নতার ভাবও অনুভব করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার

আনুকূল্যের একটি কারণ। অর্জ্জুনের ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা উলূপী বুদ্ধিমতী ব্যাখ্যার দ্বারা দূরীভূত করিলেন। শেষে অর্জ্জুন 'ধর্ম্মবুদ্ধিতে' উলূপীর ইচ্ছা পূরণ করিলেন, ইহাই মহাভারতের উক্তি। সমগ্র ব্যাপারটীতে একটি প্রাণশক্তির প্রসন্নতার ক্রিয়া আছে, উগ্রতা নাই। এই প্রাণশক্তির প্রসন্নতাই ভারতীয় 'ধর্ম্ম'-সাধনার একটী প্রধান লক্ষণ। এই প্রাণশক্তির স্বাভাবিক প্রসন্নতাবিধানের জন্যই বংশরক্ষার্থে বিধিমত পত্নীর ঋতুরক্ষার দিকে সেযুগে এতখানি প্রবণতা ছিল। ইহার জন্য স্বভাবজগতে কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটী নিহত হওয়ায় ঋষি বাল্মীকির 'ধর্ম্ম'প্রাণ হৃদয়ে কাব্যশোকের শ্লোক আবির্ভূত হইয়াছিল। কাব্যধর্ম্ম, কামধর্ম্ম ও জীবনধর্ম্ম এভাবে এক বিচিত্র ঐক্যতানে অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'নিয়োগ' প্রথা এবং সমাগম-প্রার্থিনী নারীর ইচ্ছাপূরণও এই দৃষ্টিতেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া সে যুগে গণ্য হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠ সত্যজীবন ছাড়া স্বাভাবিক কামধর্ম্মকে বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। এজন্য যে অর্জ্জুন উলূপীর ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের পরমা রূপসী নন্দনবাসিনী উর্ব্বশীর কামনিবেদন সবিনয়ে অথচ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে উর্ব্বশীর শাপগ্রস্তও হইতে হইয়াছে, তথাপি তিনি অস্বাভাবিক, অহঙ্কারী কামচাঞ্চল্যের প্রশ্রয় দেন নাই। এই উর্ব্বশী-প্রসঙ্গে আমরা মহাভারতে অর্জ্জুনের যে চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা পাই তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত। অর্জ্জুন—অসাধারণ ইন্দ্রিয়সংযমী, অতুলনীয় বীর ও তেজস্বী, হিংসাদ্বেষবিহীন, ক্ষমাশীল, বেদ-উপনিষদে

কৃতবিদ্য, গুরুজনশুশ্রূষু, মেধাবী, ব্রহ্মচারী, অনলস, আত্মপ্রশংসা-বর্জিত, লোকমানদ, সত্যবাদী, অভিজ্ঞ লোকপালক, শরণাগত-বৎসল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। * বলা বাহুল্য এগুলি সমস্তই বাস্তব জীবনের আদর্শ মানুষ ও আদর্শ ব্রহ্মচারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এরূপ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই মহাপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে ও ভাবে যৌনকাম বা প্রণয়ভালবাসার অঙ্গীকার সম্ভব। এই স্বভাবের মানুষই মণিপুর-রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদাকে প্রথম দর্শনেই ভালবাসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বীর বভ্রুবাহনের জন্মদান করিয়াছিলেন। এই প্রণয়ে যে ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা নাই তাহা তিনি পূর্ব্বেই উলুপীর ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'বামদেব্য'-সামে 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ' কথাটীর আমরা ইতিপূর্ব্বে যে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ২৬১-৬৩) তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আরও সুপরিস্ফুট হইবে। সমাগমপ্রার্থিণী নারীকে প্রত্যাখ্যান না করার নীতি ব্রহ্মচর্যপরায়ণ ও উক্ত সামমন্ত্রের সাধকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাহা কোনও সাধারণ নিয়ম নয়, একটী বিশেষ বৈদিক ক্রিয়ায় স্বাভাবিকী শ্রদ্ধার অনুবর্ত্তন মাত্র। বাস্তবজীবনে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উর্ব্বশীর প্রত্যাখ্যানেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

অর্জ্জুনের সুভদ্রার প্রতি প্রথম সন্দর্শনেই প্রণয় (love at first sight) এবং সুভদ্রাহরণের কাহিনীও আমাদের আদর্শবাদের প্রসঙ্গে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। রৈবতকের যে মেলায়

* — মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৪৫ অধ্যায়।

(সে যুগের পরিভাষায় 'সমাজ'-এ) ইহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা এযুগেরই একটি অভিজাত প্রমোদমেলার সহিত তুলনীয়। এইরূপ 'রোমান্টিক' পরিবেশে অর্জ্জুনের সুভদ্রার সহিত আকস্মিক সাক্ষাৎ ও 'প্রেম'—সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগের আচম্বিত প্রেমেরই কাহিনী। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বনবাসী অর্জ্জুনের এই অবস্থা দেখিয়া একটু বিস্ময়ের হাসিও হাসিয়াছেন - যেমন তিনি হাসিয়াছিলেন কুরুক্ষেত্রে তাঁহারই এই সখার অপ্রত্যাশিত শোক দেখিয়া— 'তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।' কিন্তু মহানির্লিপ্ত এই শাশ্বতকালের 'দ্রষ্টা'পুরুষ কখনও বিচলিত না হইয়া সর্ব্বদাই সত্যজীবনের পথই দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তিনি অর্জ্জুনের বিবাহের ব্যবস্থাই করিয়াছেন এবং নিজ ভগিনী সুভদ্রাকে 'হরণ' করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ইহা elopement বা নারী লইয়া পলায়ন এবং তাহার abetment বা সাহায্য করা নহে। ক্ষাত্রজনোচিত বীরত্বের প্রমাণ দিয়া সুভদ্রাকে পত্নীরূপে গ্রহণই তিনি ধর্ম্মসম্মত মনে করিয়াছেন। ইহা কোনও গোপন কামলিপ্সার প্রণয়কার্য বা 'love-making'ও নহে। বলরাম ও অন্যান্য যদুবংশীয়েরা রুষ্ট হইলে তিনি অর্জ্জুনের পক্ষ লইয়া যে সব যুক্তি দিয়াছেন তাহাতে সকলেই শান্ত হইয়াছেন এবং অর্জ্জুনেরও চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই অর্জ্জুনচরিত্রের মহত্ত্ব আমরা ইতিপূর্ব্বে উর্ব্বশী-প্রসঙ্গেও দেখিতে পাইয়াছি। নবপরিণীতা বধূ সুভদ্রা শ্বশ্রূ কুন্তীর পদপ্রান্তে প্রণতা হইয়াছেন, সপত্নী দ্রৌপদীর অনুচরী হইয়াছেন। সমস্তই মঙ্গলজীবনের অনুকূল। উদগ্র কামপরিণয়

ইহা নহে। এই বিবাহের ফলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন মহাভারতের অলোকসামান্য বালকবীর অভিমন্যু, সপ্তরথী মিলিয়া যাঁহাকে নিধন করিতে হিম-সিম খাইয়াছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটীই পূর্ব্বকথিত এক মহাজীবনলীলার অঙ্গীভূত। ইহাই শাশ্বত ভারতের ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠ সত্যজীবনের বাস্তব কাহিনী। মনে রাখিতে হইবে, এই অর্জ্জুনকেই আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধ করিয়া ভারতের শাশ্বত সমাজধর্ম্মের রক্ষায় অনাসক্তিযোগে মহামুক্তি লাভে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের গোড়ার দিকে শান্তনুজনক রাজর্ষি প্রতীপের কাহিনীতেও শিখিবার বিষয় আছে। প্রতীপ সর্ব্বভূতহিতৈষী পৃথিবীর অধিরাজ। গঙ্গাতীরে তাঁহার ধ্যানপরায়ণ অবস্থায় নারীরূপধারিণী স্বয়ং গঙ্গাদেবী রাজার রূপ এবং গুণ, উভয়ে আকৃষ্ট হইয়া 'দেবকার্যসাধনার্থ', প্রতীপের প্রতি 'ভক্তি ও প্রীতিনিবন্ধন' প্রসিদ্ধ 'ভরতকুলের কামিনী' হইবার বাসনায় ঐকান্তিক প্রণয় নিবেদন করিলেন। * সমাগমপ্রার্থিনী নারীর প্রণয়-প্রত্যাখ্যানের অধর্মও তিনি রাজাকে জানাইলেন। কিন্তু প্রতীপ বলিলেন তিনি সাধনায় ব্রতী, সেজন্য এভাবের প্রণয় স্বীকারে তাঁহার ধর্মচ্যুতি ঘটিবে। তিনি গঙ্গাকে নিজ পুত্রবধূ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। গঙ্গাও তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তাঁহার 'আদেশ' শিরোধার্য করিলেন। পুত্র শান্তনুর সহিত গঙ্গার পরিণয়ে মহাভারতের মহান্ 'পিতামহ' ভীষ্ম জন্মগ্রহণ

* —কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

করিলেন এবং সেই সঙ্গে অভিশপ্ত সপ্তবসু জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন। গঙ্গাও তাঁহার মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এক্ষেত্রেও সমস্ত ব্যাপারটীতে এক মহা-জীবনের লীলাই ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখা যাইতেছে 'বামদেব্য সাম' অবাধ স্ত্রীগ্রহণের কোনও অপরিহার্য নজীর বলিয়া এখানেও স্বীকৃত হয় নাই। অতঃপর রাজা শান্তনুর সত্যবতীর প্রতি 'প্রণয়' এবং ভীষ্মের আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রতের উপর তাঁহাদের বিবাহ ও বিচিত্রবীর্যের জন্মগ্রহণ, যাঁহার 'ক্ষেত্রে' বেদ-ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর আবির্ভাবে মহাভারতের সাক্ষাৎ সূচনা।

মহাভারতে আরও কয়েকটী ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র করা যাইতে পারে। ভীমের হিড়িম্বার সহিত পরিণয়ও আমাদের দৃষ্টিতে বিচারযোগ্য। হিড়িম্বা ভীমের প্রতি গভীর প্রণয়াসক্তা হইয়া অগ্রজ যুধিষ্ঠির এবং মাতা কুন্তীর কাছে ভীমকে স্বামীরূপে পাইবার কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার কাতর আকুলতায় মাতা ও অগ্রজ সম্মতি দিলেন। ভীমের ইচ্ছা না থাকিলেও এই প্রণয়কে তিনি স্বীকার করিলেন কিন্তু একটী পুত্র (ঘটোৎকচ) জন্মগ্রহণ করার পর তিনি হিড়িম্বার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলেন, পুত্র ঘটোৎকচ পিতৃসেবায় সাগ্রহে প্রতিশ্রুত রহিলেন। বর্ত্তমানের প্রণয়বিবাহের উন্মত্ততা ইহাতে নাই।

কচ ও দেবযানীর বিখ্যাত প্রণয়কাহিনীও আমাদের বিশের অনুধাবনযোগ্য। বৃহস্পতি-তনয় কচ শুক্র-তনয়া দেব-যানীর গভীর ভালবাসা পাওয়া সত্বেও অনায়াসে তাহাকে

গুরুপুত্রী জ্ঞান করিয়া তাহার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিলেন, শেষে উভয়ে উভয়ের শাপে পড়িলেন। কচের প্রতি দেবযানীর এই প্রণয় অত্যন্ত রোমান্স (Romance)-ধর্ম্মী, কিন্তু মহাভারতকারের নিছক রোমান্সে কোনও আগ্রহ নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় কচের প্রতি প্রণয়ে শুধু করুণা (Pity) নহে (Shakespeare-এর টেম্পেষ্ট-নাটকে ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি মিরাণ্ডার 'প্রেম' তুলনীয়), কচের চরিত্র অর্থাৎ—তিনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী, গুরুশুশ্রূষু, কর্ম্মদক্ষ এ সমস্তই দেবযানীকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে যযাতির সহস্রবৎসরের যৌবন লইয়া কাম-সম্ভোগের কাহিনীটীও মনে রাখিবার মত। 'ন জাতু কামাঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি' বলিয়া তাঁহার সমগ্র জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতার হাহাকার মহাভারতে একটি শাশ্বত আলোকস্তম্ভের মত মানুষের কামকামনার অন্ধকার সমুদ্রবক্ষে চিরকাল পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। এখানে নিছক যৌনকাম-সম্ভোগের স্বেচ্ছাচারী অহঙ্কারকে তাহার স্বরূপেই চিত্রিত করিতে মহাভারতের মহর্ষি-মহাকবি বিস্মৃত হন নাই। মনে রাখিতে হইবে ইহা কোনও ধর্ম্মীয় বা নৈতিক শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা নয়, ইহা সত্যসাহিত্যে জীবনসত্যের উদ্ঘাটন।

মহর্ষি বেদব্যাসের সুমহান্ পুত্রলাভের কাহিনীতেও লৌকিক কামশক্তি এক অলৌকিক মহাপ্রকৃতির কার্যসাধনে সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। শতবর্ষ কঠোর তপস্যার পর বরলাভান্তে মহর্ষি হোমের অগ্নিসৃজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখিয়া হোমকাষ্ঠে শুক্র-

ক্ষরণের ফলে নিত্যকালের মহাসন্ন্যাসী শুকদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। কোন্ বাতুল এই-জাতীয় বিশ্বভৌমিক (Cosmic) কাহিনীগুলিকে পদস্খলন বলিতে সাহসী হইবে? অনুশাসন-পর্ব্বে মহর্ষি অষ্টাবক্রের কাহিনীতেও আমাদের নবযুগের ব্রহ্মচর্য বা জাতীয় ব্রহ্মচর্যের আদর্শের অনুকূলে কিছু রহিয়াছে। মহর্ষি অষ্টাবক্র কামদমনশক্তি লাভ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত পরমজ্ঞানী হইয়া মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভাকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন্ এবং তাহার পাণিগ্রহণ করিতে সংকল্প করেন। কিন্তু ঋষিকন্যা সুপ্রভাকে লাভ করিবার পূর্ব্বে যৌনচঞ্চলতা-সংযমের এক কঠোর পরীক্ষা তাঁহাকে দিতে হয়। তাহাতে তিনি তাঁহার নিষ্ঠা, সংযম ও সত্যপ্রতিজ্ঞতা প্রমাণিত করিয়া তবে ঋষিকন্যাকে লাভ করিতে পারেন। বিবাহ-সম্পর্কে ইন্দ্রিয়সুখসাধনের কোনও স্থান আছে কিনা, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীষ্ম বলিয়াছেন, অবশ্যই আছে এবং মহাত্মা অষ্টাবক্রের কাহিনীটী তাহার নিদর্শনরূপেই তিনি বিবৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ নরনারীর বিবাহিত জীবনের মূলে যে ইন্দ্রিয়সুখলাভের প্রবর্ত্তনা রহিয়াছে তাহা মহাভারতকার অস্বীকার করেন নাই বরং তাহাকে একটি ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও যাহা বিচার্য তাহা এই যে ইহা অষ্টা-বক্রের দুর্ব্বলতা হিসাবে দেখান হয় নাই, ইহা তাঁহার সংযমপ্রতিষ্ঠ জীবনের উপর স্বভাবধর্ম্মের ক্রিয়ারূপেই গৃহীত হইয়াছে। বিবাহিত নরনারীর অসংযত কামজীবনের অধর্ম্মের বিরুদ্ধে জিতেন্দ্রিয়ের কামধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

পরমসন্ন্যাসী শ্রীমৎ শুকদেবের কথা দিয়া আমরা মহা-ভারতের আলোচনা শেষ করিব। শুকদেব সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ বালসন্ন্যাসী। ত্যাগ-তপস্যা ও নির্লিপ্ততায় তিনি পিতা ব্যাস-দেবকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় এত বড় মহাসন্ন্যাসীর গুরু বা আচার্য্য হইয়াছিলেন ক্ষত্রিয় রাজর্ষি জনক যাঁহার প্রাসাদে বিলাস-সরোবর এবং সুন্দরী বারবণিতাগণেরও অভাব ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় নারী এবং নারীসৌন্দর্য নানাভাবে সেযুগে নগর বা রাজপ্রাসাদের শোভাবর্দ্ধনে ব্যবহৃত হইত। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশের সময় বিরাট্ শোভাযাত্রায় এই সুসজ্জিতা বারবণিতাগণের অংশ-গ্রহণের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু জনক ছিলেন সংযত নির্লিপ্ত-তার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার প্রাসাদে আগত তরুণ শুকদেবকে তিনি একদিন অপেক্ষা করাইয়া রাখিলেন, সুসজ্জিত বিলাসকক্ষে তাঁহার স্থান হইল। লাস্যময়ী বারবণিতাগণে পরিবৃত হইয়াও তরুণ মহাতপস্বী অক্ষুব্ধচিত্তে তাঁহার ধ্যানধারণায় নিমগ্ন রহিলেন। পরে রাজর্ষি জনক আসিয়া গুরু (ব্যাস)-পুত্র শুকের যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন ও তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা উদ্বোধিত করিলেন। এই কাহিনীর মধ্যে আমরা পাই জাতিনির্ব্বিশেষে মহামুক্তজীবনের অর্থাৎ ব্রহ্মজীবনের সাধনাই ভারতের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে ভোগ-ত্যাগ সব কিছুর মধ্যেই কঠোর সংযমতপস্যা ও নির্লিপ্ততাই মহা-ভারতের মহাজীবন।

রামায়ণেও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আমরা দেখি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র শারদীয়া জ্যোৎস্নারজনীতে তরুণী বিরহিণী অপহৃতা সীতার কথা

চিন্তা করিয়া 'কামশোকাভিপীড়িত' হইয়াছেন। রামচন্দ্রের ভাবা-বেগকে ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ আসিয়া সংযত করিয়াছেন। অথচ এই রামচন্দ্রই সত্যসঙ্কল্প, জিতেন্দ্রিয়, মহাবীর, 'নির্ম্মম' কর্ত্তব্যপরায়ণ, সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত। এইখানেই সে যুগের কামজীবনের ধর্ম্মীয় বৈশিষ্ট্য। সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সেই যুগ নরনারীর প্রেমকে প্রায় সর্ব্বত্রই 'কাম'-নামে স্বচ্ছন্দে অভিহিত করিয়া যৌনকামকে এক পরম স্বাভাবিক মর্য্যাদায় স্থাপিত করিয়াছে।

পরবর্ত্তী মধ্যযুগের অথবা আধুনিক কালের অতিমাত্রায় আত্মসচেতন (self-conscious) মনের জটিলতা-কুটিলতা-অশ্লীলতার অবসর সেখানে নাই। আজ আমরা যৌনকামের প্রবল কদর্য ব্যর্থতা ভিতরে ভিতরে অনুভব করি অথচ সাময়িক অন্ধ আবেগে তাহার উপর সার্থকতার পালিশ লাগাইতে চাই, যদিও পদে পদে সে পালিশ চটিয়া গিয়া নগ্ন কদর্যতাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কামের এই ব্যর্থ সম্মোহকে লইয়া নাড়াচাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই আজিকার সমাজমনের ও সাহিত্যকাব্যের প্রধান উপজীব্য। কামজীবনের এই জঘন্য কদর্যতাকে উদ্‌ঘাটিত করাই আজ সাহিত্যরস। উৎকটভাবে অশ্লীল যৌনসাহিত্যে আজ দেশ-বিদেশের বাজার ভরিয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষেও তাহার দীন অনুকরণের কোনও কার্পণ্য নাই। অথচ এই অশ্লীলতাকে অশ্লীল বলিয়া স্বীকার না করিবারও একটা উদগ্র উন্মাদনা সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে। বিষ খাইব কিন্তু বিষকে বিষ বলিয়া স্বীকার করিব না, ইহাই আজিকার fashion বা রীতি। কিন্তু বিষক্রিয়া তাহাতে

দূর হয় না। এইভাবে দূষিত সমাজজীবন হইতে আজ বিষাক্ত সাহিত্য বাহির হইতেছে এবং সমাজের বক্ষে আরও বিষ ছড়াইতেছে। জীবনে বিষ এবং অমৃত দুইই আছে, কিন্তু বিষকে কেমন করিয়া অমৃতে পরিণত করিতে হয় তাহার রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রাচীন ভারত জানিত। তাই সেকালের সমাজ ও সাহিত্য 'অশ্লীলতা'-সত্বেও বিষায়িত নয়। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতেছে জাতীয় জীবনে ব্রহ্মচর্যের শিক্ষাসাধনা। সেকালের স্বাভাবিকজীবনে একালের অশ্লীলতার বোধই ছিল না। মানুষের সহজ মনে এযুগের মত Inferiority Complex বা অসূয়ার প্রাবল্যও ছিল না। প্রতিক্রিয়ামূলক 'অহং'-চেতনার অভাবে প্রতিক্রিয়ামূলক কামও বিশেষ ছিল না। মহাভারতে রাজর্ষি জনক পরম ব্রহ্মচারী শুকদেবকে ব্রহ্মচর্যসাধনার উপদেশ-প্রসঙ্গে এই সচেতন মনের অসূয়ারূপ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার কথাও বলিয়াছেন।

আমাদের সেই প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা গ্রহণ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে এই অস্বাভাবিক চেতনার প্রতিকার করিতে হইবে। যৌনতামূলক Psycho-Analysis (মনোবিশ্লেষণ) তাহার পথ নয়। তাহার ভ্রান্তি আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। ব্রহ্মচর্যভিত্তিক জাতীয়জীবন-সাধনাই ইহার সত্য প্রতিকার এবং তাহারই উপর সত্যকার ভোগ ও ত্যাগের জীবন দাঁড়াইতে পারে। আর ইহাও মনে রাখিতে হইবে এই সংযম কোনও মধ্যযুগীয় ঘৃণাবিতৃষ্ণার ভাবে ভাবিত সংযম নয়। ইহা প্রাণশক্তির সত্য প্রস্ফুরণ, ইহা আসক্তিহীন জীবনের স্বচ্ছন্দ

আনন্দগতি, ইহা বীরত্ব-তেজোবীর্য-নির্ভীকতার অগ্র্যুৎসব। সেজন্য রামায়ণ-মহাভারতের সর্ব্বত্রই যেমন ত্যাগ ও তপস্যার কাহিনী, তেমনি প্রেম-প্রণয়-বিবাহের কথাস্রোত, আবার ততোধিক শৌর্য-বীর্য-পরাক্রম ও ক্ষাত্রমনোভাবের বজ্রনির্ঘোষ। তাহার সহিত ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ দেশের বক্ষে সত্যকার সাম্য, মৈত্রী ও মহামুক্তির মহালীলা। ইহাই প্রাচীন ভারত, ইহাই শাশ্বত ভারত ও তাহার সাহিত্য।

এখন আমরা পরবর্ত্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যের কথা কিছু আলোচনা করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে এই সময় প্রাচীন যুগের সমাজসাধনা ও সমাজসংহতি কতকটা শিথিল হইয়াছে, এজন্য জাতীয় মন তাহার তপস্যাময় জীবনের শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য কতকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে ও সচেতন রসাস্বাদ-বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই ভারতীয় সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ। কামকামনার ভাববিলাস নানাভাবে এই যুগসাহিত্যে অপূর্ব্ব কাব্যরসে সিঞ্চিত হইয়াছে। আধুনিক শিল্পকলার সৌন্দর্য্যবিলাসিতা বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া এযুগকে আধুনিক দৃষ্টিতে ভারতের স্বর্ণযুগে রূপান্তরিত করিয়াছে। কিন্তু তথাপি এযুগের ভারত ও ভারতসাহিত্য তাহার প্রাচীন যুগের মহাজীবনকে বিস্মৃত হয় নাই। জীবনকে নিছক কামকলারসে উপভোগ করিবার নানা কৌশল ও শিল্প অবশ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং নানা কাব্যগ্রন্থাদিতেও আমরা যে চতুঃষষ্টি (৬৪) কলার বিবরণ পাই—তাহার মধ্যে আছে নৃত্য, গীত, বাদ্য, রন্ধনবিদ্যা, রসায়ন,

ধনুর্ব্বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, অস্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা, সূচীশিল্প, চিত্রকলা, সন্তরণবিদ্যা, প্রসাধন, চর্ম্মশিল্প, ধাতুশিল্প, স্থাপত্য, অলঙ্কারশিল্প, অস্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা, সারথ্য, মুষ্টিযুদ্ধ অসিযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ, উদ্যানশিল্প ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন এগুলি আধুনিক 'সভ্য' জীবনে আনন্দ-উপভোগের উপকরণের প্রতিচ্ছবি। অবশ্য এই জীবনরসসম্ভোগ একেবারে তখন নূতন বলিলেও ভুল হইবে। কারণ রামায়ণেও এই চতুঃষষ্টিকলার উল্লেখ আছে। * প্রসঙ্গক্রমে, গ্রীক লেখকগণের লিপি হইতেও আমরা ভারতের বিলাস-ঐশ্বর্যসম্ভোগের বহু বর্ণনা পাই। এই ঐহিক প্রাণোচ্ছলতার প্রতিচ্ছবি সে যুগের সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ভারতের ইতিহাসে সাহিত্য-শিল্প-কলার সুবর্ণযুগ। এই যুগই আমাদের কালিদাস-ভবভূতি-শ্রীহর্ষ-ভারবি-মাঘ-বাণভট্ট-শূদ্রক ইত্যাদি সাহিত্য-মহারথীদের উপহার দিয়াছে।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই যুগের প্রধান প্রধান কাব্যে রামায়ণ-মহাভারতের ত্যাগ-সত্য-সংযম-ব্রহ্মচর্য ও মহা-মুক্তির ধারা বন্ধ হইয়া যায় নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সুচিন্তিত সমালোচনা উদ্ধৃত করিতেছি—

'মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্ম্মের আন্দোলন দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে।......রামায়ণেও তাহাই,......সেইরূপ কালিদাসের

* —Ancient Indian Education, by R. K. Mukherjee, Pg. 353-65 দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম্ম ও বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায় তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে।' *

পুনশ্চ—'কালিদাস অনাহুত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুণ লাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। .. ...মহাভারতের সমস্ত কর্ম্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে তেমনি কুমার-সম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনেই পরিসমাপ্ত। ......কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাকে একত্র তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। ......দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে .....যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্নপ্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পন করেন নাই।' §

কুমারসম্ভব-কাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি এত গভীর এবং ভারতীয় আদর্শে নরনারীর 'প্রেম' সম্বন্ধে এত তাৎপর্যপূর্ণ যে তাহা হইতে আমরা আরও কিছু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হইলাম—

---

* —প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫১১।

§—Ibid. পৃঃ ৫১২, ৫১৪।

—'পর্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় আসিয়া গিরীশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার কর্ণ হইতে পল্লব এবং অলক হইতে নবকর্ণিকার বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। .. নিজের হাতে গৌরী যে জপমালা গাঁথিয়াছিলেন সেই মালা তিনি ... সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। বিচলিতচিত্ত যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিম্বাধরে, তাঁহার তিন নেত্রকেই ব্যাপৃত করিয়া দিলেন। উমার শরীর তখন পুলকাকুল, দুই চক্ষু লজ্জায় পর্যস্ত এবং মুখ একদিকে সাচীকৃত। ... কিন্তু অপূর্ব সৌন্দর্যে অকস্মাৎ উদ্‌ভাসমান এই যে হর্ষ, দেবতা ইহাকে বিশ্বাস করিলেন না, সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ... ললিত দেহের সৌন্দর্যই নারীর পরমগৌরব, চরম সৌন্দর্য নহে।... .. সেই জন্যই 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী', পার্বতী রূপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন। ... তিনি তপস্যাদ্বারা নিজের রূপকে অবন্ধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। * তিনি কঠোর মৌঞ্জীমেখলা দ্বারা অঙ্গে বল্কল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন। বসন্তসখা মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন দুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন। ... যে ত্রিলোচন বসন্ত-পুষ্পাভরণা গৌরীকে এক মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তিনি তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণহৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। ... সেই সৌন্দর্যের বন্ধনকে আত্মা আদরে বরণ

*—প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৫১২, ৫১৪।

করিল; তাহার মধ্যে নিজের পরাজয় অনুভব করিল না। ধর্ম যেখানে দুই হৃদয়কে একত্র করে, সেখানে মদনের সহিত কাহারও কোনো বিরোধ নাই। ...... ধর্মের অধীনে তাহার যে নির্দিষ্ট স্থান আছে সেখানে সেও পরিপূর্ণতার একটি অঙ্গস্বরূপ। — ধর্ম্ম যখন তাপস-তপস্বিনীর মিলনসাধন করিল তখন স্বর্গমর্ত এই প্রেমের সাক্ষী ও সহায়রূপে অবতীর্ণ হইল।' তারপর হরগৌরীর মিলন ও বিবাহ এবং কুমারের আবির্ভাব। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধানপদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটী পবিত্র মঙ্গলব্যাপার। সেই জন্য মনু রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।

তাঁহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়া মহাভাগা, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্য কুমারজন্মরূপ মহৎ ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শরনিক্ষেপ করিয়া ধৈর্যবাঁধ ভাঙ্গিয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য নহে; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। এইজন্য কবি মদনকে ভস্মসাৎ করাইয়া গৌরীকে দিয়া তপশ্চরণ করাইয়াছেন।' *

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনবদ্য ভাষায় কুমারসম্ভব কাব্যের যে বিষয়বর্ণনা ও ভাষ্য দিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের জাতীয় আদর্শ অতুলনীয়রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

*—প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৫১৪-১৮।

'কুমারসম্ভব' প্রবন্ধের শেষে তিনি এই ভারতীয় আদর্শের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও বিশেষ আকর্ষণীয়—

'একদিকে গৃহধর্ম্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসারমধ্যে ভারতবর্ষ বহুলোকের সহিত জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না; তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। ... তাঁহার (কবি কালিদাসের) কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব, গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। ...... ঋষির আশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্মল যোগাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নর-নারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত।* প্রাক্‌মধ্যযুগীয় এবং বস্তুতঃ সর্বকালের প্রকৃত ভারতীয় সাহিত্যের ইহাই মর্ম্মকথা। শাস্ত্র ও সাহিত্য এখানে এক দিব্যবন্ধনে মিলিত হইয়াছে।

'রঘুবংশ'-কাব্য সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা একই কারণে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। তিনি বলিয়াছেন এই কাব্য লেখার সময় 'প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রার যে একটা সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটা ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারংবার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল। ...... তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের

*—প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৫২৫।

আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায় ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজেনি তা নয়। ...... কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? ...... ভারতবর্ষের যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল ..... কবি সেই নির্মল সুদূরকালের দিকে একটী বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন। রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটী নিগূঢ় হয়ে রয়েছে।'* ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন রঘুবংশ কাব্য এবং তাহার তাৎপর্যের কথা। তিনি দেখাইয়াছেন যে কালিদাস এই বিরাট কাব্যের মধ্য দিয়া ভারতের জাতীয় জীবনের যে মহান্ গরিমা ত্যাগতপস্যার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার অধঃপতনের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। —'তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা (রঘু) জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।' তারপর—'সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি

---

*—'শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, পৃ: ৪৬৩-৬৪।

অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী আর হয়েছে কী। সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই, যার ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। .. কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটী সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখান হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকল প্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।'*

এইযুগের ভারতীয় সাহিত্যের আর কোনও আলোচনার প্রয়োজন নাই, মূল সুরটী রবীন্দ্রনাথ আমাদের ধরাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন গুপ্তযুগের ঐহিক সাহিত্যে নানা বিলাসব্যসনের কথাই চিত্রিত হইয়াছে তাঁহারা সে যুগের কাব্যের বহিরঙ্গ ব্যাপারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। একথা অবশ্য সত্য যে নিছক কামকলা-লীলাবিলাসের কাব্য যে পূর্ব্ব হইতেই একেবারে ছিল না তাহা নহে। মহাকবি ভাসের নাটকে—যথা 'স্বপ্নবাসবদত্ত', 'চারুদত্ত' ইত্যাদিতে—সামাজিক 'প্লট্' লইয়া কল্পনার কলাকৌশল অতি চিত্তাকর্ষকভাবে বিস্তার করা হইয়াছে। বাসবদত্তা চিরদিনের কল্পলোকের 'সামাজিক' নায়িকা, অথচ (যুগ্ম) নাটকে

*—'শান্তিনিকেতন', রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ: ৪৬৪-৪৬৫।

মন্ত্রী যৌগন্ধারয়ণের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক কলাকৌশলও মূল প্রেমকাহিনীর সহিত সুন্দরভাবে গ্রথিত হইয়া একটী বিভাস্বকা বাস্তব জীবনচিত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 'চারু দত্ত' নাটকের বসন্তসেনা চিরদিনের hetaera বা সম্ভ্রান্ত রূপোপজীবিনী এবং চারুদত্তও চিরদিনের 'নাগর' নায়ক। সুতরাং লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় ভারতীয় সমাজ-সাহিত্য-জাতীয়তা কোনও দিন অবাস্তব আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বেদ-রামায়ণ-মহাভারতেও যৌনপ্রণয়-কাহিনীর কথা আমরা পূর্ব্বেই কিছু উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সমস্ত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত আলোচনা সত্য প্রমাণিত হয়। ভাসের যুগ হইতে কালিদাসের যুগ পর্য্যন্ত আমরা নানাসূত্রে নানাভাবে প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারতযুগের শক্তিমান্ আদর্শের স্মৃতির আভাসই খুঁজিয়া পাই। আশ্রম তপস্যা, ইন্দ্রিয়জয়, মুক্তি ইত্যাদির কথা নানাসূত্রে সেখানে আসিয়া পড়ে। সমাজ ও জাতীয়জীবন আজিকার মত ভোগৈশ্বর্যে বিচিত্র হইলেও, জীবনের মূলে ঐ সংযম, সত্য, তপস্যা, আশ্রম। লক্ষ্য করিবার বিষয় কালিদাস-পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি ভাসের অধিকাংশ নাটকই রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত।* প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগ হইতে ভারতের তপস্যাপরায়ণ রাজধর্ম্মের যে আত্মবিস্মৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহারই ইঙ্গিত হয়ত পাওয়া যায় রাজগণের আদিরস (যৌনকাম)-

---

*—History and Culture of the Indian People (B.V.B.) Vol II, p: 260-64.

আশ্রিত কাব্যরচনায়। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', রাণা কুম্ভের 'গীতগোবিন্দ'-টীকা ইত্যাদি হয়ত তাহারই প্রমাণ। এই অধোমুখী ভাবধারাই কালক্রমে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় শৃঙ্গাররসের (যৌনকামের) উদ্দাম লীলাবিলাসে আসিয়া ঠেকিয়াছে। অথচ এই যুগেই বহির্ভারতীয় সামরিক শক্তি নানাভাবে দেশের দুয়ারে আঘাত হানিতেছে অথবা দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের বন্যা ছুটাইতেছে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা প্রয়োজন যে ভারতের আদর্শ সমাজশক্তির মূল উৎস কোথায় ও তাহা কত সুপ্রাচীন—তাহাও রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের আলোচনাসূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাই ভারতীয় সাহিত্যের সনাতন ধারা।

একটা কথা সত্য এবং ইহার ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি, যে শাশ্বত-ভারতের সমাজধর্ম যাহা কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতের রাষ্ট্র-সমাজ-গৃহ-পরিবার ও শিল্পকলা-সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও শক্তিমান্ করিয়াছিল, তাহা মোটামুটী 'গুপ্তযুগ' পর্য্যন্ত চলিয়া আসে। তাহার পর হইতে এই সমাজ-রাষ্ট্রধর্ম আরও ক্ষীণ হইলে ভারতের জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। শক-হূন ইত্যাদি বিজাতীয় আক্রমণের সম্মুখে এই সময় হইতেই জাতীয় জীবন স্থায়ীভাবে অবনমিত হইতে থাকে। ইতিপূর্ব্বে আমরা এই অধোগতির ধারা ব্রিটীশ যুগ পর্যন্ত চিত্রিত করিয়াছি এবং এই সময়ের মধ্যে মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়ধর্ম কেমন করিয়া জাতীয় জীবনধর্মের স্থান গ্রহণ করিল তাহাও বিবৃত

করিয়াছি। সে যাহা হউক, পরবর্ত্তী যুগে ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে কালিদাসের ঐ জাতীয় আদর্শবাদিতার স্ফুরটীও অন্তর্হিত হইল। আমরা আসিয়া পড়িলাম আদর্শবাদহীন তপস্যাবিহীন জাতীয় জীবনে নিছক কামকলাবিলাসের যুগে। শৃঙ্গাররসের নানা অবাধ চর্চ্চা রাজসভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর এবং শিক্ষিত জনসমাজের আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। জনসাধারণের সাহিত্যবোধ বা সাহিত্যরুচিও এই পতনের যুগে উচ্চমার্গের হওয়া সম্ভব নয়। এই ইতর রুচি ইংরাজের আগমনের কিছুকাল পর পর্যন্তও চলিয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় একেবারে আধুনিক যুগে ইহাই আবার পাশ্চাত্য ভাবসংঘর্ষে আরও এক সর্ব্বদাহী অগ্ন্যুৎপাতের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

যাহা হউক, ঐ যুগে শৃঙ্গার-সর্ব্বস্ব 'জাতীয়' সাহিত্যের নমুনা—অসতী নারীর নানাবিধ কামকলা লইয়া কাব্য রচিত হওয়ার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। আর জাতীয় সত্ত্বা ব্যক্তিগত জীবনের সুখলালসার মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার ইহা সাহিত্যিক লক্ষণ। মহাভারতেরশাশ্বত সাক্ষীপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্রধর্ম প্রতিষ্ঠ শৌর্যবীর্য-মহাপরাক্রম ও অনাসক্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবনালেখ্য মুছিয়া ফেলিয়া এই যুগ স্বভাবতঃই তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-মাধুর্যের লীলারসে মগ্ন হইতে চাহিয়াছিল এবং তাহাই যুগসাহিত্যে এক সুদূরপ্রসারী নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করে। দ্বারকা—মথুরা—কুরুক্ষেত্র এবং সমগ্র মহাভারতের ঐশ্বর্যমহিমার দিব্যলীলা বৃন্দাবনের রসমাধুর্যে নিমগ্ন এবং সীমাবদ্ধ হইল।

এমনকি ভাগবতের ত্রয়োদশটী বিরাট স্কন্ধের সমাজধর্ম—রাষ্ট্রধর্ম—জীবনবিজ্ঞান—যোগধর্ম পরিত্যক্ত হইয়া দশমস্কন্ধের রাসলীলার উপর সমগ্র ঝোঁক পড়িল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পুরীতে জগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য করিয়া যে দিব্যবিরহের গান গাহিলেন তাহা লৌকিক কামকলাসাহিত্যের অসতী নারীর প্রেমসম্বন্ধীয় এক কাব্যগীতি হইতেই সংগৃহীত।* অবশ্য মহাপ্রভু ঐ সঙ্গীত রাধাকৃষ্ণমিলনের পরিপ্রেক্ষিতে গাহিয়াছিলেন এবং তাহার ব্যাখ্যাও ভিন্নপ্রকার। কিন্তু তবুও একথা সত্য যে এই মধ্যযুগীয় ধর্মসাধনায় যে ভাবের প্লাবন আসে তাহাতে নানা আকারে লৌকিক নরনারীর শৃঙ্গাররসাশ্রিত মধুরভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহা যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের রহস্যময় ভাগবতী কামলীলা এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই কাব্যপ্রধান শৃঙ্গার-রসসাধনার যুগ একমাত্র পূর্ববর্তী বলিষ্ঠ সমাজধর্মসাধনার যুগের অবসানেই সম্ভব ছিল, কালিদাসের কাব্যে যে অবসানের বেদনা ধ্বনিত হইয়াছে। 'গুপ্তযুগ' হইতেই আমাদের জাতীয় মহাজীবনসাধনায় ধর্মের অবক্ষয়ের সূচনা। এই মাধুর্যভাবরসধারা দাক্ষিণাত্যে আল্বার ভাবসাধকদের মধ্যেও কতকটা দেখা গিয়াছিল।

এই সময়েই জনপ্রিয় শৃঙ্গাররসাত্মক 'গীতগোবিন্দ' কাব্যও রচিত হইয়াছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস. বিদ্যাপতি ইঁহারা ছিলেন

*— 'য: কৌমারহর: সএবহিবর:' ইত্যাদি, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১ম ও ১৩শ পরিচ্ছেদ।

পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় কবি।

—'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥' *

শৃঙ্গাররসমূলক কাব্যনাটকাদি রচনার সখও মধ্যযুগে কোনও কোনও রাজার মধ্যে দৃষ্ট হয়। শূদ্রক, শ্রীহর্ষ ইহার প্রমাণ। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় ত ইতর যৌন আদিরসের বান ডাকিত। সুতরাং সেযুগের জনগণের কথা দূরে থাক, রাষ্ট্রীয় এবং অভিজাত স্তরের প্রধানগণের জীবনেও যে রাজধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্ম একটী অতীতের বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল তা' বিলক্ষণ বুঝা যায়। এই জাতীয়-আদর্শহারা জাতির জীবনে বাংলা দেশে যে উচ্চমার্গের ধর্ম্মান্দোলন আসিল—আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মান্দোলনের কথাই বলিতেছি—তাহাতেও ঐ শৃঙ্গাররসাশ্রিত কাব্যনাটকের ছড়াছড়ি। 'বিদগ্ধমাধব', 'উজ্জ্বলনীলমণি' ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। রাধাকৃষ্ণের জাগতিক প্রেমলীলামূলক কাহিনী পূর্ব্ব হইতেই ভারতের নানাস্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই কাহিনী এক বিচিত্র সমাজমনস্তত্ত্বের ক্রিয়াফলরূপে ধর্মীয় নেতাদের ভক্তিভাবান্দোলনে আধ্যাত্মিক প্রেমলীলার প্রতীকরূপে স্বীকৃত হইল। গত কয়েকশত বৎসরের ইতিহাসে এই রাধাকৃষ্ণলীলা যে ধর্ম্মের আবরণে স্থূল যৌনকামলীলার পরিবেশন করে নাই তাহা নহে। —'প্রাকৃত ও অপভ্রংশে যে উত্তপ্ত দেহকামনামুখর কবিতার বিশেষ জনপ্রিয়তা হইয়াছিল, জয়দেবের মধ্যে তাহারই স্পর্শ পাওয়া যায়।

*—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা—১০।৫১।

... সমকালীন লিপিলেখনে হরপার্ব্বতী, বিষ্ণুলক্ষ্মীর স্তবস্তুতিগুলিও মিথুনরসেই অভিসিঞ্চিত। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' সংগৃহীত শ্লোকের মধ্যে আদিরসাত্মক পংক্তিরই সমারোহ। ... 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী 'অসতী-ব্রজ্যা' অর্থাৎ অসতী রমণীর প্রেমের পর্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে।'* বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু মতও আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

—'এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে। ... রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। .. রাধাকে প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দেখিতে পাই। ... এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ, বাঙ্গলার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গলার যাত্রামহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।'†

রাধাতত্ত্ব বা ব্রজগোপীতত্ত্ব লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। আমরা অবশ্য এই তত্ত্বের মধ্যে কোনও কৃত্রিম মানুষী কল্পনার

---

*—'বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ডা: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৮৭।

†—বঙ্কিম রচনাবলী, কৃষ্ণচরিত্র' পৃ: ৪৫৪, ৪৬৯-৭০।

প্রাধান্য স্বীকার করি না। ধর্মীয় রহস্যবাদ (mysticism) তাহার নিজস্ব ঊর্দ্ধতর সত্যে নানা যুগপরিবেশে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে; কোনও সাধক, দার্শনিক, কবি তাহাকে রূপদান করেন মাত্র। এমনকি এই তত্ত্ব বেদ-উপনিষদে কিঞ্চিৎ আভাসিত হইয়াছে কিনা তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়, কারণ ইহা এক বিশেষপ্রকার মহাভাব-সত্য। রাধাতত্ত্বের পিছনে পূর্ব্ববর্ত্তী নানা সাধনার ধারাও সক্রিয় থাকিতে পারে।* কিন্তু আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে 'গুপ্ত' পরবর্ত্তী যুগ হইতে ভারতের রাষ্ট্রধর্ম ও তাহার সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে ভারতের সুসংহত, বীর্যবান্ সমাজধর্মের আদর্শ যখন ক্ষীয়মান তখনই জাতীয় সত্বা যৌনকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে এবং তাহা কৃষ্ণভক্তির মধ্য দিয়া এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমরসের স্রোতস্বতী সৃষ্টি করে। ধর্মের দিক্ দিয়া এই নূতন ভাবপ্রবাহের সার্থকতা অবশ্য ছিল ও আছে, কিন্তু ইহাও একটী নিষ্ঠুর বেদনাদায়ক সত্য যে বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারতযুগের মহাভাবময় সমাজধর্ম ও রাষ্ট্রধর্মের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়া এই স্রোত প্রবাহিত। ইহারই পূর্ব্বলক্ষণ আমরা পাইয়াছিলাম কালিদাসের যুগে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'কেবল আনন্দদানকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যরচনা সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসে প্রথম দেখা গেল। . অথচ বিক্রমাদিত্যের সময় শক-হূণরূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব

*—'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ', ডা: শশিভূষণ দাশগুপ্ত—দ্রষ্টব্য।

একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল ··· ··· রাজসভার শ্রোতারা দেবতাদের বিপৎপাতে উদাসীন। * এই জাতীয়-জীবনে সমাজ-রাষ্ট্রধর্মের অধোমুখী ধারা কালিদাস-পরবর্ত্তী ভবভূতি-প্রমুখ কবিদের কাব্যের মধ্য দিয়াও প্রবাহিত হইয়াছে। ভবভূতির করুণরসপ্রধান 'উত্তররাম-চরিত' এবং শৃঙ্গাররসপ্রধান 'মালতীমাধব' তাহার প্রমাণ। এ রকম ভারতবর্ষে পূর্ব্বে বেশী দেখা যায় নাই। ভারতবাসীদের মধ্যেও সত্যকার মানুষী ভালবাসা ('true love') তাহার আধ্যাত্মিক ও জাগতিক (ইন্দ্রিয়জ) সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই 'মালতী-মাধব'-এ। ভবভূতি অযথা বেদ-উপনিষদ্-সাংখ্য-যোগের কথাও তাঁহার নাটকে অবতারণা করিতে চাহেন নাই। ভারতীয় সমাজ-মনস্তত্ত্বে লৌকিক (secular) ভাবের অগ্রগতি এখানে সূচিত হয়। আরও কিছু পরে ভট্টনারায়ণের বীররসপ্রধান 'বেণীসংহার' নাটকে হাল্‌কা কথা (দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির ও ভীমের কথোপকথনে) ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধালু পাশ্চাত্য মনীষীর নিকটেও বিসদৃশ ঠেকিয়াছে। মহাভারতের গাম্ভীর্য-শক্তি সেখানে নাই। † বঙ্কিমচন্দ্রও রামায়ণের রামচন্দ্রের সহিত ভবভূতির রামচন্দ্রের পার্থক্য দেখাইয়া ভারতের জাতীয় জীবনে মনুষ্যত্ব-শৌর্যের আদর্শ ম্লান হওয়ারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ‡

---

*—প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৫৩৯।

†—A History of Indian Literature, Vol III, M. Winternitz pp: 263-64, 267 দ্রষ্টব্য।

‡—উত্তর চরিত, বঙ্কিম রচনাবলী পৃ: ১৬৩-৬৬।

মধ্যযুগের উচ্চস্তরের সমাজ ও সাহিত্য ছাড়া সাধারণ স্তরের সমাজ ও সাহিত্যের কিছু আলোচনাও আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে কতকটা আলোকপাত করিবে। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যদি আমরা বৌদ্ধ দোহা ও চর্য্যাগীতির যুগ বলিয়া ধরি তবে সেই সময় সমাজধর্ম ও প্রাচীন রাষ্ট্রধর্ম যে চরম বিপর্যস্ত তাহার সন্দেহ নাই। 'ব্রাহ্মণ্য'-ধর্ম তখন নানা প্রাণহীন শুষ্ক আচারে ও শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যে পর্য্যবসিত, চারিদিকে অর্থহীন অক্ষম বিধিনিষেধের বেড়াজাল দিয়া মরণোন্মুখ সমাজধর্মকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা, অপর দিকে বৌদ্ধধর্মেও মহাযান-পন্থার তান্ত্রিক রূপায়ণে ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানে চরম বিভ্রান্তি। অন্যান্য প্রাচীন ধর্মমতের সাধনা সম্বন্ধেও কতকটা সেই একই কথা। সমাজের উচ্চস্তরে অবশ্য মায়াবাদী বেদান্ত এবং তাহার প্রতি-ক্রিয়ায় নানা ভক্তিবাদী বেদান্ত ক্রমশঃ দেখা দিলেও ভাঙ্গিয়া-পড়া সমাজের বক্ষে প্রাচীন সমাজ-রাষ্ট্রধর্মের অনুকৃতি প্রাণহীণ বলিয়া অনুভূত হইতেছিল। বৌদ্ধ দোহা ও চর্য্যাগীতিগুলির মধ্যে আমরা স্বভাবতঃই এক নূতন শূন্যমার্গী ভাব সাধনার প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রাণস্পর্শ দেখিতে পাই। এগুলির মধ্যে প্রাচীন সমাজধর্মকে পাশ কাটাইয়া দেহ-সাধনায় এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আনন্দের সন্ধান আমরা পাই। প্রাচীন সমাজধর্মের গুরু-শুশ্রূষার প্রাধান্য স্বভাবতঃই এযুগে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন গুরুবাদে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য বিষয়ের দিক দিয়া যাহা বিশেষ লক্ষ্যণীয় তাহা এই যে এযুগের ধর্মসাধনার বিকাশে

প্রাচীন সংযম-সাধনার ধারা অব্যাহত থাকিয়া যায়। এযুগের এই সাধনা (বৌদ্ধ এবং নাথপন্থীদের ন্যায়) কিছুটা শূন্যবাদী ও কিছুটা তন্ত্রবাদী হইলেও নাড়ী-চক্রসাধনা ও মনোজয়ের মূল সাধনায় প্রাচীন যোগমার্গকেই ধরিয়া ছিল, যাহাকে ডাঃ সুরেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত সর্ব্বযুগের 'হিন্দু'-ভারতীয় সাধনার সাধারণ ভূমি বলিয়াছেন (পৃঃ ২৮৩)। এই যোগমার্গী সাধনার মূল কথা রিপু-দমন ও ইন্দ্রিয়-সংযম। বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ডাঃ সুকুমার সেন বলেন— 'সমস্ত চর্য্যাগীতির মধ্যে একটি বাহ্য লক্ষণ প্রধান ভাবে বিদ্যমান। এটী হইতেছে রূপক উপচারের সাহায্যে অধ্যাত্ম অনুভূতির বর্ণনা ও অধ্যাত্ম সাধনার পথনির্দ্দেশ। এই জন্যই গানগুলির নাম হইয়াছিল চর্য্যাগীতি। ...... চর্য্যাকবি-সাধকদের এই যে অদ্বয়দৃষ্টি, ইহা গীতোক্ত যোগদৃষ্টি, যে যোগ হইতেছে সমতা (সমত্বং যোগ উচ্যতে)। এই যোগী ভবসংসারকে মানিয়া লয়, কিন্তু তাহাতে বদ্ধ হয় না। ..... হঠযোগের প্রক্রিয়া, বিশেষ করিয়া শ্বাসের ক্রিয়া—প্রাণায়াম চর্য্যাগীতি-নির্দ্দিষ্ট সাধনার একটা বড় অঙ্গ ছিল। ...... সরহ দোহায় লিখিয়াছেন— চিত্ত-নিরোধের দ্বারা অনিমেষ-লোচন হইয়া শ্রীগুরুর বোধে পবন নিরুদ্ধ হয়। সেই পবন যদি নিশ্চলভাবে বহে তবে কি যোগী কালগত হয়? ... চর্যাগীতিতে সরহ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ... জন্ম যেমন মরণও তেমনি। ... সকলই নিরন্তর বুদ্ধ ... ইহাই পরম প্রাপ্তি।'*

*—'চর্য্যাগীতি-কবিদের ধর্ম্মমত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ('ভারত-সংস্কৃতি' গ্রন্থ, অমিয়কুমার মজুমদার সম্পাদিত)।

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও বলিয়াছেন—'দেহকে যন্ত্ররূপে অবলম্বন করিয়া সহজানন্দরূপ পরমসত্যকে দেহের মধ্যেই অনুভব করিতে হয়, এই সত্যকেই সাধনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ—তথা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ দেহের মধ্যে কতকগুলি চক্র বা পদ্মের কল্পনা করিয়াছেন ··· এই সহজানন্দের সাধনা ··· বা এই অদ্বয়-বোধিচিত্তের সাধনার কথা ছড়াইয়া আছে বহু চর্য্যাপদের মধ্যে। প্রথম পদেই বলা হইয়াছে চঞ্চলচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করিতে হইবে মহাসুখের মধ্যে তাহাকে বিলীন করিয়া'।* পরবর্ত্তীকালে বাউল-সহজিয়াগণের ভাবসাধনা বা রসসাধনার মধ্যেও এই জাতীয় কঠিন, কঠোর প্রাণ-সংযমনের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল বা বাউলগান' গ্রন্থে।

প্রসঙ্গক্রমে, চর্যাগীতির মধ্যে যে যৌনসাধনার ইঙ্গিত কোথাও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় সেখানে নিম্নজাতীয়া ডোম্বী, মতঙ্গী, শবরী ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন 'অস্পর্শ' বলিয়াই এই অস্পৃশ্যদের কথা সাধনার রূপক হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। প্রশ্নটী তান্ত্রিক নারী-সাধনার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে মধ্য-যুগীয় কোনও কোনও 'গ্রন্থে'-যে নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদের বিভিন্ন তীর্থস্থানের সহিত তুলনা করা হইয়াছে ইহা লক্ষণীয়। জিনিষটি বিসদৃশ কিন্তু তন্ত্রসাধনার ছায়া ইহাতে সুস্পষ্ট। সেযুগের সমাজ-

*—'বৌদ্ধধর্ম্ম ও চর্যাগীতি' পৃ: ৯৮-৯৯।

ধর্ম-অস্বীকারী এই-সব সাধনায় এক বিকৃত সাম্যবোধের প্রচেষ্টা ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে কিনা বলা যায় না। তবে মাত্র ইহাই বলা যায় যে 'সহজিয়া' ইত্যাদি সাধনায় নিম্নতর সমাজস্তরে যে ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ৩০৪-৬), এ ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

আরও পরবর্ত্তী কালের অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যে আর এক-প্রকার উচ্চতর 'মানবতাবাদী' ধর্মান্দোলন সমাজে দেখা দেয় তাহার মধ্যে ইস্‌লামের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের মহৎ প্রচেষ্টা ছিল একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ১০৫)। এই ধর্মও স্বভাবতঃই 'হিন্দু'-সমাজধর্ম্মের বাহ্যিক আচার-নিয়ম-বিধিব্যবস্থাকে অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিই ইহা পোষণ করিত। ইহার মধ্যে ভারতীয় সমাজধর্ম্মের প্রতি বিরোধিতাই প্রধান কথা ছিল না, ঈশ্বরভক্তি-মূলক মনুষ্যত্বের সাধনাই ছিল বড় কথা। কিন্তু এই একেশ্বর-বাদী ভক্তিসাধনা ছিল ভারতীয় ধর্মেরই এক নূতন সংস্করণ। এজন্য ভারতের শাশ্বত সংযম-সাধনার ধারা এখানে অব্যাহত ছিল। আমরা গুরু নানকের ধর্মে একের উপাসনা ও 'ওঁ'-কার সৎ-নামের উপাসনার সহিত সৎ-আচার বা চরিত্রসাধনার গুরুত্বের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ১৯৫)। কবীর-প্রমুখ এই যুগের ভক্তিবাদী 'সন্ত' সাধকদের সম্বন্ধেও একটি মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ও প্রচার করা হইয়া থাকে যে ইহারা ভারতীয় সাধনার ধারাকে অস্বীকার করিয়া এক নূতন

ঈশ্বর প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নূতন ধর্ম্ম-মতবাদ প্রচারের পিছনে ভারতীয় সমাজধর্ম্ম-বিরোধিতাই বড় প্রশ্ন ছিল না। ভগবান্ বুদ্ধের ধর্ম্মমতবাদ সম্বন্ধেও অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী লিখিয়াছেন—'It has been very generally held that Buddhism rose as a revolt against the caste system of Brahmanism. To hold this view is to completely misunderstand the very mission of Buddhism. Although the Buddha was fond of attacking the mere Brahmanhood of birth and insisting on the Brah anhood of virtue, yet the idea of being a social reformer never entered his mind or into his schemes.' 'অর্থাৎ ইহা অনেক সময় মনে করা হইয়াছে যে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণবিভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব হইতে উদ্ভূত হয়। এইরূপ ধারণার অর্থ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যকেই সম্পূর্ণ ভুল বুঝা। যদিও বুদ্ধ কেবল-মাত্র জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের উপর আক্রমণ চালাইতেন এবং ধর্ম্ম-সাধনাগত ব্রাহ্মণ্যের উপর জোর দিতেন, তথাপি সমাজ-সংস্কারক হওয়ার ইচ্ছা তাঁহার মনে বা তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতিতে কখনও স্থান পায় নাই।'* বৌদ্ধধর্মে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যসাধনার মূল সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। (পৃঃ ২৮৪)। কবীর-

* Ancient Indian Education, p: 391

প্রমুখ 'সন্ত' গুরুদের সম্বন্ধেও ইহা কতকটা প্রযোজ্য। ভারতের রাষ্ট্রধর্ম্মের বিপর্যয়ে এবং সমাজধর্মের অধঃপতনে এইরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ধর্ম্মসাধনার আরও বেশী প্রয়োজন তখন হইয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত নানাভাবে তাহার প্রযোজন স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ প্রাচীন সমাজধর্ম্মকে উৎখাত করা অথবা শাশ্বত সাধনার ধারাকে অস্বীকার করা নহে। ইহাদের সাধনা-সম্বন্ধে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের আলোচনায় নানাসূত্রে প্রাচীন চিত্তবৃত্তি-সংযমের কঠোরতার কথাই আসিয়া গিয়াছে। † বস্তুতঃ মধ্যযুগেব এই তথাকথিত 'মানবতাবাদী' ও 'ভাববাদী' সাধকগণ মূলে রিপু-ইন্দ্রিয়সংযমেব সনাতন যোগ-সাধনার উপরও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের আলোচনা এ বিষয়েও কিছু আলোকপাত করিতে পারে। ††

প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা প্রয়োজন যে ভারতে সত্যকার মানবতাবাদী মহাসমন্বয় ও মহামিলন ঘটাইতে গেলে ভারতের প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সমাজ-সংস্কৃতি-সাধনাকে বাদ দিয়া তাহা সম্ভব নয়। অবশ্য ইহার জন্য এই প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতি-সাধনাকে এ যুগের ভাবে অনেকখানিই সংস্কৃত-সংগঠিত হইতে হইবে।

ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে মহাত্মা কবীরের গুরু রামানন্দ

---

† 'ভারতের সংস্কৃতি', পৃ: ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৭১।

†† 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', পৃ: ৯৮-৯৯, ৫১৮।

স্বয়ং বৈদিক ঐতিহ্য এবং প্রাচীন বর্ণাশ্রমের মহিমাকে একেবারে অস্বীকার করেন নাই, তিনি ইহাকে যুগোপযোগীভাবে অনেকখানি উদার করিয়াছিলেন মাত্র। ভাবীযুগের সংস্কার-সংগঠনে এই উদারতা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্ত্তীকালে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মেও বর্ণাশ্রমসাধনা অস্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু প্রাচীন সমাজধর্ম্মের মহিমা একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই, তাহা উদার-ভাবাপন্ন হইয়াছিল মাত্র। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও স্থানে স্থানে প্রাচীন সমাজধর্মের স্মৃতির প্রতি সামাজিক আনুগত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। * গুরু রামানন্দের মত মহাত্মা কবীরও রামচন্দ্রকেই অদ্বিতীয় পরমাত্মারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার এই যুগে রামায়ণ-মহাভারতের চিরন্তন মহাজীবনের ঐতিহ্য যে জনমানসে কতখানি সক্রিয় ছিল তাহার নিদর্শনেরও অভাব হয় না। ইহার অব্যবহিত পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাত্মা তুলসীদাস এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে উত্তরভারতের কোটী-কোটী 'হিন্দু' জনসাধারণের মধ্যে রামচন্দ্রের উপাসনার যে ঢেউ তুলিলেন তাহা ভক্তিরসাশ্রিত হইলেও প্রাচীন ভারতের সমাজধর্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম্মের সুমহান্ আদর্শের প্রতি গভীর আনুগত্য ইহা নিঃসন্দেহ। মহাত্মা তুলসীদাস সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি এইরূপ— 'তুলসীদাস হ'চ্ছেন ভারতের সবচেয়ে বড় জনপ্রিয় কবি।...... প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা আর আদর্শকে তুলসী মধ্যযুগের ভক্তিরসে সিক্ত

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৪।৮৩ ; ১৩।৩৮ ; অন্ত্যলীলা ৬।২৬।

ক'রে আমাদের দিয়েছেন।' প্রাচীন ভারতের সমাজ-ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারাকে সে-যুগের ধর্ম-বিশৃঙ্খলার নামে অস্বীকার করিবার এমন কি লোপ করিবার যে প্রবণতা দেখা দিয়াছিল তাহাকে কেমনভাবে তুলসীদাস প্রতিহত করিয়াছিলেন সে-কথাও শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।*

বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অনুধাবন-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—'……আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের যে আদর্শ ছিল তাহা ক্ষণভঙ্গুর নহে……ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আদর্শের মধ্যেও একটা চিরন্তন এবং একটা সাময়িক অংশ আছে।…… ভারত-বর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।' পুনশ্চ—'অতীতকে লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই ·…কেহ কেহ এ সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলে মুসলমানের সঙ্গে আমার যোগ অস্বীকার করা হয়, তাহাতে ঔদার্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সেই বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এই জন্যই সে পরামর্শে সত্যফল পাওয়া যায় না। কারণ

*—'ভারত-সংস্কৃতি', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ১৩৫-৪২

আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায় ...... আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিন্তা দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ... "যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না, নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় একথা কখনোই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।' মানবতাবাদী বিশ্বধর্মকে সমর্থন করা সত্ত্বেও তাঁহার কথা—'কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না .....তাহার তো বিশেষ নামরূপ আছে।' এই 'বিশেষ নামরূপ' কোনও মতবাদী (dogmatic) ধর্ম নহে, ইহা ভারতের প্রাচীন মনুষ্যত্ব-গঠনের সাধনা। 'হিন্দু' বলিতে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতিকেই বুঝিয়াছেন এবং সে জাতির মধ্যে মনুষ্যত্ব-সাধনার ভিত্তিতে সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ই মিলিত ভাবে থাকিতে পারে, এ-কথাও তিনি বলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজধর্মের পরবর্ত্তী গোঁড়ামিকে অস্বীকার করিলেও তাহার মূল মানবধর্মী সমাজ-সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।*

*—রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ: ১৩৪-৩৫, ১৬৬-৭৯, ১৭২ দ্রষ্টব্য।

ইহার পর আমরা বাংলা দেশে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে আসিয়া সার্দ্ধসহস্রাধিক বৎসরের সমাজধর্মচ্যুত ও রাষ্ট্রধর্মহীন জাতির জীবনে আরও নানা উদ্দাম বিভ্রান্তি ও নির্লজ্জ যৌনমানসিকতার লক্ষণ দেখিতে পাই। এই রুচিবিকার সম্বন্ধে ভারতীয়-সংস্কৃতিদরদী বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু মত উদ্ধৃত করিতেছি।

—'অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি (বৈষ্ণবপদাবলীরচনা-যুগের) প্রাণপ্রবাহে ভাঁটা পড়িতে লাগিল ও রুচিবিকারচিহ্ন প্রকট হইয়া উঠিল। ······কাব্যে ভক্তির ক্ষীণ আবরণের মধ্যে কামকলাবিলাস প্রধান হইয়া দেখা দিল। বৈষ্ণব ভক্তিবাদ স্রোতহীন হইয়া কতকগুলি কুৎসিত সমাজবিরোধী আচরণের বদ্ধ পঙ্কিল জলাশয়ে পর্যবসিত হইল। শাক্তধর্মে মাতৃপূজার নূতন আবেগ স্ফুরিত হইলেও ইহা ইন্দ্রিয়াসক্ত সমাজের মানস প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বেশীদিন জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না। যে রামপ্রসাদ এই মাতৃমন্ত্রের প্রধান উদগাতা তিনিই আবার বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ আখ্যানধারার অন্যতম বাহক। ······তা ছাড়া, বাংলা কাব্যে ও জীবনে এই প্রথম নাগরিকতার কৃত্রিম দুষ্ট রুচির প্রকাশ ঘটিল। কৃষ্ণনগর রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র .... চটুল হাব-ভাব-ভঙ্গীতে, বঙ্কিম কটাক্ষে, প্রবৃত্তি-উদ্রেককারী ইঙ্গিত-সঙ্কেতের সুষ্ঠু সমাবেশে এই বিলাস-কলাচাতুর্যকে সারস্বত মন্দিরবেদীতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ...... রাজসভার সম্ভ্রান্ত পরিবেশে প্রতিভাবান্ কবির কণ্ঠে, যে

চিত্তবিভ্রমকারী মোহময় সুর ধ্বনিত হইতেছিল তাহারই নানা বিকৃত রূপ ... শালীনতাহীন অনুকরণ হাটে-মাঠে, দেশব্যাপী গ্রাম্য আসরে প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল'।*

ইহার পর আমরা আধুনিক যুগের দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ—'ইংরাজী আমলের প্রারম্ভিক প্রান্তসীমায় পৌঁছিলাম। ইহার প্রথম ফল হইয়াছিল রুচিবিভ্রান্তিকে আরও ঘনীভূত করা। ... যখন আমরা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত কামরসায়ন সেবনে নেশাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, তখন তাহার উপর উগ্র বিলাতী মদিরা পান যে আমাদের ভারসাম্য ও সঙ্গতিবোধকে আরও বিচলিত করিবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দাম ভোগলালসা প্রাচীন সমাজে রূপকের আশ্রয়ে ও ধর্ম-সাধনার ছদ্মবেশে নিজ কুণ্ঠিত প্রকাশের উপায় খুঁজিতেছিল, তাহা ইংরেজী শিক্ষার উত্তেজনায়, তথাকথিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাম্ভিকতায় আরও নগ্ন, বেপরোয়াভাবে আত্মপ্রকাশ করিল।' ইহার পর সহসা বিদেশী-বাণিজ্যের সংযোগসূত্রে 'দেশী মুৎসুদ্দি ও বেনিয়া-দালাল' সৃষ্ট হইল এবং তারপর ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে 'দ্বিতীয় ফল দাঁড়াইল 'বাবু'-সম্প্রদায়। কলিকাতার অনেক অভিজাত পরিবারে প্রথম পুরুষের বাণিজ্যসহায়ক দালাল দ্বিতীয় পুরুষে সংস্কৃতিধ্বংসী আলালের ঘরের দুলালে পরিণত হইল। এই বেনিয়া-বাবুর প্রাসাদের বৈঠকখানায় কবিগান, তর্জা-খেউর, আখড়াই—হাফ্-আখড়াই, বিদ্যাসুন্দর-জাতীয় যাত্রা-গান, পোষা বিড়ালের বিবাহ ও

*—'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৪৬৮-৬৯।

বুলবুলির লড়াই, সুরা-সঙ্গীতের স্রোত, নর্ত্তকীর নুপুর-নিক্কণ ও মদমত্তকণ্ঠোত্থিত চীৎকার-কোলাহলের স্থায়ী আসর প্রতিষ্ঠিত হইল।*

এই স্তরে আসিয়া আমরা এক নূতন কৃত্রিম ও বিকৃত সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভব করিলাম।

আরও পরবর্ত্তী ইংরাজ-আমলে আসিয়া আমরা যে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় পাই তাহা উক্ত-বিদগ্ধ সমালোচকের মতে এইরূপ—'অবশ্য এই যুগেই সুরুচির নূতন আদর্শ রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নীতিবোধপূর্ণ রচনা ও জনকল্যাণমূলক সমাজচেতনার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই রুচিবোধ দৃঢ়তর হইল ও রবীন্দ্রনাথ আসিয়া ইহা এক আদর্শলোকের শ্রী ও সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিল।†

পাঠক লক্ষ্য করিবেন ভারতের প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতির শাশ্বত সাধনা-ধারা এতখানি চরম অধঃপতনের যুগের প্রান্তে আসিয়াও আবার উষর-ভূমিতে নূতন তৃণের মত মাথা তুলিতেছে। কিন্তু ইহা ঠিক্ সেই প্রাচীন সমাজধর্ম নহে, তাহার এক নূতন রূপ। পাশ্চাত্যের জীবন্ত সমাজ-রাষ্ট্রবাদী সভ্যতার ধাক্কা খাইয়া মৃতকল্প ভারত-সমাজ এক নূতন গতিপথ ও গতিবেগ লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে সে তাহার প্রাচীন মানবীয় আদর্শকে রূপায়িত

*—'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ৪৬৯-৭০।
†—ঐ পৃ: ৪৭১।

করিতে চাহিতেছে। এই অবস্থার কথা আমরা অন্য দৃষ্টিকোণ হইতেও ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ৩১২-২৩)।

তারপর আমরা আধুনিকতর বাংলা সাহিত্যের যুগে উপস্থিত। ইউরোপীয় সাহিত্যের নকলে এই সাহিত্য প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবী (intellectual) ও অভিজাত (aristocratic) সম্প্রদায়ের সাহিত্য। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-সমাজই এই সাহিত্যের ধারক-বাহক। এক অধিকতর কৃত্রিম নূতন জীবনধারা এই মধ্যবিত্ত সমাজের বক্ষে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল।

এখন হইতে সাহিত্যের সহিত শাশ্বত সমাজ-জীবনের সম্পর্ক বাহ্যতঃ ছিন্ন হইল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এযুগে পাশ্চাত্যের সাহিত্য-ধারাকে স্বীকার করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন ভারতীয় আদর্শবাদ এখন ইউরোপীয় মননশীলতার নীচে চাপা পড়িয়া গেল। শরৎচন্দ্র এই সাহিত্যের স্রোত আরও খরবেগ-সম্পন্ন করিলেন তাঁহার 'দরদী' সাহিত্যের মধ্য দিয়া। পশ্চিমের প্রভাবে শিক্ষিত সমাজ সহসা আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিযা এক নূতন সঙ্কীর্ণতা-মুক্ত জীবনের সন্ধান করিতে লাগিল। সমাজ ও সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপজীব্য নরনারীর প্রেমসম্পর্ক এক নূতন 'মুক্ত' দৃষ্টিতে দেখা হইতে লাগিল। 'চোখের বালি' হইতে 'চরিত্রহীন' পর্যন্ত শিক্ষিত সমাজের বক্ষে এক নূতন কাম (প্রেম)-ভাবনার আগুন জ্বলিল। বিধবা, নির্য্যাতিতা, পরিত্যক্তা, ইত্যাদির যৌন-জীবনের তথা প্রেমতৃষ্ণার কাহিনী সহানুভূতির সহিত উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল। নারীর সংযম-শালীনতার পরিবর্ত্তে স্বাধীন ব্যক্তিত্বই

প্রশংসিত হইল। আধুনিক কবি-সাহিত্যিকেরা দ্রুত ধাপে ধাপে আগাইয়া যাইতে লাগিলেন। কাম-সংযমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল, নিছক রিরংসা-বৃত্তির নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সংযম-ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে বিদ্রূপও করা হইতে লাগিল। পতিতা নারীদের মধ্যে মহত্ত্বের সন্ধান চলিতে লাগিল। উদ্দাম দেহবৃত্তির উচ্ছ্বসিত স্তব গাওয়া হইতে লাগিল।

অতি-আধুনিকের দল আরও আগাইয়া চলিলেন। ফ্রয়েডের কামতত্ত্বই হইল সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন। এই চরম বিলাতী-বিপ্লবের যুগে রবীন্দ্রনাথকেও অতি আধুনিক সাহিত্যকে কঠোর সমালোচনা করিতে হইল। কিন্তু স্রোত তাহাতে থামিল না। ইহার সহিত আসিয়া যুক্ত হইল পাশ্চাত্য কমিউনিজ্‌ম। নিপীড়িত বুভুক্ষুর হাহাকারের মধ্যেও সাহিত্য এক বিদ্রোহ-ভাবুকতার উপাদান খুঁজিয়া পাইল। অপর দিকে নৈরাশ্য ও আত্মগ্লানি নানাভাবে মানব-সভ্যতার ব্যর্থতার স্বরে সুর মিলাইল। ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের সহিত একাত্ম হইয়া ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্য এক কৃত্রিম বিশ্বজনীনতার স্রোতে ভাসিতে লাগিল। ইহাই প্রধানতঃ বর্ত্তমান ভারত ও বর্ত্তমান বাংলা এবং বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য।

এই সাহিত্য যে কৃত্রিম জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ এবিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সাহিত্য হিসাবে ইহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এই সাহিত্যের ভ্রান্তি অবশ্যই আধুনিক সমাজ-জীবনের ভ্রান্তির মধ্যে লুকায়িত আছে। এই ভ্রান্তিটি হইতেছে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত জাতির 'পরধর্মে' দীক্ষিত জীবন।

ভারতের সমাজ ও সাহিত্য সহস্রাধিক বৎসরে নিজ সমাজ-ধর্ম ও রাষ্ট্র-ধর্ম হারাইয়া যে জড়তায় অধঃপতিত হইয়াছিল তাহার শেষ প্রান্তে আসিয়া নূতনযুগের ভাবধারাকে নিজস্ব আদর্শে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তাহার মধ্যে ছিল না। হয়ত তাহার সময়ও আসে নাই। সুতরাং কৃত্রিম প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হইলেও নব-জীবনের এক সম্ভাবনা তাহার মধ্যে দেখা দিল। এই দৃষ্টিতে দেখিলে এ-যুগের সমাজ-সাহিত্যকে শাশ্বত ভারতের ভাবী-মহাজাগরণের প্রস্তুতি বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্বেও ভ্রান্তি ভ্রান্তিই, এবং সাময়িক পরিবর্ত্তন-যুগের প্রয়োজনকে চিরস্থায়ী করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা হইতে বুদ্ধিকে মুক্ত রাখিবার জন্য ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া জানা প্রয়োজন। এই ভ্রান্তি ইতিপূর্ব্বেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে। যথা—'আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্যয়ের ফলে, ইউরোপের চেতনার-ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় যে সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই —এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোস-খেয়ালের কথা, জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই দেখি আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে।* স্বয়ং

*—'আধুনিকতম সাহিত্য', শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত; শ্রীসুকুমার সেন লিখিত—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃ: ২৫৩।

রবীন্দ্রনাথও সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—'আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। ...... আজকের হাটে যা-নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায় কালই তা আবর্জনা-কুণ্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা ··· সেটাকে কাল্‌চারের লক্ষণ বলে মানি। ··· সকল দেশের সাহিত্যেই জীবন-ধর্ম আছে, এই জন্যে মাঝে মাঝে সে-সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূর্চ্ছা আক্ষেপ দেখা যায়। কিন্তু দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার ক'রে নিই। মনে করি তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান্ ও স্থায়ী যেহেতু এটা আধুনিক'।* এই অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আর একটী প্রামাণ্য সমালোচনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। —'এখন সাহিত্য জীবনে কোনও নূতন আদর্শের সন্ধান দেয় না, বাস্তবজীবনের বিভ্রান্তি, নৈরাশ্যবোধ এবং করুণ অসহায়ত্ব প্রতিফলিত করে মাত্র। ··· এই যুগে যে কয়টী নূতন ভাবাদর্শ আমাদের মনকে ঈষৎ আবেগাতুর করিয়া তুলিতেছে—যথা বিশ্বমানবতাবাদ, শান্তির জন্য আকুতি, বিড়ম্বনাময় জীবনের জন্য ক্ষুব্ধ অনুযোগ ও সুন্দরতর জীবনের জন্য একপ্রকার ধোঁয়া ধোঁয়া স্বপ্নাকুলতা—তাহারা কল্পনা-বিহার হইতে মর্ত্যজীবনের সুনির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে অবতরণ করে

---

*—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', শ্রীসুকুমার সেন, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ২৫৫।

নাই ......'। পুনশ্চ—'সাহিত্যে শব্দঘটিত অশ্লীলতা নাই সত্য * কিন্তু নারীরূপের মোহ ও যৌনচেতনা প্রায় সর্ব্বত্রসঞ্চারী। ইহার উপর একটা বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসার আবরণ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ ও আবেগহীন দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা নারীপুরুষের স্বৈরাচারী প্রবৃত্তিচরিতার্থতা ও দাম্পত্যবন্ধনচ্ছেদী প্রেমবিলাসের যুক্তি ও হৃদয় দিয়া সমর্থনই বেশী প্রকট হইয়াছে।' †

সুতরাং এই পর্য্যন্ত আসিয়া আমরা কি দেখিলাম? আমরা উদ্‌ভ্রান্ত অসহায়ভাবে জীবন-কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যৌনকেন্দ্রিক আবর্ত্তে ঘুরিয়া মরিতেছি এবং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনে আমাদিগকে কাম-মানসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া ছাড়িয়াছে। আসলে ইহা সেই একই জীবন-ধ্বংসী কাম-বন্যার উত্তাল জলস্রোত যাহা আমাদের ক্ষীয়মাণ সমাজধর্ম ও রাষ্ট্রধর্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর হইতে অজস্র ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া পঙ্কিল আবেগে জাতীয় জীবনের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

অবশ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগে আমরা পাশ্চাত্য-অনুসারী কাম-সাহিত্য ছাড়া সুস্থ নীতিবাদী সাহিত্যেরও পরিচয় পাই নাই তাহা নহে। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে যে নীতিবাদী বিচারশীলতার সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে

*—অধুনা বিলাতী সাহিত্যের অনুকরণে ইহাও কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে।
—গ্রন্থকার।

†—'বাঙালীর রুচি', প্রবন্ধ, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাহাও একেবারে সহসা ঘটে নাই। জাতীয় জীবনের তলায় তলায় সহস্রাধিক বৎসরের অধোগতির মধ্যেও যে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির জীবন-ধারা ফল্গুস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত ছিল ইহা তাহারই প্রমাণ। পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা-সংস্কৃতি এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিখ্যাত হওয়ার মূলে যে 'নোবেল'-পুরস্কার প্রাপ্তি তাহাও ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কৃতির চিহ্নধারী 'গীতাঞ্জলি'-গ্রন্থের জন্য। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিকে তাঁহার অজস্র সুচিন্তিত প্রবন্ধের তো কথাই নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী ও এক-হিসাবে তাঁহার অনুগামী শরৎচন্দ্র ধর্ম্মসংস্কৃতির সমর্থক না হইলেও 'হিন্দু' সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধালু ছিলেন এবং তাহার বিনাশ কামনা করেন নাই ইহা সমালোচকগণের সর্ব্বসম্মত অভিমত।

ইহার পর যে কামায়ন-সাহিত্যের দ্রুত অগ্রগতি তাহাতে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির আনুগত্য অবশ্যই অস্বীকৃত। কিন্তু এই অস্বীকারের স্বরূপ নির্ণয় করিলে আমরা ইহাকে বিদ্রোহ না বলিয়া সাময়িক আত্মদ্রোহ-রূপেই চিহ্নিত করিব। মনে রাখিতে হইবে কোনও জীবন্ত আদর্শের প্রেরণা হারাইয়া গেলে তাহার কাঠামো ধরিয়া বেশীদিন চলা যায় না, প্রাণের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হয়। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিমূলক সাহিত্যে এই কাঠামো ধরিয়া চলা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত কোনও রকমে সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ঐ 'নিষ্প্রাণ' সমাজ-সংস্কৃতির আনুগত্যের অভিনয়

দুঃসহ বোধ হইল। নিজের ঘরে যখন একেবারেই আনন্দ থাকে না তখন পরের ঘরে আনন্দ-উত্তেজনায় মাতিয়া উঠা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। স্বধর্মে যখন একেবারে আস্থা থাকে না তখন মানুষ 'ভয়াবহ' পরধর্ম্মেই দীক্ষা গ্রহণ করে। সেই আত্মদ্রোহই অতি-আধুনিক ভারতীয় বা বাঙ্গালী সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের স্বরূপ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতায় পরধর্ম্মী 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় যে আত্ম-অবমাননা ও আত্মদ্রোহের উৎকট রূপ প্রকাশ করিয়াছিল, আজ তাহারই দ্বিতীয় ও চরম ধাপ। আজ তাহা দেশব্যাপী এবং বিশ্ব-আলোড়নের অঙ্গীভূত। সুতরাং একটা সম্পূর্ণ নূতন জীবনের অন্ধ আশা ও আকাঙ্খা এই আত্মদ্রোহের মধ্যে বিদেশের সহিত সুর মিলাইয়া নকল জীবনের অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। ইহাই আজিকার সমাজ ও সংস্কৃতি। কিন্তু এই বিদেশী নকলের মধ্যে ভুল কোথায় তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃতি-সহযোগে দেখাইয়াছি। বিলাতী কবি ইলিয়টের অনুসরণ-প্রবণতা সম্বন্ধে শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'বহু আধুনিক বাংলা কবি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহারই অবলম্বিত কাব্য-রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। ... কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে যাহা আন্তরিক অনুভূতি তাঁহার বাঙালী অনুসরণকারী কবিদের ক্ষেত্রে তাহা প্রায়ই একটা pose বা কৃত্রিম মনোভঙ্গী।* জনৈক আধুনিক বাঙ্গালী কবি ইলিয়টী কায়দায় উপনিষদের

---

*—'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', পৃ: ২৬৪।

টুক্‌রা-টাক্‌রা জোড়াইয়া যে বুদ্ধিবাদী কবিতা রচনা করিতেছেন অথবা আর একজন পূর্ব্ববর্ত্তী কেমন করিয়া ম্যালার্মের সজ্ঞান-ব্যর্থ অনুকরণে ব্যস্ত ছিলেন, সেদিকে শ্রীসুকুমার সেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* অপর একজন স্পষ্টতঃই ঘোষণা করিয়াছেন 'আমি ভারতীয় অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের প্রসাদ-বঞ্চিত'।† অপর দিকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে যৌন-কামনার বর্ণনা ক্রমশঃ ফ্রয়েডী কায়দায় যৌন-বিকৃতির বর্ণনা পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। আবার কোনও কোনও সাহিত্যিক ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির উপাদান লইয়া তাহার মধ্যে সুকৌশলে কামরসের সঞ্চার করিতেছেন। কিন্তু এ সবেরই মধ্যে একটা বৈসাদৃশ্য ধরা পড়ে। এই যে সর্ব্বব্যাপী কামায়ন ইহা কি কোনও নূতন জীবন-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত? নিশ্চয়ই না। অথচ পাশ্চাত্যের দিকে তাকাইয়া দেখুন। তাহাদের শত বৈকারিক সাহিত্যের নৈরাশ্যবাদের পশ্চাতে একটা গভীর-বলিষ্ঠ জীবন-দর্শনেরও সাক্ষাৎ পাইতেছি। আমরা 'Existentialism'-এর কথা বলিতেছি যাহা লইয়া বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক সার্ত্রে (Sartre) এক মনীষা-সম্পন্ন দার্শনিক-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।‡ এই জীবন-দর্শন Eliot কেও প্রভাবিত করিয়াছে। অপর দিকে Eliot এবং আরও কাহারও কাহারও লেখায় যৌন-জীবন অতিক্রম করিবার একটা ইচ্ছার আভাস-ইঙ্গিতও শোনা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে সে অন্তরের গভীরতা কোথায়? পশ্চিমের

---

*—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৩-৭৪।

†—ঐ, পৃ: ৩৩৫।

‡—'L' Etre et Le Ne'ant', Jean-Paul Sartre.

দেখাদেখি যে সাম্যবাদী (কমিউনিষ্ট) সাহিত্যের স্রোত বহিতেছে তাহাতেই বা আত্মস্থ সত্যদৃষ্টি কোথায়? দরিদ্রের দুঃখ লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টি হয়না আমরা এমন কথা বলিতেছি না। পূর্ব্বেও হইয়াছে এখনও হইতে পারে। কিন্তু বিদেশের বিদ্রোহ নকল করিলে আত্মদ্রোহ হইয়া দাঁড়ায় কিনা তাহাই ভাবিবার কথা। আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতিক্ষেত্রেও সেই ভ্রান্তি। সাহিত্য সেখানে নূতন পথ না দেখাইয়া বিভ্রান্তি বাড়াইতেছে ইহাই একটা বড় ট্র্যাজিডি। সার্দ্ধ-সহস্রাধিক বৎসরের 'মৃত' সমাজ-রাষ্ট্রের ইহা স্বাভাবিক পরিণতি।

সে যাহা হউক, এই অনাত্মস্থ কামায়ন-সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট উদ্গাতা আজ সাধু-মহাপুরুষদের পুণ্যজীবন লইয়া অপূর্ব্ব উপন্যাস লিখিতেছেন ইহাও এই আত্মদ্রোহী সাহিত্যিকদের মনের গভীরে স্ববিরোধের একটা লক্ষণ। অপরদিকে যৌন-কামকে লইয়া নৈরাশ্যবাদী সিনিক্যাল্ কবিতার প্রাচুর্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কামান্দোলনের গভীর ভুলেরই পরিচয় দেয়,—কি এদেশে কি বিদেশে। অতি-আধুনিক অপর একজন সাহিত্যিক উগ্র যৌন-স্বাধীনতা (promiscuity) সমর্থন করার সূত্রে অনাসক্ত-কর্ম্মময় যৌবনধর্ম্মী জীবনের যে জয়গান গাহিয়াছেন তাহাতে—'দেহ-মনের স্তর ভেদ ক'রে আত্মা থেকে যৌবনরস উৎসারিত করতে হবে' বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোন্ পথে সত্য-সত্যই সম্ভব হইবে তাহার ধীর-স্থির-গভীর চিন্তার লক্ষণ তাঁহার মধ্যে নাই। তথাপি এদেশের প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মধ্যে তাঁহার মুখে কিছু ভাল কথাও বাহির হইয়াছে।

সুতরাং আমরা যে কথা বলিতেছিলাম, এই অতি-আধুনিক সাহিত্য 'মৃত' জাতীয়-জীবনে একটা কৃত্রিম জীবনস্পন্দন সার্থকভাবেই সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু ইহা কোনও জীবনবাদী বিপ্লব নয়, ইহা মরণবাদী আত্মদ্রোহ। তবে ভাবী-জীবনের ফসল ফলাইতে এই 'মাটী-কাটা'র সার্থকতা অবশ্যই আছে।

প্রচলিত যৌন-মানসিকতা হইতে মুক্ত শক্তিশালী অতি-আধুনিক কালের 'দরদী' লেখক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনায়নের স্পষ্ট সমর্থক তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে। —'মানুষের জীবনসত্য মৃত্যুকে স্বীকার করে না। মৃত্যু হইতে সে অমৃতত্বে যাইতে চায়। ... অমৃতত্বের পথ সত্যের পথ ... অসতো মা সদ্গময় ... এই ধ্বনি বা এই অভিপ্রায় যেখানে আছে—যে জ্ঞানে আছে, যে বিজ্ঞানে আছে, যে শিল্পে আছে, যে সঙ্গীতে, যে সাহিত্যে ··· আছে তাতেই আছে অমৃতের স্পর্শ। তাই সত্য, তাই শুদ্ধ, তাই সত্যকার আনন্দে স্থিত; তাতেই সত্যকার মঙ্গল, তার নির্দেশ-পথই প্রগতির পথ .. সাহিত্যের বিচার এবং জাতির বিচার এইখানেই। সাহিত্যে শিল্পে কি এই ধ্বনি বাজিয়া চলিয়াছে ? শোনো, বিচার করিয়া দেখ। অন্যায় বা পাপ বা ব্যভিচারকে বাস্তবতার দাবীতে সাহিত্যে বড় আসন দিয়া লালসার পণ্যকে কামনার-ধন না করিয়া তুলিয়া ইহাই দেখার কথা—ইহাই বিচার্য বিষয়। ... বাংলার সাহিত্যে কি ... সেই ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে ? আমি বাঁচতে চাই, শুধু বাঁচা নয়—আমি সৎ হয়ে বাঁচতে চাই,

আমি শুদ্ধ হয়ে বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচতে দাও, বাঁচাও।'* সুতরাং সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতার আত্মদ্রোহ একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র, এই আত্মদ্রোহের শক্তিই আমাদের আত্মানুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করিবে। তখনই হইবে নব-যুগের চিহ্নিত পথে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির মহাজীবনের নূতন প্রকাশ। সেইদিন ঘটিবে ভারতীয় সাহিত্যের নূতন মহাজাগরণ, তাহার সত্যিকার রেণেসাঁ (Renaissance) যাহাতে দেখা যাইবে নবযুগের মহা-সমন্বয় ও মহা-মুক্তি।

ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির সাধনা-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু কথা দিয়া আমরা বাংলা-সাহিত্যের এই পরিক্রমা শেষ করিব।

প্রচলিত ধারণা এই যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ত্যাগ-সংযম-ব্রহ্মচর্য-বৈরাগ্যের বিরোধী। ইহা অপেক্ষা মিথ্যা এবং ভ্রান্ত আর কিছুই হইতে পারে না। তাঁহারই উক্তি হইতে আমরা ইহা প্রতিপন্ন করিতেছি। —'আমাদের দেশে সাধনা-মার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। ... ভারতবর্ষ যে-সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ ... কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। ... বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা; প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায় ...

---

*—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ৪২ তম অধিবেশন, ১৩৭৩, মূল সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ, দৈনিক বসুমতী, ১০ই পৌষ ১৩৭৩ দ্রষ্টব্য।

এই জন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ...... আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস ... কিন্তু সে আমি কোনো মতেই স্বীকার করতে পারিনে। ... দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে ...।

ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদরূপে ছিল না; প্রত্যেক জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল; সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে ...'।*

পুনশ্চ '... আমি বৈরাগ্যের নাম ক'রে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে। আমি এই বলি ... বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। ... অন্তরে প্রেম ব'লে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত ... এই সাধনায় সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম, সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য'।†

—'দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য ... তাহাই সনাতন ভারতবর্ষ।'‡

---

*—'তপোবন', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ: ৪৭৩-৭৬, ৪৭৯।

†—'শিক্ষার মিলন', সংকলন, পৃ: ৩৪-৩৫।

‡—'নববর্ষ', সংকলন, পৃ: ৪৭।

—'এই জন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন আমরা যথার্থত পুত্রকে চাইনে আত্মাকেই চাই। ··· তেমনি বৈরাগ্য যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রস-পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।' *

ইহাই বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ। মনে রাখিতে হইবে তাঁহার 'মহর্ষি' পিতার শান্তিনিকেতনে ভারতীয় আদর্শে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া দীর্ঘকাল তিনি জাতি-গঠনের ব্রতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহাই 'বিশ্বভারতী'র আদিরূপ।

প্রশ্ন উঠিতে পারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে যে ভিন্ন রকমের সুরের ধ্বনিও শোনা যায় সেগুলি কি ? আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এরূপ একটী দ্বৈত ব্যক্তিত্ব ছিল। প্রথমটীতে তিনি ঋষি-কবি, দ্বিতীয়টীতে তিনি একান্তভাবে কবি ও সাহিত্যিক। কিন্তু তাই বলিয়া কোনওটীই অপরটীর নিকট নাকচ হইয়া যায় না, উভয়েরই স্বস্থানে যথোপযুক্ত মূল্য আছে। বরঞ্চ ইহা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ শুষ্ক সংযম-বৈরাগ্যকে অস্বীকার করিলেও সত্যিকার প্রাণধর্ম্মী সংযম-বৈরাগ্যকে চিরদিনই সমর্থন করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ভারতীয় শাস্ত্রও শুষ্ক সংযম-বৈরাগ্যের সমর্থন করেন না (পৃঃ ২৭৬)।

*—'বৈরাগ্য', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ: ৩৫১-৫২।

কবি বা সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ-নির্জ্ঞানের স্তরে পুঞ্জীভূত, 'অবদমিত' অথচ প্রকাশব্যাকুল ভাবকে নিজ নির্জ্ঞানের স্তর হইতে অনেক সময় উৎসারিত করেন। তাহা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন সেখানে অবান্তর হইয়া দাঁড়ায়, শিল্পীর তাহা না করিয়া উপায় থাকে না। বিষয়টী জীবনরহস্যের বৃহত্তর প্রশ্নের সহিত জড়িত যাহার আলোচনা ও সমাধান এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু সে যাহা হউক, ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ও কাব্যে যে অজস্র ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতির অনুকূলে আবেগময়ী বাণী রহিয়াছে তাহার শাশ্বত মূল্য কে অস্বীকার করিতে পারে ?

সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা শেষ করিয়া আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

জার্মান মহাকবি গ্যেটে (Goethe) তাঁহার বিখ্যাত 'ফাউষ্ট' মহাকাব্যে যৌন-জীবনের ও ইন্দ্রিয়-জীবনের তীব্র আবেগকে নায়কের চরিত্রে ও জীবনে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। জীবনের এক সমন্বিত ঊর্দ্ধগামী ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক-জীবনের অগ্রগতি ও মানসিক জীবনের আত্মসচেতন চিন্তাধারার ন্যায় চিরন্তন যৌন-জীবনের দুকূল-প্লাবী খরস্রোত—কোনওটীকে বাদ দেন নাই। অথচ অধঃপ্রকৃতির ঐ সমস্ত তীব্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি ঊর্দ্ধপ্রকৃতির এক সমন্বিত জীবন-দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়—'গ্যেটে আমাদের দুরন্ত কামনা, দুর্দমনীয়

প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করেন নাই ... কিন্তু এই সমস্ত চ্যুতি-অসংযম প্রাণশক্তির বৃথা অপচয় ঘটায় নাই, ইহা পূর্ণতর বিকাশের সহায়তা করিয়াছে। ..... ফাউষ্টের স্বাভাবিক চরিত্র-গৌরব সমস্ত প্রলোভন ও কুশিক্ষার উপর জয়ী হইয়া নিজ মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। ... আর কোন কবিই কাব্যের মাদকতার সহিত ঋষিজনোচিত দিব্যদৃষ্টির ... এমন সার্থক সমন্বয় ঘটাইতে ... পারেন নাই।'* এখানে বলা প্রয়োজন এই উর্দ্ধাভিমুখী অথচ বাস্তব জীবন-সংগ্রামের আদর্শই ভারতীয় জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যেরও চিরদিনের লক্ষ্য। ইহা মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়ামূলক (reactionary) ব্যক্তিগত ব্রহ্মচর্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা যায় এই জার্ম্মান কবিই কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন এবং 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব' নাটক দুইটী কি অপূর্ব্বভাবে শাশ্বত ভারতের জীবন-সাধনার দ্যোতক তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সহযোগে বিবৃত করিয়াছি (পৃঃ ৩৭০, ৩৭৩)।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 'ঋষি' টলষ্টয়ের জীবনে ও সাহিত্যে অনুরূপভাবে কাম-সংযমনের সমস্যা উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিকাশের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহাতে কৃত্রিম নীতি-ধর্ম্মের অথবা আধুনিক অবদমনের কোনও স্থান নাই। জীবনের এই আদিম প্রবৃত্তির একটা সুযুক্তি-সম্মত উর্দ্ধায়ণের সমস্যাকে টলষ্টয় জীবন-সমস্যার সমাধানের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত

*—'কবিগুরু গ্যেটে' ও 'মহাকবি গ্যেটে' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', পৃঃ ১৫১-১৬৭।

করিয়াছেন। ইহা তাঁহার বাস্তববাদী, মানবতাবাদী আদর্শেরই একটী দিক্। প্রচলিত ধর্ম্মীয়-শিক্ষা অপেক্ষা ইহাতে তাঁহার মানবিক জীবনাদর্শ ও বাস্তব অভিজ্ঞতাই প্রবল। এদিক্ দিয়া তাঁহাকে একইভাবে সংযম-ব্রহ্মচর্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতের গান্ধীজীর সহিত তুলনা করা চলে। উভয়েই রিপুর সহিত একনিষ্ঠ সংগ্রামের তীব্রতা ও সাময়িক ব্যর্থতার কথা অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন। 'The Devil' ('সয়তান') উপন্যাসে টলষ্টয় নিম্নস্তরের যৌন-আকর্ষণের তিক্ত কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন। 'The Kreutzer Sonata' টলষ্টয়ের বিশেষ পরিণত বয়সের লেখা। কিন্তু সেখানেও তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—' ... The words of Christ; 'Every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart', apply to all women—especially to one's own wife, and that absolute purity of thought is the only safe and right thing. Sex should be eliminated from human life as far as possible'. অর্থাৎ—'যীশুখ্রীষ্টের বাণী—'যে কেহ কাম-লালসার ভাব লইয়া নারীর দিকে তাকায় সে ইতিমধ্যেই সেই নারীর সহিত অন্তঃকরণের ব্যভিচার করিয়াছে'—এই বাণী সকল স্ত্রীলোক-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, —বিশেষে নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে, এবং সম্যক্ চিন্তার পবিত্রতাই একমাত্র নিরাপদ্ ও সঠিক পথ। মানুষের জীবন হইতে

যৌন-ব্যাপারকে যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া উচিত'।* এই যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে টলষ্টয় আরও অনেক কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, এমনকি নারীর সহিত স্থূল কাম-সম্পর্কের লালসা লইয়া 'আধ্যাত্মিক' বিবাহিত-মিলনের আদর্শকেও তিনি ঐ উপন্যাসের নায়কের মুখে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।† তাঁহার বিখ্যাত 'Anna Karenina' উপন্যাসে তিনি নারী-জীবনে কাম-সমস্যার তীব্রতা সহানুভূতির সহিত উদ্‌ঘাটিত করিলেও পাপের অনিবার্য্য পরিণতিকেও নিষ্করুণ-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' এই উপন্যাস হইতে প্রেরণা পায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় জীবন-সত্যের সন্ধানী এই সাধক-সাহিত্যিক 'আর্ট' অথবা কাব্য-সাহিত্যকেও একদা মিথ্যা বলিয়া তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিলেন।‡ 'আর্ট' সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত ও বহু-প্রচারিত গ্রন্থ 'What is Art ?' আমাদের যে চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করে, তাহার মধ্যেও টলষ্টয়ের দুঃসাহসী অথচ ঋষি-জনোচিত চিন্তাধারার লক্ষণ সুস্পষ্ট। লক্ষ্য করিবার বিষয় 'আর্ট'-সম্বন্ধে তাঁহার এই তপস্বী-সুলভ, স্বভাব-সরল, সত্যজীবন-বাদ তাঁহার সমসাময়িক কালে এবং আজিও বিখ্যাত মনীষীগণের বিশেষ আগ্রহের বস্তু। প্রচলিত বহু প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও সমসাময়িক আর্টিষ্ট-সাহিত্যিককে—এমনকি বহুক্ষেত্রে

---

*—The Life of Tolstoy, Vol II, Aylmer Maude, p: 266.

†—Ibid. p: 278.

‡—op. cit, Vol I, p: 389.

নিজেকেও—তিনি কৃত্রিম, বিকৃত, মনোরঞ্জনকারী মিথ্যা-সাহিত্যিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে, এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক-সমালোচকের মতবাদ জীবন-সত্যের ক্ষেত্রে 'আর্ট' ও সাহিত্যের সত্যকার মূল্য-সম্বন্ধে অনেক আধুনিক সমালোচককেও ভাবাইয়া তুলিবে।*

বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক লরেন্স (D. H. Lawrence) তাঁহার সাহিত্যে যৌনকামের জীবনকে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোনও প্রচলিত যৌনজীবন-বিলাস নয়। ইহার পিছনে রহিয়াছে আধুনিক ধনস্ফীত যন্ত্র-সভ্যতার কৃত্রিমতা ও মনুষ্যত্বহীনতাকে দূর করিয়া এক আদিযুগের অকৃত্রিম জীবনবাদকে স্থাপিত করা। ইহার মধ্যে এক আদর্শবাদী জীবন-দর্শনই পরিকল্পিত হইয়াছে, কোনও অতি-আধুনিক নৈরাশ্যবাদী যৌন-বিজ্ঞান নহে। অবশ্য শিল্পী হিসাবে এই নব-জীবনের রূপায়ণে কিছু কিছু অশ্লীল শব্দও তাঁহার 'লেডি চ্যাটার্লিজ্ লাভার' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং বইটী প্রথমে অশ্লীলতা-দোষে অভিযুক্ত হয়। বইটী প্রধানতঃ ইংলণ্ডের ধনিক-সম্প্রদায়ের আত্মসন্তুষ্ট জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার এমন অনেক উক্তি রহিয়াছে যাহা প্রমাণিত করে যে ইতর যৌনকাম-প্রচার নয়, এক উচ্চতর স্বভাব-সত্য জীবনের প্রবর্ত্তনাই লেখকের উদ্দিষ্ট। লরেন্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'Women in Love' গ্রন্থেও তাঁহার

*—'Literary Criticism', W. K. Wimsatt, Jr. & Cleanth Brooks ও 'What is Art ?' Ed. Aylmer Maude, দ্রষ্টব্য।

যৌন-জীবনদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে। যৌনকামকে তিনি জীবনের গভীরতম সত্যরূপে দেখিয়াছিলেন এবং এই অদৃশ্য অন্ধকারের শক্তির মধ্যে সাধারণ প্রেম-মিলন অপেক্ষা গভীরতর, আধ্যাত্মিক-রহস্যময় মিলনের সন্ধানই তিনি পাইয়াছিলেন। মানুষের নৈর্ব্যক্তিক সত্বার স্পষ্ট ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছেন এবং নর-নারীর যৌনকাম-ভিত্তিক সত্যকার মিলনে তিনি আদিকালের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষায় 'the sons of God saw the daughters of men, that they were fair'-এর প্রতিরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন।* লরেন্সের 'mystic' বা রহস্যবাদী অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে ভারতীয় তন্ত্র-সাধনার দৃষ্টিভঙ্গী খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সুতরাং যে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্রহ্মচর্য-সাধনার কথা আমরা আলোচনা করিতেছি এই সব খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাহার প্রতিকূল কিছুই নাই বরং অনুকূল বিষয়ই অনেক কিছু রহিয়াছে।

আধুনিক ইংরাজী-কাব্যের অন্যতম যুগ-প্রবর্ত্তক T. S. Eliot-ও তাঁহার সাহিত্যে যৌনকামের সমস্যাকে বেশ গুরুত্ব দিয়াছেন। 'The Waste Land' কাব্যে যে আধুনিক জীবন-ব্যর্থতা চিত্রিত হইয়াছে তাহার নানারূপ ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও তাহার মধ্যে আদি পাপের সমস্যা পরিস্ফুট এবং যৌনকাম এই আদি পাপের ফল। জনৈক চিন্তাশীল সমালোচকের ভাষায়—'In the poem Eliot conceives of Original Sin,

*—'Women in Love', Chapters XIII, XXIII দ্রষ্টব্য।

after the manner of St. Augustine, as concupiscence or lust. Thus indirectly lust, surrender to sex, passion and "Love of created beings" are at the bottom of human suffering. ... This explains the sexual symbolism of "The Waste Land", অর্থাৎ—'এই কাব্যে ইলিয়ট সেণ্ট অগাষ্টাইনের ভাবেই আদি-পাপকে যৌনলালসা বা কাম-রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। স্থতরাং প্রকারান্তরে কাম, কাম-জীবনের নিকট আত্ম-সমর্পণ, রিপু এবং বিষয়-প্রীতি এইগুলিই মানব-জাতির দুঃখের মূল। ... "The Waste Land"এর যৌন-প্রতীকতার ইহাই ব্যাখ্যা'।* ইলিয়ট নিজেই বলিয়াছেন—'What Tiresias sees is, in fact, the substance of the poem'. অর্থাৎ—'Tiresias যাহা দেখিয়াছেন তাহাই বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত কবিতাটীর মূল কথা।' এবং Tiresias দেখিয়াছেন কদর্য, প্রেমহীন দেহ-লালসার চিত্র।† অবশ্য এই কাব্যে মানুষের অসহায় নৈরাশ্যজনক নিয়তির কথাই রূপায়িত করা হইয়াছে, বিশেষভাবে আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু ধর্ম্মীয় আদর্শবাদ প্রচার এই কাব্যে বা ইলিয়টের অন্য কাব্যে উদ্দেশিত না হইলেও মানুষের জীবনে মৃত্যু, পাপ, বিনাশ ও বিশৃঙ্খলার উপাদান লইয়া যে কাব্য-রসরূপ তিনি নানা

*—T. S. Eliot, A. G. George, Ph. D., p: 119.

†—op. cit, pp: 122, 131.

চিত্র-সহযোগে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার মধ্যে পাপ ও পাপের মূলে যৌনকাম-সমস্যা বেশ স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। 'Existential'—দর্শনের নৈরাশ্য-নিয়তিবাদের মধ্যেও যৌনকাম ও মৃত্যুর অধীনতা হইতে মুক্তির এষণা তাঁহার কাব্যে আভাসিত হইয়াছে, বৃহদারণ্যক-উপনিষদের 'দত্ত-দাম্যত-দয়ধ্বম্'-এর রূপক-কাহিনী গ্রহণ তাহার প্রমাণ। নূতন মানবিক ধর্ম্ম-সমন্বয় ও নূতন মানবিক সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কথাও তিনি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছেন।* নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার গুরুত্বকে তিনি অর্থনীতির উপরে স্থান দিয়া লিখিয়াছেন—'We are being constantly told that the economic problems cannot wait. It is equally true that the moral and spiritual problems cannot wait; they have already waited too long'.—'আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই যে অর্থনৈতিক সমস্যা-সমূহ অপেক্ষা করিতে পারে না। ইহা সমান সত্য যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা-সমূহও অপেক্ষা করিতে পারে না; তাহারা ইতিমধ্যেই অনেক কাল অপেক্ষা করিয়াছে'।†

আমাদের প্রস্তাবিত আন্দোলনের সহিত ইহার অবশ্যই কিছু আত্মিক সাদৃশ্য রহিয়াছে।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সমারসেট মম্ (Somerset Maugham) তাঁহার সুপরিচিত উপন্যাসের বিশিষ্ট একটী চরিত্রকে

---

*—'Essays, Ancient and Modern', পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ২২৩-২৪।

†—'The Criterion', গ্রন্থ হইতে সন্নিবিষ্ট। op. cit, পৃ: ২১৫।

আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি খাস আমেরিকায় ভারতীয় আদর্শে নূতন জীবন যাপনে ব্রতী করিয়া তুলিয়াছেন। আদর্শবাদী Larry বাঁচিতে চায়—'With calmness, forbearance, compassion, selflessness and continence, অর্থাৎ—'প্রশান্তি, সহিষ্ণুতা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা ও ব্রহ্মচর্যের সহিত।' তাহার উক্তি—'I am in the fortunate position that sexual indulgence with me has been a pleasure rather than a need. I know by personal experience that in nothing are the wise men of India more dead right than in their contention that chastity intensely enhances the power of the spirit', অর্থাৎ—'আমি একটা সুবিধাজনক অবস্থা হইতে কথা বলিতেছি, কারণ যৌন-সম্ভোগ আমার কাছে একটা (দৈহিক) প্রয়োজন অপেক্ষা আনন্দ-রূপেই দেখা দিয়াছে। (তথাপি) আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে যৌনসংযম ও যৌন-পবিত্রতা গভীরভাবে আত্মিক শক্তিকে বাড়াইয়া দেয়। ভারতীয় ঋষিদের (জ্ঞানী-সাধকদের) এই যে যুক্তিপূর্ণ উক্তি ইহা অপেক্ষা অধিকতর ধ্রুব সত্য তাঁহারা আর কখনো উচ্চারণ করেন নাই।* এই আদর্শবাদী আপন-ভোলা চরিত্রটী সম্বন্ধে মম্-এর শ্রদ্ধামিশ্রিত মমতা সুপরিস্ফুট। 'I can only admire the radiance of such a rare ceature'—'এরূপ

*—'The Razor's Edge', S. Maugham, Chapter Six দ্রষ্টব্য।

দুর্লভ জীবের জ্যোতির্ম্ময় রূপ কেবলমাত্র আমার মধ্যে মুগ্ধ-বিস্ময়ের উদ্রেক করে।' ইহা হইতেই বুঝা যায় এই সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও পৃথিবী-বিখ্যাত সাহিত্যিকের সহানুভূতি কোন্ দিকে। উপন্যাসের নাম তিনি সার্থকভাবেই কঠোপনিষদের 'ক্ষুরস্য ধারা নিষিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' এই শ্লোক হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতীয় জাতীয়-সংস্কৃতির ব্রহ্মচর্য-ভিত্তিক সভ্যতা-গঠনের আদর্শ পাশ্চাত্যকে আজিও গভীরভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, ইহা তাহারই সাহিত্যিক নিদর্শন।

বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী এবং ইউরোপীয় নাটক যে বিচিত্র এবং অদ্ভুত পথে আগাইয়া চলিয়াছে তাহাতেও যৌন-প্রবৃত্তির উৎকট মূর্ত্তি অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও কেমন করিয়া যৌন কাম-ভাবনা রোমান্টিক উচ্ছ্বাস হইতে বিতৃষ্ণ লালসার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ তীব্র উৎকটতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহার কিছু ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। জীবন-বিতৃষ্ণা ও যৌন-বীভৎসতা আজকাল সর্ব্ব-দেশের সাহিত্যে হাতে হাত মিলাইয়া অগ্রসর হইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যৌন কামনা-ভালবাসার উদ্দাম বহিঃপ্রকাশের নেশাও আজকাল টুটিয়া যাইতেছে। মোহভঙ্গ (disillusion) এবং উৎকট-বিকৃত জিজ্ঞাসাই আজিকার নিয়ম। তথাপি বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা যে কথা বলিয়াছি তাহা সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে ও প্রকারান্তরে এইযুগে উৎকট মোহ-মুক্তির মধ্য দিয়া নূতন আধ্যাত্মিক সাধনারই প্রস্তুতি চলিতেছে।

সে যাহা হউক, এ-যুগের জীবন-বিতৃষ্ণার সহিত বিকট যৌনকাম-চিন্তার কিছু নমুনা বিদগ্ধ ও বহুজ্ঞ সমালোচক Bamber Gascoigne-এর অনুসরণে আমরা আধুনিক ইংরাজী ও ইউরোপীয় নাটকের ক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। বিংশ শতাব্দীর বিংশ-দশকের নাট্য-সাহিত্যের পরিচয় এইরূপ—

'In the theatre the targets of the satire covered the whole range of life ... The key-note is chaos. ... In E. E. Cummings's 'Him' (1927) a character 'vomits copiously' in the hero's lap and a woman carries a severed male organ on to the stage, represented by a banana in a blood-stained napkin. In Brecht's 'Baal' (19 8) two characters ... wander on to the stage, decide it's a good place to pass water and do so. ... Cocteav's Orpheus (1926) announces: We must throw a bomb. We must create a scandal ... It's stifling. ...These examples are extreme, but the impression they give—of violence, disgust and disillusion—is a fair one. ... In 'Transfiguration (1917) a woman staggers in to prove in a gory speech that love is just lust', অর্থাৎ—'থিয়েটারে জীবনের সব কিছুকেই

লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ করা হইতেছিল। ... মূল সুরটী চরম বিশৃঙ্খলার সুর। ... E. E. Cummings-এর 'Him' (1927) নাটকে একটী চরিত্রকে নায়কের কোলে 'প্রচুর বমি করিতে দেখা যায়' এবং একটী স্ত্রীলোক একটী বিচ্ছিন্ন পুরুষাঙ্গকে একটী কদলীর প্রতীকে রক্ত-মাখা গামছায় ঢাকিয়া মঞ্চে লইয়া আসিতেছে দেখা যায়। Brecht-এর 'Baal' (1918) নাটকে দুইটী চরিত্র ... বেড়াইতে বেড়াইতে মঞ্চের উপরে আসিয়া পড়ে এবং মঞ্চটীকে মূত্রত্যাগের উপযুক্ত স্থান সিদ্ধান্ত করিয়া কার্যতঃ তাহাই করে। ... Cocteau-র Orpheus (1926)-এর ঘোষণা—'আমরা বোমা ছুঁড়ব। আমরা কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করব। ... দম বন্ধ হ'য়ে আসছে।'

এই উদাহরণগুলি চরম হইলেও যে হিংসাত্মক-কার্য, বিতৃষ্ণা ও মোহভঙ্গের ধারণা তাহারা সৃষ্টি করে তাহা ঠিকই। ...Transfiguration (1917) নাটকে একটী স্ত্রীলোক টলিতে টলিতে প্রবেশ করে এবং রক্তাক্ত-বক্তৃতা দিয়া প্রমাণ করিতে চায় যে প্রেম শুধু দেহলালসা ছাড়া আর কিছুই নয়।' নাট্যকার Elmer Rice-এর একজন নায়ক Mr. Zero (নামটী লক্ষণীয়) adding machine লইয়া কেরানীগিরির কাজে ও পারিবারিক-জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উপর-ওয়ালাকে খুন করিয়া স্বর্গে যায়। সেখানের মেয়াদ ফুরাইলে তাহাকে সুন্দরী নারীর ছায়া-মূর্তি দেখাইয়া পৃথিবীতে আনিতে হয়। এবং—'The moment is made more pathetic, and the author's disgust

more clear, when one knows that Zero's sex-life on earth has been confined to peeping through a blind at a prostitute undressing.' —সেই মুহূর্তটী আরও করুণ হইয়া ওঠে এবং লেখকের বিতৃষ্ণার ভাব আরও স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় যখন জানা যায় যে পৃথিবীতে Zero-র যৌন-জীবন জানালার পর্দ্দার ফাঁক দিয়া নগ্নকল্পা বারাঙ্গনার দিকে উঁকি দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।' অথচ এই যুগই 'We are men and women' বলিয়া নর-নারীকে মানুষ হইয়া দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছিল।*

ত্রিংশ-দশকের নাটকে রাজনৈতিক উত্তেজনার ও আন্দোলনের বর্ণনার ছড়াছড়ি। চত্বারিংশ-দশকে Camus-Anouilh Sartre-Eliot-এর নাটকে Existential-দর্শনের প্রকোপ। জীবনের আমোদ-আহ্লাদ তখন মূর্খতা ও মৃত্যুর নামান্তর। জীবনের মূলে নৈরাশ্য (despair)। এই নৈরাশ্যকে স্বীকার করিয়া স্বাধীন যন্ত্রণা-ভোগের মধ্য দিয়া কার্যকারী 'মানুষ' হইতে হইবে ইহাই নাটকের প্রতিপাদ্য। এযুগে ভাব-ভাবুকতার স্থান নাই, আছে নির্ম্মম কার্যকারিতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তবুও ভাবে-ভাষায় এক যৌন-বিতৃষ্ণা ও প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। যথা—'He (Anouilh) sees all humanity ...... drifting its way through life on a

*—Twentieth-Century Drama, Bamber Gascoigne, pp: 17-22 হইতে উদ্ধৃতি ও উপাদান সংগৃহীত।

ব্যর্থতা, বিকার ও বীভৎসতার মধ্য দিয়া এক সত্যকার জীবন-নীতির উদ্দাম অনুসন্ধিৎসা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাহা হউক, ১৯৬০-এর পরবর্ত্তী নাটকের সম্ভাব্য-রূপ সম্বন্ধে উক্ত বহুজ্ঞ সমালোচকের সিদ্ধান্ত প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—'I suspect and hope that the direction it will take will be towards something crisper, something more intelligent, something more concerned with moral questions.' —'আমার মনে হয় এবং আমি আশা করি ইহা অধিকতর সতেজ ও পরিষ্কার, অধিকতর বুদ্ধিদীপ্ত, অধিকতর নৈতিক প্রশ্নের সহিত জড়িত কোনও কিছুর দিকে অগ্রসর হইবে'।*

সাহিত্য নীতি-প্রচার করিবে অথবা সমাজ-সংস্কার করিবে এমন কিছু এ-যুগের পক্ষে বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাহাতে সাহিত্যের আন্তরিকতা থাকাও সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের মূলে যে যৌন-জীবন তাহার গুরুত্ব আজ সম্পূর্ণ অবহেলিত এমনকি অবজ্ঞাত, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে Havelock Ellis-এর 'I regard sex as the central problem of life……,' —'যৌন-ব্যাপারকেই আমি জীবনের মূল সমস্যা বলিয়া মনে করি'...এই উক্তিটি স্মরণীয়। বর্ত্তমান সাহিত্য-আলোচনা হইতে আমরা এই

---

*—Twentieth-Century Drama, Bamber Gascoigne, pp: 38-55, 109-20, 144-65, 184-208 হইতে উদ্ধৃতি ও উপাদান সংগৃহীত। সিদ্ধান্ত নিজস্ব।—

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের মূলে যৌন-জীবনের গুরুত্ব এযুগের সাহিত্যে রাজনীতি-অর্থনীতির আবরণ ভেদ করিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই এক উগ্র কদর্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যৌন-জীবনে উগ্রতা-কদর্যতা থাকিতেই হইবে এমন কোনও কথা নাই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা একথা বলিয়াছি। আজ কিন্তু সাহিত্যে যৌন-জীবনের কদর্যতা উগ্র ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করার মধ্যেই এক রস-সৃষ্টির আনন্দ অনুভূত হইতেছে। ইহা যে সাধারণ 'অশ্লীলতা' নয় তাহাও আজ সুস্পষ্ট। ইহা ব্যর্থ মানবতার উদ্‌ভ্রান্ত আত্মানুসন্ধানের এক বিকৃত প্রচেষ্টা। রোমান্টিক যুগের যৌন-বর্ণনার প্রাচুর্য এবং আজিকার যৌন-বর্ণনার সোকর্য, এই দুইয়ের মধ্যে একটা মৌলিক মনোভাবের পার্থক্য বর্ত্তমান। মধ্যযুগের ধর্ম্মীয় যৌনসংযমের ব্যক্তিগত আদর্শ সমাজ-জীবনে যে ব্যর্থতা ও অসম্ভাব্যতার সৃষ্টি করে ইহা হয়ত তাহারই প্রতিক্রিয়া। ইহা ব্যর্থ ধর্ম্মনীতির নিরর্থক ভীতি-সঙ্কোচ (inhibition) হইতে একপ্রকার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তথাপি ইহারও মধ্যে এক নবযুগের নূতন সত্য-পিপাসা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ইহাই আমাদের বক্তব্য। ইহাতে ধর্ম-নীতির জীবন বড় কথা না হইতে পারে, কিন্তু জীবনধর্মের নীতি অবশ্যই বড় কথা। এজন্য প্রচলিত যৌনতাকে অস্বীকার করিয়া এক নূতন জীবন সামঞ্জস্যই এ-যুগের কাম্য এবং যুগ-সাহিত্যেও তাহার করুণ বিকারগ্রস্ত কণ্ঠধ্বনি মুহুর্মুহুঃ শোনা যাইতেছে। তজ্জন্য T. S Eliot-এ Sweeney-র

শ্লেষাত্মক ভাষা—'Birth and copulation and death.
That's all the facts when you come
to brass tacks.',

অর্থাৎ—'জন্ম আর যৌন-সঙ্গম আর মৃত্যু।
এই-ত দেখি যা'কিছু সব আসল ব্যাপার'॥*

অথবা Anouilh-এর ভাব-জগতের বর্ণনাতে সমালোচকের স্পষ্ট ভাষা—'. the happy rest of the world merely eats and belches, copulates and sleeps'., অর্থাৎ—'... আর সব সুখী মানুষেরা খালি খায় ও ঢেকুর তোলে, যৌন-সঙ্গম করে আর ঘুমায়'।†

এই যে যৌন-প্রেমের ব্যাপারে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তীব্র বিতৃষ্ণা, ইহা যৌন-সংযমের বৈরাগ্য হইতে হয়ত খুব বেশী দূরে নয়। Anouilh-এর আর একটী নাটকে ইহা আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। —'Far from being magical, love is now explained in the most cynical of terms. One person loves another, the play argues, because he can see a reflection of himself in the loved one. So the relationship is not a giving of oneself, as it is normally explained, but a taking of oneself. When the loved one

---

*—'T. S. Eliot, His Mind and Art', p: 218.

†—Twentieth-Century Drama', p: 146.

changes a little, the lover can no longer see a reflection of himself. He therefore moves on— and hence, so many broken affairs.', অর্থাৎ—'প্রেম আর মোটেই যাদু নয়, ইহাকে যতদূর সম্ভব ঘৃণা-বিদ্বেষের ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই নাটকের বক্তব্য এই যে, এক ব্যক্তি অপরকে ভালবাসে তাহার কারণ তাহার মধ্যে সে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। সুতরাং সম্পর্কটা একজনের অপরকে আত্মদান বলিয়া যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় সেরূপ নহে, ইহা নিজেকে পাওয়ার প্রশ্ন। প্রেমাস্পদ একটু পরিবর্ত্তিত হইলেই প্রেমিক আর তাহার মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায় না। সে তখন নিজের পথে আগাইয়া চলে—এবং ইহাই এত প্রণয়-ব্যর্থতার কারণ।' * তারপর নাট্যকার দুইজন কুঁজ-ওয়ালা নর-নারীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ও বিশ্বস্ত প্রেমিক-প্রেমিকারূপে চিত্রিত করিয়াছেন, কারণ তাহাদের পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা এবং নূতন-ভাবে কোথাও আত্ম-প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়ার আশা কম। কী বীভৎস-বিতৃষ্ণার মধ্য দিয়া যুগসাহিত্য যৌনপ্রেমের ক্ষেত্রে রূঢ় জীবনসত্যকে দেখিতে চাহিতেছে ইহা তাহারই প্রমাণ। বৈরাগ্য এবং অনাসক্তির কঠিনতা এখানে অস্বীকৃত নয়, বিকৃত ছদ্মবেশে উপস্থাপিত। ভবিষ্যতের সত্যজীবন-সম্ভাবনা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই।

---

*—op. cit, p: 150.

আমরা স্বভাবতঃই স্মরণ করিতে পারি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও একদিন বলিয়াছিলেন—'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়, স্ত্রীর কামনায় স্ত্রী প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় স্ত্রী প্রিয় হয়।* মৈত্রেয়ী ছিলেন তাঁহার আন্তরিক প্রীতি-পাত্রী, তাই মহাজীবনের যাত্রাপথে তিনি সাগ্রহে মৈত্রেয়ীর সহিত আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী এজন্য তাঁহার অধিকতর 'প্রিয়া' হইয়াছেন।† অথচ স্বচ্ছন্দে সাদরে মৈত্রেয়ীকে বিদায় দিয়া তিনি মহাসত্যের প্রেমের অভিসারে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও নরনারীর প্রেম-সম্পর্কে এক আত্মপ্রীতি রহিয়াছে, কিন্তু তাহা স্বার্থপর জীবনের আত্মপ্রীতি নয়, মহাজীবনের 'আত্মা'-প্রীতি। সংযম, বৈরাগ্য ও প্রেমের এখানে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টীর আমরা ইতিপূর্ব্বেও আভাস দিয়াছি (পৃঃ ২৬৪, ৩৫২-৫৪)।

সাহিত্যে আধুনিক যুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক বোদ্‌লেয়ার (Baudelaire)-এর কাব্যে যদিও আমরা যৌনকাম ও বিতৃষ্ণা তথা জীবন-যন্ত্রণার তীব্র বর্ণনা পাই তথাপি তীব্র জীবন-সত্যের অনুসন্ধানও সেখানে ব্যাকুলভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। বাংলা কামায়ন-সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট অগ্রদূতও আজ বোদ্‌লেয়ার-বন্দনায় বলিতেছেন—'… মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী … মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী'।‡

*—বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬

†—'প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়মবৃধৎ'—বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৫

‡—আমরা এখানে শ্রী বুদ্ধদেব বসুর কথা বলিতেছি, যেমন পূর্ব্বে (পৃ: ৪০৪) বলিয়াছি শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথা।

এখানে ঠিক্ সংযম-বৈরাগ্যের কথা না থাকিলেও তাহারই অভিমুখী কথা রহিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। Eliot-ও বলিয়াছেন—'Baudelaire perceived that what matters is sin and redemption',—'বোদ্‌লেয়ার অনুভব করিয়াছিলেন যে পাপ এবং পাপ হইতে উদ্ধারই আসল কথা'।*

সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রশ্ন আজ নূতন নয়। সেক্সপীয়রেও অশ্লীলতা আছে, সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের সাহিত্যও ইহা হইতে মুক্ত নয়। জীবনসত্যের 'intuition' বা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অন্তর্দৃষ্টি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ইহা হয়ত স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও 'অশ্লীলতা' ও তাহার বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ৩৪৬-৪৮, ৩৬৬-৬৭)। কিন্তু বর্ত্তমানে বিকৃত যৌনকাম-সম্বন্ধীয় বর্ণনা এবং কামজীবন-সম্বন্ধীয় ইতর ভাষার প্রয়োগ সাহিত্যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে স্থান পাইতেছে। Lawrence-এর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। Flaubert-এর Madame Bovary এবং James Joyce-এর Ulysses-ও অপর দুইটী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। Ulysses-গ্রন্থটী লইয়া যখন আমেরিকায় মামলা হয় তখন একজন বিচারক ইহার বিরুদ্ধে রায় দেন, কিন্তু প্রধান বিচারক ইহার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসব ক্ষেত্রে যাহা বিচারের বিষয় হয় তাহা এই যে সমগ্রভাবে বইটীর লক্ষ্য কি? স্থূল কামোত্তেজনা জাগ্রত করা অথবা মানুষের জীবন ও চরিত্র অকপট শিল্পীর দৃষ্টিতে

*—'T. S. Eliot · His Mind and Art' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ৩০।

অঙ্কিত করা? বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে নিক্তি-ধরা বিচার আজ অসম্ভব। কিন্তু একটা কথা অতি সত্য যে এ-যুগের সাহিত্যে এ-দুইয়ের সীমা-রেখা লইয়াও বিশেষ মাথা-ব্যথা নাই। তাহার কারণ, এ-যুগে এক নূতন জীবন-প্রেরণা দেখা দিয়াছে যাহা জীবনের সব-কিছু রহস্যের গোড়া খুঁড়িয়া পরীক্ষা করিতে এবং নূতন জীবনের সম্ভাবনা বিস্তৃত করিতে চায়। কিছু পূর্ব্বে পাশ্চাত্য আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সুতরাং আজ আর শ্লীলাশ্লীলের ভেদ লইয়া চুলচেরা বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু আজও যাহা বিবেচ্য এবং অধিকতর বিবেচ্য তাহা এই যে এই সাহিত্য যখন প্রকারান্তরে একটা উদ্দেশ্যকে মানিয়া লইয়াছে তখন সেই উদ্দেশ্যের সার্থকতার প্রতিও কবি-সাহিত্যিকের দৃষ্টি সজাগ থাকিবার কথা। নচেৎ কবি ও সাহিত্যিক বিশ্বাসের সততা ও ভাবের গভীরতা দাবী করিতে পারেন না। সাহিত্যের কোনও উদ্দেশ্য নাই বলিয়া এক অতি হাল্‌কা বুলি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে ইহাই বলা যায় যে Shakespeare-এর মত মহান্ সাহিত্য-স্রষ্টাও মানব-জীবনে Nemesis বা কর্ম্মফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার যুগান্তকারী অমর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। Tolstoy যে 'emotion' বা ভাবাবেগ পাঠকের মধ্যে সঞ্চার করাকে Art-এর প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই ভাবাবেগ তাঁহার মতে প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক সহজ-সত্যের বাহক। Bernard Shaw-প্রমুখ

শক্তিমান্ সাহিত্যিকেরা উদ্দেশ্যহীন Art-কে কোনও দিন স্বীকার করেন নাই। সুতরাং আজ যদি মানুষের 'শুষ্ক' জীবনে আগুন লাগাইবার উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টি করা হয়, তবে সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে সে আগুন নিভাইবার ও নূতন রস-সমৃদ্ধ জীবনের উদ্বোধনের দিকেও লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক। তবেই সত্যকার সৌন্দর্য-সৃষ্টি সাহিত্যে সম্ভব হইবে। নচেৎ ক্লাসিক্যাল সাহিত্য নিছক বুদ্ধি-বিচার দিয়া যে 'ভুল' করিয়াছে, রোম্যান্টিক সাহিত্য নিছক ভাব-বিলাস দিয়া যে 'ভুল' করিয়াছে, আধুনিক সাহিত্য বিতৃষ্ণা-বিভ্রম দিয়া সেই ভুলেরই এক মারাত্মক পুনরাবৃত্তি করিবে মাত্র। শুভ উদ্বোধিত হইবে না।

আশার কথা অতি-আধুনিকেরা কেহ কেহ সাহিত্য-রচনায় বিচার-বিবেচনার প্রবন্ধ-রচনাতেও হাত দিতেছেন। James Joyce-এর বিখ্যাত বইটী সম্বন্ধে স্বয়ং Ezra Pound-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যেও আমরা একটা শুভ উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত পাইতেছি। Pound আধুনিক নিষ্করুণ স্পষ্টবাদিতার সহিত Joyce-এর উপন্যাসে অতি নিম্নস্তরের অশ্লীল শব্দ-প্রয়োগকেও সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন এগুলি—'.. every small boy has seen written on the walls of a privy', অর্থাৎ —'প্রত্যেক ছোট ছেলেই এগুলি মলমূত্রাগারের দেওয়ালে লেখা থাকে দেখিয়াছে।' তারপর তাঁহার উক্তি আমাদের বক্তব্যের দিক্ দিয়া বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। তিনি বলিতেছেন—'And ought an epoch-making report on the state

of the human mind in the twentieth century (first of the new era) to be falsified by the omission of these half a dozen words, or by a pretended ignorance of extremely simple acts?' অর্থাৎ— 'বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনের অবস্থা সম্বন্ধে একটা যুগান্তকারী রিপোর্টকে (বইকে)—যাহা এ-যুগের প্রথম—কি এইরূপ গোটা-ছয়েক কথা বাদ দিয়া অথবা অত্যন্ত সরল কতকগুলি ক্রিয়ার বিষয়ে অজ্ঞতার ভান করিয়া মিথ্যা করিয়া দিতে হইবে?' এখানে উল্লেখযোগ্য যে Joyce-এর পুস্তকের বিরুদ্ধে যে বিচারক রায় দিয়াছিলেন তিনিও শিক্ষিত বুদ্ধিবাদীদের আধুনিক যৌন-সাহিত্যে বিচলিত না হওয়াকে ভান বলিয়াছিলেন। পুনশ্চ— 'The faecal analysis, in the hospital around the corner, is uncensored. ... A great literary masterwork is made for minds quite as serious as those engaged in the science of medicine. The anthropologist and sociologist have a right to equally accurate documents ...'. —'ঐ রাস্তার বাঁকে হাঁসপাতালে যে মল-পরীক্ষা করা হইতেছে তাহার বাধানিষেধ নাই। ... একটা বড়দরের সাহিত্যিক-লেখা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মতই যাহাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে এমন লোকদের জন্য তৈয়ার হয়। বিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীর ঐরূপ নিখুঁত দলিল পাইবার অধিকার আছে ... '।* শ্রীযুক্ত

*—'Literary Essays of Ezra Pound' (Faber), p: 408.

পাউণ্ড-এর মত মনস্বী লেখকের কথায় এবং বিশ্বের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী (intelligentzia)-দের এক সম্প্রদায়ের কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে এই-জাতীয় লেখার পিছনে এক নূতন মানুষের সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যের পিছনে উদ্দেশ্য নাই একথা যুক্তি-বিচারে টেঁকে না। সচেতন-ভাবে না হইলেও এক জীবন-প্রেরণাদান অবশ্যই সাহিত্যের 'নিশ্চেতন' উদ্দেশ্য। সাহিত্য যেখানে কাজ শেষ করে, যুগের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি সেইখান হইতেই কাজ আরম্ভ করিতে পারে। সমাজ ও সাহিত্যের এই স্থূল তত্ত্বটী হাল্‌কা-ভাবে উপেক্ষা করার ফলে মনুষ্য-সভ্যতা এক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে সাহিত্য চিরদিনই আনন্দদানের মধ্য দিয়া জ্ঞান বিতরণ করিয়াছে। সুখের বিষয় আধুনিক সাহিত্যও অজ্ঞাতসারে ও বিকৃত-দৃষ্টিতে সেই আদর্শেই বিশ্বাসী।

অর্থহীন সাহিত্যে মিথ্যা 'ধর্ম্ম', 'নীতি' ও 'সম্মাননীয়তা' (respectability) আজ আর স্থান পাইবার যোগ্য নয়। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইংল্যাণ্ডের দুইজন মনীষী-লেখক, একজন সাহিত্যিক (Bernard Shaw) এবং অপরজন দার্শনিক (Bertrand Russell), নির্ম্মমভাবে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে এই সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অথচ চিন্তাশক্তিহীন হাল্‌কা-জীবন হইতে তাঁহারা বহু দূরে। ইহার কিছু ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি (পৃঃ ৩৭, ১২৮)। রোম্যাণ্টিক প্রণয় এবং আত্মসন্তুষ্ট বিবাহেরও আজ আর গৌরব নাই। থাকা উচিতও

নয়। মামুলী 'ধর্ম্ম' ও 'নীতি' আজ একইভাবে আকর্ষণ-বিহীন। সর্ব্বত্রই প্রাণহীন গতানুগতিকতা। এই অবস্থায় যৌন-জীবন লইয়া 'রাখা-ঢাকা' ভাব আর সম্ভব নয়। সেজন্য খোলাখুলি নানা বিচিত্র যৌন-জীবনের উদ্ঘাটন অথচ তাহার সহিত একপ্রকার 'অকপট' পাপ-স্বীকৃতি এবং 'নৈতিক' কিছু সম্ভাবনার জন্য ব্যাকুলতার আভাসও অধুনাতন সাহিত্যে রস-সৃষ্টির এক রীতি বা কৌশল। Vladimir Nabokov 'বিশ্ব-বিখ্যাত' হইলেন 'Lolita'-নামক এইরূপ একটী বই লিখিয়া। পুস্তকে একটী শিশু-বালিকা (পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে) নায়িকার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। নায়ক একজন প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি, পিতৃস্থানীয়। অস্বাভাবিক যৌন-চরিতার্থতার কথাও সুকৌশলে আভাসিত। নায়ক মানসিক-বিকার-গ্রস্ত (pervert), অথচ তাঁহার বিকৃত মনের 'ভালবাসা'ই উপন্যাসের উপজীব্য। এজন্য তাঁহার 'physiological urges' বা দৈহিক প্রবৃত্তি-তাড়না এক 'aesthetic bliss' বা সৌন্দর্য-তত্ত্বের রসাস্বাদে পরিণত হইয়াছে, ইহাই লেখকের নিজের বক্তব্য। যৌন-ব্যাপারের সঙ্কোচ দূরে সরাইয়া চাপা 'অশ্লীল' ব্যাপারকে খুলিয়া বলা এখানেও রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন 'Public School'-এর ছেলেদের খেলার মাতামাতি-দাপাদাপির মধ্য দিয়া সমকামী যৌনচরিতার্থতা ('homosexual romps') অথবা পরিবার-পরিকল্পনার গোপন প্রয়োজনে আধুনিক বাথরুমের ব্যবহার ('the bath-room,......has to be used for the furtive needs

of planned parenthood'—Part Two, Ch. 35)—ইত্যাদি যৌন-ইঙ্গিত মূলক বর্ণনাও আছে। আবার নানাস্থানে নায়কের নিজের অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য আত্মগ্লানির কথাও রহিয়াছে। অথচ নায়কের এই অস্বাভাবিক 'প্রেম'কে সাহিত্যের বা শিল্পের মধ্য দিয়া অমর করিবার রোম্যান্টিক ইচ্ছাও ব্যক্ত হইয়াছে উপন্যাসের শেষ লাইনে। 'পাপের ফল' যে ব্যক্ত হয় নাই তাহাও হয়ত নয়। জনৈক সমালোচকের ভাষায় উপন্যাসটী 'dreadfully moral in its almost melodramatic summing up of the wages of this particular sin',—ভয়ঙ্কর-ভাবে নীতিশিক্ষা-পূর্ণ, কারণ ইহা এই বিশেষ রকমের পাপের মাশুলের কাহিনী উচ্ছ্বাসপূর্ণ পরিণতির মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছে'।* বলা বাহুল্য এরূপ কোনও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য লেখক বা বিদগ্ধ পাঠক-সমালোচকগণ অনেকেই স্বীকার করেন না। উপন্যাসটী বহু-প্রশংসিত।

এইরূপ আর কয়েকটী সহসা-বিখ্যাত সাহিত্য-সৃষ্টির কাহিনী বাংলা সংবাদপত্রের সমালোচনা হইতে আমরা পাঠকের দৃষ্টিগোচর করিতেছি।

লেখক অ্যালান শার্প। উপন্যাসের নাম 'এ গ্রীন ট্রী ইন গেদ।' বইটী তাঁহাকে রাতারাতি খ্যাতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। যৌনকামকে বিশেষ ঘনিষ্ঠ-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কবির দৃষ্টিতে তিনি দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'তবু শার্পের বিরুদ্ধে

*—Kenneth Allsop in THE DAILY MAIL.

অভিযোগ এসেছে। তাঁর বইকে পর্ণোগ্রাফির বদনাম দেওয়া হয়েছে। শার্প তাঁর জবাবে বলেছেন 'আমি স্বীকার করি আমার বিষয়বস্তু যৌনতা। আমি নিজেও যৌন-তাড়নার শিকার। আমি যৌনতা নিয়ে আছি যেমন কাফকা ছিলেন নরক নিয়ে। আমার কাছে সব চেয়ে বড় কথা হল 'সম্পর্ক', হয় তোমাকে যৌনতার উর্দ্ধে উঠতে হবে, নয়ত সম্পর্কের সে যে আঙ্গাঙ্গী তা তোমাকে মানতে হবে'।* যৌনতার উর্দ্ধে উঠার প্রয়োজনীয়তা এখানে প্রকারান্তরে স্বীকৃত।

আর একটী উদাহরণ। লেখিকা ভায়োলেট লিডুক। এই মহিলা তাঁহার আত্মজীবনী লইয়া 'একটী সাংঘাতিক পুস্তক লিখেছেন।' বইয়ের নাম 'লা বাডারদ'। শ্রীমতী লিডুক তাঁর এই আপন নরক বর্ণনায় নিজের ভিতরের প্রেমহীনতার কথা, স্থূল যৌন আচরণের কথা অকপটে লিখেছেন। ভায়োলেট ছিলেন মায়ের অবৈধ সন্তান। ... স্কুলের সহপাঠিনী ইসাবেল এবং পরে হারমাইন নামে জনৈকা শিক্ষিকার সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ... হারমাইনের সঙ্গে থাকতে থাকতেই গ্র্যাব্রিয়েল নামক একটী অতি সাধারণ ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ভায়োলেটের। শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করেন লেখিকা। এই ধরণের বিয়ে করা তাঁর মত প্রেমহীন মেয়ের পক্ষেই সম্ভব।' তার পর গর্ভপাত, এবং এক লেখককে বিবাহ, সাহিত্য-লেখার প্রেরণা লাভ এবং বিচ্ছেদ। 'এরপর লেখিকা ব্ল্যাক মার্কেটিং

*—'সাহিত্য জগৎ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০।৯।৬৫

শুরু করেন' ।* যৌনতার সহিত অপরাধ-প্রবণতার সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

পুনরায় একটী উদাহরণ। লেখক নরম্যান মেইলার। উপন্যাসের নাম 'দি অ্যামেরিকন ড্রিম'। 'কলিকাতাতেও বইটী এসেছে সম্প্রতি। ··· উপন্যাসটী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ পড়ে যায় আমেরিকায়। ··· উপন্যাসটী উত্তম পুরুষে লেখা। উপন্যাসের নায়ক ষ্টেফাস রোজাক যেন শয়তানকেই দ্বৈরথে আহ্বান করেছে। নিজের স্ত্রীকে একরাত্রের সহবাসের পর সে খুন করেছে। স্ত্রীর শব-দেহকে পাশের ঘরে রেখে পরিচারিকার শয্যায় যাচ্ছে সে নতুন সুখের খোঁজে। এর পর রোজাক যেন সত্য শক্তির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। ···যাবতীয় দৈহিক ক্রিয়াকলাপের কথা মেইলার এই বইয়ে অসংকোচে লিখেছেন।'† সত্য শক্তির খোঁজ লক্ষণীয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য-সাহিত্যের নমুনা ও আলোচনা হইতে পাঠক কি সিদ্ধান্ত করিবেন? আমরা বলিব এগুলিকে পুরাতন যুগের মামুলী অশ্লীলতা বা দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা বলিয়া অভিযুক্ত করা ঠিক্ নহে। সেরূপ অভিযোগ আজ মূল্যহীনও বটে। বরং আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এই সাহিত্যের অকপট যৌনতা ও কদর্যতার মধ্যে যুগমানসের একটা গতির সন্ধান করাই বিজ্ঞতার কাজ। যৌন-জীবন লইয়া—শিক্ষিত সভ্যমানব রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-বিজ্ঞাননীতি-সমরনীতি-শিক্ষানীতি-ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে যে আত্মসন্তুষ্ট নির্ব্বিকার ভাব লইয়া চলিতেছে, তাহার মধ্যে এক দুষ্টক্ষতের পচনক্রিয়া কতদূর অগ্রসর হইয়াছে যুগসাহিত্য তাহারই

*—,সাহিত্য জগৎ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২।৫।৬৬
†— ঐ ৩০।১।৬৫

স্বীকারোক্তি। সভ্য-শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও যৌন-জীবনের বীভৎস-সমস্যার সমাধান মিলে নাই ইহা তাহারই লক্ষণ। এই সব সাহিত্য-পাঠে মানুষ আজ তীব্র যৌনকামের রহস্যেরই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। যৌন-জীবনের গভীর সমস্যার সমাধান আজ পুরাতন ধর্ম্ম-নীতি ও বাহ্যিক ধর্ম্মাচরণ দিয়াও সম্ভব নয়, ইহা তাহারও নিদর্শন। এই নূতন জীবন-সামঞ্জস্যের দর্শন কি ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইবে না? বহুশত বৎসরের পরাধীন জাতির সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক পরা-ধীনতা তাহার ভাবদাসত্বে। উচ্ছিষ্টভোজীর মত কি আমরা পশ্চিমের এই আত্মহারা উদ্‌ভ্রান্ত সাহিত্যের নকল করিব? আমাদের দেশেও পুরাতন ধর্ম্ম ও নীতি আজ অনেকখানি প্রাণহীন। কিন্তু ভারতবর্ষই একমাত্র সেই দেশ যেখানে জাতীয়-জীবনে ব্যাপকভাবে যৌন-জীবনের সমাধান ও মহাজীবনের উদ্বোধন এক যুগে বাস্তবে সম্ভব হইয়াছিল। অথচ ইহা শুধু শুষ্ক কৃচ্ছ্রতার জীবন ছিল তাহাও নহে। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অধ্যায় আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি। আজ বিশ্বের যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের সাহিত্যে কি এক নূতন জীবন-দর্শনের অরুণোদয় হইবে না? অথবা সাহিত্যিকদের শুধু দোষ দিয়া লাভ নাই। কারণ মনে রাখিতে হইবে সমাজ সাহিত্যের সেবক নয়, জনক। সমাজের অন্তরের চাহিদা, সমস্যা ও সমাধানই সাহিত্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। সুতরাং শুভ ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ পাঠক সমাজের দায়িত্বই আজ সবচেয়ে বেশী। নূতন যুগ-সাহিত্যের পটভূমিকা তাঁহারা সৃজন করিতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কামরহস্য ও জীবনসাধনা।

জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া আমরা বিষয়টীকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে ও বাস্তব জীবনে যৌনকামের যে সব প্রশ্ন বা সমস্যা জাগে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। সুতরাং প্রসঙ্গতঃ কিছু দার্শনিক বা দার্শনিক-কল্প বিষয়েরও অবতারণা করিতে হইবে। আনুষঙ্গিক ভাবে জীবতত্ত্ব-মনস্তত্ত্বের কথাও কিছু আসিবে।

আমরা যাহাকে জীবন বলি তাহার গোড়ায় যে প্রধান বস্তুটী বাসা বাঁধিয়া আছে তাহা—আরাম বা স্বস্তি-লাভ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নানা ভাবে নানা সূত্রে এই আরাম বা স্বস্তি-লাভের আকুল ও দুর্নিবার ইচ্ছাই মানুষকে তথা সমস্ত জীবকে চালিত করিতেছে। আমরা তাত্ত্বিক দর্শনের দিকে বেশী না গিয়া এখানে জীবন-দর্শনের মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিব। 'যোগস্থ' সাধারণ-জ্ঞানের দৃষ্টিতেও আমরা বিষয়টীকে বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

মানুষ যে বাঁচিতে চায়, মরিতে চায় না, ইহাই আদিম ও প্রধান আরাম বা স্বস্তি-ইচ্ছা। ইহারই জন্য জীবনের সব কিছু। সুতরাং জীবনের বহু-প্রকারের ও বিভিন্ন গুণ-পরিমাণের যাবতীয় আরাম বা স্বস্তি এই মূল আরাম বা স্বস্তির শাখা-প্রশাখা মাত্র। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাম-ক্রোধ, আধি-ব্যাধি, অভাব-অভিযোগ, ভয়-ভাবনা, লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, দম্ভ-মান, এবং আধুনিক ভাষায় **sadism-masochism** বা ধর্ষকাম-মর্ষকাম এসবেরই মূলে যে একটা আরাম বা স্বস্তি-লাভের ইচ্ছা এবং সেই আরাম ও স্বস্তির মূলে যে বাঁচিবার আরাম ও স্বস্তি-বোধ এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 'বাঁচিয়া থাকা' যে কি বস্তু তাহা সর্ব্বত্র পরিষ্কার-ভাবে ও একই-ভাবে প্রতিভাত হয় না। কারণ, শরীরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যাধির নিবৃত্তি চাই, মনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কাম-ক্রোধ-লোভের নিবৃত্তি চাই, আবার বুদ্ধিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ভয়-ভাবনা-অজ্ঞানের নিবৃত্তি চাই। কিন্তু শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যাধির নিবৃত্তি যে আরাম বা স্বস্তি দান করে তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি না, সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাভাবে ঐ আরাম বা স্বস্তিকে ব্যাপক করিয়া বিশেষভাবে আস্বাদের চেষ্টা করি। এগুলি না হইলেও শরীরটা হয়ত বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু সে বাঁচায় আমরা গুরুত্ব আরোপ করি না। এমন কি এই সব আরামের সন্ধানে অন্ধ বিলাস-লালসায় তাড়িত হইয়া দুঃখ-কষ্ট, ব্যাধি-যন্ত্রণা বা মৃত্যু বরণ করিতেও আমাদের দ্বিধা থাকে না। তেমনি মনের এবং

বুদ্ধির বাঁচার ক্ষেত্রেও আমরা বাঁচার প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া অনেক দিকে অনেক দূর আগাইয়া যাই এবং মন ও বুদ্ধির সহিত দেহেরও যন্ত্রণা বা বিকৃতি-বিনাশকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকি। আবার উচ্চতর 'আদর্শ'কে ধরিবার জন্য—দেশের জন্য অথবা ধর্ম্মের জন্য বা অপরকে রক্ষা করিবার জন্যও—আমরা দুঃখ-কষ্ট-মৃত্যু বরণ করিতে পারি। সুতরাং বাঁচিতে চাওয়া আদিম এবং প্রধান আরাম বা স্বস্তি-ইচ্ছা হইলেও আরও কোনও আদিমতর, প্রধানতর আরাম বা স্বস্তি-ইচ্ছা মানুষের ভিতরে ক্রিয়া করিতেছে, ইহা সুনিশ্চিত।

এই আদিমতর, প্রধানতর আরাম বা স্বস্তি-ইচ্ছাটী কি তাহা ধরিতে না পারিলে জীবন-সমস্যার কোনও মৌলিক ও সত্যিকার সমাধানও অসম্ভব। এই গভীরের অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াই কবি বেদনাময় সুরে গাহিয়াছেন—

'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই না'।

আমরা কোনও দার্শনিক আলোচনার গভীরে যাইতেছি না। কিন্তু তথাপি জীবন-সমস্যার বাস্তব সমাধানের ক্ষেত্রে প্রশ্নটীর তাত্ত্বিক সদুত্তর প্রয়োজন। নচেৎ জীবন হইয়া উঠিতেছে ব্যর্থতার বিভীষিকা, আরামের তলায় জ্বলিতেছে বে-আরামের আগুন, স্বস্তির পিছনে হাঁ করিয়া আছে অস্বস্তির হাহাকার। আজীবন সার্থকতার ছদ্মবেশী ব্যর্থতার কাছে ঘাড়-ধাক্কা খাইতে খাইতে শেষে জীবনের নাট্যমঞ্চ হইতে আমাদের একান্ত অসহায় ভাবে বাহির হইয়া যাওয়াই একমাত্র নিয়তি। এই মর্মন্তুদ অবস্থা হইতে

বাস্তব-জীবনে কতকটা নিষ্কৃতি পাইবার সমস্যা আজ পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে।

এই সমস্যার সমাধানে পাশ্চাত্যের আধুনিক Existential মতবাদ একভাবে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে সে কথার কিছু আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। তাহার মধ্যে বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তির পরিচয় থাকিলেও তাহা বর্ত্তমানের মানসিক বিকারকেই জোর করিয়া চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই মধ্যে এক নিষ্করুণ, অস্বাভাবিক আত্ম-অঙ্গীকারকে তাহা আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভূমি-রূপে কল্পনা করিয়াছে। ফলে 'নির্ম্মম' অনাসক্তির * কাছ ঘেঁষিয়া যাইলেও তাহাতে 'অনাসক্ত কর্ম্মযোগ'এর মত কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ইহার কারণ, তাহা জীবনের মূলে শূন্যতার পরম-তত্ত্বকে সাধারণ দার্শনিক বুদ্ধিতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, আত্মশুদ্ধির যোগদৃষ্টিতে দেখে নাই। বুদ্ধদেব ইহাকে যোগদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং প্রচারও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও তত্ত্ববিচার ও জ্ঞানবাদের দিক্ দিয়া। বাস্তব কর্ম্মজীবন সেখানে ছিল এক-প্রকার উপেক্ষিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অল্পবিস্তর বিভিন্ন-প্রকারের শূন্যবাদী দর্শনের অভাব নাই, কিন্তু তাহার ভিত্তিতে কোনও বাস্তব জীবন-দর্শন সেখানে বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে বেদের আদি হইতে উৎসারিত হইয়া এক শূন্যবাদী পরমপূর্ণ মহাসত্যের জীবন-দর্শন রামায়ণ-মহাভারতযুগের মহাজীবনে এবং পরবর্ত্তী কালেও নানা ধর্ম্মীয় সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। †

*—গীতা, ২।৭১; ৩।৩০ †—প্রস্থান্তরে আলোচ্য। —গ্রন্থকার।

সে যাহা হউক, এই জীবন-দর্শনের মূল কথা হইতেছে সুখ এবং দুঃখ, জ্ঞান এবং অজ্ঞান, জীবন এবং মৃত্যু, স্বস্তি এবং অস্বস্তি উভয়কে সমানরূপে মহাপ্রকৃতির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়া শাশ্বত জীবনরসকে আস্বাদ করা। এই যে শূন্যতা-বাদী নিত্যপূর্ণতার জীবন ইহারও দৃষ্টিতে স্বভাব-জীবনের আরাম বা স্বস্তিলাভের উপরে এক বৃহত্তর মৌলিক আরাম বা স্বস্তি-আস্বাদের নিত্যলীলা চলিতেছে। তাহারই এষণা বা প্রেরণায় (শাস্ত্রীয় ভাষা 'চোদনা') এই নিম্নস্তরের জীবনে খণ্ডিত আরাম ও স্বস্তির স্রোত খেলা করিতেছে। সেই জন্য বাস্তবিক পক্ষে এই সব আরাম বা স্বস্তি-চেষ্টায় আমরা সত্যভাবে স্বাধীন নই। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, জীবনের অনেক কিছু মৌলিক ক্রিয়াও—যথা শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন, রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা-ব্যতিরেকেই চলিয়া থাকে। অথচ ইহারা বাঁচার পক্ষে আহার-নিদ্রার মতই অনিবার্য প্রয়োজন। মন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রেও কাম-ক্রোধচরিতার্থতা বা চিন্তা-বিচার ইত্যাদি বৃত্তির ক্রিয়া আপাততঃ আমাদের ইচ্ছা ('will')-প্রসূত বলিয়া মনে হইলেও ইহারা প্রকৃতই স্বাধীন নয়। এমন কি আমরা যে সুখদুঃখ-রূপ কর্ম্মফল ভোগ করি এবং 'আমি' ভোক্তা বলিয়া অনুভব করি ইহাও কতটা সত্যভাবের স্বাধীনতা তাহাও যোগ-দর্শনের বিচার-সাপেক্ষ। Existential-দর্শন এখানে আত্মার মধ্যে একটা শূন্যতার সক্রিয়তাকে* আত্মার বা মানুষের দুঃখবোধ-

*—'Das Nichtat Nichtet'—Heidegger, quoted by Sartre.

ভয়-উৎকণ্ঠা ইত্যাদির কারণ-রূপে কল্পনা করিয়াছে। সুতরাং ঐ মতে মানুষের চেতনার মধ্যে যে হাহাকার-অভাববোধ-উৎকণ্ঠা-তৃষ্ণা-কামনা অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, তৃপ্তিহীন ও বিসদৃশ (absurd) ভাবে ক্রিয়া করে তাহার কারণ উহার মধ্যে থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় বেদ-উপনিষদের মধ্যে যে একপ্রকার শূন্য-তত্ত্ব বা অনস্তিত্ব-তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই তাহা জীবনের সর্ববিধ 'রস' বা আনন্দের ও অস্তিত্বের মূলে ক্রিয়া করিতেছে। সুতরাং এখানে এই 'রস' বা আনন্দকে তাহার মূলের সহিত যুক্ত করিযা রাখিলে ব্যর্থতা-হাহাকার-অভাববোধ-ভয়-উৎকণ্ঠার কোনও কারণ থাকে না। এই দৃষ্টিতে এক ঊর্দ্ধতর পূর্ণকাম 'নিজবোধরূপ' জীবন-সত্ত্বা তাহার নিজ নিয়মে, নিজমধ্যে নিজস্ব আরাম বা স্বস্তি-আস্বাদের যে 'লীলা' করিয়া চলিয়াছেন, আমাদের জীবনের আরাম বা স্বস্তিলাভ তাহারই এক যান্ত্রিক আনুষঙ্গিক বাহ্যিক অনুকৃতি মাত্র।

এই নূতন ভারতীয় ব্যাখ্যায় সমস্ত চিত্তবৃত্তির এক তুরীয় (transcendental) মহাভাব-রূপ মানুষের ঊর্দ্ধচেতনায় নিহিত আছে। অন্যান্য কামের ন্যায় যৌনকামেরও এক অতিকাম আদিরূপ তথায় নিত্যক্রিয়াশীল। কিন্তু সেখানে চেতন মনের যৌন-কামের ক্ষুদ্রতা-ব্যর্থতা-প্রতিক্রিয়া নাই, আছে 'সহজ-শূন্যতা'র 'সামরস্য' ও পরমা তৃপ্তি, নিত্যপূর্ণতার প্রেমরস। এই তত্ত্ব-বিজ্ঞানকেই তন্ত্র-সহজিয়া-বজ্রযানাদি সাধনমার্গ কাজে লাগাইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মেও নিত্যবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নিত্য-কামলীলার বর্ণনা পাই —

'রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত॥'

অথচ এই অতিকাম-লীলায় লৌকিক জীবনের পুরুষ-স্ত্রী পার্থক্য এমনকি জড়-চেতনের পার্থক্যও লোপ পাইয়াছে।

—'পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষান্মন্মথ মদন' ॥*

এই অত্যদ্ভুত অতিচেতন (Supra-conscious) কামতত্ত্ব, যাহাকে আমরা একপ্রকার মহাকাম বলিতে পারি, তন্ত্র ও তান্ত্রিক-পন্থী যোগ-সাধনায় তাহা মূলাধারে সুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিরূপে এবং ষট্চক্রের মধ্য দিয়া সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিতা-রূপে অনেকখানি, এমন কি প্রধান, স্থান অধিকার করিয়া আছে। নাথ-পন্থী যোগ-সাধনা যাহা মধ্যযুগে ভারতবর্ষে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল তাহাতেও বিন্দুকে, অর্থাৎ শারীরিক চঞ্চল কামতত্ত্বকে, পরমবিন্দুতে অর্থাৎ নিশ্চল অতিকাম-তত্ত্বে মিলিত করার 'কায়া-সাধনা' প্রাণায়ামাদি-সহযোগে বিহিত হইয়াছে। লক্ষণীয় যে এই পরমবিন্দুতে সাধকের সত্ত্বা মিলিত হইয়া এক শূন্য বা পরমশূন্যের মহাসত্যের সন্ধান পায়। যোগসাধনার নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে কিছু কিছু বিভিন্নভাবে হইলেও এই চরম শূন্যতত্ত্ব ও ঊর্দ্ধের অতীন্দ্রিয় কামতত্ত্ব অনেক স্থলেই আভাসিত

*—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮।১২৮ ; ৮।৯৪

হইয়াছে। যথা—শিব-শক্তির মহামিলনক্ষেত্র সহস্রার, ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে মহাশূন্যে অবস্থিত। সেখানে ত্রিকোণ-মণ্ডল বা শক্তি-মণ্ডল, তন্মধ্যে 'তেজোময় বিসর্গাকার মণ্ডল-বিশেষ'। তাহাতে 'কোটিসূর্য-স্বরূপ' বিন্দু বা পরমশিবের অবস্থান। 'ইনিই সৃষ্টিস্থিতি-নাশ-কারী পরমেশ্বর।' ঐ বিন্দু 'সতত বিগলিত সুধা-স্বরূপ।' তাহারও মধ্যে 'অমা-কলা, আনন্দ-ভৈরবী' ও 'ইহার মধ্যে নির্ব্বাণ-কামকলা।' তন্মধ্যে পরমনির্ব্বাণ-শক্তি ও 'তদুপরি নিরাকার মহাশূন্য' ইত্যাদি। এইরূপ ত্রিকোণ-পীঠ ও কামকলা-রূপ তেজোময় মূর্ত্তির কথা ব্রহ্মরন্ধ্রে, গুরুচক্রে ও হৃদয়ে অনাহত-চক্রেও পাওয়া যায়।*

এখানে আমরা পরম-তত্ত্বের বা শূন্য-তত্ত্বের আলোচনার মধ্যে যাইতেছি না, কারণ আমাদের আলোচ্য 'কামরহস্য ও জীবন-সাধনা'র সহিত তাহা সাক্ষাৎ-ভাবে যুক্ত নহে, প্রশ্নটী মূলতঃ তত্ত্ব-দর্শনের। বেদ-উপনিষদ্ ইত্যাদি শাস্ত্রের শূন্য-তত্ত্বের আলোচনার মধ্যেও আমরা যাইব না। কিন্তু পূর্ব্বে যে কথাটীর আমরা ইঙ্গিত দিয়াছি তাহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে উপনিষদ্ হইতে যে 'রসো বৈ সঃ', † অর্থাৎ 'তিনি রস-স্বরূপ' বলিয়া "তাঁহার" সৃষ্ট এই জগৎ-জীবনকে 'আনন্দময়'-রূপে ভাবার চেষ্টা করা হয়, সে 'আনন্দ' বা 'রস' প্রকৃতপক্ষে এক 'অসৎ' বা শূন্য-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, একথা কিন্তু আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। সুতরাং ইহা জাগতিক

*—'যোগী-গুরু', স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস, দ্রষ্টব্য।

†—তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্, ২।৭।১ দ্রষ্টব্য।

জীবনের আনন্দরসের কোনও ঘনীভূত বা সূক্ষ্ম রূপমাত্র নহে, ইহা তাহার এক অতীন্দ্রিয় আদি-রূপ (Prototype), নিম্নচেতনায় যাহার 'মায়িক' প্রকাশ। সে যাহা হউক, এখানেও আমাদের প্রতিপাদ্য শূন্য-তত্ত্বের সহিত এক অতিকাম-তত্ত্বের সহাবস্থিতির কথাই ঘোষিত হইয়াছে। পুনশ্চ আমরা যে শিবরূপী বিন্দুর স্থানে তেজোময় বিসর্গাকার মণ্ডলের কথা পাইতেছি যাহা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের স্থান, তাহার সহিত গীতার মতেরও ভাবগত সাদৃশ্য বোধহয় পাওয়া যাইতে পারে। গীতায় শ্রীভগবান্ সৃজনধর্ম্মী কর্মতত্ত্বকে 'বিসর্গঃ' বলিয়াছেন,* এবং নিজেকে সৃষ্টির 'বীজপ্রদঃ পিতা' এবং প্রকৃতিকে যোনিস্বরূপা বলিয়াছেন।†

এই সমস্ত তত্ত্ব রূপক অথবা বাস্তব সত্য, অথবা রূপকময় পরমসত্য তাহার দার্শনিক আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি না। পূর্ব্বোক্ত যোগশাস্ত্রের কথাগুলিকে এখানে হুবহু আক্ষরিক-ভাবে সর্ব্বত্র গ্রহণও করা হয় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা সুস্পষ্ট যে মানুষের অতিচেতন স্তরে এক ঊর্দ্ধমূল মহাজীবনের গোড়ায়‡ এক পরমসত্য সর্ব্বাধার মহাশূন্যের ও এক সর্ব্বানন্দময়ী কামশক্তির ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি। এই সর্ব্বানন্দময়ী কামশক্তি ঊর্দ্ধে নিত্যসত্য মহাচেতনায় উদ্ভাসিত। ইহাই মহাজীবন। আবার ঐ শক্তিই নিম্নে অনিত্য ও অসত্য অপেক্ষিক চেতনায় প্রতিভাসিত। ইহাই লৌকিক সাধারণ জীবন। সুতরাং এই কামশক্তির মিথ্যা

*—'ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ', গীতা, ৮।৩
†—গীতা, ১৪।৩,৪
‡—'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্', গীতা, ১৫।১

ভোগবিলাসের ক্ষেত্র হইতে সত্য লীলাবিলাসের ক্ষেত্রে উন্নয়নই বাস্তব জীবনসাধনা। প্রথমটীতে স্থিতির মধ্যে চাঞ্চল্যের গতি—বিয়োগ, বিসৃষ্টি। দ্বিতীয়টীতে গতির মধ্যে পরমা স্থিতি—মিলন, সংসৃষ্টি। সুতরাং জাগতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোনও স্তরে সত্যকার লাভ ও তৃপ্তির সার্থকতা একমাত্র ঐ উর্দ্ধমুখী সংসৃজন-ক্রিয়াতেই সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় প্রথমটী আত্মার 'Generation' এবং দ্বিতীয়টী তাহার Regeneration (পৃঃ ৪৪, ৫১) বলা যায়।

সুতরাং কি জাগতিক ক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একই শক্তি ও তাহার প্রতিচ্ছবি যুগপৎ উর্দ্ধদিকে শূন্যময় অদ্বয় সত্যে ও নিম্নদিকে অভাবময় দ্বৈত মিথ্যায় লীন হইতে চাহিতেছে। উর্দ্ধের সেই পরমসার্থক আরাম* বা স্বস্তি-আস্বাদের লীলা নিম্নে এই ক্ষুদ্র-ব্যর্থ-খণ্ডিত আরাম বা স্বস্তিলাভের খেলায় পর্যবসিত। সবটী মিলিয়া একটী বিরাট বিধান (system) যাহার উর্দ্ধদেশের সাম্যময় আত্মলয়ের প্রতিক্রিয়া-রূপে অধোদেশের বৈষম্যময় আত্মবিলয়ের বা আত্মনাশের প্রকাশ পরিদৃশ্যমান। এই প্রতিক্রিয়ামূলক (reactionary) চেতনাই আমাদের জৈব জীবনের 'মূলাধার'। দুঃখ-ব্যর্থতা-হতাশা-বিসদৃশতা এ-জীবনের গর্ভে স্বাভাবিকভাবেই নিহিত। কিন্তু ইহাই উর্দ্ধদিকে সুখ-সার্থকতা-আশা-সুসামঞ্জস্যের মহাজীবনের সহিত সংযুক্ত। নিম্নস্তরের এই বেসুরা ছন্দহীন জীবনকে সেজন্য সহজেই উর্দ্ধস্তরের সুরে ও ছন্দে বাঁধিয়া লওয়া

*—'প্রাণারামং মন-আনন্দম', তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, শিক্ষাবল্লী।

যায়। এই জাগতিক জীবনই তখন হয় মহাজীবনের সোপান। এইখানেই মানুষের সার্থক স্বাধীনতা। ইহাই সংযম-তত্ত্বের স্বরূপ-বিজ্ঞান। সংযম কোনও কৃত্রিম আত্মবঞ্চনা নয়, উহাই স্বাভাবিক আত্মপরিপূর্ত্তি। ইহাকেই বলে ত্যাগের মধ্যে ভোগ, ত্যাগের অভিমুখী ভোগ। ভোগের নিজস্ব কোনও বৈজ্ঞানিক সার্থকতা এজন্য নাই। জীবনের এই মূল নীতিকে অস্বীকার করিলে জীবনে আনন্দময় ব্রহ্মাগ্নি* প্রজ্বলিত না হইয়া দুঃখময় দাবাগ্নিই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

উপরে আমরা যৌনকামের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আলোচনা করিলেও কামরহস্য বলিতে শুধু যৌনকাম বুঝায় না, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জীবনে যাবতীয় আরাম বা স্বস্তিলাভের ইচ্ছা—যাবতীয় কামনাই কাম। মহাজীবনের পরমা তৃপ্তি ও সার্থকতার পথে জীবনকে সংযুক্ত করিতে হইলে এই কাম-কামনার সংযমতত্ত্বের সদর্থক (positive) দিক্‌টী বুঝিতে পারা দরকার। জীবনের কাম-কামনাকে সার্থকভাবে ভোগ করিবার এবং মহাজীবনের পরমসার্থকতায় তাহাকে মিলিত করিবার ইহা একমাত্র চাবিকাটী। 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ইহার মন্ত্র।† আনন্দময় জীবনের দরজা এই মন্ত্রে উন্মোচিত হইয়া যায়। ভোগের কদর্যতা ও হাহাকার ইহার মধ্যে তীব্র হইতে পারে না, স্থায়ী স্থান পাইতে পারে না। ইহাই ভারতের জাতীয় ব্রহ্মচর্য-সাধনার মূল-তত্ত্ব।

*—গীতা, ৪।২৪, ২৫

†—ঈশোপনিষদ্।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে প্রথমে আমরা যৌনকামের দিকেই আমাদের তত্ত্ব-বিচারের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব। পরে সাধারণ-ভাবে জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কামের বা কাম-কামনার কথা জাতীয় ব্রহ্মচর্য-সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু আলোচনা করিব।

জীবনের ঊর্দ্ধস্তরে যে পরমা তৃপ্তি বা আরাম-স্বস্তির নিত্যলীলার আমরা ইঙ্গিত দিয়াছি তাহার সহিত এক পরম শূন্যের ধারণাও সংযুক্ত রহিয়াছে সে-কথা আমরা বলিয়াছি। এই পরম-শূন্যের একটা কৃত্রিম আভাস Existential-দর্শনেও রহিয়াছে তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এখন আধুনিক যৌন-মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া আমরা ইহার কিছু সমর্থন পাই কি না লক্ষ্য করিব।

ফ্রয়েড (Freud)-এর কামতত্ত্বের চমৎকারিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা সত্ত্বেও তাহার স্ববিরোধ ও ভ্রান্ত প্রয়োগ অথবা তাহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানে আমরা ফ্রয়েডের 'দার্শনিক' গবেষণার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিব। ফ্রয়েড প্রধানতঃ বাস্তববাদী যৌন-গবেষণাকারী হইলেও জীবনের শেষ দিকে তিনি কামতত্ত্বের রহস্য-উদ্ঘাটনে যে দুঃসাহসিক 'দার্শনিক' কল্পনাশক্তির ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর এবং আমাদের মতে তাঁহার যৌনকাম-তত্ত্বকে এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক সত্যের অভিমুখী করিয়া তোলার সম্ভাবনায় পূর্ণ। আমরা তাঁহার 'Beyond the Pleasure Principle' গ্রন্থটীর এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার

Death Instinct মতবাদের কথা বলিতেছি। তাঁহার পরিণত বয়সের এই সব গভীর মনস্তাত্ত্বিক 'দর্শন' অনেকে গ্রহণ করিতে চান নাই, কিন্তু ফ্রয়েড নিজে ইহাদের উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। Ernest Jones বলেন—'...within a couple of years ..he came to accept them fully, and as time went on, with increasingly complete conviction. As he once told me, he could no longer see his way without them, they had become indispensable to him.' অর্থাৎ— '...দুই চার বৎসরের মধ্যেই...তিনি এগুলিকে (এই মতবাদগুলিকে) সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যতই সময় যাইতে লাগিল ততই তিনি এগুলিকে ক্রমবর্দ্ধমান ও পরিপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একবার তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি এগুলিকে বাদ দিয়া চলিতে পারেন না, এগুলি তাঁহার পক্ষে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।' * এখানে 'Beyond the Pleasure Principle'—'সুখতত্ত্বের ঊর্দ্ধে' এবং 'Death Instinct' —'মৃত্যু-প্রবৃত্তি', এই দুই তত্ত্বের কোনও আলোচনা সম্ভব নয়। তবে ইহা উল্লেখনীয় যে এই দুইটি তত্ত্বের মধ্য দিয়া ফ্রয়েড যৌন-কামবর্জিত এক আদিমতর বৃত্তিকে জীবনরহস্যের মূলে স্থাপন

---

*—The Life and Work of Sigmund Freud, Ernest Jones (Pelican), p: 510.

করিয়াছেন, যাহাকে প্রাণের আত্মবিনাশ-বৃত্তি বা প্রাণলয়ের বৃত্তি বলা যায়। প্রাণের কোলাহল (ফ্রয়েডের ভাষায় 'clamour')-এর পিছনে যেমন কামবৃত্তি, তেমনি কাম-বৃত্তিরও পিছনে রহিয়াছে এই প্রাণলয়ের বৃত্তি। এবং ফ্রয়েডের মতে কামবৃত্তি প্রকারান্তরে প্রাণলয়-বৃত্তিরই কার্যসাধিকা (handmaid)। সুতরাং ফ্রয়েডের পরিণত বয়েসের সুচিন্তিত চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গেলে প্রাণময়ী কামবৃত্তির পিছনে এক প্রাণলয়ী 'মৃত্যু' বা শূন্যতাকে স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য ফ্রয়েড ইহাকে দার্শনিক কোনও শূন্যতা-তত্ত্বের সহিত সম্পর্কিত করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার মধ্যে আমাদের প্রতিপাদ্য অতিকাম-তত্ত্বের পিছনে অদ্বয়, সত্যরূপ শূন্যতার একটা সাদৃশ্য নিশ্চয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে রাখিতে হইবে বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আমরা জীবনের মূলে, অদ্বয় 'সৎ'-তত্ত্বের পূর্বে, পরম এক 'মৃত্যু' তত্ত্বের কথা পাই। এই 'মৃত্যু' হইতেই মনের সৃষ্টির কথাও আছে।* সাদৃশ্য এখানেও বিশেষ লক্ষণীয়। এই মনই কামের আধার ইহাও স্মরণীয়।

এইটুকু ভূমিকার পর আমরা এখন কামজীবনের কতকগুলি সমস্যার আলোচনায় অগ্রসর হইব। কামের সমস্যা সর্বকালে থাকিলেও এযুগে তাহা নিঃসন্দেহ উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ, এযুগে মানুষের চেতনায় এক বিশেষ কৃত্রিমতা ও জটিলতা

---

*—'নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ। মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। ... তন্মনোঽকুরুত', বৃহদারণ্যক, ১।২।১।

দেখা দিয়াছে। Self-conscious বা আত্মসচেতন ভাব আজ স্বভাবচেতনার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাকৃতিক কারণে—ভারতীয় শাস্ত্রের ভাষায় ত্রিগুণের স্বাধীন ক্রিয়াফলে—এ-যুগে তমঃ ও রজোগুণের প্রাবল্যে ইহা ঘটিয়াছে। কিন্তু 'গুণক্রিয়া' সব সময় যুগপৎ বা একই-সঙ্গে সবগুলি চলে বলিয়া সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালেই চেতনার এক ঊর্দ্ধগতির বা সত্যপ্রকাশের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, এই ভাবেই নানা ধর্ম্মান্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের অধোগামী চেতনাকে স্বস্থানে বা স্বাভাবিক স্থানে ফিরাইয়া আনে। ইহাকেই ভারতীয় শাস্ত্রে 'যুগে-যুগে ধর্ম্মসংস্থাপন'* বলা হইয়াছে। ইহা, ভারতীয় মতে, এক বিশ্ববিধানের নিয়ম, কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতের আবির্ভাবের প্রশ্ন নয়। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান যুগে মানুষের চেতনায় এমন এক আমূল পরিবর্ত্তন বা অধোগমন ঘটিয়াছে যাহা প্রচলিত ধর্ম্মমতবাদ বা সম্প্রদায়-ধর্ম্মের দ্বারা ঠিক সমাধান করা যাইবে না। সেজন্য চেতনারই আজ আমূল এক রূপান্তর প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সাহিত্যে নিষ্করুণ বাস্তবদর্শিতার অন্যতম বিখ্যাত উদ্গাতা রুশ-লেখক Dostoevsky জীবনের বীভৎসতার চিত্র উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়া নূতন ধর্ম্মীয় প্রেরণায় নূতন চেতনার উদ্বোধনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন— '...he championed a renewal of man and life through a change of consciousness in the name of deeper spiritual values'.—

*—'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে', গীতা।

'... তিনি গভীরতর আধ্যাত্মিক মূল্যায়নের নামে চেতনার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া মানুষ এবং জীবনের নবজন্ম-দানের কথা ঘোষণা করেন।' * ইহার প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে Rousseaw যৌনজীবনের নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াও মানুষের চেতনাকে এক সহজ-সরল-স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতায় উদ্ভাসিত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যুগের চাহিদা ইঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

এই চেতনার রূপান্তর এ-যুগের চাহিদা। ইহাকে চরম দিব্যচেতনায় রূপান্তরিত করিবার দিব্য স্বপ্ন দেখিয়াছেন ভারতের এক দার্শনিক মনীষী সাধক শ্রীঅরবিন্দ। আমরা এখানে সেই চরম মানবীয় অভিব্যক্তির কথা বলিতেছি না। আমরা বলিতেছি এক স্বাভাবিক, আত্মস্থ, দৃঢ়-সংযত, সত্যপ্রতিষ্ঠ চেতনার কথা যাহার মধ্যে আত্মসচেতনতা (self-consciousness) অপেক্ষা আত্মজ্ঞান (self-knowledge) হইবে প্রবলতর। আত্মসচেতনাতায় অন্ধ অহঙ্কারের চরিতার্থতা, আত্মজ্ঞানে জাগ্রত বিচারের আত্মপ্রসাদ। এই চেতনার রূপান্তর প্রকৃত পক্ষে চেতনার স্বাভাবিক স্তরে উত্তরণ। চেতনা স্বাভাবিক ও ঊর্দ্ধমুখী স্তরে থাকিলে তাহা হয় 'আত্মা'-সচেতন (soul-conscious), আবার অস্বাভাবিক অধোমুখী স্তরে থাকিলে তাহাকেই বলে আত্মসচেতন (self-conscious)। যোগসাধনার ভাষায় চেতনা যতই

*—Casscll's Encyclopaedia of Literature (Ed. S. H. Steinberg), Vol I, p: 848.

নাভির অধোদেশে কেন্দ্রীভূত হয় ততই তাহা তমোগুণী ও রজোগুণী মোহ, লালসা ও উদ্‌ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া পড়ে। আবার যতই তাহা নাভির উর্দ্ধদেশে কেন্দ্রীভূত হয় ততই তাহা সত্বগুণী ও রজোগুণী নিবৃত্তি, সংযম ও জ্ঞানের মধ্যে স্বীয় স্বরূপের স্বাধীনতা লাভ করে। যৌগিক প্রাণায়াম-চক্রভেদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুক্তিসাধনা বা তাহারই বৃহত্তর সংস্করণ সম্প্রদায়গত মুক্তিসাধনা আমাদের এখানে বিবক্ষিত নয়। কিন্তু এই যৌগিক পরিভাষা হইতে আমরা আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে একটী সুস্পষ্ট সমাধানের ইঙ্গিত পাই। তাহা এই যে মানুষের যাবতীয় অসৎ-প্রবৃত্তি—তাহার স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, কাপুরুষতা, কপটতা, চালাকি, জড়তা, নিষ্ঠুরতা, দম্ভ, অহঙ্কার সমস্তই শরীরের অধোদেশস্থ যৌনকাম-বৃত্তির সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে জড়িত থাকে। মানুষের সত্যিকার মনুষ্যত্ব এ অবস্থায় সুপ্ত বা আচ্ছন্ন। সুতরাং যৌনকামের উপর সংযমের প্রবল প্রভাব বিস্তার না করিলে মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্ব বিকশিত হওয়া দূরের কথা প্রকাশিতই হয় না। যাবতীয় পাপাচার বা সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি (antisocial tendencies) ঐ একটী গভীর, অন্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাসা বাঁধিয়া থাকে এবং বর্দ্ধিত হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সম্ভ্রান্ত-ইতরের পার্থক্য সেখানে থাকে না। এ-কথা ঠিক্ যে প্রচলিত সভ্য-সমাজে মানুষ একপ্রকার 'স্বাভাবিক' সামাজিক জীবরূপে বাস করে। কিন্তু এই 'স্বাভাবিকতা' যে সত্যকার স্বাভাবিকতার caricature বা বিকৃত অনুকরণ মাত্র তাহা প্রমাণিত হয় সর্ব্বদেশে আধুনিক

'সভ্য'-সমাজে সমাজবিরোধী কার্যের ব্যাপকতায়। ইহা যে প্রকৃত স্বাভাবিকতা বা সামাজিকতা নয় তাহা আরও প্রমাণিত হয় আধুনিক কালের সাহিত্য-রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি-শিল্প-দর্শনে প্রায় সর্ব্বত্রই সাধারণ স্তরের মানুষের জীবনে ফিরিয়া যাইবার 'রোমান্টিক' ইচ্ছায়। এক কথায় বলা যায় ইহাই এ-যুগের ইতিহাস। সভ্যতার উপর বিতৃষ্ণা এবং স্বভাব-জীবনের উপর আকর্ষণই ইহার লক্ষণ। প্রসঙ্গক্রমে ইহাকে ফ্রয়েডের ব্যক্তিগত কাম-বৃত্তির 'Regression' বা প্রাচীন-পুরাতন-অতীত অবস্থার দিকে—সহজ-সাম্যাবস্থার দিকে—ফিরিয়া যাওয়ার প্রবণতার সহিত তুলনা করা যায়। মানব-জাতির অবচেতনে—race-unconscious-এ ইহা হয়ত ঐ বৃত্তিরই প্রতিরূপ। কথাটী শুনিতে বেশ, কিন্তু কাম-বৃত্তির পশ্চাদপসরণের ন্যায় এই মানবিক কামনার নিম্নাভিমুখী গতি সত্যিই কোনও সমাধান দেয় কি? 'Repetition-Compulsion' বা আদিম যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির দুর্নিবার প্রবণতায় সেই একই জিনিষের পুনরাবর্ত্তন ঘটে মাত্র। প্রকৃত সহজ-সাম্যাবস্থা যে কি ও কোথায় তাহাই আজ ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে বিচারের বিষয়। সে কথায় আমরা পরে আসিতেছি। ইহাই গণতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের সমস্যা।

ব্যক্তির কাম-বশীভূত জীবন যে সমাজ ও রাষ্ট্রে কতখানি অপরাধ-প্রবণতার সৃষ্টি করে সে বিষয়ে M. Paul. Bureau-র তীক্ষ্ণ উক্তি ও যুক্তির প্রতি ইতিপূর্ব্বেই আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি (পৃঃ ১৩০-৩২)।

সমস্যাটীকে বুঝিবার জন্য একটু তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। অধিকাংশ মানুষই, অন্ততঃপক্ষে সমাজের বেশ কিছু অংশ, বাল্য ও যৌবনের কাম-চাঞ্চল্যের নানা অসামাজিক বিকার ও বিভ্রান্তি কোনওক্রমে পার হইয়া একটা মোটামুটী 'সামাজিক' ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বচ্ছন্দে কাম-সম্ভোগের জীবন যাপন করেন। এইটীকেই তাঁহারা 'স্বাভাবিক' বলিয়া মনে করেন, সমাজও তাহাই মনে করে। আর এক শ্রেণীর বিশেষ মানুষও আছেন যাঁহারা সমাজের প্রচলিত ভাবধারা না মানিয়া একটা কিছু অভাবনীয় কাণ্ড করিতে পারিলে নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। এক্ষেত্রেও কাজটা অসামাজিক পর্যায়ে আর গণ্য হয় না, বরং এই কাম-সাহিত্য, কাম-চলচ্চিত্র, কাম-শিল্পের যুগে এক প্রকার তাহা 'মান্য'ই হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাল্য-কৈশোর-যৌবনের অসামাজিক উদ্‌ভ্রান্তির সময়টা পার করিতে পারিলে পরিণত বয়সের 'পাকা বুদ্ধির' নিত্য কাম-চরিতার্থতায় দোষণীয় কিছুই আর থাকে না। অভিভাবকেরাও এই বাঁধা পথেই চলিয়াছেন বলিয়া ইহাতে ভুলের কিছুই দেখিতে পান না। যে কোনও ভাবে যে রকমের হোক একটা 'বিবাহ' করিলে আর সমাজও কিছু বলে না, বিশেষে কিছু অর্থ-সংস্থান থাকিলে ত কথাই নাই। সুতরাং 'ছেলেমানুষী' 'ভুল-ভ্রান্তি'র অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্বচ্ছন্দে যৌনসঙ্গম চালাইয়া যাওয়াই এখনকার 'স্বাভাবিক' জীবনের ধারা। শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তিকেও বলিতে শুনিয়াছি, 'দুঃখের-জীবনে ঐ একটু সুখই যা' আছে।' জীবনের

সেখানে 'পাপ' বলিয়াও একটা জিনিষ আছে এবং তাহার অলঙ্ঘ্য নীতিও আছে। মানুষের এই আত্মা বা স্বরূপের রাজ্য কামচাঞ্চল্যকে বা কামের দম্ভকে একেবারেই স্বীকার করে না। আমরা নীচের স্তরে বসিয়া যতই তাহার নূতন আয়োজন, বিধি-ব্যবস্থা করি না কেন সমস্তই যথা সময়ে 'উপরের আদালতে' নাকচ হইয়া যায়। Tolstoy তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাসের নায়িকা Anna Karenina-র প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ও উদারভাবাপন্ন। তথাপি তাঁহার উপন্যাসে উদ্ধৃত নীতিবাক্য (epigraph)—'Vengeance is mine, I will repay'—'প্রতিহিংসা আমার হাতে, প্রতিফল আমিই দিব।' যাঁহার এই ঘোষণা তাঁহাকে আমরা জানি না, কিন্তু এই অমোঘ বিধান যে রহিয়াছে ইহা না মানিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতি-গণতন্ত্র-সাম্যতন্ত্র—ব্যক্তিস্বাধীনতা-সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-বিজ্ঞান কিছুই তাহার ধারেপাশে যাইতে পারে না, তাহাকে এতটুকু টলাইতে পারে না। Anna Karenina-র ভাগ্য সম্বন্ধে Dostoevsky সত্যই বলিয়াছেন—'... the Russian author's (Tolstoy's) view clearly considers that no abolition of poverty, no organizing of labour, will save humanity from abnormality, and consequently from guilt and delinquency. ... It is made so clear and intelligible as to be obvious, evil lies deeper in humanity than our

Socialist physicians imagine—that no arrangement of society will eliminate evil, ... the laws of the soul of man are still so unknown ... that there are not as yet, and cannot be, physicians or ultimate judges, but there is only He, who says 'Vengeance is mine, I will repay !'', অর্থাৎ— 'রুশ লেখক (টলষ্টয়)-এর দৃষ্টিতে ইহা স্পষ্টরূপেই বিবেচিত হইয়াছে যে দারিদ্র্য বিদূরিত করিয়া অথবা শ্রমিকদল সংগঠন করিয়া মনুষ্য-জাতিকে অস্বাভাবিকতা, সুতরাং পাপ ও অপরাধ-প্রবণতা হইতে রক্ষা করা যাইবে না। ... ইহা স্বতঃসিদ্ধ-রূপেই পরিষ্কার এবং বোধগম্য হইয়াছে যে আমাদের সমাজতন্ত্রী চিকিৎসকেরা যতদূর কল্পনা করেন তদপেক্ষাও গভীরে পাপ (অমঙ্গল) নিহিত রহিয়াছে, কোনও সামাজিক ব্যবস্থা ইহাকে দূর করিতে পারে না, ... মানুষের আত্মার বিধানগুলি এখনও এত অজ্ঞাত ... যে আজ পর্যন্ত সে-ক্ষেত্রের কোনও চিকিৎসক বা চরম বিচারক নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিতে পারে না, কিন্তু কেবলমাত্র "তিনি" আছেন যিনি বলেন—'প্রতিহিংসা আমার হাতে, প্রতিফল আমিই দিব!" পুনশ্চ—'To Him alone all the secrets of this world and the ultimate fate of man are known.', অর্থাৎ—'এই পৃথিবীর যাবতীয় গূঢ় রহস্য এবং মানুষের চরম ভাগ্য একমাত্র "তাঁহার" নিকটই জানা আছে'।* এই যে

*—The Life of Tolstoy, Aylmer, Maude Vol I, p: 437.

পাপের প্রতিফল ইহা সাধারণ-বুদ্ধিতে সুস্পষ্ট না হইলেও অন্তরের তীব্র অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্য দেয় যে 'পাপ' বলিয়া একটী অনুভূতি মানুষের অন্তরে আপনা হইতে জাগে এবং তাহার ফল আর যাহাই হউক শান্তি-স্বস্তি কখনই নহে। সব কিছুর মধ্য দিয়া কালক্রমে এই নিয়মেরই জয় হয়। সুতরাং যে আরাম বা স্বস্তির পিছনে আমরা ধাবমান তাহা আত্মার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিয়মকে ভঙ্গ করিলে কিছুতেই লাভ করা যাইবে না, পরন্তু অশান্তি-অস্বস্তিই আমাদের অনিবার্যরূপে ঘেরিয়া ধরিবে। অন্য পাপের ক্ষেত্রে না যাইয়া আমরা এখানে যৌনপাপের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতেছি। মানুষের আত্মার রাজ্যে বিবেকের কণ্ঠস্বরকে নিরুদ্ধ করিয়া কোনই লাভ নাই। আজ অবশ্য সব কিছু জানিয়া-শুনিয়াই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই পাপের প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই যুগের চাহিদা—যুগধর্ম্ম। আমরা যে চেতনার রূপান্তরের বা উত্তরণের কথা ভাবিতেছি, এইখানেই তাহার বীজভূমি।

যৌনকাম যে একটী দুর্ব্বার প্রবৃত্তি ইহা কে অস্বীকার করিবে? প্রতি শুক্রবিন্দুর ক্ষরণে যে কয়েক লক্ষ শুক্রকোষ (spermatozoa) ক্ষয়িত ও অপচিত হয় তাহা আজ আর অজ্ঞাত নয়। কী ইহার উদ্দেশ্য? যৌনকামেরই বা উদ্দেশ্য কি? এই সব প্রশ্নের সর্ব্ববাদীসম্মত উত্তর মেলা ভার। তবুও প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গীর নিজস্ব উত্তর অবশ্যই আছে। যৌনকাম জীবনের গোড়ায় দাঁড়াইয়া সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই হ্যাভলক্ এলিসের কথা উল্লেখ করিয়াছি যে যৌনকামই জীবনের

কেন্দ্রীয় সমস্যা। প্রাণসৃষ্টি যদি প্রকৃতির প্রয়োজন হইত তবে এই বিপুলাতিবিপুল অসংখ্য-কোটী শুক্রবীজের অপচয় হইত না। আসলে প্রকৃতির কোনও নিজস্ব 'উদ্দেশ্য' নাই, থাকিতে পারে না। কারণ প্রকৃতি জড়া। যোগ-দর্শনের কথা আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। সংশ্লিষ্ট সংখ্যামতে 'পুরুষ' neutral বা উদাসীন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—জীবনের এই তিনটী ক্রিয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরমশূন্য-স্বরূপ 'দ্রষ্টা' পুরুষের 'সাক্ষী'-ভাবের আশ্রয়ে প্রকৃতির এই প্রাণক্রিয়া—এই জন্ম-জীবন-মৃত্যুর ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। যদি কোনও 'উদ্দেশ্য' থাকে তাহা 'সাক্ষী-চৈতন্য' 'পুরুষ'-এর আত্মোপলব্ধির লীলা অর্থাৎ তাঁহার স্বপ্রমাণিতার 'আনন্দ।' এই স্বপ্রমাণিতার আস্বাদই এই জীবনস্রোতের নিগূঢ় রহস্য। এ-জন্য যে 'শূন্য' হইতে জীবের উৎপত্তি সেই শূন্যে লয়ের অভিমুখেই তাহার গতি। আমরা ভারতীয় মতে অসংখ্য জন্মান্তর বা অভারতীয় মতে অনন্ত স্বর্গ-নরক যাহাই মানি না কেন, এই পরমশূন্য-স্বরূপ মহাসত্যে লয় হওয়াই জীবনের নিয়ত গতি। ইহারই জন্য প্রকৃতির রাজ্যে চলিয়াছে 'অনন্ত' মৃত্যুর স্বাধীনতাময় জীবন-লীলা। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখিতে হইবে মহাসত্যেই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, ভক্তের পরমেশ্বর বা যোগীর পরমাত্মা বিরাজিত আছেন। অনন্ত স্বাধীন অপচয়ের মধ্য দিয়া এই নির্লিপ্ত অনন্তসত্তার আত্মতত্ত্বোপলব্ধি। জাগতিক কাম-কামনার জীবন "তাঁহার" নিত্য-মহালীলারই ছায়া বা প্রতিক্রিয়া-স্রোত। এই অচিন্ত্যনীয় বিরাট স্রোতের স্বাধীন ছন্দই

এক পরমশূন্যতার অভিমুখী—এই তত্ত্ব হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন ছাড়া চৈনিক ঋষি লাও চু (Lao Tzu)-র দর্শনেও আমরা দেখিতে পাই। বাস্তবজীবনের একদিকে তাহা কর্ম্মনীতি-রূপে প্রযুক্তও হইয়াছিল। এই শূন্যতার সত্তা ও তাহার ক্রিয়া উপনিষদেও উদাহৃত হইয়াছে।* এ-সমস্ত তত্ত্বের গভীরে আমরা যাইতেছি না। কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে মনের বা চেতনার এই নেতিকরণ (Negation)-বৃত্তি আধুনিক দর্শনাদিতে, এমনকি সাহিত্যেও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও আজ T. S. Eliot কাব্যসৃষ্টিকে ব্যক্তিত্বের ও ভাবের প্রকাশ (expression) না বলিয়া বিলয় (escape) বলিতেছেন।†

সূক্ষ্ম অন্তর্দ্দৃষ্টির অনুবীক্ষণে দেখিলে যৌনকামও আত্মসৃজনের পরিবর্ত্তে আত্মবিলয়ের প্রবৃত্তি-রূপেই প্রতিভাত হয়। চেতন-জীবনের যাবতীয় কাম-কামনা আসলে শূন্যতা-সপ্রমাণের জন্যই প্রকৃতিতে 'পরিকল্পিত'।‡ এই ভাবেই মহাসত্যের প্রশান্তির আস্বাদ-লাভ ঘটে, 'কাম-সংকল্প' তাহারই নানা সোপান। ফ্রয়েডের ভাব ও ভাষার অনুবর্ত্তনে বলা যায় কামবৃত্তির পশ্চাতে মরণ-বৃত্তির সহিতই পরিচয় ঘটে। মৃত্যুবৃত্তিই জীবনবৃত্তির নিয়ন্তা।

---

*—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২; তৈত্তিরীয় ২।৭।১

†—Selected Essays, T. S. Eliot, quoted by A. G. George, Ph. D.

‡—বৌদ্ধদর্শনের 'অভূতপরিকল্প' তুলনীয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, প্রাক্-আধুনিক যুগেও বিখ্যাত দার্শনিক Schopenhaur মনে করিতেন 'Death is the goal of life'—'মৃত্যুই জীবনের লক্ষ্য', Hartmann লিখিয়াছিলেন—'Philosophy of the Unconscious' বা 'নির্জ্ঞানের দর্শন' এবং মহাকবি Goethe-ও একবার মৃত্যুলক্ষ্যের কথা বলিয়াছিলেন। যৌনপ্রেমের অলভ্যতা বা দূরগ্রাহ্যতার আদর্শ (Shelley), অথবা তাহার শাশ্বত অতৃপ্ত অনুসরণের যন্ত্রণা-মাধুর্য (Keats), রোমান্টিক যুগের এইসব ভাবধারার মধ্যে মৃত্যুবিলাস বা শূন্যতত্ত্বের প্রতি আসক্তি কতটা লুক্কায়িত আছে তাহাও গবেষণার বিষয়।

আমরা যে শূন্যতা ও মৃত্যুতত্ত্বের কথা বলিতেছি তাহা নিশ্চয় কোনও সাধারণ অস্তিত্ত্বের 'অভাব' অথবা দৈহিক জীবনের অবসান মাত্র নয়।

এখন আমরা আর একবার জীব-তত্ত্ব ও শরীর-তত্ত্বের রাজ্যে প্রবেশ করিব। আলোচনার প্রথম দিকের কিছু কিছু উপাদান William Loftus Hare-এর সুলিখিত ও শুভেচ্ছা-প্রণোদিত প্রবন্ধ 'Generation and Regeneration' হইতে সংগৃহীত।* প্রবন্ধটী হইতে কিছু উদ্ধৃতি আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি (পৃঃ ৪৫, ৫১)।

যে মৃত্যু-তত্ত্বের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, জীবতত্ত্ব (biology) বা শরীরতত্ত্ব (physiology) হইতে তাহার কোনও

*—প্রবন্ধটী মহাত্মা গান্ধী-লিখিত 'Self-Restraint V. Self-Indulgence' গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হইয়াছে। বিচার ও সিদ্ধান্ত আমাদের নিজস্ব।

সমর্থন পাওয়া যায় কিনা ইহাই আমাদের বিচার্য। শরীর মরিয়া যায়, ইহার জন্য কোনও অনুসন্ধান প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শরীরের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় যে মৃত্যু-তত্ত্বের মধ্যে নিহিত ইহা নিশ্চয় সূক্ষ্ম গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

আনুবীক্ষণিক যে সমস্ত জীবকোষ (cells) লইয়া জীব-দেহ গঠিত সেই কোষ (cells)-গুলিকেই প্রাণের আদি মাত্রা বা 'unit' বলিয়া ধরা হয়। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগুলির ক্ষুদ্রতম এককোষ (unicellular) জীব কেমন করিয়া নিজে-নিজে দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুই এবং বহুতে পরিণত হয় তাহা আমরা জানি। এই আত্মবিভাজন (fission)-ক্রিয়াই আদিজীব বা মূলজীবের সংখ্যাবৃদ্ধি বা 'বংশ'-বিস্তারের কারণ। সুতরাং এই বিস্তার ঘটিতেছে নিজেকে খণ্ডিত করিয়া। এই যে আত্মধ্বংসের মধ্য দিয়া আত্মসৃজন ইহাই প্রকৃতির মূল বিচিত্র লীলা। ঠিক্‌ভাবে দেখিতে গেলে ধ্বংস বা সৃজন কোনওটাই তাহার লক্ষ্য নয়, অন্তরালের কোনও মহাশক্তির নিরপেক্ষ মহাজীবনের লীলাই এখানে 'অভিপ্রেত', নচেৎ এই দুই বিরুদ্ধ, বিসদৃশের একত্র সমাহার ঘটিতে পারিত না। Metabolism (বিপাক)-ক্রিয়ার মধ্যেও আমরা অনুরূপ-ভাবে katabolism (অপচিতি) ও anabolism (উপচিতি), এই দুই ধ্বংসমূলক ও সৃজনমূলক ক্রিয়াকে একত্র চলিতে দেখিতে পাই। কিন্তু তবুও এই যুগপৎ ক্রিয়ার মধ্যে ধ্বংসের ক্রিয়াই প্রাথমিক প্রয়োজন ইহা শরীরতত্ত্ব-সম্মত কথা। বহুকোষ (multicellular) প্রাণীদেহ বা জীবদেহের

মধ্যেও এই ক্রিয়া দেখা যায়। দেহের জীবকোষগুলি এখানে দুই-ভাবে কাজ করে। একদল প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশের সৃজন-পালন করিবার জন্য আত্মবিভাজন ও আত্মবিস্তারের ক্রিয়া বন্ধ রাখিয়া একপ্রকার আত্মবিলয় সাধন করে। অপর দল প্রাণীদেহের বিশেষ স্থানে রক্ষিত হইয়া বংশবিস্তারের কাজে লাগে। এইগুলিই প্রাণীদেহের 'germ-cells'। ইহারাও বংশবিস্তার ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে প্রয়োজনমত দেহরক্ষার কাজেও আত্মোৎসর্গ করে। এখানেও দেখিতেছি ধ্বংসের ভিত্তিতেই সৃজনের ক্রিয়া। যৌনসঙ্গমের সহিত প্রাণী-দেহের মৃত্যুর সম্পর্কও অতি ঘনিষ্ঠ। অনেক প্রাণী প্রজনন-ক্রিয়ার পরেই দেহত্যাগ করে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। —'Goette has well shown how closely and necessarily bound together are the facts of reproduction and death which may both be described as katabolic crises', অর্থাৎ—'Goette ভালভাবেই দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া প্রজনন এবং মৃত্যুর মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ এবং নিয়ত সম্পর্ক বিদ্যমান। এই দুইটীকেই অপচিতির সংকট বলা যাইতে পারে।' পুনশ্চ—'... Geddes concludes with these remarkable words: "In the higher animals the fatality of the reproductive sacrifice has been greatly lessened, yet death may tragically persist, even in human life, as

তাহা বিষয়টীর মূলের দিকে যায় নাই। Sex-glands বা যৌনগ্রন্থি কোষে—অণ্ডকোষ (testes) এবং ডিম্বকোষ (ovaries) এই উভয়ের মধ্যে—যে যৌনকাম-রস (sex-hormone) প্রচুর পরিমাণে সৃষ্ট হইয়া নর-নারীর দেহ-মনকে যৌনকাম-ভাবে ভাবিত করে এবং যৌনসঙ্গমের উপযুক্ত শারীরিক-মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে ইহা প্রমাণিত। এমন কি শুধু ঐ কোষ (gland)-গুলি নয়, শরীরের অন্যান্য অন্তঃস্রাবী (endocrine) কোষগুলিও এবং বিশেষে পিটুয়িটারী (pituitary) কোষ বিশেষভাবে যৌনকাম-রস সৃষ্টি করার উপযোগী রস-সঞ্চার করে। এই পর্যন্ত আমরা মানুষের জৈব দেহযন্ত্রকেই দেখিলাম। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় কেন এইরূপ ব্যাপার ঘটে তবে জীব-বিজ্ঞান (biology) বা শরীর-বিজ্ঞান (physiology) মাথা চুলকাইবে মাত্র। কারণ জীবনের পিছনে উদ্দেশ্য-নির্ণয়ে তাহাদের দায় নাই। অথবা, আশ্চর্যের বিষয়, এই সব বিজ্ঞানও মানুষের মনোমত উদ্দেশ্য প্রকৃতির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিবে। প্রচলিত মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান হয়ত cerebral cortex-এ চিন্তাভাব ও hypothalamus-এর ভিতরে মানুষের মানসিক আবেগ (emotion)-সৃষ্টির একটা কেন্দ্র খুঁজিতে চেষ্টা করিবে। অধুনা 'conditioned reflex'-এর অধিকতর যান্ত্রিক দৃষ্টি মানসিক ভাব বা আবেগকেও অস্বীকার করে। যৌনকামের মত জীবের এবং মানুষের একটী আদিম প্রবল প্রবৃত্তির ব্যাপারগুলিকে সে-জন্য শেষ পর্যন্ত একটী 'complex uncon-

ditioned reflex' বলিয়া গোঁজামিল দিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। —'... they include phenomena of sexual excitement (libido) which is accompanied and determined by a number of reflexes of a nature of unconditioned inborn activity.', —'... ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে যৌন-উত্তেজনার (কামের) ব্যাপার যাহা কতকগুলি সহজাত 'unconditioned'-প্রকৃতির 'reflex'-এর দ্বারা নিরূপিত ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট।'* তথাপি মস্তিষ্কের উর্দ্ধতর অংশগুলির ক্রিয়ার গুরুত্ব এক্ষেত্রেও অস্বীকৃত হইতে পারে নাই।—'Normally, cortical signalization is enormously important to the libido and the performance of the sexual act.', —'স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ উর্দ্ধ-মস্তিষ্কের বহিঃস্তরীয় (cortical) অংশের নির্দ্দেশ যৌনক্রিয়ার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন'।† এবং যে reflex activity (প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়া) লইয়া এত বাড়াবাড়ি তাহার সূক্ষ্ম ক্রিয়ারহস্য আজও একরূপ অজ্ঞাত। —'We still know very little of the delicate changes taking place in the various nervous structures and in the interconnection of different groups of nerve cells in the course of reflex activility', —'প্রতিবর্ত্ত-ক্রিয়ার সমকালে

---

*—Test-Book of Physiology, Ed. K. M. Bykov, p: 450.

†—Op. cit, p: 452.

স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন সংগঠনে এবং বিভিন্ন স্নায়ুকোষ-মণ্ডলীর পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে এখনও আমরা বিশেষ কিছুই জানি না'।* প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে আমরা Conditioned Reflex-মতবাদের বিরোধী নাই। অতিরিক্ত দার্শনিক-মানসিক তত্ত্বদৃষ্টির অবাস্তবতার বিরুদ্ধে ইহা স্বভাবতঃই আবির্ভূত হইয়াছে। Pavlov এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের যাবতীয় পরীক্ষা ও আলোচনার মধ্যে একটা জিনিষই পরিস্ফুট হইয়া ওঠে যে তাঁহারা মানুষের জীবনে অবাস্তব মননশীলতার ব্যর্থতায় বীতশ্রদ্ধ। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা মানুষের মানসিক-শারীরিক যাবতীয় ক্রিয়াকে বাহ্যিক ও বাস্তব এমন কি স্থূল কার্য-কারণসূত্রে নির্দ্ধারিত করিতে চান। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে 'যান্ত্রিক' জীবনবিজ্ঞান মানসিকতার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ দেহের স্তরে নামিয়া ঊর্দ্ধের অতিমানস স্তরের বৃহত্তর বাস্তব সমস্যার সমাধান কোনও দিন করিতে পারিবে না। অথচ তাহা স্থূল ল্যাবরেটারীর ব্যাপার না হইলেও সূক্ষ্ম যোগ-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত অবশ্যই হইতে পারে। যোগ-বিজ্ঞানের সব কিছু শেষ কথা বলা হইয়া গিয়াছে এমন ভাবিবারও কোনও কারণ নাই। অধ্যাত্মরাজ্যেও এক মহাযান্ত্রিকতার ক্রিয়া মহাবৈজ্ঞানিক নিয়মে সাধিত হইতেছে, এবং ভাবীযুগ বিশ্ববিধানের নিয়মে সেই মহাবিজ্ঞানের গবেষণায় অগ্রসর হইবে ইহাই আমাদের ধারণা। নিছক জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্র

*—Ibid, p 522.

উহা নয়। তবুও এই বিজ্ঞানে মানুষের চেতনা এবং 'স্বাধীন' ইচ্ছাকে যে অস্বীকার করার এত আগ্রহ তাহাও এ-যুগে ঐ কৃত্রিম চেতনার ভার হইতে মুক্তির ইচ্ছার দ্বারাই অনুপ্রাণিত। ইহাও এক আত্মবিলয়েরেই প্রচেষ্টা।

পুং-শুক্রকোশ ও স্ত্রী-ডিম্বকোশের ক্রিয়ার বাহ্যিক কাঠামো শরীরতত্ত্বে নির্ণিত হইয়াছে বটে। কিন্তু যে cerebral cortex-এর ক্রিয়া অর্থাৎ মানুষের চেতনা ও ভাবরাজ্যের ক্রিয়া ইহার জন্য দায়ী তাহার বিষয়ে ইহারা কোনও সত্যজ্ঞান দিতে পারে না। অণ্ডকোশ (testes)-এ কতকগুলি 'seminal tubules'-এ শুক্রকোশ (spermatozoa) উৎপন্ন হয়। প্রথমে তাহারা খণ্ডিত হয় না, তাহাদের কেন্দ্রবস্তু (nuclei)-গুলি segmentation-পদ্ধতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র। পরে বয়ঃপ্রাপ্তির সময়ে শুক্রকোষ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়। ইহারা আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া vas deferens-এর মধ্য দিয়া বীর্যনালী (seminal tubules)-মধ্যে সঞ্চিত থাকে। পরে নানা পেশীসঙ্কোচের ফলে যৌনসঙ্গমের সময় 'seminal vesicles', 'prostate gland' ও 'Cowper's gland'-এর নিঃসৃত রসের সহিত মিশিয়া মূত্রনালীর পথে বহির্গত হইয়া যায়। 'উদ্দেশ্য' স্ত্রী-গর্ভে স্ত্রী-ডিম্বকোষের সহিত মিলিত হইয়া সন্তানোৎপাদন— The entire complex of sexual reflexes ensures the act of fertilization, i.e., the union of the ovum and the spermatozoon.'*

*—Text-Book of Physiology Ed. K. M. Bykov, p: 450.

এদিকে স্ত্রী-দেহেও ডিম্বাশয় (ovary) হইতে এবং পিটুয়িটারী গ্রন্থি ইত্যাদির রসস্রাব হইতে যৌনযন্ত্র-সহ যৌনকামের ক্রিয়ার প্রস্তুতি চলে। পক্ক graafian follicle ঝরিয়া পড়ে, ডিম্বকোষ fallopian tube-এর মধ্যে শুক্রকোষের সহিত মিলিত হয় ও পরে গর্ভাশয় (uterus)-মধ্যে স্থান পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি সবই বুঝিতে পারা গেল। Reflex activity-র ফলে স্তন্যে বা mammary glands-এ দুগ্ধ হইল এবং আরও 'প্রতিবর্ত্ত ক্রিয়া'র ফলে শিশুকে লালন-পালনের ইচ্ছা হইল, তাহাও বুঝা গেল।* কিন্তু জীবনের জন্ম-মৃত্যুর মত এই গুরুতর যৌনক্রিয়ার মূলে সমানে অজস্র প্রশ্ন ও সমস্যা রহিয়া গেল। শুক্রকোষ (tesres)-এর মধ্যে এমন অদ্ভুত প্রজনন-কোশ (spermatozoa) সহসা আবির্ভূত হইল কেন যাহারা নিজেই স্বাধীন-ভাবে চলা-ফেরা করিতে পারে? কেন তাহারা স্ত্রী-গর্ভের প্রজনন-কোষ (ovum)-এর দিকে অগ্রসর হয়? কেন স্ত্রী-প্রজননকোশ একটা নৃত্যের-স্পন্দনের তালে তাহাকে গ্রহণ ও গ্রাস করিয়া ফেলে?† আবার কেনই বা চলন্ত শুক্রকোষ সৃষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হওয়ার সময় নিশ্চল কোষও পাশাপাশি সৃষ্ট হয়? সর্ব্বোপরি স্নায়বিক (সুতরাং মানসিক) কোন্ কারণে পুং-শুক্রকোষ উৎপন্ন হয়? বৈজ্ঞানিককে স্বীকার করিতে হইয়াছে—'The nervous influences on spermatogenesis are not clear

*—Text-Book of Physiology, Ed. Bykov.

†—'The Psychic Life of Micro-Organisms', Alfred Binet.

as yet.', —'স্নায়বিক প্রভাবে কি প্রকারে শুক্রকোষের উৎপত্তি হয় তাহা এখনও অজ্ঞাত।' আধুনিক শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান কতখানি অজ্ঞানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাজ করিতেছে ভাবিলে বৈজ্ঞানিকতার দম্ভ বা মোহ আর থাকে না। স্বীকার করি এত চরম প্রশ্নে যাইবার কোনও প্রয়োজন ইহারা অনুভব করে না। মানুষের দৈহিক কষ্ট দূর করিয়া শরীরকে সুস্থ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাইয়া যদি অহঙ্কারের সম্মোহ উপস্থিত হয়, যদি মানুষের জীবনে রহস্যময় যৌনকাম-বৃত্তিকে ধরিয়া যে অজস্র তীব্রতর ও গভীরতর মানসিক ও শারীরিক সমস্যার স্রোত বহিয়া যায় সেগুলি উপেক্ষিত হয় বা সেগুলিকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সেই দারুণ অবৈজ্ঞানিক মনোভাবকে সমর্থন করা যায় কোন্ যুক্তিতে? মনে রাখিতে হইবে আমরা তথাকথিত ধর্ম্মসাধনা বা নীতিসাধনার কথা বলিতেছি না, আমরা নিতান্তই ইহ-জগতের ইহ-জীবনের কথাই বলিতেছি।

কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যৌনকামের মিলন কাহার জন্য? ইহা মানুষের জন্য একথা কোন্ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বলা হয়? যৌনকোশের জীবনরহস্য কি আজিও অজ্ঞাত নয়? প্রোটিনের প্রক্রিয়া বলিলে কি তাহার ব্যাখ্যা হয়? প্রোটিনও এত অস্থিতিশীল (unstable) যৌগিক পদার্থ কেন, ইহাও দ্রুত নিজের আত্মবিলয় করিতে চায় কেন, তাহা কি জানা আছে? আদি জীবকোষের 'অমর' জীবনের সম্মুখে প্রাণী ও মানুষের

(সভ্য মানুষেরও) দৈহিক জীবন কি নিতান্তই 'মায়ার খেলা' নয়? Weismann-এর ভাষায়—'The body or *Soma* thus appears to a certain extent as a subsidiary appendage of the true bearers of life—the reproductive cells.', —'এইভাবে আমরা দেখিতেছি শরীর কতকটা আনুষঙ্গিক উপাঙ্গ মাত্র, প্রজননকোষই জীবনের সত্যকার অধিকারী।' অর্থাৎ, প্রজনন-কোষেরই সত্যকার জীবন আছে, প্রাণী বা মানুষের জীবন, উপজীবন মাত্র। এই দৃষ্টিতে জীবনকোষের মুখ্য-জীবনের চারিপাশে আমরা 'সভ্য' মানবের দল অনন্তকাল ছায়ামূর্ত্তি প্রেতদলের মত ঘুরিয়া মরিতেছি মাত্র। অথবা Ray Lankester-এর ভাষায়—'... the bodies of the higher animals, which die, may ... be regarded as something temporary and non-essential, destined merely to carry for a time, to nurse and to nourish the more important and deathless fission-products.', —'... মরণশীল প্রাণী-দেহগুলিকে সাময়িক ও গৌণবস্তু বলা যায়, তাহাদের একমাত্র নিয়তিদত্ত কাজ হইতেছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, 'মৃত্যুহীন' ও বিভাজন-প্রক্রিয়াজাত জীবকোষগুলিকে কিছুকাল বহন করা এবং লালন-পালন করা'।* সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টির সম্মুখে মানুষের দেহাত্মবোধী অহঙ্কার ও দেহ-সর্ব্বস্ব সভ্যতা দাঁড়ায়

*—'Generation and Regeneration', W. L. Hare.

কোথায় ? অপরদিকে পাঠক আর এক চিত্র দেখুন। —'Cells not only grow (multiply); they also differentiate. Now differentiation and growth are mutually antagonistic, and this is a profound biological principle — Division and function are not possible at the same time. The more highly differentiated a cell becomes, the more does it lose its power of reproduction.', — 'জীবকোষগুলি কেবল সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; তাহারা বিভিন্ন কাজের উপযোগি-ভাবে স্বভাবের বিভিন্নতা অর্জ্জন করে। সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিভিন্নতা-অর্জ্জন পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং ইহা একটী গভীর জৈববিজ্ঞানিক নীতি। ... সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিশিষ্ট-ক্রিয়া একসঙ্গে চলিতে পারে না। একটী জীবকোষ যত অধিক উচ্চস্তরের বিশিষ্টতা অর্জন করে, তাহা তত অধিক যৌন-প্রজননের শক্তি হারায়'।* অপরদিকে—'Growth is brought about by the change of non-living into living material. All dead matter is potentially living, and we see the transformation of dead into living matter going on ceaselessly. "The molecules of the dead world are waiting to be delivered from the bonds of death", as Lorrain

*—A Text-Book of Pathology, William Boyd, M. D., p: 240.

Smith remarks ··· .', —'নির্জীব পদার্থকে সজীবে রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়াই বৃদ্ধি ঘটে। সমস্ত প্রাণহীন পদার্থই ভিতরের শক্তিতে প্রাণবান্ এবং আমরা ক্রমাগত নির্জীব পদার্থের সজীব পদার্থে রূপান্তর দেখিতে পাই। Lorrain Smith-এর ভাষায়, "মৃত-জগতের অণুগুলি মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তির অপেক্ষা করিতেছে"·· '।* আমরা এখানে কোনও দার্শনিক আদর্শবাদীর কথা উদ্ধৃত করিতেছি না, ইহা বিখ্যাত Pathologist বা রোগবিজ্ঞানীর কথা।

প্রকৃতির রাজ্যে তবে কিসের খেলা চলিতেছে? বাহ্য দৃষ্টিতে অবশ্যই প্রাণসৃজন ও প্রাণরক্ষার খেলা। কিন্তু গভীরের দৃষ্টিতে ধ্বংসের ও মৃত্যুর খেলা। জীবন আসলে এই মৃত্যুর খেলাকে কিছুটা ঠেকাইয়া রাখে মাত্র। ফ্রয়েড ইহা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন সে-কথা আমরা পূর্ব্বে কিছু উল্লেখ করিয়াছি। —'In his opinion ... the instinct of self-preservation, which one might have hoped would be opposed to the death instinct, turned out to be its servant; its only function was to ensure as far as possible that the organism died in its own way, ... — The mute force, operative both in mind and in every single cell of the body, intent on ultimate destruction

*—op. cit, p: 240.

of the living being, performed its work silently.', —'তাঁহার মতে ... আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, যাহা মৃত্যু-বৃত্তির বিরোধী হইবে বলিয়া আশা করা যাইত, তাহাকে মৃত্যু-বৃত্তিরই সেবক-রূপে দেখা গেল; ইহার একমাত্র কাজ হইল লক্ষ্য রাখা যেন প্রাণীদেহটী সম্ভবমত স্বাভাবিক নিয়মে মরে, ... যে নির্ব্বাক্ শক্তি মনে এবং শরীরের প্রত্যেকটী জীবকোষে ক্রিয়া করে এবং প্রাণীর প্রাণনাশই যাহার চরম লক্ষ্য তাহা নীরবে তাহার কাজ করিয়া যাইতে থাকে'।* জীবনের বা প্রাণশক্তির প্রধান অংশরূপে যৌনবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের ধারণা—'It was true that they tended to reinstate earlier forms of being and must therefore form part of the death instinct, but at least their mode of action had the merit of indefinitely postponing the final goal of the latter.', —'ইহা সত্য যে তাহারা (যৌনকামবৃত্তিগুলি) জীবনসত্ত্বার প্রাথমিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে, সুতরাং মৃত্যু-বৃত্তিরই তাহারা অংশ, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়া-পদ্ধতির অন্ততঃ এই গুণ আছে যে তাহা মৃত্যু-বৃত্তির চরম লক্ষ্যটীকে ক্রমাগত ঠেকাইয়া রাখে'।† ইহাই জীবন-নাটকের নেপথ্য-চিত্র, মৃত্যুকে ক্রমাগত ঠেকাইয়া রাখার

---

*—The Life and Work of Sigmund Freud (Pelican), Ernest Jones, pp 508-9.

†—op. cit, p: 508.

চেষ্টা। সুতরাং প্রকৃতির জীবনসৃজনের লীলা মূলতঃ একটী নেতিবাচক (negative) ক্রিয়া। যৌগিক-দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রকৃতি মহাশূন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া এক অভাবমূলক নকল জীবনের বিকৃত অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। এই দৈহিক-মানসিক জীবন সেজন্য শত রকমের ব্যর্থতা, বিসদৃশতা ও বিপর্যয়ে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। যৌন-প্রজননের ক্ষেত্রেও সেই সত্যই নানারূপে ফুটিয়া উঠে। ধ্বংস ও সৃজনের যুগপৎ খেলার কতকগুলি শরীরতত্ত্ব-সম্মত উদাহরণ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। অজস্র কোটী-কোটী শুক্রকোষের প্রাত্যহিক সৃজন ও ধ্বংস ইহার একটী জ্বলন্ত প্রমাণ। নারীদের মাসিক রক্তঃস্রাবও (menstruation) আর একটী উদাহরণ। প্রতিমাসে গর্ভসৃষ্টির অনুকূল জরায়ুর এক অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নির্ম্মম-ভাবে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বহিষ্কৃত করার ধ্বংসলীলাই এখানে প্রকৃতির কাজ। ইহা যে গর্ভাশয়ের haemorrhage বা রক্তক্ষরণ ইহা সুবিদিত। অথচ দীর্ঘকাল গর্ভসৃজনের মিথ্যা সম্ভাবনায় এই মাসিক অবক্ষয় চলিতে থাকে। জীবনে Biology, Physiology ও Pathology-র ক্ষেত্র হইতে সৃজনের পশ্চাতে ধ্বংসের প্রাকৃতিক ক্রিয়ার আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যাপারটীর আরও একটী গুরুত্বপূর্ণ দিক্ আছে। 'সন্তান' সৃজন করিয়া মানুষ যাহাতে 'সুখে ঘরকন্না' করে তাহার জন্য নিশ্চয় প্রকৃতি মনুষ্যদেহ ও কামবৃত্তির সৃষ্টি করে নাই।

মানুষ 'স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে' যৌনমিলনে লিপ্ত হইয়া থাকুক ইহাই নিশ্চয় প্রকৃতির উদ্দেশ্য নয়। উদ্দাম কাম-ভালবাসার ক্ষেত্রে অজস্র বিকার ও ব্যর্থতা এবং যথেচ্ছ কাম-সম্ভোগের ক্ষেত্রে অজস্র ব্যাধির বিড়ম্বনা নিশ্চয় প্রকৃতির 'অনিচ্ছা'ই সূচিত করে। আধুনিক জীব-বিজ্ঞান (biology) এবং শরীর-বিজ্ঞান (physiology)-এর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকেরাও কতভাবে প্রকৃতির নানা 'উদ্দেশ্য' খুঁজিয়া বাহির করেন। কিন্তু এই বিরাট মনুষ্য-জীবনের ক্ষেত্রেও প্রকৃতির এই স্পষ্ট 'অনিচ্ছা'র উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতে দোষ কি? আর যদি সন্তানসৃষ্টি করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলেও মানুষ যে সেই উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিতেছে ইহা নিশ্চয় বলা যায় না। সুতরাং কোনও দিক্ দিয়াই একথা ঠিক নয় যে মানুষ জৈবিক (biological) বা শারীরিক (physiological) প্রকৃতির 'ইচ্ছা'মত যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হইয়া থাকিতেছে। কারণ নিশ্চয় আরও গভীরে।

মানুষ ও সর্ব্বজীবই চায়' স্নেহ-ভালবাসা'—দিতে ও নিতে। জড়বস্তুর রাজ্যেও রহিয়াছে equilibrium-এর 'আকাঙ্ক্ষা'। জীবতত্ত্ব-শরীরতত্ত্বের রাজ্যেও চলিয়াছে 'equilibration'-এর ক্রিয়া।† এই সাম্যের অবস্থা লাভ করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য এবং ভালবাসা-স্নেহ-মিলনের লক্ষ্য এই সাম্য লাভ করা। এই সাম্য যখন পরমসাম্যে উপনীত হয় তাহাই যোগের চরম লক্ষণ।*

*—'ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গঃ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।' —'সমত্বং যোগ উচ্যতে।' গীতা, ৫।১৯, ২।৪৮। † Pavlov.

এই সাম্যের পথে অগ্রসর হওয়াই জীবনব্যর্থতার কেন্দ্রদেশের সার্থকতা। কিন্তু এই স্নেহ-ভালবাসারও স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই এখানেও জীবনচেতনা আত্মধ্বংস বা আত্মবিলয়ের মধ্যে দিয়াই সার্থকতা লাভ করিতে চায় — নিজেকে ও অপরকে নিঃশেষ করিয়াই জীবনের সৃজন-প্রকাশ করিতে চায়। চেতনার এই নিত্যানেতিকরণ (Negation)-বৃত্তি কয়েকজন 'Existential'-দার্শনিকের হাতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।* কিন্তু তাহা তাহার নিম্নমুখী নেতিকরণ-বৃত্তি সে-কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই আত্মবিলয় বা আত্মধ্বংসের একটী বিরাট ঊর্দ্ধমুখী স্তরও রহিয়াছে যেখানে তাহা মৃত্যুকে ধরিয়া অমৃতের স্পর্শলাভ করে, মৃত্যুর পরিবর্ত্তে পরমশূন্যের মহাজীবনের মধ্যে আত্মলয় করে। ভারতীয় দর্শনে ও সাধনশাস্ত্রে এবং পৃথিবীর কোনও কোনও দর্শন-সাধনশাস্ত্রেও ইহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাই 'স্নেহ-ভালবাসা'র দিব্যরূপ ও দিব্যগতি। ইহাকেই শাস্ত্র বলিয়াছেন 'প্রেম' বা 'রস'।† ইহা ত্যাগে ও অনাসক্তিতে, সুতরাং আত্মসংযমে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিম্নস্তরের অধোমুখী আত্মসচেতন (self-conscious) স্নেহ ভালবাসা ঐ প্রেম বা রসের বিকৃতি বা ব্যভিচার মাত্র। তখন তাহা পরমশূন্যের মধ্যে আত্মলয় না করিয়া মৃত্যুর মধ্যে আত্মবিলয় বা আত্মধ্বংস

—*Heideggar, Sartre.

†—'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' তৈত্তরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মানন্দ বল্লী।

করে মাত্র। পরমসত্য হইতে বিচ্যুত এই বৃত্তিকে সেজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন আত্মঘাতী প্রবৃত্তি।* এই 'স্নেহ-ভালবাসা'ই কাম।

সে যাহা হউক, এই আত্মবিলয়-বৃত্তিই জীবনচেতনা হইতে জীবনচেতনার স্থূলরূপ দেহ ও জীবকোষের মধ্যে, বিশেষে যৌন জীবকোষের মধ্যে, সঞ্চারিত হয়। জীবকোষের ও প্রজননকোষের এই আত্মধ্বংস বা আত্মবিলয়ের রীতি আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এই ধ্বংসময় সৃজনের স্রোতে নানা 'রূপ' ও 'দেহ' নানাভাবে ফুটিয়া উঠে জীবনচেতনার রাজ্যে, ঐ প্রবাহের বীজকে পুনরায় ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য। কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপের সৃজন ও পালন তাহার লক্ষ্য নয়। সংখ্যায় সীমাবদ্ধ হইলেও কিন্তু ইহারা ঐ 'অনন্ত' ধ্বংসস্রোতের ধারক। আত্মসঙ্কোচী (centripetal) ও আত্মবিস্তারী (centrifugal) শক্তির সমবায়ে সীমাবদ্ধ প্রজননক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে। ধ্বংস বা 'মৃত্যু' হইতে জাত অজস্র জীবনকণা পুং-শুক্রকোষরূপে উদ্ভূত হইয়া সীমাবদ্ধ সৃজনক্রিয়ার অভিমুখে চালিত হয় এবং অজস্র ব্যর্থতার মধ্য দিয়া এক বা একাধিক 'দেহ'-সৃষ্টি ঘটে, স্ত্রী-ডিম্বকোষের মধ্যে তাহার আত্মবিলয়ের ফলে। ইহাই পুং-শুক্রকোষ ও স্ত্রী-ডিম্বকোষের মিলনরহস্য। ইহাই পরমশূন্যতায় অধিষ্ঠিত মৃত্যুতত্ত্বের জীবনলীলার স্থূল রূপ। ইহার প্রথম অবস্থায় গতিশীল পুং-শুক্রকোষ স্থিতিশীল স্ত্রী-ডিম্বকোষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের অস্তিত্ব হারায়, পরে গর্ভিত (fertilized) স্ত্রী-ডিম্বকোষ জীবকোষের আত্মধ্বংসী আত্মসৃজনের নিয়মে দ্রুত ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া দেহের উৎপত্তি ঘটায়।

*—'আত্মহনো জনাঃ', ঈশোপনিষদ্, ৩।

এই জীবদেহেও আবার আত্মধ্বংসের মধ্য দিয়া আত্মবিস্মৃজনের নানা ক্রিয়া চলে, পূর্ব্বে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি।

জৈব জীবনের মৃত্যুর রাজ্যে 'স্নেহ-ভালবাসা'র এই আত্মবিলয়ের মধ্য দিয়া আত্মবিস্মৃতির যে বহির্ম্মুখী আরাম বা স্বস্তির সন্ধান চলে, ঊর্দ্ধস্তরের পরমশূন্যের পরমানন্দ বা পরমস্বস্তির বিমুখিতাই তাহার কারণ। সত্যকার আত্মলয়ের অভয়শক্তির পরিবর্ত্তে সেজন্য মিথ্যা আত্মবিলয়ের ভয়-দুর্ব্বলতাই এখানে আসিয়া দেখা দেয়। বৈষ্ণব সাধনশাস্ত্রের ভাষায়—

'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেলা।
সে কারণে মায়াপিশাচী তার গলায় বাঁধিলা॥'

যোগবাশিষ্ঠ 'দ্রষ্টা'ভাবের অভাবে 'দৃশ্য'-পিশাচীর আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং চরম বিশ্লেষণে ঐ আদি ভয়ই জীবনচেতনার উৎস এবং ঐ মৌলিক ভয় হইতে এক আত্মরক্ষার অন্ধ আবেগে জৈব জীবনের 'স্নেহ-ভালবাসা' ও কামের প্রকাশ।

অতএব চেতনার রূপান্তরের বা উত্তরণের জন্য যাহা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা এই আদি ভয় হইতে মুক্তি। বলা বাহুল্য, এই ভয় প্রচলিত অর্থে সাধারণ-জীবনের ভয় নহে। ইহা সেই আদি ভয় যাহা জীবনচেতনার মূলে থাকিয়া সর্ব্ববিধ কাম-কামনার ও ভয়ের জন্ম দেয়। এই ভয় অন্যান্য কাম-কামনার সহিত যৌনকামের সহিতও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং যৌনকাম-সংযমও এই ভয়-জয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এই ভাবেই ঘটিতে পারে এ-যুগের বিকৃত ও ব্যাপক আত্মসচেতনতা (self-

consciousness) হইতে মুক্তি। আত্মস্বরূপে আত্মবিচার ও আত্মানুশীলনই ইহার পথ। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আমরা পাই কেমন করিয়া আত্মসচেতনতার প্রথম স্ফুরণে ভয়ের উদ্ভব হইয়াছিল এবং কেমন করিয়া সেই ভয় আত্মস্বরূপের আত্মবিচারের দ্বারাই তিরোহিত হইয়াছিল। এই আত্মস্বরূপ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (ব্রহ্মানন্দ-বল্লী) পরমশূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত 'রস'-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই শূন্যাভিমুখী রস হইতে এতটুকু বিচ্যুতির ফলেও ঐ ভয়ের উৎপত্তি ঘটে তাহাও সেখানে উক্ত হইয়াছে—'যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি'। ইহা বিচারহীন ব্যক্তির ('অমন্বানস্য') ভয়। আবার ঐ বৃহদারণ্যকে আমরা পাই কেমন করিয়া বহির্ম্মুখী চেতনার স্ফুরণ হইতে বহির্ম্মুখী আরামের ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং তাহা হইতে স্ত্রী-পুরুষভাবের সৃষ্টি হইয়া মানুষ-সৃষ্টি এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ 'ভয়' ও 'লজ্জা'র বশে স্তরে স্তরে নীচের দিকে নানা স্ত্রী-পুরুষভাবের সৃষ্টির সহিত নানা জীব-জন্তুর আবির্ভাব ঘটে।* অবশ্য এগুলি সবই পরম-'মৃত্যু'তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত আত্মতত্ত্বের প্রতিক্রিয়ামূলক বহিঃপ্রকাশ। সেজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন মহাশূন্যস্বরূপ আত্মা এই ক্রিয়ার মধ্যে অধিষ্ঠান-রূপে থাকিলেও উপাদান-রূপে নাই। সর্ব্ব-উপনিষদের সার গীতা বলিয়াছেন—

'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিণা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

*—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।৭।১, বৃহদারণ্যক ১।৪।২-৪ দ্রষ্টব্য।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ' ॥*

কথাগুলি অতিসূক্ষ্ম দার্শনিক সত্যের দ্যোতক হইলেও কামসম্ভূত সৃষ্টজগতের প্রতিক্রিয়া-মূলক অস্তিত্ব ও মৌলিক অসারতার প্রকাশক। ইহাই আত্মসচেতন 'স্নেহ-ভালবাসা' ও কামজীবনের স্বরূপ। পরমসত্যসাধনার জীবনে সাধকগণ এ-জন্য এই সহজ, সরল সত্যটীর উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।†

কিন্তু স্নেহ-ভালবাসাই যদি কামজীবনের মূল তবে মনুষ্যসমাজ, যাহা ঐ স্নেহ-ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছে, তাহা দাঁড়াইবে কোথায়? কামাধীন মিথ্যাজীবনের ব্যর্থতাই কি তাহার অনিবার্য নিয়তি? শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষের মিলনের সন্তত প্রবাহই কি মানুষ পুরুষ-স্ত্রীকে যন্ত্রের মত অনন্তকাল ঘুরাইবে? বলা বাহুল্য, ইহাই জীবতত্ত্ব (biology) ও শরীরতত্ত্ব (physiology)-সম্মত সিদ্ধান্ত হইলেও মানুষ আসলে এত অসহায় ও দুর্বল নয়। প্রথম কথা, যে স্নেহ-ভালবাসা ও কাম সাধারণতঃ মানুষের জীবনের সব কিছু অবলম্বন বলিয়া ভাবা হয় তাহা স্বরূপতঃ ঊর্দ্ধ-স্তরের সত্যজীবনের 'শাশ্বত' প্রেম ও 'অমৃত' জীবনরস ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহারই প্রতিচ্ছবি

*—গীতা, ৯।৪-৫।

†—'প্রঃ—কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অবলম্বন করিয়া মানুষের ভিতর কাম-বাসনার উদয় হয়?

উঃ—স্নেহ-মমতা-ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়া।', আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ জী ('সঙ্ঘবাণী')।

লইয়া মানুষের আত্মসচেতন জীবনের খেলা। সুতরাং স্নেহ-ভালবাসা একেবারে মিথ্যা নয়, কামও একেবারে মিথ্যা নয়, কিন্তু ঐ আত্মসচেতন অহমিকার স্নেহ-ভালবাসা ও কাম অবশ্যই মিথ্যা। সুতরাং ঊর্দ্ধের সহিত ভাবসংযোগ-রক্ষাকারীর সংযত জীবনে স্নেহ-ভালবাসা ও কাম উভয়ই সার্থক, প্রকৃত সুখপ্রদ এবং কল্যাণময় হইতে পারে। আধুনিক অন্ধ যৌনবিজ্ঞানের আসুরিক আস্ফালনের সম্মুখে সগৌরবে ইহা স্মরণ রাখিবার মত কথা যে ভারতের "ভগবান্" গীতামুখে বলিয়াছেন—তিনিই যৌনকাম যদি সে কাম জীবনসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।* এত বড় মহাবৈজ্ঞানিক ঘোষণা জগতের আর কোনও ধর্ম্মে আছে কি না জানা নাই। কিন্তু তবুও, দ্বিতীয় কথা আসিবে, মানুষের পক্ষে কি এই জীবনসত্যের সহিত সংযোগরক্ষা করিয়া সংযত-ভাবে চলা সম্ভব? ইহার উত্তর আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি (দ্বিতীয় অধ্যায়) এবং আবার দিব, কারণ আমরা যে জাতীয়জীবনে ব্রহ্মচর্য-সাধনার কথা প্রচার করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি তাহা মধ্যযুগীয় ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনার 'প্রতিক্রিয়া'মূলক ব্রহ্মচর্য নয়। একথারও আভাস আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি (পৃঃ ৩০৭-৮)। আমরা যে জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা এক সুদীর্ঘ যুগ ব্যাপিয়া ভারতে সাধারণ মানুষেরই বাস্তব জীবনে শত ব্যর্থতা, দুর্ব্বলতা ও সমস্যার মধ্যেই সম্ভব হইয়াছিল। এ-কথাও পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জাগতিক-জীবনে স্নেহ-মমতা-ভালবাসার মাধুর্য ও প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, বাস্তববাদী

*—'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।' গীতা, ৭।১১।

ভারতীয় সমাজধর্ম্ম (পরবর্ত্তী মধ্যযুগের সম্প্রদায়ধর্ম্ম নয়) তাহা যথেষ্টই বুঝিত। এজন্য ভারতের বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত-স্মৃতি-পুরাণে সমাজের ও রাষ্ট্রের তথা গৃহপরিবারের ভালমন্দ, দোষগুণ, সুখদুঃখের বহু বাস্তব কাহিনী সর্ব্বত্রই যথোপযুক্ত-ভাবে স্থান পাইয়াছে। অথচ সর্ব্বত্রই একটা ঊর্দ্ধমুখী ('ব্রহ্মমুখী') মুক্তজীবনের পরমসত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখা যায়। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ এবং ভারতের ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম যাহাতে ত্যাগ, সত্য, সংযম, ব্রহ্মচর্য ও বীরত্বের সহিত কল্যাণময় স্নেহ-প্রীতির জাতীয় জীবনসাধনার আদর্শ কার্যকরী করা হইয়াছিল। তাহারই পাশাপাশি কাম-কামনার 'আনন্দ-উচ্ছল' জীবন যে ছিল না, তাহা নহে, সবকিছুর মধ্যে দোষগুণ যে ছিল না তাহাও নহে, কিন্তু মূল সত্যের আদর্শ যে সমাজে স্বীকৃত ছিল তাহাতে তিলমাত্র সংশয় নাই। এ-বিষয়েও আমরা পূর্ব্বে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি (তৃতীয় অধ্যায়)।

সুতরাং নিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে ভারত কামকে বা স্নেহ-মমতা-ভালবাসাকে অস্বীকার করে নাই, পরন্তু ইহাদের ব্যর্থতা ও বিকৃতিকে নিরস্ত করিয়া সার্থক সুন্দর শুভ রূপে ইহাদের প্রকাশের ও ঊর্দ্ধমুখী অভিব্যক্তির পথ করিয়া দিয়াছে, এবং এই বিরাট মানবকল্যাণ-মূলক কার্যে সে-যুগের উপযোগী এক ব্যাপক জাতীয়-পরিকল্পনা (National Planning)-কেও গ্রহণ করিয়াছে। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বাস্তব সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের সমাধানকেও ভারত বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে। এজন্য ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি

সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি সবই হইয়াছে মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে রচিত। সব মানুষই এ-পথে হয়ত সমান সাফল্য লাভ করে নাই, —কোনও আদর্শেই তাহা করে না – কিন্তু সকল মানুষই নিজ নিজ স্বাভাবিক যোগ্যতা-মত সাফল্যলাভের সুযোগ পাইয়াছে। ইহাকেই ভারত বলিয়াছে ধর্ম্মসমাজ ও ধর্ম্মরাষ্ট্র। এই 'ধর্ম্ম' আর কিছু নয়, ইহা সুস্থ, সত্য, স্বাভাবিক, সার্থক জীবন-যাত্রা। ধর্ম্মের এই সংজ্ঞাও আমরা সুদীর্ঘ অপরিচয়ের ফলে বিস্মৃত হইয়াছি। এই ধর্ম্মে স্নেহ-মমতা-ভালবাসা ও কামকে স্তরে স্তরে শাশ্বত প্রেম ও অমৃতত্বের ভূমিতে উন্নীত করারই ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং ভারতের এই 'ধর্ম্মক্ষেত্র'কে 'অমৃতত্ব' ও 'প্রেমসাধনা'র শিক্ষাক্ষেত্র (Training Ground) বলা যাইতে পারে। মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়সাধনার দৃষ্টিতে আমরা ভারতের এই 'শাশ্বত ধর্ম্ম'কে অনেকদিন দেখিতে পাই নাই, তাই বিশ্বাসও হারাইয়াছি।*

ভারতের এই জাতীয় ব্রহ্মচর্যের সাধনা কোনও পাপ-তাপ-আধি-ব্যাধি-ব্যর্থতার ভয়ে ভীত সংযমসাধনাও নয়। জীবনের সব কিছু দুর্ব্বলতা-বিভ্রান্তির মধ্য দিয়াই এই জাতীয় শিক্ষাসাধনার পথ। আদর্শের অভিমুখিতাই ইহার প্রাণ, নীতির স্বীকৃতিই ইহার আনুগত্য, আচরণের নিষ্ঠাই ইহার তপস্যা। ফলাফল লইয়া ইহা বিব্রত নয়। দ্রুত কোনও ফললাভই ইহার সিদ্ধি নয়, সাধনাই ইহার সিদ্ধি, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'। আর সর্ব্বোপরি ইহা ভারতের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট জাতীয় পুনরভ্যুদয়ের—'মহাজাগরণ-মহামিলন-মহাসমন্বয়-মহামুক্তি'র দিব্যস্রোতে উজান বাহিয়া

*—পূর্ব্ববর্ত্তী বিশদ আলোচনা (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

যাওয়ার সাধনা। ইহাই এ-যুগের 'সহজ'-জীবনের সাধনা। এজন্য ভারতের জাতীয় মহাজীবনের যুগে বেদ-উপনিষদ্‌-রামায়ণ-মহাভারত-সংহিতা-পুরাণে যে শাশ্বত সত্যজীবনের সাধনার স্রোত বহিয়া গিয়াছিল তাহারই জীবন্ত-জ্বলন্ত মৃত্যুহীন ঐতিহ্যে বিশ্বাস-সম্পন্ন হওয়াই এই সাধনার মহাশক্তির উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ও আরও মহাপুরুষের ঐ একই বাণী। কে দুর্ব্বল, কে পাপী, কে ইন্দ্রিয়পরায়ণ এ-সব আজ বড় কথা নয়, সকলকেই এই নবযুগে "সর্ব্বনিয়ন্তা"র আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে ইহাই বড় কথা। ব্যক্তিগতজীবনের ব্রহ্মচর্যসাধনা এই জাতীয় জীবনসাধনার পথে যথাসময়ে সহজেই সুসিদ্ধ হইবে।

সুতরাং ইহা মধ্যযুগের কোনও দুঃসাধ্য ব্যর্থতাবহুল, 'স্থূল' দৈহিক সংযমের সাধনা-মাত্র নয়। ইহা মূলতঃ এক মহাভাবের সাধনা যাহা দৈহিক সংযমকে স্বভাবসিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে এই জাতিগঠনের ভাবে উদ্বুদ্ধ জীবনসাধকের দল ক্রমশঃ দেশব্যাপী এই ধর্ম্মসংস্কৃতির ভাবধারাকে ছড়াইয়া দিতে পারে। গীতায়ও এই জাতীয়সাধনার দায়িত্বের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।* রামায়ণ-মহাভারত-সংহিতা-পুরাণ ইহার কথায় পরিপূর্ণ।

প্রসঙ্গক্রমে, স্বাভাবিক যৌনসংযম-সাধনাকে যাঁহারা অসম্ভব কষ্টকর বলিয়া বর্জ্জন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাঁহাদের আমরা অন্য প্রসঙ্গে যৌনতত্ত্ববিৎ Havelock Ellis-এর একটী কথা স্মরণ

*—গীতা, ৩।২০-২১।

করিতে বলি। Ellis বলিয়াছেন—'... it is a mistake to suppose that men and women are afraid of difficulty and pain; all our lives bear witness that both are accepted, even welcomed, when they seem worthwhile ....', —'... নর-নারী কষ্টযন্ত্রণাকে ভয় করে ইহা মনে করা ভুল; আমাদের সমস্ত জীবন ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে ঐ উভয়ই মানুষ গ্রহণ করে, এমন কি বরণ করিয়া লয়, যদি তাহা গ্রহণযোগ্য ও বরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।*

এখন আধুনিক কাম-জীবনের কয়েকটী সমস্যার মধ্যে আসা যাক্। বলা বাহুল্য, আজ অধিকাংশের জীবনে এগুলি হয়ত সমস্যাই নয়, কারণ সমস্যার বিকৃত বা বিভ্রান্ত সমাধানই প্রায় সর্ব্বত্র সত্যসমাধান-রূপে অতি-সহজেই গৃহীত হইতেছে। কিন্তু তথাপি সর্ব্বত্রই যৌনজীবন লইয়া যে নগ্ন বীভৎসতা ও উদ্‌ভ্রান্ত জিজ্ঞাসা দেখা দিতেছে, সর্ব্বদেশের আধুনিক সাহিত্য অন্ততঃ তাহার প্রমাণ। ইহার নমুনা আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে কিছু দিয়াছি। তাহা ছাড়া পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমন কি রাষ্ট্রীয় জীবনে যে উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) ও বিশৃঙ্খলতা সর্ব্বত্র প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহাও জীবনের এই মূল সমস্যা যে তীব্র হইয়া উঠিতেছে তাহারই সাক্ষ্য দেয়।

প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে এখানে বা এই গ্রন্থে আমরা চরম মুক্তিকামী সাধু-সন্তদের জীবনসাধনা লইয়া প্রধানতঃ

---

†—The Future of Marriage' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আলোচনা করিতেছি না। তবে আমরা যে ইতিপূর্ব্বে* ভারতীয় ও অভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি তাহার কারণ যে ধর্ম্মমতগুলি যুগে-যুগে পৃথিবীর মানুষকে নানা-ভাবে প্রকৃত সভ্যতার এবং প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়াছে তাহাদের সর্ব্ববাদি-সম্মত সাক্ষ্য নিশ্চয় অবহেলার বিষয় নয়, মানুষের জীবনসমস্যার ক্ষেত্রে তাহাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু তথাপি এ-কথা সত্য যে এই বিংশ-শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মানুষ যন্ত্রবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব অগ্রগতিতে এতদূর প্রভাবিত হইয়াছে যে শুধু প্রাচীন ধর্ম্মীয় সমাধান দিয়া জীবনসমস্যার কিনারা করা যাইবে না। আজ প্রাচীন ধর্ম্মীয় প্রজ্ঞাকে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে নূতন-ভাবে আবিষ্কার ও প্রয়োগ করিতে হইবে।

কামের স্বরূপ লইয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। তাহা প্রধানতঃ দার্শনিক-যৌগিক-মনস্তাত্ত্বিক অথবা জীবতাত্ত্বিক-শরীরতাত্ত্বিক। কিন্তু এ-যুগের বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্রে বিষয়টীর সম্বন্ধে আরও কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে যাহার যুক্তিসঙ্গত সমাধানে আসা আবশ্যক।

আধুনিক মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনের শান্তি-মুক্তি-জ্ঞান-ভক্তি লইয়া তত আগ্রহান্বিত নয়, সে প্রধানতঃ ইহজীবনের সুখ-শান্তি লইয়াই বিব্রত। তাহার মধ্যেও সুখই তাহার প্রধান কাম্য, শান্তি কেবল অশান্তির হাত হইতে সাময়িক পরিত্রাণের উপায়-রূপে কাঙ্ক্ষণীয়। মানুষের এই লৌকিক সুখশান্তি-স্পৃহা

*—তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তাহার আধ্যাত্মিক জীবন-প্রয়োজনকে একপ্রকার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বলিলেই চলে। তথাপি মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাধীন সত্তা এই লৌকিক চেতনার স্তরেই ননাভাবে সঠিক পথের সন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ইহাই বিজ্ঞান-শরীরতত্ত্ব-জীবতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব-দর্শন এমনকি গৃহ পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাচীনের ভয়-সঙ্কোচ (inhibition)-কে সরাইয়া নূতন পথের সন্ধানে মানুষকে ঠেলিয়া দিতেছে। কিন্তু অত্যুৎসাহী চিত্তের অত্যুত্তেজনায় এ-ক্ষেত্রে শুধু ভ্রান্তি নয় উদ্‌ভ্রান্তি ও বিপর্যয় ঘটিতেছে প্রচুর। ইহাও মানুষের কাম্য নয়। এ-যুগের মানুষ এভাবে এক দোটানার মধ্যে পড়িয়া কাল কাটাইতেছে। সেই জন্যই আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাকে আজ এই নূতন ক্ষেত্রে নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে।

মানুষ এ-যুগে শুধু দৈহিক কামচরিতার্থতা চায় বলিলেই এ-যুগের কাম-মানসিকতার সব কথা বলা হয় না। দৈহিক কামের তৃপ্তিকেই বড় করিয়া দেখিয়া তাহারই মধ্যে পাপের সন্ধান করিলে এ-যুগের মানুষের ঠিক মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করা যাইবে না। 'পাপ' অল্পবিস্তর গভীরভাবে সকল যুগের মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। সেই পাপকে সরাইয়া সত্যজীবনের সুখশান্তি ও শক্তির প্রকাশই মুক্তি। মিথ্যাজীবনের ব্যর্থ প্রবৃত্তিই পাপ, জীবনের সুখশান্তি ও শক্তিকে নাশ করা বা নাশের পথে লইয়া যাওয়াই তাহার কাজ। সুতরাং সকল যুগের সকল মানুষই নানা-ভাবে মুক্তিকেই চায়। পুণ্য বা ধর্ম্মও বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করিলে এই পাপে পরিণত হইতে পারে, তখন নূতন ধর্ম্মান্দোলনকে নূতন-ভাবে পাপমুক্তির সাধনা

প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। এ-যুগে আমরা এইরূপ এক নূতন ধর্ম্মান্দোলনের সম্মুখীন হইয়াছি যেমনটী ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে ঠিক দেখা যায় নাই। এ আন্দোলনের নীতি হইতেছে ইহলোকের মধ্যেই 'পর' অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ' লোকের সন্ধান। মানুষ ইহজীবনের মধ্যেই সত্যজীবনের পথ খুঁজিয়া পাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বলিয়াছি এ-যুগের সাহিত্যে ব্যাপক কামবিকারের মধ্যে একটা সমাধান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল।

কামসংযমের বিরুদ্ধে এ-যুগে প্রায় সর্ব্বব্যাপী একটা প্রবণতা দেখা দিয়াছে। কিন্তু এ-যুগের মানুষ যে কামসংযম একেবারেই করে না বা করিতে বাধ্য হয় না তাহা নহে। নৈতিক কারণে নাই হোক্ কতকটা দৈহিক, কতকটা মানসিক ও কতকটা সামাজিক কারণেই মানুষকে অল্পবিস্তর যৌন আবেগকে সংযত করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এই সংযমের কোনও কারণ বা সঠিক যুক্তি হয়ত সে খুঁজিয়া পায় না। অথচ নর-নারীর যৌন আকর্ষণের 'charm' (সম্মোহ) এ-যুগের অত্যগ্র self-consciousness (আত্মসচেতনতা) কে আশ্রয় করিয়াই মাথা তুলিয়াছে। প্রচলিত ধর্ম্মনীতির কাছে সে মাথা নোয়াইতে রাজী নয়। 'ঈশ্বর' বা পরমসত্যের কোনও নূতন ধারণা আজিও তাহার কাছে পৌঁছায় নাই, সেজন্য জাগতিক জীবনের মধ্যেই সে ঈশ্বর বা পরমসত্যের সন্ধান করিতেছে।

পুরাতন যুগে দেহ-মন-আত্মা সব কিছু লইয়াই একটা গোটা মানুষ উন্নতি বা অবনতির পথে চলিত, সুতরাং দেহের

পাপ ও দেহের অধোগতিও আত্মার ও মনের পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। আজ আত্মা সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং দেহই আজ আত্মার স্থান গ্রহণ করিয়া মনকে লইয়া সব কিছু পরিচালনা করিতেছে। আত্মকর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া মনেরও আজ কোনও স্বাধীনতা নাই, দেহই তাহার পরিচালক। ইহাই 'দেহাত্মবোধ' এবং আজ ইহা 'অজ্ঞান' নয়, জ্ঞানের বিকৃত প্রতিরূপ। আজ সেজন্য ইহা অতিশয় ব্যাপক ও শক্তিশালী। ছান্দোগ্য উপনিষদের দেহাত্মবাদী বিরোচনের মত ইহার তপস্যা দেহসুখবাদী 'আসুরিক' তপস্যা। অথচ আত্মার নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দেহ-মনে একটা 'conflict' বা বিরোধও সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। এই দ্বন্দ্বময় দেহচেতনাই আজ কামেরও নিয়ামক। সর্ব্বদা একটা অস্বস্তিভাব লইয়া সর্ব্বদা যে কোনও উপায়ে একটা সাময়িক স্বস্তির সন্ধানই ইহার স্বভাব ও স্বরূপ। নীতি-দুর্নীতি, শান্তি-অশান্তি, সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। এই বিকৃত, বিভ্রান্ত, আত্মহারা চেতনাই আজ মানুষের "আত্মা'-র স্থান দখল করিয়াছে। মানুষ সেজন্যই সর্ব্বদা এত আত্মসচেতন। অপরিণতবুদ্ধি বালক-বালিকারাও আজ আত্মসচেতনতায় পূর্ণ, বয়স্কদেরত কথাই নাই। তথাপি ইহা যতই বিকৃত হউক ইহা যখন 'আত্মা'-র স্থলাধিকারী, তখন ইহাকে 'গ্রহণ' করিতেই হইবে। এই প্রাথমিক 'স্বীকৃতির' পর আমাদের এ-যুগের সত্যসাধনার পথের সন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে।

সুতরাং এ-যুগের দৈহিক কাম-কামনার জীবনকে মাত্র physical বা দৈহিক বলিয়া দেখা চলিবে না, ইহা psychic বা

মানসিক। কথাটা খুব সাধারণ পরিচিত কথা মনে হইবে, কিন্তু ইহার মধ্যে মারাত্মক নূতনত্ব আছে। দৈহিক জীবনই আজিকার মানসিক জীবন, পৃথক্ মানসিক জীবন (আত্মিক জীবন বহু দূরে) বলিয়া কিছু নাই। আমাদের পূর্ব্বালোচিত 'Conditioned Reflex'-মতবাদ অথবা আধুনিক 'Behaviourism' এই ভাবেরই সমর্থক। এ-যুগের 'Psycho-analysis' বা মনঃ-সমীক্ষণ-বিদ্যায় 'মানসিক' ক্রিয়া-বিক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া হইলেও আসলে তাহা এত নিম্নচেতনা বা 'অবচেতন' লইয়া ব্যাপৃত যে তাহাকেও একপ্রকার দৈহিক ক্রিয়ার সামিল করিতে বাধা নাই। সুতরাং এই অবস্থার মধ্য হইতেই ইহার 'ভুল', 'অসঙ্গতি' বা 'অসম্পূর্ণতা' লক্ষ্য করিয়া আমাদের উপরের দিকে উঠিতে হইবে। এই গ্রন্থের বহুস্থানে আমরা সেই চেষ্টাই করিয়া আসিতেছি।* এই দৈহিক কাম-কামনার মধ্যে পূর্ব্বের মত 'পাপ'-তত্ত্বের কোনও স্থান নাই। যেখানে দেহাতীত কোনও উচ্চতর সার্থকতার বোধ নাই সেখানে 'পাপ'-তত্ত্বের প্রশ্নই আসে না। এ-যুগের নৃত্য-গীত-সাহিত্য-শিল্প-কলা-দর্শন এগুলিও হয় এত বেশী সংবেদনশীল যে ইন্দ্রিয়চেতনায় যান্ত্রিক (mechanical)-ভাবে একটা নূতনত্বের চমক দেওয়াই যেন তাহাদের কাজ, অথবা তাহারা একান্তই স্থূল ও স্পষ্ট-ভাবে যাবতীয় নীতিবাদের বিরোধী এবং জড়বাদ্ বা দেহবাদের সমর্থক। সুতরাং এ-সব ক্ষেত্রেও একপ্রকার সূক্ষ্ম physical mind বা দৈহিক

*—তৃতীয় অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মন ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা করা সম্ভব নয়। মনে রাখিতে হইবে এ-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী speculative philosophy বা কাল্পনিক চিন্তাবাদী দর্শন এবং romantic literature বা কাল্পনিক ভাববাদী সাহিত্যের যুগও অতীত হইয়াছে। তাহাদেরও মধ্যে দেহবাদী মনেরই এক অন্তর্ম্মুখী (introspective) রূপ ছাড়া উচ্চতর বাস্তব সত্য সব সময় ছিল না। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে আমরা পাই যাবতীয় লৌকিক বিদ্যা, এমন কি 'দার্শনিক' ব্রহ্মবিদ্যাকেও বাহ্যিক ও স্থূল 'নাম'মাত্র বলা হইয়াছে। দুঃখাতীত 'ভূমা' সত্যচেতনার সাধনা ইহাদের মধ্যে নাই। সুতরাং এ-যুগের এই দেহাত্মবোধী মনকে সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের সত্যবিচারের ও যুগ-সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

মানুষের রাজসিক ও তামসিক আত্মসচেতনতা আজ এমন এক স্তরে পৌঁছিয়াছে যেখানে তাহার দুর্ব্বিষহ বোঝা সব সময়েই লাঘব করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অবিরল অত্যুগ্র কামের (এখানে আমরা যৌনকাম, ধনকাম, লোককাম সবগুলির কথাই বলিতেছি) অনুসরণ করাই তাহার একমাত্র পথ। কিন্তু এই উগ্র আত্মসচেতনতার মূল কোথায় এবং এ-রোগের প্রকৃত প্রতিকার কোন্ পথে তাহার আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। সে যাহা হউক, এ-যুগের মানুষ যেমন শুধুমাত্র স্থূল শারীরিক কামচরিতার্থতাই চায় না, তেমনি 'সূক্ষ্ম' মানসিক প্রেম-প্রণয়কেও যথার্থ চায় বলা যায় না। তাহার বহু নিদর্শন পৃথিবীর সাহিত্যে ও

মনস্তত্ত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্থবিবাহিতা প্রণয়িণীকে হত্যা করিয়া নূতন প্রণয়ের সন্ধানে ছোটা বা দুঃসাহসিক সমাজবিরোধী (antisocial) অপরাধে লিপ্ত হওয়া এই সব কাহিনী আজ সাহিত্যে বিরল নয় এবং মনস্তত্ত্বে ও বাস্তবজীবনেও অসমর্থিত নয়। সুতরাং এ-যুগের মূলব্যাধি ঐ অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা, এবং তাহা বিসদৃশ কামজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জীবনচেতনায় 'রস' নাই বলিয়াই আজ খোঁচাইয়া রসের সঞ্চার করিবার প্রবণতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 'রস' যে কি বস্তু তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ৪৮৪)। সুতরাং প্রেম-প্রণয়কেও সার্থক-সুন্দর করিতে গেলে ঐ জীবনরসের উৎসের সহিত 'স্বভাব'মত সংযুক্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন। উৎকট আত্মসচেতনতারও উহাই একমাত্র প্রতিকার। 'প্রেম'-জীবন বা বিবাহিত জীবন কিছুই ইহার অভাবে দাঁড়াইতে বা ঠিকপথে চলিতে পারে না। অথচ যৌন-ভিত্তিক প্রণয়-ভালবাসাই এ-যুগের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু স্নেহ-মমতা-ভালবাসার যে আত্মবিনাশী (self-destructive) 'বৈজ্ঞানিক' রূপটী আমরা পূর্ব্বে উদ্ঘাটিত করিয়াছি, তাহার বিচারে এই প্রেম-প্রণয়-ভালবাসার অন্ধ প্রবণতা একটি প্রচলিত কুসংস্কার (superstition)-রূপেই গণ্য হইবে। 'বৈজ্ঞানিক' সত্য পিছনে আছে বলিয়াই এ-যুগের অসত্য প্রণয়লীলায় এত বীভৎসতা ও ব্যর্থতা। বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রেও বিশ্বাসহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিতৃষ্ণা ও বিবাহ-বিচ্ছেদ এজন্য নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার উপর এই দারুণ ব্যাধির ভুল নিদান ও ভুল চিকিৎসা চলিতেছে। হ্যাভলক্ এলিসের মত বিচারশীল লেখকও (হ্যাভলক্ এলিস বিবাহ-বিচ্ছেদের বিশেষ সমর্থক নন, সে কথায় আমরা পরে আসিতেছি) প্রণয়ের 'আর্ট' (art) শিখাইয়া এই মৌলিক জীবনব্যাধির চিকিৎসা করিতে চাহিয়াছেন। 'Art of love' বা কামকলার উপর তাঁহার বিশেষ ঝোঁক। ভারতীয় কামশাস্ত্র, বিশেষে 'বাৎস্যায়ন' তাঁহার কতকটা প্রেরণা যোগাইয়াছে। ফলে ভারতীয়েরা নাকি কামকলায় এরূপ সুনিপুণ যেরূপ পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না, এই তাঁহার মত। —'among the higher races in India, the sexual instinct is very developed, and sexual intercourse has been cultivated as an art, perhaps more elaborately than anywhere else ... .', —'ভারতবর্ষের উচ্চশ্রেণীর মানবগোষ্ঠীদের মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তি খুব বিকশিত এবং যৌনসঙ্গমকে একপ্রকার শিল্প (কলা)-রূপে চর্চ্চা করা হইয়াছে এবং সেরূপ পুনখানুপুঙ্খ-ভাবে আর কোথাও সম্ভব হয় নাই .. '।* Ellis অবশ্য একথা নিন্দাসূচক অর্থে বলেন নাই, কারণ 'art of love' বা কাম-কলা তাঁহার মতে নর-নারীর 'প্রেম' সম্পর্ককে অনেকরকমে বাধামুক্ত ও সফল করিতে পারে। অংশোদ্ধৃত বিশ্বকোষ-গ্রন্থেও মোটামুটী স্বীকৃত হইয়াছে যে ভারতীয় হিন্দুদের জীবনে কামকলার

*—Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol 3, p: 474 (quoted).

সহিত স্বাভাবিক সংযম-পবিত্রতা এবং ছাত্রজীবনে দ্বিজাতিগণের ব্রহ্মচর্য-সাধনা সংযুক্ত ছিল। —'No race has shown such sexual sensibility and knowledge of the science and art of love as the Hindus. ... While both natural chastity and sacerdotal, whether marital or celibate, has been a regular phenomenon ... with ancient rule of continence during the brahmin's study of the Vedas,...' —'হিন্দুদের মত আর কোনও জাতিই সূক্ষ্ম যৌনানুভূতি এবং প্রণয়ের কলা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান দেখায় নাই। ... অথচ কি বিবাহিত কি অবিবাহিত জীবনে স্বাভাবিক এবং ধর্ম্মীয় সংযম-পবিত্রতা বরাবর দেখা গিয়াছে। — দ্বিজাতির বেদপাঠের সময় প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের নিয়ম ...'।* ইত্যাকার কথা তাহা প্রমাণিত করে। কিন্তু বাৎস্যায়নের কামসূত্র লইয়া পাশ্চাত্যের এই আধুনিক বাড়াবাড়ির মধ্যে যদিও প্রকারান্তরে প্রাচীন ভারতীয় সমাজচিন্তার বাস্তবতা ও 'বৈজ্ঞানিকতা' প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও সর্বোপরি মোক্ষশাস্ত্রের ব্যাপক প্রাধান্যের এক পাশেই কামশাস্ত্র স্থান পাইয়াছিল, একথা গৌণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ বাৎস্যায়নের কামসূত্রে যৌনকামের নানা দিক্ নানাভাবে খোলাখুলি আলোচিত হইলেও যুক্তিসম্মত ও পরিশুদ্ধ (refined) আনন্দ-উপভোগই বাৎস্যায়নের প্রতিপাদ্য।

—*op. cit p: 485.

—But Vatsayana, the author of Kamasutra, makes a distinction between higher pleasures and lower pleasures, rational pleasures and sensual pleasures. ... Wealth and happiness should be pursued in harmony with virtue.',
—'কিন্তু কামসূত্রের রচয়িতা বাৎস্যায়ন উচ্চস্তরের আনন্দ ও নিম্নস্তরের আনন্দ, বিচারসম্মত আনন্দ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ আনন্দ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। ... অর্থ এবং কামকে ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে'।* অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে 'ধর্ম্ম' এখানে এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বাৎস্যায়ন কামশাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে কাম বা আনন্দ-উপভোগের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তথাপি তিনি যে এক সুসমন্বিত, সুষ্ঠু ভোগজীবনের প্রবক্তা ছিলেন তাহা প্রমাণ হয় নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে। —'Excessive penance sacrifices happiness. undermines health, and destroys the capacity for earning wealth. ... Excessive indulgence in sexual pleasure sacrifices wealth and dharma. So these should be avoided',
—'অতিরিক্ত তপস্যা কাম (সুখভোগ), স্বাস্থ্য এবং অর্থোপার্জ্জনের শক্তি নষ্ট করে। ... অতিরিক্ত যৌনসম্ভোগ অর্থ এবং ধর্ম্মকে

*—A History of Indian Philosophy, Prof. J. N. Sinha, M. A., Ph. D., Vol I, p: 250.

নষ্ট করে। সেজন্য উহাদের বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে।'†
পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন এদেশে ও বিদেশে হঠাৎ বাৎস্যায়নের কামসূত্রের বহুল-প্রচারের মধ্যে বাৎস্যায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তাহার সহিত প্রাচীন ভারতের সংযম-তপস্যার ভিত্তিতে জীবন-সম্ভোগের আদর্শ কেমন করিয়া বিকৃত হইতেছে। উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে বাৎস্যায়ন উপযুক্ত তপস্যার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন ভারতের জাতীয়জীবনের লক্ষ্য তপস্যার মধ্য দিয়া মহামুক্তির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া। বাৎস্যায়নের কামসূত্র অবাধ, স্থূল যৌনসঙ্গমের গ্রন্থ নহে।

এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ভোগ-সম্ভোগময় রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও রিপু-ইন্দ্রিয়সংযম অর্থাৎ সংযম-ব্রহ্মচর্যের বিধান রহিয়াছে সেকথা আমরা পূর্ব্বে (পৃঃ ২০০) আলোচনা করিয়াছি।

অতএব Havelock Ellis যে 'art of love' বা কামকলার মধ্য দিয়া আধুনিক যুগের নর-নারীর 'প্রেম'-জীবনের তীব্র সমস্যা-সমাধানের আশা করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। প্রদাহ যেখানে গভীর সেখানে এতবাহ্যিক প্রলেপে বিশেষ কাজ হয় না। এ-যুগের জটিল জীবনে কাম-মিলনের যাবতীয় সমস্যা-সমাধানে এইরূপ বাহ্য 'বৈজ্ঞানিক' কায়দা-কানুন বা কৌশল-প্রয়োগে বিশেষ কোনও কাজ হইতে পারে না, ইহা সহজ-বোধ্য। ইহা জটিল, আত্মসচেতনতার যুগ। Ellis নিজেও বহুস্থলে এই-সব কৃত্রিমতার

†—op. cit, p: 250.

বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতে ভোলেন নাই, যথাস্থানে আমরা তাহা দেখাইব।

'Havelock Ellis'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণ্যে যে দারুণ বিভ্রান্তি বিরাজ করিতেছে তাহার নিরসনে আমরা এখানে কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি। Havelock Ellis একটা উদ্দেশ্যহীন, অবাধ যৌনসঙ্গমের স্বেচ্ছাচার প্রচার করিবার জন্য নিশ্চয় লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার গভীরতর 'নৈতিক' উদ্দেশ্য তিনি নিজেই এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—'I approach what may seem only a psychological question not without moral fervor. But I do not wish any mistake to be made. I regard sex as the central problem of life. And now that the problem of religion has practically been settled, and that the problem of labor has at least been placed on a practical foundation, the question of sex ... stands before the coming generations as the chief problem for solution. Sex lies at the root of life, and we can never learn to reverence life, until we know how to understand sex.', —'... যে প্রশ্নটাকে শুধুমাত্র একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন বলিয়া মনে হইতে পারে সেটার প্রতি আমি নৈতিক উৎসাহ লইয়াও অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু

আমি কোনও ভুলই হওয়া চাই না। আমি যৌন-ব্যাপারকে জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যা বলিয়া মনে করি। এবং যেহেতু ধর্ম্মের সমস্যার বস্তুতঃ একরূপ শেষ কথা বলা হইয়াই গিয়াছে. এবং শ্রমিক-সমস্যা অন্ততঃপক্ষে একটা বাস্তব ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে, সেহেতু এখন যৌনজীবনের প্রশ্নটাই সমাধান করিবার প্রধান সমস্যা-রূপে ভাবীযুগের মানুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। যৌন-ব্যাপার জীবনের মূলে রহিয়াছে এবং যৌনজীবনকে ঠিক্‌মত বুঝিতে না শিখিলে আমরা জীবনকেও শ্রদ্ধা করিতে শিখিব না'।* এই ভূমিকাই প্রত্যেক বিচারশীল লোকের চোখ খুলিয়া দিবে কি উদ্দেশ্যে Ellis তাঁহার শ্রমসাধ্য 'Studies in the Psychology of Sex'-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যৌনজীবনের সত্যকার সমাধান যে এখনও বাহির হয় নাই, এবং তাহা খুঁজিয়া বাহির করা যে এ-যুগের মানুষের একটা পবিত্র দায়িত্ব, এই 'সাধারণ ভূমিকা' তাহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। Ellis আভাসে আরও কয়েকটা চিন্তার খোরাক দিয়াছেন। প্রথম, মানুষের জীবন একটা বিশেষ শ্রদ্ধার জিনিষ হেলায়-ফেলায় 'ভোগ' করার জিনিষ নয়। এইরূপ ধীর মতবাদও তাঁহার যৌনস্বাধীনতা-কামী চিন্তাধারায় বহুস্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যৌনজীবনে বাস্তবতার বিশেষ পক্ষপাতী হইলেও তিনি যৌন-জীবনকে কতখানি 'ধর্ম্মীয়' শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে চান তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতেও বুঝা যাইবে। —'Today, we do

*—'Sex and Marriage (Pyramid Edn.), p:—12

not hesitate to approach the miraculous flame of sex as nearly as we can. But the reader will hardly be in a position to do so profitably unless he first puts off his shoes.'—'আজ আমরা রহস্যময় কামাগ্নির অতি নিকটবর্ত্তী হইতে দ্বিধা করি না। কিন্তু পাঠক যদি (পবিত্র দেবস্থানে যাওয়ার মত) আগে পায়ের জুতা খুলিয়া সেখানে না যান তবে তাঁহার পক্ষে লাভবান হওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।' *

যাহা হউক, আধুনিক জীবনে কামের স্বরূপ ও সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের আর একটু অবহিত হইতে হইবে। কাম-সম্বন্ধীয় ধারণায় আধুনিক জৈব মনের বিচারে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহার আভাস আমরা দিয়াছি। যৌনকাম সম্বন্ধে এযুগের ধারণায় একটা দ্বৈধীভাব রহিয়া গিয়াছে। নিত্যদ্বন্দ্বময় যে আধুনিক দৈহিক মনের বর্ণনা আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি তাহার পক্ষে ইহা খুব স্বাভাবিক। চেতনার সামঞ্জস্য-বিধায়ক নিয়ন্ত্রণ তিরোহিত হওয়ায় এযুগে দেহময় মন ও মনোময় দেহ এই দুইটী ভাবই পর্য্যায়ক্রমে মানুষী চেতনায় প্রাধান্য বিস্তার করে। 'মনোময় দেহ' বলিতে কিন্তু কোনও সূক্ষ্ম 'আত্মচেতনাময় দেহ' বুঝায় না, আজ উহা স্থূল 'প্রবৃত্তিচেতনাময় দেহ' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে যৌনকামকে কেবলমাত্র দৈহিক-প্রাকৃতিক ব্যাপার বলিয়া জৈবভাবে গ্রহণ করিবার প্রবণতা যেমন

*—op. cit, p: 28.

একদিকে প্রবল, তেমনি অপরদিকে যৌনকামের ভিত্তিতে প্রেম-প্রণয়কে মানসিক প্রকৃতি বলিয়া মানবিকভাবে গুরুত্ব দিবারও প্রবণতা সমান প্রবল একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ফলে, যৌনকামকে উপলক্ষ্য করিয়া মানুষের আত্মসচেতন অহংকার 'শাঁখারীর করাতের মত' দুই দিকেই কাটিতে সুরু করিয়াছে। অর্থাৎ, মানবীয় মনের দিক্ দিয়া অবস্থাবিশেষে উহাকে নিন্দনীয় বা কদর্য কিছু বলিলে এযুগের চেতনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিবে উহা দৈহিক ও জৈব প্রকৃতি, সুতরাং 'স্বাভাবিক'। আবার জৈব দেহের দিক্ দিয়া উহাকে অবস্থাবিশেষে স্থূল ও নিন্দনীয় বলিলেও ঐ চেতনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিবে উহা মানসিক মানবীয় ভাব, সুতরাং অনিন্দনীয়। এই ভাবেই আধুনিক 'সুবিধাবাদী' আত্মসচেতনতা ক্রিয়া করিতেছে। ইহা অবশ্যই অজ্ঞাতসারে বুদ্ধির চাতুর্যের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে নৈতিক সততার একান্ত অভাব।

ফলে, আমরা কি দেখিতে পাই ? জান্তব দৈহিক ক্রিয়াকে মানুষের মানসিক ক্রিয়ার স্বাভাবিকতার মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করা হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইহা বলা হয় অস্বাভাবিক উপায়ে কামচরিতার্থ করা যেহেতু বানর ইত্যাদি বহু প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়, অতএব উহা স্বাভাবিক ও নির্দ্দোষ এবং উহার অভ্যাস অবাধে সকল মানুষের মধ্যেই চলিতে দেওয়া উচিত।* হ্যাভলক

*—Reny de Gourmont. হ্যাভলক এলিসের 'Studies in the Psychology of Sex' (বঙ্গানুবাদ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির), বয়ঃপ্রাপ্তি—পৃঃ ১২৫ দ্রষ্টব্য।

এলিস অবশ্য ইহা অবাধে প্রশ্রয় দেওয়ার সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তথাপি তিনিও ইহাকে 'not unnatural' অর্থাৎ 'অস্বাভাবিক নয়' বলিয়া আধুনিক মানুষের স্বাভাবিক জীবনে পরিমিতভাবে গৃহীত হইবার সুপারিশ করিয়াছেন, যেহেতু পশুজগতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। † এইরূপ মনোভাবের কারণ কি? নিশ্চয় মূলতঃ 'man is an animal' অর্থাৎ 'মানুষ একটা প্রাণী' বলিয়া। কিন্তু মানুষ প্রাণী হইলেও যে জন্তু নয় এই সহজ সরল সত্যটা মনস্তাত্ত্বিক, জীবতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক (ethnic) নানা যুক্তিজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা হইতেছে। মনোভাব যেখানে প্রতিকূল সেখানে সমর্থনকারী যুক্তির অভাব হয় না ইহা সুবিদিত। কিন্তু মানুষকে এভাবে জন্তুর স্তরে নামাইয়া তাহার স্বাভাবিকতার বিচার করিবার এ প্রবণতা কেন? কারণ নিশ্চয় অন্যত্র। অস্বাভাবিক উপায়ে কামচরিতার্থতার কথা আমরা পরে আলোচনা করিব এবং বর্ত্তমান যুগে কোন্ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ইহাকে সমর্থন করা হইতেছে তাহাও দেখিব। কিন্তু এখানে যাহা আমাদের বক্তব্য তাহা এই যে জীবজন্তুর নজীর দিয়া মানুষকে বিচার করা নিশ্চয় কোনও মানুষেরই কাম্য নয়, এমন কি যাহারা জান্তব ক্রিয়ার সমর্থক তাহাদেরও নয়। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত-ভাবেই যে একটা মানবীয় (দিব্য না হইলেও) আত্মমর্যাদা রহিয়াছে সে তত্ত্বকে অস্বীকার করিলে মানুষকে এবং মানব-সভ্যতাকেই অস্বীকার

†—'Sex Education' প্রবন্ধ, 'Sex and Marriage (Pyramid Ed.), পৃ: ২১১ দ্রষ্টব্য।

করা হয়। এসব ক্ষেত্রে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকের সহায়তায় ও সমর্থনে শরীরতাত্ত্বিকও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি জীবজন্তুর দৈহিক জীবন লইয়া নানা গবেষণায় নানা চমকপ্রদ আবিষ্কারের ফলে তাঁহারা মানুষের শারীরিক ক্ষেত্রে তাহাদের উপযোগিতা প্রমাণ করেন এবং অত্যুৎসাহের বশে মানুষের বিশিষ্ট মানসিক স্তরটীর গভীর রহস্যকে একপ্রকার দৃষ্টির বাহিরে রাখিতে চান। অপর দিকে অসভ্য' (savage) আদিবাসীদের (aboriginals) জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করিয়া 'সভ্য' মানবের পক্ষে কি স্বাভাবিক ও ঠিক তাহা নির্ণয়েরও অনেক চেষ্টা হইয়াছে। ইহারও মূলে আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিম আত্ম-সচেতনতার কুফল হইতে আত্মরক্ষার একটা 'রোমান্টিক' ইচ্ছা রহিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রকৃত 'সভ্য' মানুষের সমাজ গঠন বা পুনর্গঠন করিতে গেলে মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক মানদণ্ড কি আদিম মানুষের জীবনধারার স্থূল, অবিকশিত দিক্‌গুলি হইতে গ্রহণ করিলে চলিবে? পুনরায় যদি প্রশ্ন করা হয় যে জীবজন্তু বা আদিম মানুষের ভিতরে যে অপেক্ষাকৃত সরল, স্বাভাবিক, সংযত যৌনজীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার অনুকরণের কথা বলা হয় না কেন, তবে তাহারই বা উত্তর কি হইবে? জীবজন্তুর ক্ষেত্রে ইহা সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট। 'Mating season' এর 'oestrus' অর্থাৎ যৌনসঙ্গমের বিশেষ কাল ও তৎকালীন কামাবেগ ছাড়া জন্তুদের কামক্রিয়া ঘটে না। আদিম মানুষের সমাজেও যৌনজীবনের নানা সংযম-শুদ্ধতার বিধিনিষেধের

প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া আদিম মানুষের মধ্যে আত্মসচেতন যৌনকামের একান্ত অভাব। * সুতরাং 'সভ্য' মানুষের কামজীবনের সমস্যা-সমাধানে ইহাদের নজীর দেওয়া কতখানি সমীচীন তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

এখানে আমরা একটা সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করিয়া রাখিতে চাই। মানুষের দৈহিক বা মনোদৈহিক (psycho-physical) রূপ লইয়া যতই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হউক মানুষের একটা আত্মিক-মানসিক স্বরূপ রহিয়াছে যাহার সত্তাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ সব কিছু অস্বীকার করিবার স্বাধীনতার মধ্যেও প্রকারান্তরে এই আত্মিক-মানসিক সত্তাই ক্রিয়া করিতেছে। এই আত্মিক-মানসিক সত্তার পরিধি হইতে দেহও বজ্জিত নয়। দেহ তখন সেই সত্তার আত্মোপলব্ধির যন্ত্র। তাহার মূল্যও তখন খুবই বেশী। তাহার সমগ্র প্রবৃত্তিকে ঠিকমত ব্যবহার করিয়া সে তখন সেই আত্মোপলব্ধির অনুকূলে কাজ করিতে পারে। এখানে পুনরায় আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমে আধুনিক মনস্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সহ যৌগিক-দার্শনিক যে বিচার কামপ্রবৃত্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। যৌনকাম-বৃত্তির মধ্যে যুগপৎ আত্মধ্বংসকামী প্রবৃত্তি এবং আত্মলয়কামী নিবৃত্তির যে 'বৈজ্ঞানিক' ক্রিয়ার কথা আমরা বলিয়াছি তাহা আধুনিক যুক্তি-চাতুর্য দিয়া বন্ধ করা যাইবে না। মানুষের দুইটার একটাকে,

---

*—Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol 3, p: 474 দ্রষ্টব্য।

ঊর্দ্ধ অথবা অধোগতিকে, অবলম্বন করিতেই হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় সাধনশাস্ত্রে যৌনকামের সদ্ব্যবহারের স্বীকৃতির উদাহরণও আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। ইহাও লক্ষণীয় যে ভারতীয় সাধনশাস্ত্রে শরীর বা দেহের এক নূতন সংজ্ঞাও রহিয়াছে, দেহ-মন-বুদ্ধি ও 'প্রকৃতি' সবগুলিকে লইয়াই মানুষের 'শরীর' বলা হইয়াছে। * এযুগের আত্মহীনতার ফলে এই চেতনার একত্ব ও সংহৃতি (integrity and homogeneity) প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। দেহ, মন, বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন-বিপর্যস্ত হইয়া কাজ করিতেছে। যে 'dissociation of personality' বা 'split personality' অর্থাৎ দ্বিধাকৃত ব্যক্তিত্বের কথা আজকাল অস্বাভাবিক (abnormal) মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে শোনা যায়, তাহা আজ 'স্বাভাবিক' ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। Mathew Arnold বহুদিন পূর্ব্বে এই যুগব্যাধিকে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—'Our sick hurry and divided aims.'—'মানুষের পীড়িত অস্থিরতা ও লক্ষ্যের অব্যবস্থিততা'। *

ভারতীয় জীবনসাধনায় দেহমনোবুদ্ধি সুসংহত। ব্রহ্মচর্য শুধু দৈহিক শুক্রসংযম নয়। বিখ্যাত অষ্ট্রিয় চিকিৎসক Dr. Wilhelm Stekel (M.D.) যে ব্যঙ্গের সুরে বলিয়াছেন—'The spermatozoa cannot be hoarded'—'শুক্রকোষগুলিকে গাদা করিয়া জমান যায় না'†, তাহা তাঁহার ব্রহ্মচর্য

*—গীতা, ১৩।৫-৬।

*—'The Scholar Gipsy' কবিতা দ্রষ্টব্য।

†—'Sexual Abstinence and Health' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধে অব্যবস্থিতচিত্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী-যাজকদের মধ্যে যে চির-কৌমার (celibacy) ও যৌনসংযম (continence) -এর প্রাবল্য দেখা দেয় তাহা ভারতেও মধ্যযুগীয় সংযমব্রহ্মচর্যের সহিত তুল্যমূল্য। ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের যৌন-ক্রিয়া হইতে বিরত থাকা, সুতরাং শুক্রধারণ করাকেই একমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়। অবশ্য ইহার মধ্যে সাধনার মহত্ব ও ব্যর্থতা দুইয়েরই স্থান ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্য-সাধনা যে আসলে বাস্তব-জীবনে মানবীয় চরিত্র-সাধনা এবং প্রধানতঃ সর্ব্ববিধ মানসিক সংযমের ব্যাপার, এবং তাহার মধ্যে দৈহিক যৌনসংযম স্বভাবতঃই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে—এই দৃষ্টিভঙ্গী ঐ উভয় ক্ষেত্রে গজাইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। কারণ, সমগ্র সমাজে ও দেশে এক সুনিয়ন্ত্রিত আদর্শবাদী কর্ম্মপদ্ধতি হিসাবে এই আদর্শবাদ গড়িয়া উঠে নাই * অথচ ভারতের আদর্শ জাতীয় যুগে এই ভাবেই জাতীয় ব্রহ্মচর্যের সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং ঐতিহাসিক যুগেরও অনেকদূর পর্যন্ত (প্রায় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত) উহা দেশ-জাতি-সমাজ-রাষ্ট্র-গৃহ-পরিবার সব কিছুকে লইয়া এক মানবীয় আদর্শের বিরাট শক্তিরূপে ব্যাপকভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল। এসব কথা আমরা গ্রন্থের বহুস্থানে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং স্বভাবতঃই এই ভারতীয় জাতীয় ব্রহ্মচর্যের সাধনায় স্বাভাবিক ভুল-ত্রুটী-দুর্ব্বলতার যথেষ্ট বাস্তব স্বীকৃতি ছিল,

*—তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্র ও অবস্থানুযায়ী তাহার সংশোধনের ব্যবস্থাও ছিল এবং সর্বোপরি দেশের বিরাট অংশকে সর্ববিধ কামসম্ভোগের মধ্য দিয়াই ধীরে ধীরে ত্যাগ ও সংযম-ব্রহ্মচর্যের মহামুক্তির পথে অগ্রসর করা হইত। প্রেম-প্রণয়-বিবাহ এমনকি সব কিছু স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্য দিয়াই এই জাতীয় মহামুক্তির অভিযান চলিত। সেজন্য দৈহিক স্থূল শুক্রনিরোধকেই কোনও দিন একমাত্র ব্রহ্মচর্যের রূপ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। সত্য-পালন, বীরত্ব, ন্যায়যুদ্ধ, কল্যাণব্রতী রাজনীতি, অর্থনীতি, গৃহ-পরিবারের মহিমা ও ধর্ম্মসঙ্গত সুখসম্ভোগের গুরুত্ব ইত্যাদির মধ্য দিয়া পরমশূন্যমুখী ত্যাগের বা পরমসত্যমুখী আত্মোপলব্ধির গতিই ছিল ব্রহ্মচর্যের স্বরূপ। জড়তা-নিদ্রা আলস্য ভীরুতা কাপুরুষতা-স্বার্থপরতা-সঙ্কীর্ণতা-কপটতা-অস্থিরতা-অসহিষ্ণুতা-পর-নির্ভরতা-আত্মবিশ্বাসহীনতা ইত্যাদি দুর্বল অহংকারের প্রতিকারও ছিল ব্রহ্মচর্যের অঙ্গ। * ভূমা বা শাশ্বত সুখ ছিল ইহার চরম লক্ষ্য। ক্ষুদ্র, অল্প সুখকে ক্রমশঃ প্রত্যাখ্যানই ছিল এই জীবনের স্বরূপ। সুতরাং ইহা ছিল মহাজীবনের সাধনা। 'দুঃখবাদ', 'নৈরাশ্যবাদ', অবাস্তব 'পরলোকবাদ' ইত্যাদি কখনো ভারতীয় জাতীয় মহাজীবনের লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং এই বিরাট জাতীয় জীবনযজ্ঞে মাত্র 'শুক্রকীটকে দেহের মধ্যে পুঞ্জীভূত করা' কোনও দিন কল্পিত হয় নাই। মৃত, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে মধ্যযুগীয় ব্যক্তিগত সম্প্রদায়-সাধনার প্রভাবে (আজিও তাহার

---

*—আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ (সংঘবাণী) দ্রষ্টব্য।

ক্তের চলিতেছে অন্য পরিবেশে) ব্রহ্মচর্যসাধনা-সম্বন্ধে এই অদ্ভুত দৈহিক বীর্যধারণের উপরেই একটা দুর্বল, "ধর্মীয়" কল্পনা-ভাবুকতার বিকার বাসা বাঁধিয়াছে। ইহার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ মধ্যযুগের শেষ দিকে ভক্তি-প্রেমবাদী সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বভাবতঃই ব্রহ্মচর্যকে মাত্র শারীরিক বলরক্ষার সাধনারূপে ক্ষুদ্র করিয়া দেখার প্রবণতাও লক্ষিত হয়। এখনও অনেক সাধনমার্গে ঐরূপ ধারণা প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বমার্গেই ব্রহ্মচর্য-সাধনার প্রয়োজন কতখানি তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। (পঞ্চম অধ্যায়)।* ফলে, এখনও লোকের ধারণা ব্রহ্মচর্য বা বীর্যধারণ না করিলে শরীর দুর্বল হইয়া যাইবে, এবং মাত্র এইজন্যই ইহার প্রয়োজন আছে। এই অবজ্ঞাত ভূমিকায় ব্রহ্মচর্য কতদিন বা কতটুকু টিকিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই আজ দেশব্যাপী কালে ও অকালে, 'স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক' উপায়ে যৌনকাম-চরিতার্থতার নানাবিধ আয়োজন গোপনে ও প্রকাশ্যে গৃহে-পরিবারে-সমাজে অবাধে কাজ করিয়া যাইতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 'ধার্মিক-অধার্মিক' নেতা-জনসাধারণ আজ ইহার বিমূঢ় অসহায় দর্শক। জীবনসত্যের ও জীবনবিজ্ঞানের অবহেলার ইহাই অনিবার্য পরিণতি।

তবে কি শারীরিক বীর্যধারণের কোনও সার্থকতা নাই? অবশ্যই আছে এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ-ভাবেই আছে। কিন্তু ইহাই

---

*—প্রেমভক্তি-মার্গী সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন (পৃ: ৩২২-২৩)।

ব্রহ্মচর্যের— বিশেষে জাতীয় ব্রহ্মচর্যের— একমাত্র দিক্ নয়। মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য পালন করা হইত বস্তু গুরু বা আচার্যের সেবা-সাহচর্যের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের উদ্বোধন করিয়া গৃহধর্ম-সমাজধর্ম-রাষ্ট্রধর্ম ও বিশ্বকল্যাণধর্ম পালনের উপযুক্ত 'নাগরিক' ('citizen') গড়িয়া তুলিবার জন্য। এজন্য আমরা দেখিতে পাই সেযুগের তিন দ্বিজাতিকেই—অর্থাৎ দেশের বিরাট অংশকেই—এই নাগরিকতার শিক্ষা (training in citizenship) গ্রহণ করিতে হইত, নচেৎ সামাজিক মর্য্যাদার হানি ঘটিত। এ-যুগে চাকুরী-ব্যবসা-রাজনীতি ইত্যাদির মধ্য দিয়া 'উচ্চপদ' না পাইলে যে সামাজিক অমর্য্যাদার ভয়ে আমরা ভীত হই, সে-যুগে সেই অমর্য্যাদার ভয় ছিল ব্রহ্মচর্য-পালনের সহিত শিক্ষা গ্রহণ ও মনুষ্যত্ব গঠন করিয়া গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বের সেবার উপযুক্ত হইতে না পারিলে। স্মৃতি-সংহিতার মধ্যে এরূপ ব্যক্তি নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত। এ-সমস্ত কথাই আমরা ইতি-পূর্ব্বে (তৃতীয় অধ্যায়ে) আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং মানবিক চরিত্রসাধনাই ছিল ইহার মূল কথা। ইহার জন্য বসিয়া বসিয়া শুধু দৈহিক শুক্রধারণের চিন্তা ও চেষ্টা করা হইত তাহা নহে, পরন্তু গুরু বা আচার্যের সমীপে সর্ববিধ বিদ্যার 'ট্রেনিং' লওয়া হইত। এই বিদ্যাশিক্ষার তালিকায় সেযুগের শিল্প-বিজ্ঞান-ধর্ম সব কিছুই পড়িত। উপনিষদে * বিভিন্ন বিদ্যা যাহা নারদের ন্যায় মুনি প্রথমে আয়ত্ত করিয়া পরে চরম সুখের শিক্ষালাভের জন্য

*—ছান্দোগ্য, নারদ-সনৎকুমার সংবাদ।

সনৎকুমারের সমীপস্থ হইয়াছিলেন, সেগুলি এইরূপ—চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, ... কালজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, অস্ত্র (যুদ্ধ)-বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা. সর্পবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা। এই সব 'লৌকিক' (secular) বিদ্যা পার হইয়া ভূমা-সুখের পরাবিদ্যা-লাভ।

তবে রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযম এই সমস্ত শিক্ষাসাধনার প্রাণ ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য তাহার অর্থ এই নয় যে 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ' করিয়া দিতে হইত। তাহা হইলে এই শিক্ষার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থীই গৃহে-সমাজে-রাষ্ট্রে নানা কাজকর্ম্ম-ভোগসম্ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতে পারিত না, যাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা সেযুগের ইতিহাস-পুরাণ-স্মৃতিগ্রন্থে পাই।

ব্রহ্মচর্য যে শুধু শারীরিক, স্থূল সাধনা ছিল না তাহার অন্য প্রমাণ আমরা গীতার মধ্যেও পাইয়া থাকি। ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা এই দুইটীকেই সেখানে সমস্তরের ভাবসাধনা-রূপেই ধরা হইয়াছে। ইহার সহিত, সে-যুগে দেহ-মন-বুদ্ধি সবটাকে লইয়া যে 'শরীর' ভাবা হইত এবং 'কাম' দেহের ন্যায় মন এবং বুদ্ধিকেও আশ্রয় করিয়া কাজ করে এইরূপ চিন্তা করা হইত, সে-কথাও বিবেচ্য। † সুতরাং দৈহিক 'বীর্যধারণ' বা অন্যায় শুক্রক্ষয় না-করা শুধু কোনও স্থূল শারীরিক অর্থে 'শুক্রকীট (spermatozoa)-

* — 'ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।', গীতা।

† — গীতা, ১৩।১-৬ ; ৩।৪০।

সঞ্চয়' করাকে বুঝাইত না। অথচ প্রাচীন ভারতীয় গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্রজীবনে এই 'বীর্যধারণ'-রূপ দেহমনের শুদ্ধতা ও শক্তির সাধনাকে দেশের নাগরিক-গঠনের অপরিহার্য পন্থারূপে গ্রহণ করা হইত। কী ইহার রহস্য ? এই রহস্যের সমাধান না হইলে এ-যুগের জাতীয়-জীবনে ব্রহ্মচর্য সাধনার আদর্শ ও নীতি দূর ভবিষ্যতেও প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব।

এই রহস্যের প্রথম সমাধান, ব্রহ্মচর্য ছিল সুখেরই সাধনা। যে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে আজ রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞাননীতির মধ্য দিয়া 'Conquest of Happiness' এর চেষ্টা চলিতেছে *, সে-কালে তাহার মূলে আর একটা নীতিকে অপরিহার্য-রূপে গ্রহণ করা হইত। তাহা মানবনীতি বা মনুষ্যত্ব-সাধনার নীতি। ইহা কতকগুলি মানবীয় গুণের সাধনা। এইভাবে স্বাভাবিক, সহজ, সুস্থ, ও শক্তিমান্ বাস্তব-জীবনের মধ্য দিয়াই ধাপে-ধাপে উচ্চ হইতে উচ্চতর সুখের অধিকারী হওয়া, ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মের অর্থ। ধর্ম্ম বলিতে আজকালকার বাস্তবজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক বা ভাবুক 'spirituality' বা 'আধ্যাত্মিকতা' বুঝাইত না। অথবা মানবধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন 'Religion' বা 'সম্প্রদায়ধর্ম্ম'কেও বুঝাইত না। ধর্ম্ম-অর্থ-কামের 'ত্রিবর্গ' এবং মোক্ষের চতুর্থবর্গ, এ সকলেরই সার্থকতার জন্য যথোচিত মানবীয় গুণের অনুশীলন-কেই ইহাতে গুরুত্ব দেওয়া হইত। এই ধর্ম্মকেই সাধারণভাবে

---

*—Bertrand Russell-লিখিত উক্ত নামের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বলা হইত ব্রহ্মচর্য। ছান্দোগ্য-উপনিষদে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই এই সুখের সাধনাকে জীবন-সাধনার মূল বলিয়া ধরা হইয়াছে। আবার এই সুখের সাধনার জন্য 'ভূমা'র সাধনাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ভূমার সাধনাই ব্রহ্মচর্য। জীবনের প্রারম্ভেই বেদাধ্যয়নের সহিত ইহার অনুশীলন আরম্ভ হইত। *

যে 'ভূমা' বা যথার্থ সুখের কথা আমরা উপনিষদ্ হইতে নির্দ্দেশ করিলাম, ঐ সুখকে 'অমৃতত্ব' বা 'অমৃত' ও বলা হইয়াছে। পরম সুখ ও ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মতত্ত্বোপলব্ধি একই কথা। পার্থিব জীবনে মানুষ মৃত্যুর অধীন। এই মৃত্যুতে এখানকার সব শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুর এই 'সর্ব্বহর' বিপুল শক্তি অমৃত 'আত্মা'রই এক 'বিভূতি'। ¶ বহির্ম্মুখী মৃত্যুর অধীনতাই মানুষের জীবন ও চেতনাকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাবতীয় ব্যর্থ সুখদুঃখের তাড়নায় তাড়িত করে। ইংরাজ কবি Shelley এই মৃত্যুর ঊর্দ্ধের জ্ঞান বা বোধ না থাকাতেই মানুষের জীবনে এত তীব্র অতৃপ্তি-অপূর্ণতা বলিয়াছেন। † যাবতীয় সত্য ও গভীর সুখের সাধনা সেজন্য মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়ার জ্ঞানলাভের সাধনা। কিন্তু ইহা বাস্তব জীবনেই সাধ্য। ‡ ইহাই চেতনার ঊর্দ্ধস্তরে উত্তরণ। সেজন্য যে ভারতীয় জাতীয় জীবনসাধনার কথা আমরা বলিতেছি তাহা অমৃতত্বের বা অমৃতেরই সাধনা। বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত সর্ব্বত্র এই পরম বৈজ্ঞানিক সত্য-

---

*—ছান্দোগ্য, ৭।২২-২৪। ¶—গীতা, ১০।৩৪।
†—'To A Skylark' কবিতা দ্রষ্টব্য। ‡—গীতা, ৫।১৯।

জীবনের সাধনার কথা রহিয়াছে। এই 'বৈজ্ঞানিক' অভিযানে প্রাচীন ভারতীয় জাতি সুদীর্ঘকাল চরম দুঃসাহসের সার্থক পরিচয় দিয়াছে—সমস্তই গৃহ-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বের বাস্তবজীবনের পটভূমিকায়। ইহার ভিত্তি ও মূল অবলম্বন ছিল ব্রহ্মচর্য। এই ব্রহ্মচর্যের সহিত সেজন্য আত্মিক সাধনা,—সত্য-তপস্যা-জ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। —'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্'। * এই ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মচর্যই সেজন্য 'অমৃতের পথ' বলিয়া ভারতীয় শাস্ত্রে বিবেচিত হইয়াছে।

ঐ রহস্যের দ্বিতীয় সমাধান এই যে শারীরিক 'বীর্যধারণ' বা শুক্রসংযমের অভ্যাস-প্রচেষ্টার সহিত ঐ সুখের সাধনা এবং তাহার জন্য মনুষ্যত্বের গুণাবলীর সাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলিয়া গণ্য হইত। সর্ববিধ অস্বাভাবিক বা অন্যায় যৌনকাম-সম্ভোগ হইতে বিরত থাকা বিবাহিত বা অবিবাহিত উভয় জীবনেই শরীর, মন ও বুদ্ধির সুস্থতা, প্রসন্নতা ও শক্তিমত্তার বিশেষ সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ ইহা শুধু 'শুক্রকীট সঞ্চয় করা' ছিল না। আধুনিক শরীরতত্ত্ব (physiology) বলে অসংখ্য 'অফুরন্ত' শুক্রকীটের উৎপত্তি অণ্ডকোশ-মধ্যে প্রাকৃতিক কৌশিক নিঃসারণ (glandular secretion) ও কোষসংখ্যা-বৃদ্ধি (multiplication of cells), এই দুই নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যথেষ্ট যৌনক্রিয়া-সত্ত্বেও

*—মুণ্ডক উপনিষদ্‌, ৩।১।৫।

স্বাভাবিক নিয়মেই যথেষ্ট শুক্রকীট ও বীর্যরস (seminal fluid)-এর পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ঘটিতে পারে। সুতরাং খুব অতিরিক্ত মাত্রায় না হইলে যৌনসঙ্গমে কোনও দৈহিক-মানসিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, ইহাই আধুনিক মত। কিন্তু এই যৌনসম্ভোগবাদী যুক্তিটী পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকে তাহা পাশ কাটাইয়া চলিতেছে। প্রত্যেক যৌনক্রিয়ায় অজস্র শুক্রকীট ও তৎসহ রেতঃপদার্থের নিঃসারণের পিছনে যে মনের ও বুদ্ধির, এক-কথায় আত্মার, সংকল্পের বিশেষ ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান এবং এই শক্তির একটা নিজস্ব সাম্য ও স্বাভাবিকতার মান আছে, এই গভীর তত্ত্বটী আজ বিপজ্জনকভাবে অবহেলিত। অথচ শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের নির্ণীত তথ্য হইতেও ইহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে। যৌন ক্রিয়ায় প্রতি শুক্রবিস্রংসনে অজস্র শুক্রকীটের বহির্গমনের একটা যৌগিক-দার্শনিক ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছি। সেখানে 'মৃত্যুময় জীবনগতি' স্বাধীনভাবে আত্মবিলয়ের মধ্য দিয়া পরমশূন্যে অমৃত জীবনলয়ের অভিমুখে অগ্রসর হয় ইহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং একটী আত্মিক-মানসিক সংকল্পশক্তিই সেখানে ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু শরীরতত্ত্বের দিক্ দিয়াও আমরা অজস্র শুক্রকীট-বিসর্জ্জনের পিছনে ঐ মানস-সংকল্পের অস্তিত্বের আভাস পাই। —'..... it is seen that, if the semen contains spermatozoa less than 20 million per c. c., the subject is usually sterile. In other words, the enormous number is an essential

factor for successful fertilization.', অর্থাৎ— '......ইহা দেখা যায় যে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে দুই কোটীর কম শুক্রকীট থাকিলে সাধারণতঃ গর্ভাধান ঘটে না। ইহার অর্থ গর্ভাধান সফল হইতে গেলে ঐ বিপুল সংখ্যা অপরিহার্য-রূপে প্রয়োজন।' * প্রতি শুক্র-বিসর্জ্জন (ejaculation) পরিমাণে দুই হইতে চার ঘন-সেন্টিমিটার। সুতরাং প্রতি শুক্র-বিসর্জ্জনে চার হইতে আট কোটী শুক্রকীট থাকিবার কথা। জড়বাদী দেহবিজ্ঞান এই বিরাট প্রহেলিকার কোনও সদুত্তর দিতে পারে না। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ অবশ্য টানিয়া-বুনিয়া একটা সমাধান খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জড়বাদী দৃষ্টির একটা অনুমান মাত্র। আসল প্রশ্ন হইতেছে, প্রতি শুক্র-বিসর্জ্জনে চার হইতে আট কোটী শুক্রকীটের কম হইলেই গর্ভাধান ঘটে না কেন? এই নির্দ্দিষ্ট বিপুল সংখ্যার দাবী কাহার? আমরা বলিব ইহা দেহের পশ্চাতে মানস-সংকল্পের স্বাধীনতার দাবী ও তাহারই লক্ষণ। ইহার কমে ঐ স্বাধীনতা ব্যাহত হয় বলিয়া ঐ সংকল্পও ব্যাহত হয়, সেজন্য ক্রিয়াফলও দেখা দেয় না। মানস-সংকল্পের তারতম্য অনুযায়ীই ঐসব ঘটিয়া থাকে। এখানে আমরা দেহবাদের ঊর্দ্ধে মনোবাদের প্রশ্নে আসিয়া পড়িতেছি যাহা এক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাৎভাবে আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ইহা যে কামসংকল্পের একটী স্বাধীন আত্মিক-মানসিক সত্তার গভীর ইঙ্গিত বহন করে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আধুনিক শরীরতত্ত্বের

*—Human Physiology, C. C. Chatterjee, p: 515 দ্রষ্টব্য

বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের পশ্চাতে রহস্যময় ক্রিয়ার যে কোনও জড়বাদী ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না তাহার অনেক ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্ব্বেও দিয়াছি। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা আরও সুপরিস্ফুট হইবে। যে স্নায়বিক বিধান (nervous system)-মধ্যে স্নায়ুশক্তি খেলা করে, সেই স্নায়বিক বিধানে যে স্নায়বিক 'টিস্যু' (tissue)-গুলি কাজ করে তাহারা যুগপৎ এক ও পৃথক্, —'the nerve tissue is simultaneously dismembered and integral', অর্থাৎ তাহাদের ভিতরে যোগসূত্র আছে অথচ নাই।* ভাষাটা শুনিতে অনেকটা শূন্যবাদী দার্শনিক তত্ত্বের মত, অথচ ইহাই শরীরতত্ত্বের রাজ্যে একটা 'বাস্তব' সত্য। আধুনিক পদার্থবিদ্যা (physics) ও গণিতশাস্ত্র (mathematics) অনুরূপ ক্ষেত্রে অনেক-দূর আত্মিক (spiritual) ও মানসিক (mental) রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এরূপ আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে যৌনসঙ্গম এবং শুক্র-বিসর্জ্জনের পশ্চাতে যে এক মানস-সংকল্প ক্রিয়া করে ইহা একদেশদর্শী আধুনিক শরীরতত্ত্বের একতরপা রায়ের উপর নির্ভর করিয়া অস্বীকার করা নিশ্চয় বিজ্ঞ-বৈজ্ঞানিকতা নয়। সুতরাং এই মানস-সংকল্প তাহার স্বনিয়মে সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে না চলিলে 'বিক্ষিপ্ত' যৌনক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে মানুষের দৈহিক, মানসিক

---

*—A Text-Book of Physiology, Ed. K. M. Bykov, (Eng. Tran.), p: 526.

ও আত্মিক অধোগতি (degeneration) ঘটাইবে ইহা অবধারিত। সর্ব্ববিধ কামাসক্তি ও যৌনলালসা মানুষের যে মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিবে, যৌনকোশের 'অফুরন্ত' রস-নিঃসারণ বা শুক্রকীট-উৎপাদনের ক্ষমতার দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করা যাইবে না। স্থূল বীর্যক্ষয়ের প্রশ্ন মাত্র ইহা নয়। ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা অষ্টম ধাতু 'ওজঃ' বা আত্মিক-প্রাণিক-মানসিক সূক্ষ্ম-শক্তির দারুণ অপচয়। এই অপচয়ই মানুষকে তাহার দেহমনোবুদ্ধির 'স্বাভাবিক' একপ্রকার সক্রিয়তা-সত্বেও পশুত্বে অবনমিত করিতে পারে। দৈহিক অপচয়কে ভিত্তি করিয়াই ইহা সংঘটিত হয়, সেজন্যই দৈহিক শুক্র-অপচয়ের গুরুত্ব এতখানি। ইহাতে শরীরের সুস্থ ও স্বাভাবিক ক্রিয়াও যে অনেক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে তাহাও প্রমাণিত। তথাপি ইহার মূলে রহিয়াছে আত্মিক-মানসিক জীবনের বিক্রিয়া, দৈহিক অধোগতি যাহার অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া মাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও ব্রহ্মচর্য-সাধনার গুরুত্ব উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য মূলতঃ মাত্র শুক্র-সংযমের ব্যাপার নয় বলিয়াই নারীদের ক্ষেত্রেও মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহার গুরুত্ব একই প্রকার। যে হরমোন্ (hormone) বা কাম-রসের নিঃসারণের ফলে পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গের বিকাশ ও ক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহার মধ্যে একটা যোগ পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের দেহ হইতে উভয় জাতীয় হরমোন্ নিঃসৃত হয়। * এমনকি পিটুয়িটারী

*—Human Physiology, C. C. Chatterjee, p: 510 দ্রষ্টব্য।

(pituitary) কোশ হইতে যে যৌনাঙ্গবর্দ্ধক ও যৌনকাম-উত্তেজক রস (gonadotropic hormones) নিঃসৃত হয় তাহাও পুরুষ ও নারীর পক্ষে একই, কেবল যে আধারে গিয়া তাহা পড়ে তদনুযায়ী তাহার ক্রিয়া হয়। * Sexual differentiation বা যৌনপার্থক্য হওয়ার পূর্ব্বে এবং পরে প্রাণীদেহে প্রজনন-কোষ (germ-cells) -এর ক্রিয়া-সম্বন্ধেও কতকগুলি ঐক্য দেখা যায়। এই দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও মৌলিক ভেদ নাই। পুরুষের মধ্যে নারীভাব এবং নারীর মধ্যে পুরুষভাব মনস্তত্ত্ব ও শরীরতত্ত্বে প্রমাণিত। Hermaphrodite বা উভলিঙ্গ প্রাণীর অস্তিত্বও এই দিক্ দিয়া তাৎপর্যপূর্ণ।† সুতরাং testes (পুং-অণ্ডকোশ) ও ovary (স্ত্রী-ডিম্বকোশ) যে-দিক্ দিয়াই কাম-সংকল্পের ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ হোক্, তাহার সংযমের সুফল ও অসংযমের কুফল উভয়ক্ষেত্রেই দেহমনোবুদ্ধির মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিবে। সংযম-ব্রহ্মচর্যের সাধনা এজন্য নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমমূল্য।

যৌনকাম যে একটি মানসিক-দৈহিক ইচ্ছা ইহা অবশ্য সকলেই বোঝে। কিন্তু এই সচেতন, দৈহিক মন ছাড়া যে একটি নিশ্চেতন আত্মিক মন আছে যাহা প্রাণশক্তির সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত, যাহা যাবতীয় সচেতন বা অচেতন ক্রিয়ার নিয়ন্তা, এই গভীর তথ্যটি ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানে ও আয়ুর্ব্বেদ-দর্শনে

*—A Text-Book of Physiology. Ed. K. M. Bykov, (Eng. Tran.), p : 448 দ্রষ্টব্য।

†—'Generation and Regeneration', W. L. Hare, দ্রষ্টব্য।

বিশেষভাবে স্বীকৃত। আমরা বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক সুরেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্তের গ্রন্থ * হইতে উদ্ধৃতিসহ এখানে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

আয়ুর্বেদকে 'Science of Life' বা জীবন-বিজ্ঞান বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সহিত দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টির বিচিত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই মতে দেহ ও দৈহিক জীবনের উর্দ্ধে মানস জীবন রহিয়াছে এবং তাহারও উর্দ্ধে আত্মিক জীবন রহিয়াছে। উর্দ্ধ হইতেই দৈহিক জীবন নিয়ন্ত্রিত ও তাহার ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হয়। — '...according to Caraka, the self is active and...by its activity the mind moves ; and it is by the operation of mind that the senses move.'। † ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আয়ুর্ব্বেদাচার্য চরকের মতে এই আত্মা সচেতন হইলেও ইহার নিজস্ব 'চেতনা' নাই, ইহা মনের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া 'চেতনা' লাভ করে—'...it is attained only by its connection with the senses through *manas*'। ‡ চেতনার এই ব্যাখ্যা অবশ্য ভারতীয় সাধনশাস্ত্রে ও দর্শনে কোনও নূতন কথা নয়। গীতায় চেতনাকেও অন্যান্য অনেক বস্তুর ন্যায় পরমাত্মা বা ঈশ্বরের একটি 'বিভূতি' বলা হইয়াছে। § আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিক্ দিয়া ইহার একটু বিশেষ

*—A History of Indian Philosophy, Vol. II, Dr. S. N. Dasgupta, Chapter XIII. †—op. cit, p: 368. ‡—Ibid.
§—'ভূতানামস্মি চেতনা' গীতা, ১০৷২২।

তাৎপর্য আছে। আয়ুর্ব্বেদের এই 'আত্মা' বা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' স্বরূপে নিশ্চেতন অথচ মনোদেহের সংযোগে চেতন-ভাবে সক্রিয়। এই দৃষ্টিতে সাধারণ চেতনা 'মন' বা 'আত্মার' স্বরূপ নয়। পাশ্চাত্য শরীরবিজ্ঞান এই সহজ সত্যটি জানে না বলিয়াই সাধারণ, স্থূল চেতনার প্রাধান্যকে অস্বীকার করিতে যাইয়া মন ও আত্মাকেও অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। মানুষের সাধারণ আত্ম-সচেতনতা (self-consciousness) যে কত ক্ষুদ্র ও বাহ্যিক বস্তু তাহাও এই দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। 'আত্মা' সম্বন্ধে এই দৃষ্টি-ভঙ্গী আমরা যোগবাশিষ্ঠ, ন্যায়দর্শন ইত্যাদির মধ্যেও পাই। অবশ্য পরমশূন্যস্থ 'নির্গুণ' পরমাত্মা এই আত্মারও ঊর্দ্ধে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-মতে যে আত্মা মনের মধ্য দিয়া এই দেহকে চালাইতেছে, তাহা ঐ 'নির্গুণ' পরমাত্মার মত রহস্যময় কিছু অপার্থিব বস্তু নয়। এই 'বাস্তব' 'যান্ত্রিক' আত্মার সন্ধান পায় নাই বলিয়াই আধুনিক শরীরতত্ত্ব 'conditioned reflex' ইত্যাদি মতে দৈহিক মনের ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হয়। সে যাহা হউক, এই আত্মা 'প্রাণ'শক্তির সহিতও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই অচিন্তনীয় 'প্রাণ'শক্তিকেই আয়ুর্ব্বেদ দৈহিক-মানসিক জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক শরীরতত্ত্বের মত এই 'প্রাণ'শক্তির বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ একেবারে অজ্ঞ বা অজ্ঞান নয়। আয়ুর্ব্বেদের 'বায়ু' এই 'প্রাণ'শক্তিরই ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার সহিত সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন 'গুণ' ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বা সৎ-অসৎ বৃত্তি ও কর্ম্মের প্রশ্নও জড়িত। আয়ুর্ব্বেদ-মতে সেজন্য

সুস্থ দেহমনের গঠনে শুদ্ধ নৈতিক জীবনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সংযম-ব্রহ্মচর্যও এই নৈতিক 'ধর্ম্ম'-জীবনের অন্তর্গত।* অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান হিসাবে যৌনসম্ভোগ-শক্তি বৃদ্ধির জন্য 'বাজীকরণ'ও চরক-সংহিতায় স্থান পাইয়াছে। তথাপি শারীরিক সুস্থতার ও স্বাভাবিকতার জন্য মানসিক ও নৈতিক সুস্থতার প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদে বিশেষভাবে এক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমর্থিত হইয়াছে।

এই মতে রস-রক্ত-মাংস-মেদ-অস্থি-মজ্জা-শুক্র এই সপ্ত 'ধাতু' এবং তাহার সহিত অষ্টম 'ধাতু' ওজঃ শরীরকে ধারণ করিয়া থাকে। রস-রক্তাদি-ক্রমে সপ্তম 'ধাতু' শুক্র বা বীর্য সকলের শেষে উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহারও পরে রহিয়াছে শ্রেষ্ঠ 'ধাতু' ওজঃ। 'বীর্য' কথাটী-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা বেশ স্পষ্ট নয়। ইহা হয় শুক্র-পদার্থ অথবা বীরত্ব-গুণ এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আসলে আয়ুর্ব্বেদে অথবা যোগশাস্ত্রে ইহার বিশেষ অর্থ 'সূক্ষ্ম-শক্তি'। রসরক্তাদিক্রমে অস্থিমধ্যস্থ মজ্জা হইতে শুক্র বা বীর্যের উৎপত্তি আধুনিক দৃষ্টিতে একটু বিসদৃশ ঠেকিতে পারে, কিন্তু আধুনিক শরীর-তত্ত্বেও দেহমধ্যস্থ যাবতীয় কোষ (cells), কলা (tissue) ও অঙ্গ (organs)-গুলির মধ্যে নানা বিচিত্রভাবের শরীরতাত্ত্বিক যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক শরীরতত্ত্বও যে অস্থি-মজ্জা হইতে রক্তের রক্ত-কণিকা

*—A History of Indian Philosophy, Dr. Dasgupta, Vol II, pp : 405, 419.

সৃষ্টি হয় এ-কথা স্বীকার করে। সুতরাং এই অস্থি-মজ্জা হইতে চুয়াইয়া 'শুক্র' বা তাহার কোনও শক্তিমূলক (potential) আদিরূপের উৎপত্তি ও রস-রক্ত-শিরা-ধমনী ইত্যাদির সহযোগে অণ্ডকোশ (testes)-এর মধ্যে তাহার রহস্যময় সঞ্চার ও ক্রিয়াকে একেবারে অস্বীকার করিবার মত কারণ নাই। আধুনিক শরীর-তত্ত্বেও জীবকোষ (cells), কোশ (glands), অন্তঃস্রাবী কোশ (endocrine glands), রক্ত (blood), লসিকা (lymph), স্নায়ু (nerves) ইত্যাদির ক্রিয়া ও অনেকক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বা সহযোগিতা এবং খাদ্যপ্রাণাদির যথাস্থানে পরিবেশনও এমন বিচিত্র ও রহস্যময়-ভাবে সাধিত হয় যে আয়ুর্ব্বেদের ঐ মতকে বর্ত্তমান দৃষ্টিতে একেবারে উড়াইয়া দিতে গেলে চিন্তা করিতে হয়। সে যাহা হউক, মানস-সংকল্পের উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গের এই অস্থি-মজ্জা হইতে শুক্র সমাহৃত হইয়া অণ্ডকোশে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয় ও যথাসময়ে লিঙ্গপথে বহির্গত হয় ইহাই মোটামুটী আয়ুর্ব্বেদীয় মত। এই শুক্রোৎপত্তি ও অণ্ডকোশে শুক্রসঞ্চারের মধ্যে যে দৈহিক ক্রিয়া রহিয়াছে তাহার সহিত মানসিক, প্রাণিক ও আত্মিক ক্রিয়াও অনেকখানি জড়িত রহিয়াছে। শিরা-ধমনী ইত্যাদি ছাড়া দেহমধ্যে হৃৎপিণ্ড হইতে কতকগুলি 'স্রোত' রস-রক্ত-বীর্য-রজঃ-খাদ্যরস প্রাণশক্তিকে বহন করে আয়ুর্ব্বেদের এই সিদ্ধান্তও তাৎপর্যপূর্ণ। * আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আয়ুর্ব্বেদ ও অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনে দেহকে প্রাণ-

*—A History of Indian Philosophy, Dr. S. N. Dasgupta, Vol II., p: 352.

মন-আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া দেখার ফলে রহস্যময় বহু দৈহিক ব্যাপার (phenomena) ও ক্রিয়া (activities) সুব্যাখ্যাত হওয়া সম্ভব হয়। প্রাণী ও মানুষের জীবনের ন্যায় এমন জটিল ও গভীর রহস্যময় ক্ষেত্রে মাত্র জড়বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকাকে অবিজ্ঞ একদেশদর্শিতা ছাড়া কিছু বলা যায় না। আমরা অবশ্য আয়ুর্ব্বেদীয় মতকে সব সময় নির্ভুল বা বিজ্ঞান-সম্মত বলিতেছিনা অথবা আধুনিক শরীরতত্ত্বের শরীর-সংস্থান (anatomy) ও বিশিষ্ট গবেষণা-পদ্ধতিকে মোটেই লঘু করিয়া দেখিতেছিনা। কিন্তু জীবন-বিজ্ঞানে তাহার অসম্পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। আয়ুর্ব্বেদে 'প্রাণবহা' * ধমনীর ন্যায় মহাভারতে 'মনোবহা' নাড়ীব কথাও আমরা মহর্ষি অত্রির যৌনকাম-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ২৭৩)।

আয়ুর্ব্বেদের ব্যাখ্যামত কাম-সংকল্পের সংযমে যে দেহ, প্রাণ ও মনের সাম্য ও শক্তির বৃদ্ধি হয় ইহা স্বাভাবিক। কামসংযমের জন্য মনের সংযম এবং মনঃসংযমের জন্য প্রাণসংযম বা প্রাণায়ামের কথা আমরা ভারতীয় সাধনশাস্ত্রে বহুস্থলেই শুনিতে পাই। প্রাণবায়ুর সংযমের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযমের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এখানেও আয়ুর্ব্বেদাদি ভারতীয় শাস্ত্রে 'প্রাণ'-এর ও 'বায়ু'র যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে তাহাতে সেগুলি স্থূল বাতাস (air)-এর ক্রিয়া নয়, ঊর্দ্ধের সূক্ষ্ম আত্মিক-মানসিক ক্রিয়ার সহিতই জড়িত ও তাহাদেরই বাহ্যিক রূপ বলিয়া

*—op. cit., p: 318.

মনে হয়। সুতরাং প্রাণায়াম বা প্রাণ-সংযম বলিতে মানসিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগকে গ্রহণ করা যায়। এই দৃষ্টিতে প্রধানতঃ সংকল্পশক্তির (will force) এর প্রয়োগই মনঃসংযম ও ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রধান উপায়, প্রাণায়াম অবশ্যই তাহার সহায়ক হইতে পারে। মনের সাম্যসাধনা বা ধর্ম্মের ও নীতির অনুশীলন এজন্য আয়ুর্ব্বেদে দৈহিকক্ষেত্রেও এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

শুক্র বা বীর্য অযথা, অসংযতভাবে ক্ষয়িত না হইলে মানস-সংকল্পের সাম্যশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যে উচ্চস্তরের শক্তি স্ফুরিত হয় ভারতীয় শাস্ত্রে তাহাকে 'ওজঃ' বলা হইয়াছে। এই 'ওজঃ' শুধু বুদ্ধির বা ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণতা নয়, ইহা একদিকে দেহ-মনের মৌলিক প্রাণশক্তি এবং অপর দিকে শুদ্ধ চরিত্রের 'personal magnetism' বা চারিত্রিক চৌম্বক-শক্তি। সংযম ব্রহ্মচর্যের ইহা সাক্ষাৎ ফল। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের ন্যায় ভারতীয় সাধনশাস্ত্রেও এই 'ওজঃ' একদিকে প্রাণ-পদার্থ (vital fluid), অপর দিকে ইহা আত্মিক-মানসিক শক্তিবিশেষ। অথর্ব্ববেদে এই 'ওজঃ'-লাভের জন্য প্রার্থনা মন্ত্র রহিয়াছে। সায়নাচার্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'ওজঃ' শরীরস্থিতিকারণমষ্টমো ধাতুঃ।', অর্থাৎ—'ওজঃ' শরীরের স্থিতির কারণস্বরূপ অষ্টম ধাতু।' তিনি আচার্যগণের প্রচলিত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহার অর্থ—প্রদীপ যেরূপ তৈলের উপর নির্ভর করে, বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘের উপর নির্ভর করে, ওজঃ সেইরূপ একমাত্র 'ক্ষেত্রজ্ঞ' অর্থাৎ

আত্মার উপর নির্ভর করে। * সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে ওজঃ একাধারে শরীর, মন ও আত্মার মৌলিক শক্তি।

এই ওজঃ-শক্তির প্রসঙ্গে ভারতীয় 'হিন্দু'-সাধনার আর একটি বিশেষ দিকের কথা আসিয়া পড়ে। তাহা সংযম-ব্রহ্মচর্যের সহায়ে 'উর্দ্ধরেতাঃ' হওয়ার সাধনা। এই 'উর্দ্ধরেতাঃ' হওয়ার সাধনার সহিত তান্ত্রিক কুণ্ডলিনী-শক্তির জাগরণ ও সহস্রারে পরমশিবের সহিত যোগের বা মিলনের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। বলা বাহুল্য আধুনিক শরীরতত্ত্বের দেহ-সংস্থান (anatomy) অনুযায়ী শুক্র বা রেতঃ পদার্থের মেরুদণ্ড দিয়া উর্দ্ধগমনের কোনও পথের কথা শোনা যায় না। মেরুদণ্ড-মধ্যে অবশ্য অনেক স্নায়ুতন্ত্র ও স্নায়ুকেন্দ্র আছে এবং এক জাতীয় তরল পদার্থও (cerebro-spinal fluid) আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্য দিয়া অণ্ডকোশ-জাত শুক্রের উর্দ্ধগমনের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাহা হইলে এই 'উর্দ্ধরেতাঃ' হওয়ার ব্যাপারটী কি? আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন আয়ুর্বেদ, তন্ত্র ও অন্যান্য সাধনশাস্ত্রের কথা মিলাইয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। শুক্রকীট (spermatozoa)-সমেত বীর্যপদার্থ (semen) আসলে একটী মানস সংকল্পশক্তির সাক্ষাৎ স্থূল রূপ। আত্মিক ও মানসিক সূক্ষ্ম-শক্তির ক্রিয়া কিরূপে স্নায়ু, রক্ত, মজ্জা, কৌশিক নিঃসারণ (glandular secretion), জীবকোষ (cells) ও প্রজননকোষ (germ

*—A History of Indian Philosophy, Dr. S. N. Dasgupta, Vol II, p: 293 দ্রষ্টব্য।

cells) ইত্যাদির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে তাহা বর্ত্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় একটা সম্ভাব্য সত্য (hypothetic truth) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আধুনিক শরীরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বও কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এইরূপ সম্ভাব্য সত্য (hypothesis)-এর উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে তাহারও কিছু ইঙ্গিত আমরা দিয়াছি। এমন কি আধুনিক বিজ্ঞান (science), বিশেষ পদার্থবিদ্যা (physics), এত সুসমৃদ্ধ, সুপ্রতিষ্ঠিত ও বাস্তব-ফলপ্রদ হইয়াও কতখানি আনুমাণিক (hypothetic) ও প্রতীক-ধর্ম্মী বা রূপক (symbolic) সত্যের উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতেছে তাহার সম্বন্ধে কিছু প্রামাণ্য (authoritative) উক্তি আমরা শীঘ্রই দিতেছি। সুতরাং, জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঐরূপ সত্যের উপর নির্ভর করা অসমীচীন বা অবাস্তব বলিয়া গণ্য না হইলে সত্যকার জীবনবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাকে অবশ্যই গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। বীর্যের সংযম আসলে এক অধোগামী মানসিক শক্তির ঊর্দ্ধগামিতা। এই সংযমের ফলেই ওজঃ-শক্তির প্রকাশ হয় তাহাও আমরা দেখিয়াছি। এই ওজঃ শরীরের সহিত মন ও আত্মাকেও স্বাভাবিক, সুস্থ ও সজীব অবস্থায় ধারণ করিয়া রাখে। এই ঊর্দ্ধমুখী শক্তির ক্রিয়া স্বভাবতঃই মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্র (central nervous system)-কে ঊর্দ্ধদিকে প্রভাবিত করে। শরীরের শ্রেষ্ঠ রক্ত হইতে কেমন করিয়া নরনারী উভয়ের

বিশ্বাস। ডাঃ দাশগুপ্তের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থেই নাড়ী (nerve)-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা রহিয়াছে তাহাতে তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ নাড়ীর মধ্যে (শ্রীকণাদের মতে) বাহাত্তর হাজার নাড়ীকে স্থূল 'ধমনী' বলা হইয়াছে, এগুলি পঞ্চেন্দ্রিয়ের 'গুণাবহ' অর্থাৎ কতকটা আধুনিক বিজ্ঞানের 'afferent nerves'-এর মত। ইহা ছাড়া সাত-শত নাড়ী খাদ্যরস বহন করে।* অন্যগুলি নিশ্চয় সূক্ষ্ম-স্তরেই ক্রিয়া করে। সুতরাং এই নাড়ী-তত্ত্বের মধ্যে নানা-ধরণের স্থূল-সূক্ষ্মভেদ রহিয়াছে দেখা যায়। তন্ত্রের সুষুম্নাদি সহ বাহাত্তর হাজার নাড়ীর কথাও সুবিদিত (এই বাহাত্তর হাজার অথবা তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ নাড়ীর কথা শুনিয়া আমাদের অবিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ নাই, কারণ আধুনিক শরীরতত্ত্বের মতেও স্নায়ুবিধান (nervous system)-এ স্নায়ুকোষ (nerve-cells)-এর সংখ্যা পনের শত কোটী)।† সে যাহা হউক, তন্ত্রের এই কুণ্ডলিনীকে যোনি ও গুহ্যের মধ্যদেশবর্ত্তী 'মূলাধার-চক্র' হইতে সূক্ষ্ম আত্মিক-মানসিক শক্তিরূপে যদি ঊর্দ্ধে চালিত করা হয়, তবে ইহার সহিত কামসংযম-জাত শুক্রের সারভূত ওজঃ-শক্তির প্রকাশের একটা সাদৃশ্য অবশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তান্ত্রিক গ্রন্থে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর সহিত দক্ষিণ ও বাম অণ্ডকোশ (testes)-এরও সংযোগ আছে জানা যায়। ইহাও সংযম-সাধনায় দেহসংস্থান (anatomy)-এর দিক্ দিয়া তাৎপর্য-

---

*—op. cit., pp: 354-55.

†—A Text-Book of Physiology, Ed. K. M. Bykov, (Eng. Tran.), p: 526 দ্রষ্টব্য।

পূর্ণ। * কথিত আছে বার বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনে মেধা অথবা ব্রহ্মনাড়ী খুলিয়া যায় এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সত্য-সমূহের ধারণা-শক্তি জন্মে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এই নাড়ীগুলি (যথা 'সুষুম্না' ইত্যাদি) প্রকৃতপক্ষে ঊর্দ্ধগামী কুণ্ডলিনীশক্তির গতিপথ (passage), সেজন্য ইহাদের মধ্যস্থ রন্ধ্র খুলিয়া যাওয়া দরকার। সুষুম্না-মধ্যস্থ বজ্রানাড়া ও তন্মধ্যস্থ চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী অতিসূক্ষ্ম-গতিপথের নাম ব্রহ্মনাড়ী। সুষুম্নাকে মোটামুটী মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী বলা যায়। †

বর্ত্তমান-প্রসঙ্গে তান্ত্রিক বা শৈব সাধনার নাড়ী-চক্র-নাদ-বিন্দু ইত্যাদি অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহাদের বিশদ আলোচনা অসম্ভব ও কতকটা অপ্রয়োজনীয়-বোধে আমরা বিরত রহিলাম। পাঠক এবিষয়ে বহু পণ্ডিতের গ্রন্থ ও মূল শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিবেন। তবে মোটামুটী বলা যায় যে কুণ্ডলিনীকে শব্দব্রহ্ম-রূপা বলা হয় ‡ এবং ইনিই পরমশূন্যস্থ বিন্দুরূপী শিবের সহিত ঊর্দ্ধমস্তিষ্কে মিলিতা হন। তখনই মানুষের পরমজ্ঞানের প্রকাশ ঘটে এবং এই পরমজ্ঞান বা মহামুক্তিই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য। এই 'বিন্দু'-সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও আমরা সামান্য কিছু বলিয়াছি (পৃঃ ১০৬)। এখানেও লক্ষণীয় যে চিত্তের উচ্চতম সূক্ষ্ম

---

*—A History of Indian Philosophy, Vol II, Dr. S. N. Dasgupta, p: 354 দ্রষ্টব্য।

†—Ibid, pp : 353-54. ‡—op. cit.

সাম্যাবস্থার 'বিন্দু'কে ধরিয়া রাখিতে না-পারা এবং স্থূল দেহের বীর্যকে স্থির রাখিতে না-পারা এই উভয়ই বিন্দুহানি বা বিন্দুপাত। ইহাতেই আধ্যাত্মিক জীবনের অধোগতি বা আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এখানেও আমাদের পূর্বকথিত সূক্ষ্ম ও স্থূল, মানসিক ও দৈহিক বিষয়ের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ভারতীয় সাধনদৃষ্টিতে, বর্তমান যুগের মত, পৃথক্‌ভাবে দেহ বা দৈহিক মন বলিয়া কিছু নাই, তাহাকে আত্মিক-মানসিক দৃষ্টিতেই দেখা হয়। এজন্য 'বীর্য'কে 'ব্রহ্মবস্তু'ও বলা হইয়া থাকে। এমনকি বীর্যকে মনুষ্যত্বও বলা হয়। * আমাদের ব্যাখ্যামত, এই বীর্যবস্তুর মধ্য দিয়া জীবন্ত প্রাণীদেহের—**living organism**-এর—প্রাণশক্তি ও মানুষের আত্মিক-মানসিক ব্যক্তিত্বের শক্তি ক্রিয়া করে। জড়জগতে জড়বস্তুর সূক্ষ্ম সংস্থানের মধ্যেই আজ বিজ্ঞান যেমন শক্তির স্বরূপ-সন্ধান পাইতেছে † প্রাণ-জগতে বীর্যবস্তুর সূক্ষ্ম সংস্থানের মধ্যেই তেমনি আর্য ঋষিগণ মনুষ্যত্বের শক্তি-সন্ধান পাইয়াছেন। এই ঊর্দ্ধস্তরের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আধুনিক জীবতাত্ত্বিক ও শরীরতাত্ত্বিক একদেশ-দর্শিতার তলায় চাপা পড়িয়া আছে। অপর দিকে মধ্যযুগীয় ব্যক্তিগত ব্রহ্মচর্যসাধনার চরমপন্থী ভাবের জের টানিয়া এ-যুগে

*—'বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই প্রাণ, বীর্য্যই মানুষের যথাসর্ব্বস্ব। বীর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়; এই বীর্য্য নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।' —আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ (সঙ্ঘগীতা)।

†—**Einstein** এর মতবাদ দ্রষ্টব্য।

যে বীর্য-ধারণের দৈহিক ধারণা প্রচলিত হইয়াছে এবং যাহা ব্রহ্মচর্য-সাধনার গ্রন্থাদিতেও অনেক সময় অতি-সহজে প্রযুক্ত হয় তাহাও জাতীয় জীবনে মনুষ্যত্ব-সাধনার বিশেষ সহায়ক হইতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ, তন্ত্র-সহজিয়া সাধনা, হঠযোগী 'বজ্রোলী' মুদ্রা-সাধনা ইত্যাদিতে বীর্যের অধোগামী গতি নিরুদ্ধ করিবার যে সমস্ত 'যান্ত্রিক' উপায় বর্ণিত আছে সেগুলি ব্যক্তিগত চরমপন্থী সাধকের সহায়ক, জাতীয় জীবনে সেগুলি অবাস্তব প্রতিক্রিয়া বা রহস্যময় কৌতূহলের সঞ্চার করে মাত্র। অপরদিকে আতঙ্কগ্রস্ত (neurotic) মনোভাব দিয়াও কখনও সুস্থ-স্বাভাবিক-সবল জাতীয় জীবন গঠন করা যায় না। ঐরূপ চরমপন্থী যোগ সাধনায় উক্ত হইয়াছে 'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ', অর্থাৎ বীর্যের স্খলনই মৃত্যু এবং বীর্যের ধারণই জীবন। কিন্তু এই মৃত্যু ও জীবন ঐ বিশেষ সাধনায় আধ্যাত্মিক মহামৃত্যু ও মহাজীবনকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রসঙ্গবর্জ্জিত-ভাবে এই বাক্য যত্রতত্র প্রয়োগ করিলে সাধারণের মনে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্রহ্মচর্যসাধনাকেও তাহাদের নিকট একটা স্থূল শারীরিক জীবনের স্তরে নামান হয়।

আধুনিক শরীরতত্ত্বের পটভূমিকায় যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করিলাম তাহাতে যৌনকাম-সংযমের তত্ত্বটীকে অনেকটা যুক্তিসম্মত ভিত্তির উপর দাঁড় করান যাইবে আশা করা যায়।

কিন্তু তথাপি 'নাড়ী', 'চক্র', 'কুণ্ডলিনী', 'ষট্‌চক্রভেদ'

mentalism, and so possibly also from matter to mind··· It may be then that the springs of events in this substratum include our own mental activities····' অর্থাৎ— 'কিন্তু যতই আমরা দেশ-কালের পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে ইহার তলদেশে প্রবেশ করি, ততই আমাদের মনে হয়, কিন্তু কেন জানিনা, যে আমরা জড় বস্তুবাদ হইতে মনোবাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি এবং এজন্য সম্ভবতঃ ইহাও বলা চলে যে আমরা জড় হইতে মনের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। ···সুতরাং এরূপ হওয়া সম্ভব যে এই (জড়-জগতের) তলদেশের ঘটনাবলীর উৎস-মধ্যে আমাদের মনের ক্রিয়াসমূহও বিদ্যমান রহিয়াছে।' * অপিচ— 'He (Whitehead) sustains the doctrine that "neither physical nature nor life can be understood unless we fuse them together as essential factors in the composition of 'really real' things whose interconnections and individual characters constitute the universe.', অর্থাৎ— 'তিনি (Whitehead) এই মতবাদ পোষণ করেন যে "যে 'সত্যের সত্য' বিষয়গুলি এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং পৃথক্ পৃথক্ গুণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে রহিয়াছে তাহাদের গঠনের মধ্যে জড় প্রকৃতি অথবা প্রাণকে বিশেষ প্রয়োজনীয়

*—Sri James Jeans, op. cit., p : 408.

উপাদান-রূপে মিশাইয়া না দেখিলে এই জড় প্রকৃতি ও প্রাণের সঠিক ধারণা করা যায় না।'* এখানে 'সত্যের সত্য' কথাটির সহিত উপনিষদের 'সত্যস্য সত্যম্'-এর বিশেষ সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। † এই পর্যন্ত আমরা বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ মনীষী এডিংটন, জেম্‌স জীন্‌স ও হোয়াইটহেডের সুচিন্তিত মতবাদ হইতে দেখিলাম যে বিজ্ঞানের জগৎও মনোময়, তত্ত্বদর্শন-প্রধান, প্রতীক-প্রধান, বা রূপকল্পনা-প্রধান। Eddington-এর স্পষ্ট ভাষায় 'It is a symbolic world.' ‡ সুতরাং এখন আমরা স্বচ্ছন্দে যোগসাধনায় 'কল্পিত' সুষুম্নাদি 'নাড়ী' ও 'ষট্‌চক্র' ইত্যাদি তত্ত্বের 'রূপ' গ্রহণ করিতে পারি। এগুলির ঊর্দ্ধতর বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের কারণ থাকে না, বিশেষে যখন যৌগিক সাধন-প্রক্রিয়ার ফলের দ্বারা ইহাদের যথার্থ্য প্রমাণিত (verified) হয়। আধুনিক বিজ্ঞানেও এইরূপ গাণিতিক (mathematical) প্রমাণ পরবর্ত্তী বাস্তব কার্য-কারিতার দ্বারা বাস্তব প্রমাণ-রূপেই গৃহীত হয়।

এখানে ব্যক্তিগত যোগসাধন-পন্থার বা প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু সংযম-ব্রহ্মচর্যের সাধনা বা অভ্যাসের দ্বারা মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বীর্য (semen) পদার্থের যে ঊর্দ্ধগামিতার কথা যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্যই আমাদের অনুধাবনের বিষয়। W. L.

---

*—A. N. Whitehead, op. cit. p : 340 †—বৃহদারণ্যক, ২।৩।৬।
‡—'Man and the Universe' (M. P. L.), p : 455.

Hare-এর ভাষায় স্নায়ুতন্ত্র (nervous system)-ই হইল 'the physical organ of the mind' বা 'মনের দৈহিক ক্রিয়াযন্ত্র'। এই সমস্ত স্নায়ু, বিশেষে cerebro-spinal বা মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডমধ্যস্থ স্নায়ুতন্ত্র, প্রাক্তন জননকোষ হইতেই নির্ম্মিত হয় এবং ক্রমাগত এই জননকোষের স্রোত স্নায়ু, স্নায়ুকেন্দ্র ও বিশেষ করিয়া মস্তিষ্কে বিপুল পরিমাণে সঞ্চারিত হয়, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি (পৃঃ ৪৫)। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আমরা অবশ্যই ভাবিতে পারি যে, স্থূল বীর্য-পদার্থ না হউক, বীর্য্যের সূক্ষ্ম জননকোষ বা তাহারও পশ্চাতে স্থিত প্রাণিক (vital) ও মানসিক (mental) শক্তি বা তেজঃ-পদার্থ অবশ্যই ঐভাবে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর কেন্দ্রে এবং চরমে মস্তিষ্কের শীর্ষদেশে ('সহস্রার'-পদ্মে) সঞ্চারিত এবং সঞ্চিত হইতে পারে। ভবিষ্যতের আরও নিখুঁত যৌগিক-বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসাপেক্ষ ইহাকেই আমরা 'উর্দ্ধরেতাঃ' হওয়ার তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এখন আমরা আমাদের প্রতিপাদিত ধারণার আলোকে যৌন-জীবন ও জীবন-সাধনার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিব। আলোচ্য বিষয়গুলির তালিকা :—

(১) নর ও নারী।

(২) ভালবাসা।

(৩) দাম্পত্যজীবন।

(৪) মাতৃত্ব।

(৫) জীবনলক্ষ্য।

(৬) যুগ-সংযম।

(৭) সভ্যতার ভবিষ্যৎ।

নর ও নারী ঃ—

স্ত্রী-পুরুষ পৃথক্ নয়। Sexual differentiation বা যৌন-ভেদ প্রকৃতির একটী ক্রিয়ারই—অর্থাৎ আত্মহননের মধ্য দিয়া আত্মসৃজনের—এক স্বাধীন দ্বৈধীভাবাপন্ন রূপ। সুতরাং প্রজনন (reproduction) বা জীবসৃষ্টি যখন ইহার প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য, তখন জীবনের সন্তত প্রবাহকে রক্ষার জন্যই স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও মিলন। কিন্তু জীবনের এই সন্তত প্রবাহের স্থূল স্থিতিই প্রকৃতির লক্ষ্য নয়। তাহাকে লয়ের মধ্য দিয়া এক পরমশূন্যের অভিমুখে ক্রমবিকশিত করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। এই পরমশূন্যেই তাহার পরম পূর্ণতা।

সুতরাং নর ও নারীর এই আকর্ষণ ও মিলনের মধ্যেও এই দ্বৈধীভাব প্রতিফলিত হইবেই। সেজন্য নর-নারীর যৌন আকর্ষণ যত তীব্র, উদ্দাম ও সীমাহীন, তেমনি তাহার মধ্যে বিতৃষ্ণা, বিরাগ ও অবসাদেরও প্রাবল্য। এই দুই বিসদৃশ, সামঞ্জস্যহীন যোগাযোগই যৌন-জীবনের ভিত্তি। একদিকে ইহা যেমন সুন্দর ও মধুর অপর দিকে ইহার মধ্যে আছে তেমনই কুৎসিত ও তিক্ত অভিজ্ঞতা। কোনওটাকেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সুতরাং মানুষ যদি 'জ্ঞানবান্' প্রাণী হয় তবে এই হেঁয়ালীর

সমাধান তাহাকে জানিতেই হইবে এবং সেই সমাধানের পথে তাহাকে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই জীবনসাধনা। জীবনে উদ্দাম হইবার উপায় নাই, ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া সেখানে অনিবার্য, আত্মগ্লানি সেখানে অবধারিত। ইহাই প্রকৃতির 'প্ল্যান' বা ব্যবস্থা। পাহাড় চড়াইয়ে, ক্রীড়াঙ্গনে, রাজ্যশাসনে, যুদ্ধবিগ্রহে, অভিনয়ে, শিল্পকলায়, কর্ম্মপরিচালনায়, কোথাও উদ্দামতার স্থান নাই। অনুভূতির আবেগকে অচঞ্চল-ভাবে সেখানে প্রকাশিত করিতে হয়, সর্ব্বত্রই একটা discipline বা নিয়ম-সংযমের অমোঘ রাজত্ব। যৌন-জীবনের ক্ষেত্রেও তাই। অথচ এই সহজ সত্যটী আজ উপেক্ষিত, জীবনে তাই ব্যর্থতার জ্বালাযন্ত্রণা (frustration) এত বেশী। কারণ, 'Sex is the central problem of life' —জীবনের গোড়ায় গভীরভাবে বাসা বাঁধিয়া আছে যৌনকাম। এই বিপুল সুপ্তশক্তিকে বিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিকতার সহিত পরিচালিত করিতে না পারিলে ইহা সর্ব্বদাই বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে, কারণ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে ইহা প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক যৌনবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিকতা অবশ্যই আছে কিন্তু বিজ্ঞতার একান্ত অভাব। বৈজ্ঞানিকতা বাহ্যিক, বিজ্ঞতা আন্তরিক। সেজন্য যৌনবিজ্ঞানে দৈহিক মনের কিছু সুবিধা হইলেও আত্মিক চেতনার সুস্থতালাভ ঘটে না। ইহাই এযুগের চরম দুর্ভাগ্য।

নর-নারীর যৌন আকর্ষণ ও যৌন সম্পর্ককে বিশেষভাবে ফ্রয়েড যে চক্ষে দেখিয়াছেন তাহাতে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি (intros-

pection) অবশ্যই আছে এবং কতকগুলি মানসিক রোগ-চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাহা কতকাংশে কার্যকরীও হইয়াছে ইহা বলা যায়। কিন্তু এই কামতত্ত্ব কিরূপ একদেশদর্শী এবং তাহার ভুল কোথায় সে-কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং বর্ত্তমান অধ্যায়েও কিছু আলোচনা করিয়াছি। ফ্রয়েড যে একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের জন্যই তাঁহার যৌন-গবেষণা পরিচালিত হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মানুষকে মানুষ করিবার চাবিকাটী তাঁহার হাতে ছিল না। ফ্রয়েড নিজেও তাঁহার এই ঊনতা অকপট বিনয়ের সহিত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— "The unworthiness of human beings, even of analysis, has always made a deep impression on me, but why should analysed people be altogether better than others? Analysis makes for *unity*, but not necessarily for *goodness*.', অর্থাৎ— 'মানুষের অযোগ্যতা ও অক্ষমতা এবং এমন কি মনো-বিশ্লেষণেরও অযোগ্যতা ও অক্ষমতা সর্ব্বদাই আমার মনে একটা গভীর রেখাপাত করিয়াছে। কিন্তু যাহাদের মনোবিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহারা মোটের উপর অপরদের অপেক্ষা ভাল থাকে কেন? মনোবিশ্লেষণ মনের মধ্যে একটা একত্ব আনিতে পারে, কিন্তু নৈতিক সৎভাব আনিতে পারিবে এমন কোনও কথা নাই।' *

*—The Life and Work of Sigmund Freud, Ernest Jones, p: 433.

সুতরাং একথা অতি সত্য যে আধুনিক যৌন-মনোবিজ্ঞানের মধ্য দিয়া নর-নারীর যৌন-সম্পর্ককে মনুষ্যত্বসাধনার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সুতরাং নর-নারীর যৌন-জীবনের মত একটী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মানুষকে সুস্থ, স্বাভাবিক মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রশ্নে এই সব আধুনিক বৈজ্ঞানিকতার উপর যেন আমরা অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন না করি। সংযম-ব্রহ্মচর্যের 'শাশ্বত ধর্ম্ম' ও নীতির প্রয়োজনীয়তা আজও এক্ষেত্রে এতটুকু ম্লান হয় নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নর ও নারীর যৌন আকর্ষণ ও যৌন মিলনের রহস্য সম্বন্ধে যৌগিক-দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। যে পরমশূন্যতার সাম্যের রসে মানুষের জীবনের উৎপত্তি, সেই 'সামরস্যে' লয়ের একটা প্রাথমিক, স্থূল ও অস্পষ্ট আভাস নরনারীর যৌনমিলনের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। এই তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে নরনারীর যৌন-প্রেমের যোগ তীব্র বিয়োগ-বিপর্যয়ের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। কারণ পরমশূন্যই পরমসাম্য এবং সাম্যকে লাভ করার জন্যই জীবনে বৈষম্যের আন্দোলন। নর ও নারী জীবনে এই সাম্যমুখী বৈষম্যের দুই মেরু। এই লক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন অন্ধ- আবেগের ব্যর্থ ও বিকৃত পরিণতি মানুষ কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। কারণ এখানে মানুষ জৈব (biological) কামের আত্মবিনাশের পরিধি ছাড়াইয়া আসিয়াছে এবং আত্মিক আত্মলয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। এই আত্মিক পটভূমিকার উপরেই মানসিক

প্রেম-প্রণয়ের ক্রিয়া সার্থক হইতে পারে।

জীবনে কি তবে নর ও নারীর বিচিত্র জীবনসম্পর্কের কোনও নিজস্ব মূল্য নাই? এই প্রেমরস ও কামরসের তৃপ্তি কি সাময়িক হইলেও নিরর্থক? না, ইহার চরম প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে জীবনরহস্যের সত্যসমাধানের পথে অভিজ্ঞতা-লাভে। ইহা পরমসাম্যের একটা কৃত্রিম অভিনয় যাহার মধ্য দিয়া পরম-সত্যের মহাজীবনের অভিমুখে মানবাত্মার সত্যকার অভিযান আরম্ভ হয়। প্রকৃতির বিধানে এজন্য যৌনকামের তীব্র অভিজ্ঞতা যেরূপ প্রয়োজন, ইহাকে জয় করিবার তীব্র সংকল্পও সেরূপ প্রয়োজন। ইহার তীব্রতাই মানুষকে অনিবার্যরূপে অনন্ত পূর্ণতার পথে সর্ব্বদা ঠেলিয়া দেয়। কিন্তু সে পথে যাইবার জন্য ইহার সম্মোহ হইতে মানুষকে মুক্ত হইতে হয়। এই মোহমুক্তি কোনও ব্যর্থ ভাবাবিল ঘৃণা-বিরক্তি নয়, ইহা প্রশান্ত-গম্ভীর জীবনসাম্যের জ্ঞান এবং তাহার প্রয়োগের বিজ্ঞান। কামের অভাব-শক্তিই দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মার পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। এই নব-রূপায়ণের প্রথম ধাপ আসক্তিবর্জ্জন। এপথে পূর্ণ হইতে গেলে সেজন্য 'শূন্য' হইতে হয়।

নরনারীর যৌন আকর্ষণ ও যৌন মিলনের মধ্যে তীব্র আকর্ষণের বস্তুটি কি? শরীর ও মনের একটা গভীর আরাম-বোধ বা স্বস্তি, যে আরাম বা স্বস্তিকে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে মূল আকাঙ্খার বস্তুরূপে আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি। আমাদের জৈব চেতনায় আহার-নিদ্রা-ভয় ও

মৈথুনের আরাম বা স্বস্তিই শ্রেষ্ঠ ও তীব্রতম আরামস্বস্তিরূপে অনুভূত হয়। কিন্তু স্থির চিন্তা ও বিচারে দুইটী জিনিষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রথম, এই আরামের বা স্বস্তির মধ্যে একটা আত্মচৈতন্য-হীনতার ভাব রহিয়াছে। ইহাই পূর্ব্বকথিত পরম-শূন্যের নিশ্চেতনতার প্রতিক্রিয়ামূলক অচৈতন্য। নিশ্চেতন এবং অচেতনের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য সত্বেও গভীর পার্থক্য আছে, যেরূপ পার্থক্য রহিয়াছে পরম-শূন্য ও চরম-অভাবের মধ্যে। বিষয়টী যোগদৃষ্টিগম্য দার্শনিকতা হইলেও বাস্তব সাধারণ জীবনে আমরা নানাভাবে নিত্য ইহার অভিজ্ঞতা লাভ করি, একটু স্থির চিন্তাতেই তাহা ধরা পড়ে। যৌনকাম এই দিক্ দিয়া ঠিক্ আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দের বিপরীত বস্তু, তাহারই উল্টান প্রতিচ্ছবি। আর প্রতিচ্ছবিতে একটা বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা অসার এবং নিদারুণ ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ। যৌনকাম এই দিক্ দিয়া আত্মপ্রতারণা ও পরপ্রতারণার জ্বলন্ত প্রতীক। ইহারই জন্য মানুষের জীবনে—ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক-জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতীয় জীবনে যত কিছু মিথ্যা-কপটতা দম্ভ-স্বার্থপরতা-নিষ্ঠুরতার পাপ তাহা এই যৌনকামের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। কামাসক্তি যাহার অন্তরে যতখানি গভীর ঐ পাপগুলিও প্রচ্ছন্ন-ভাবে তাহার মধ্যে ততখানি নিবিড়। যৌনকামাসক্তি কেমন করিয়া শিক্ষিত-সমৃদ্ধ সভ্যতাকেও বিষাক্ত করে সে কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১৩০-৩৫)। সে যাহা হউক, যৌনকাম ব্রহ্মমুখী জীবনের ঠিক্ বিরুদ্ধ গতি বলিয়াই যৌনকামে

আসক্তি বা মোহ লইয়া সত্যকার কল্যাণ-জীবন অসম্ভব। জৈন সাধনশাস্ত্রে যে যৌনসঙ্গমকে 'অব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্মবিরোধী বলা হইয়াছে ইহা এই দৃষ্টিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। * যৌনকাম যে শারীরিক ও মানসিক 'বেহুঁস' ভাব আনয়ন করে তাহা কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদ-ক্ষেত্রে যে 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদর' অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের সহিত সগোত্র নৈর্ব্যক্তিকতার কথা আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন তাহা নহে। ইহা নিতান্তই আত্মসচেতন দেহমনের tension (টান)-নিবৃত্তি মাত্র। সেজন্য ইহার মধ্যে মদ্যের মত একটা কৃত্রিম উত্তেজনা-নিবৃত্তির স্নায়বিক ক্রিয়া জড়িত থাকে। আচার্য শঙ্কর ইহাকে সুরার সহিতই তুলনা করিয়াছেন—'সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা, স্ত্রী'—'সুরার মত কে সম্মোহিত করে? —নারী।' † মদ্যকে নারীর সহিত তুলনা করা হয়ত নারীর প্রতি সম্মানসূচক (chivalrous) মনে না হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদেশের সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় 'wine and woman'-এর সহাবস্থান অল্পবিস্তর লক্ষণীয়। আসলে ইহাকে নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা ভাবিবার সাক্ষাৎ কোনও কারণ নাই, ইহা কামজীবনে নারীর শক্তিমত্তারই স্বাক্ষর বহন করে। বস্তুতঃপক্ষে আমরা প্রথমে যেরূপ বলিয়াছি, নর ও নারী একটী কামসত্তারই দুইটী দিক্ মাত্র, একজন বিসর্জ্জক একজন ধারক, একজন বহির্ম্মুখ একজন অন্তর্ম্মুখ,

*—A History of Indian Philosophy, Prof J. N. Sinha, M. A., Ph, D., Vol II, p: 252.

†—মণিরত্নমালা।

একজন কল্পনাবাদী একজন বাস্তববাদী, একজন মানসিক দেহের ও অপরজন দৈহিক মনের প্রতীক। দুইয়ে মিলিয়া একটী যৌগিক (compound) ক্রিয়া। নারীর সম্মোহিত করার শক্তি এবং নরের সম্মোহিত হওয়ার শক্তি একই মুদ্রার দুই-পিট মাত্র। পক্ষান্তরে, একভাবে নরও সম্মোহক, নারীও সম্মোহিতা। নরের যৌনানুভূতি দেহের মধ্য দিয়া মনে, নারীর, মনের মধ্য দিয়া দেহে, এই পার্থক্য। ইহাতে কোনও পক্ষেরই তুলনামূলক অমর্য্যাদার প্রশ্ন নাই, বরং কামই যখন সাধারণ জৈব-জীবনের প্রধান বস্তু সেখানে কামিনীর প্রধান্যই ইহাতে স্বীকৃত। সে যাহা হউক, নর ও নারী উভয়েই কামসম্মোহের প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত 'অচেতনতা'র অধীন হয়। Dr. Stekel-এর মত ব্রহ্মচর্য-বিরোধী ব্যক্তিকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে—'...speaking philosophically, every sexual act is partial death'— '...দার্শনিক অর্থে প্রত্যেক যৌনক্রিয়াই আংশিক মৃত্যুর সমান।' * এখানেই আমরা নর-নারীর আকর্ষণ-মিলনের দ্বিতীয় বিষয়টীতে উপনীত হইলাম। নর-নারীর মধ্যে এই যে তীব্র আকর্ষণ-মিলনের 'আনন্দ' ইহা স্বরূপতঃ একটী 'negative' বা নেতিবাচক আনন্দ। অবশ্য বৃহত্তর দৃষ্টিতে ইহ-জীবনের সমস্ত আনন্দই ঐরূপ। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে এগুলি মিথ্যা। ইহারা দৈহিক মনের বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেজন্য ইহারা আত্মিক মনের গভীরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহারই জন্য প্রকৃত

*—'Sexual Abstinence and Health' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তৃপ্তি দিতে বা পূর্ণ করিতে পারে না। এইরূপ বাহ্যিক সাময়িক তৃপ্তি সেজন্য বিচারবান্ মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।* সমস্ত মানুষই এই দিক্ দিয়া চির-অসন্তুষ্ট, কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশ-প্রকাশ যাহাদের কাম্য তাহারাই এই চির-অসন্তোষের প্রতিকারে যত্নবান্ হয়। ইহাই ঊর্দ্ধস্তরের 'বৈজ্ঞানিক' জীবন। কিন্তু যাবতীয় কাম-কামনার 'আনন্দ' কেন নেতিবাচক ও অভাব-মূলক সুতরাং কৃত্রিম 'আনন্দ', তাহা জানা থাকিলে বিচারের অবশ্যই সুবিধা হয়। পূর্বে আমরা ইহার পরিচয় দিয়াছি। জীবনের মূলে পরমশূন্যের মধ্যে আত্মোপলব্ধিই প্রকৃত আনন্দের স্বরূপ। নচেৎ 'আনন্দ' বলিয়া পৃথক্ কোনও বস্তু নাই। এই ঊর্দ্ধস্তরে আত্মলয় নিম্নস্তরে আত্মবিলয় বা আত্মধ্বংসের রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং নিম্নের এই 'আনন্দ' ঊর্দ্ধের প্রকৃত আনন্দের অক্ষম অনুকরণ। ইহাই কাম-কামনার 'ট্রাজিডী'। এই অনু-করণের খেলায় সর্ব্বদাই একটা নকল শূন্যতার বা অভাববোধের 'tension' (টান) সৃষ্টি করিয়া তাহা পূরণের চেষ্টা করা হয়। এই পূরণ বা স্বস্তি (relaxation) সেজন্যই নেতিবাচক বা কৃত্রিম। যৌনমিলনের মধ্য দিয়া মানুষ নকল শূন্যে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া নকল নিশ্চেতনতার আস্বাদ গ্রহণ করে। সুতরাং সাধারণ যৌনমিলন কোনও মানুষের সহিত মানুষের মিলন নয়, ইহা ভূতের (পাঞ্চভৌতিক দেহের) সহিত ভূতের মিলন, বেহুঁস উত্তেজনাই যাহার সার বস্তু। এইজন্যই ইহা চেতনা-হ্রাসকারী

---

*—'ন তেষু রমতে বুধঃ', গীতা ৫।২২।

মদিরার সহিত তুলনীয়। সুতরাং আত্মসচেতন জীবনের স্নায়বিক-মানসিক ক্লেশনিবারণের ক্ষেত্রে ইহা এক বিশেষ sedative (প্রশামক) মাত্র। যোগসাধনার ভাষায় যাহাকে 'অনিচ্ছার ইচ্ছা' বলা যায় তাহাই যৌনকামের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। যৌনকাম-সম্ভোগ (বা যেকোনও কাম-সম্ভোগ) প্রকৃতি প্রকৃতই চায়না। এজন্য সম্ভোগের রাজ্যে একটা কৃত্রিম স্বস্তির জন্য একটা কৃত্রিম উত্তেজনার টান(tension)-ই পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ব হইতে এই কৃত্রিম স্বস্তি (relaxation)-কে লক্ষ্য করিয়াই যে কামের উত্তেজনা সক্রিয় হইয়া ওঠে, শরীরতত্ত্বের দিক্ দিয়াও তাহার আভাস হয়ত লক্ষ্য করা যায় —'... erection is accompanied by a relaxation of *m.* retractoris penis' —'লিঙ্গোত্থানের সঙ্গে সঙ্গে *m.* retractoris penis-এর শিথিলতা দেখা যায়।'* মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়াও যৌনকাম বৃত্তির পিছনেই সাম্যাবস্থালাভের বৃত্তি এবং পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রবণতা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ৪৬৫)। সুতরাং কৃত্রিম শূন্যতাবোধ বা অভাববোধ সৃষ্টি করিয়া একটা কৃত্রিম পরিপূর্ণতার ব্যর্থ খেলাই জীবনে কামকামনার মূল রহস্য। কিন্তু এই কৃত্রিম শূন্যতাবোধ বা অভাববোধ ঊর্দ্ধের পরমশূন্যতারই এক বহিঃপ্রকাশ (emanation)। এই অভাববোধ সেজন্য সর্ব্বদাই পরমশূন্যতার

---

*—A Text-Book of Physiology, Ed. K. M. Bykov, p: 451 দ্রষ্টব্য। সিদ্ধান্ত নিজস্ব।

মধ্যেই ফিরিয়া যাইতে চায়। ইহাই নরনারীর 'মিলনে বিরহ' বা অতৃপ্তিময় মিলনানন্দ। অভাবের মধ্যে পূর্ণতা নাই, একমাত্র পরমশূন্যেই পরমপূর্ণতা আছে। ইহা না বুঝিলেই কবির ভাষায় সর্ব্বদাই বলিতে হয়,—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না'। *

জীবনের মূলে এই যে কৃত্রিম আরাম বা স্বস্তিলাভের ইচ্ছা ইহা শুধু দৈহিক নয়, ইহার পিছনে মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়াও রহিয়াছে। কাম সেই ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া। এবং সেজন্যই ইহা মৃত্যুগর্ভ জীবনকেও এতখানি মাধুর্য্যের সম্মোহনশক্তি দিয়া সৃজন-ধারণ-পালন করে ও করিতে সক্ষম। ইহারই অপর নাম 'Eros' বা জীবনরক্ষক কাম। যৌনকামের শক্তিসম্পর্ক-ব্যতীত জীবনের স্থিতি ও গতি অসম্ভব হইত, কারণ স্নেহমায়া-মমতাতেই ইহার আরম্ভ, গতি ও শেষ। স্নেহপদার্থের মতই ইহা মৃত্যুময় জীবনযন্ত্রকে চালু রাখে। নরনারীর যাবতীয় সম্পর্কের মূলে এই যৌনকাম, ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী হইলেও অনেকাংশে সত্য। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণও বলিয়াছেন—'Freud's emphasis on the sex basis of human life, though exaggerated, is not incorrect.'। † এবং যেহেতু নর ও নারীর মধ্যে মূলতঃ একটা সাদৃশ্য ও একত্ব রহিয়াছে সেজন্য সাধারণভাবে জীবনের সমস্ত স্নেহ-মায়া-ভালবাসার

*—রবীন্দ্রনাথ।

†—Religion and Society, S. Radhakrishnan, p : 148.

সম্পর্কের মূলে এই যৌনকাম বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি ইহা প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুগর্ভ ও ব্যর্থ এ তত্ত্ব ভুলিলে 'বৈজ্ঞানিক' ভুল করাই হইবে।

এই যে নর ও নারীর মধ্যে নিগূঢ় মাধুর্যের বা আনন্দের 'প্রেম'-সম্পর্ক ইহা আত্মিক ও মানসিক বলিয়া শুধু 'সাময়িক' বা 'ক্ষণিক' নহে। ইহা একটী জীবন-সম্পর্ক (vital relation), মাত্র জৈব-সম্পর্ক (biological relation) নহে। এবং জীবন-সম্পর্ক বলিয়াই ইহার স্থায়িত্ব ও বৈচিত্র্য অনেক বেশী। এই স্থায়িত্বের ও বৈচিত্র্যের মানুষের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রকাশ। কিন্তু ইহারই মধ্যে ধ্বংসাত্মক অভাববোধের ক্রিয়া রহিয়াছে বলিয়া এখানে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রায় সমান, বরং বিকর্ষণেরই অনেক সময় আধিক্য। ইহারই জন্য নরনারীর 'প্রেম' বা বিবাহ-সম্পর্ক লইয়া যৌনকামবাদী এই আত্মসচেতনতার যুগে এত জটিল বিকার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, প্রেমের চিরাচরিত 'রোমান্টিক' ধারণা বা গতানুগতিক 'ধর্ম্মীয়' বিশ্বাস তাহা ঢাকিতে পারিতেছে না।

নর-নারীর আকর্ষণ-মিলন যে জৈব (biological) কারণে প্রকৃতিতে 'পরিকল্পিত' তাহা সন্তানসৃজন (reproduction) হইলেও ঐ বৃত্তির মধ্যে আত্মিক-মানসিক উপাদান থাকার জন্যই সন্তান-ভিত্তিক সম্পর্ক ছাড়াও ইহার একটা নিজস্ব ব্যক্তিগত রূপ ও গতিও রহিয়াছে। তাহারও সুপরিচালনা একান্ত প্রয়োজন, এবং সেজন্য তাহার স্বরূপজ্ঞানও প্রয়োজন। ইহা

লক্ষণীয় যে ভারতীয় শাস্ত্রে ও পুরাণে নর-নারীর স্বামীস্ত্রীরূপে সন্তান-প্রজননের উপর প্রাকৃতিক গুরুত্ব দেওয়া হইলেও স্বামীস্ত্রী-সম্পর্কের নিজস্ব গুরুত্বকেও বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সবই আত্মিক সত্যের অভিমুখী। সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে যে 'নারী' বা 'পুরুষ' একটা জৈব প্রকৃতির ছদ্মবেশ, ভিতরে তাহারা একই। আত্মার মধ্যে 'নারী' বা 'পুরুষ' বলিয়া কোনও ভেদ নাই, ইহা শাস্ত্রে ও সিদ্ধবাক্যে সমর্থিত। সেই মূলের স্বরূপে সত্যের প্রতিষ্ঠা না থাকিলে নর ও নারীর যাবতীয় সম্পর্ক 'অসত্য ও অপ্রতিষ্ঠ' * হইতে বাধ্য।

ভালবাসা :—

কথাটির মধ্যে দুইটী খুব প্রাচীন ও গভীর অর্থ লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রথম 'ভাল' কথাটী সম্ভবতঃ 'ভদ্র' অর্থাৎ কল্যাণ-জনক বা হিতকর অর্থ হইতে এবং 'বাসা' একটী খুব প্রাচীন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—যাহা প্রাচীন সংস্কৃত ও পারসীক (জরথুষ্ট্র-ধর্ম্মের সমসাময়িক) ভাষার মধ্যেও পাওয়া যায়। অর্থ—প্রীতি করা, পরবর্ত্তী বিকৃত অর্থ আসক্ত হওয়া। † সুতরাং কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যাপারকে বিশেষ কল্যাণজনক বা হিতকর বলিয়া আন্তরিক-ভাবে আনন্দের সহিত গ্রহণ করাই 'ভালবাসা'।

এই যে 'ভাল' বলিয়া মনে করা, ইহার মধ্যে নিজে খুশী

*—গীতা, ১৬।৮।

†—History of Philosophical Systems. Ed. Vergilius Ferm, pp: 23, 31.

হওয়া বা সন্তুষ্ট হওয়ার ভাব রহিয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে পরমশূন্য হইতে 'আত্মা'র আত্ম-সৃজনের মধ্যেও এই ভাললাগা বা ভাল মনে-হওয়ার ব্যাপার রহিয়াছে। পরে বলিয়াছেন উহাই রস বা আনন্দ যাহা জগৎ জীবনকে ধরিয়া আছে। * সুতরাং আদিতে এই যে নিজের সৃষ্টিকে 'ভাল' ভাবা ও খুশী হওয়া, ইহাই আদি ভালবাসা। এই নিজের মধ্য হইতে কিছু করিয়া খুশী হওয়া বা সন্তুষ্ট হওয়া, এই হইল ভালবাসার মূল। এই 'মূল' সেজন্য নিজেরই মধ্যে। অপর বস্তু, ব্যক্তি বা ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া ইহা আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া 'ভালবাসা' বাহিরের সঙ্গে এতখানি জড়িত মনে হয়। বাইবেলেও পাই যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন এবং দেখিলেন যে তাহা ভালই হইয়াছে,— 'and found it very good'। † এই যে আত্মতৃপ্তি ইহাই হইল আদি ভালবাসা। সুতরাং নিজের ভিতরের পরমশূন্যতা হইতে 'নূতন'-কে সৃষ্টি করা ও তাহাতে আনন্দিত হওয়া ইহাই ভালবাসার স্বরূপ। ইহাই 'creative joy' বা সৃজনের আনন্দ। সকল ধর্ম্মেই ভগবান্ বা পরমতত্ত্বের এই আত্মসৃজনের বা আত্মপ্রকাশের মহিমার সহিত প্রেমের কথা শুনিতে পাই। এজন্য সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও "তিনি" তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি করুণাময় দয়াময়, প্রেমময়। এই ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক প্রেমই জৈব জীবনে প্রতিফলিত হইয়া কামের আকার ধারণ করে। কিন্তু তখন তাহা পরমশূন্যের পরমসত্ত্বা হইতে উৎসারিত

---

*—ব্রহ্মানন্দ-বল্লী। †—Genesis.

নয়, তাহার মূল আত্মসচেতন অহঙ্কারের অফুরন্ত অভাববোধ বা 'তৃষ্ণা'র মধ্যে নিবদ্ধ। এই আত্মসচেতন কামনাই 'চেতনবৃক্ষের ফল' যাহা ঈশ্বরবিরোধীভাবে আস্বাদ করিয়া খ্রীষ্টীয় পৌরাণিক কাহিনীর আদি মানব-মানবী—Adam ও Eve-এর পতন হইয়াছিল দুঃখমৃত্যুময় সংসারের মধ্যে। প্রাণশক্তির সত্য তৃপ্তি ও কৃত্রিম তোষণ ইহারই মধ্যে প্রেম ও কামের বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। তন্ত্রসাধনা বা ঐজাতীয় সাধনা 'স্থূল' ভাবেও এই আদি প্রাণের সত্যকার তোষণের মধ্য দিয়া পরমতত্ত্বে যুক্ত হইতে চাহিয়াছে। কিন্তু সেখানেও অভাববোধ বা তৃষ্ণা বা কামকে আশ্রয় করিয়া সাধনা চলে না। সুতরাং কামের মূলে রহিয়াছে ব্যর্থ-বিকৃত প্রেম। এই কামকে ভালবাসা বলিয়া ধরিতে চাহিলে জীবনব্যাপী একটা ব্যর্থতার খেলাই চলিতে পারে।

মানুষের যৌন আত্মসৃজন (reproduction) একটী আদিম ও গভীর আত্মতৃপ্তির ব্যাপার বলিয়া নর-নারীর যৌন আকর্ষণ বিশেষভাবে 'ভালবাসা' আখ্যা পাইয়াছে। আত্ম-সৃজন ও আত্মপ্রকাশই জীবনের প্রধান ক্রিয়াশক্তি। আত্ম-প্রকাশরূপে তাহা বাহিরের দিকে ধন-মান-ক্ষমতা-খ্যাতি-প্রতিপত্তির চেষ্টার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, আবার ভিতরের দিকে আত্মসৃজনরূপে তাহা ব্যক্তিগত জীবনের নানাবিধ সম্পর্কের মধ্যে রূপ গ্রহণ করে। এই দ্বিতীয় কারণেই পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, এত প্রিয় হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে পুত্রের জন্য পুত্র

প্রিয় হয় না, পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, পত্নীর জন্য পত্নী প্রিয় হয় না, ধনের জন্য ধন প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই ইহারা প্রিয় হয়। কিন্তু উপনিষদের এই 'আত্মা' কোনও স্বার্থপর অহমিকা নয়, ইহা মূল জীবন-সৃজনের উৎস, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ জীবনধারণে সত্যকার আনন্দ পায়—উপনিষদের ভাষায় 'রসো হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'।

সুতরাং সব দিক্ দিয়াই এই ভালবাসার সার্থকতা ও পূর্ণতা নিজের আত্মার মধ্যে লভ্য। এজন্য আত্মায় স্থিতি প্রয়োজন। যে আত্মায় স্থিত নয়, তাহার ভালবাসা কপট ও ব্যর্থ, দেহের ও মনের বিলাস। পুরুষের পক্ষে এটী প্রধানতঃ নারীদেহের মধ্যে নিজেকে বিলীন করার বৃত্তি, নারীর পক্ষে এটী প্রধানতঃ পুরুষের মনকে নিজের মধ্যে মিশাইয়া লওয়ার বৃত্তি। কিন্তু দুই-ই ব্যর্থ ও বৃথা যদি আত্মায় স্থিতি না থাকে।

মানুষ নিজে যেমন চিরকাল বাঁচিতে চায়, তেমনি প্রিয়-জনকে চিরকাল পাইতে চাই। এই অমৃতত্বের ও অমৃত প্রেমের ইচ্ছা একমাত্র মানুষেই সম্ভব। ইহা কাম-কামনা হইতে উদ্ভূত হইলেও, আত্মার অমৃতের স্পর্শ ইহাতে লাগিয়াছে। এই শাশ্বত প্রেম সেজন্য একমাত্র আত্মার মধ্যেই সম্ভব ও সার্থক, যদিও তখন তাহা আর ক্ষুদ্র দেহাত্মবোধী অহমিকার স্মৃতি লইয়া চলে না। বড় বড় স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করিয়াও এ অমৃতত্ব ও অমৃত প্রেম লাভ করা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ আত্মারই বস্তু। উপনিষদে এমন পরম আশ্বাসের বাণীও রহিয়াছে যে আত্মার মধ্যে প্রিয় বস্তু বা

প্রিয়জনকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে তাহার কোনও কালে ক্ষয়বায় নাই। কিন্তু আত্মার মধ্যে ধরিয়া না রাখিলে তাহা নষ্ট হইবেই। ইহা ছাড়া উপনিষদের বহুস্থলে সাংসারিক আনন্দ-ভালবাসার বিষয়গুলিকে অমৃত আত্মার মধ্যে নিত্যে ও পূর্ণতায় লাভ করার অনেক ইঙ্গিতও আমরা পাই।* একমাত্র এই আত্মার মধ্যে প্রেম-ভালবাসাই সত্য, সার্থক ও অমর। সুতরাং দৈহিক-মানসিক কাম-কামনার ভালবাসাকে আত্মিক-মানসিক স্তরে তুলিয়া ধরা, ইহাই সত্যকার প্রেমসাধনা। কিন্তু জৈব স্তরের মানবতা তাহা আকাঙ্খা করে না। বাহ্যিক, কৃত্রিম, ভঙ্গুর ক্ষুদ্র প্রেমের অভিনয় করিয়াই তাহা সন্তুষ্ট। অথচ দেশে-দেশে কাব্যে-সাহিত্যে এই প্রেম-ভালবাসার মহিমা-বর্ণনার ছড়াছড়ি। আধুনিক চলচ্চিত্র-শিল্পেরও ইহাই উপজীব্য। কিন্তু সবই অজ্ঞান মানবের শিশুসুলভ আস্ফালন। এমনকি বাস্তব সাংসারিক জীবনেও যে প্রেম-ভালবাসাকে সত্য বলিয়া মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া হয়, তাহাও মূলতঃ এই দৃষ্টিতে অন্তঃসারশূন্য। হাজার 'প্রেম-ভালবাসা' সত্বেও এজন্য জীবনে হাহাকারের অন্ত নাই। নরনারীর দাম্পত্যপ্রেমের মাধুর্য এবং মূল্যের কথায় আমরা শীঘ্রই আসিতেছি। কিন্তু আজিকার নিছক ঐহিক (secular) ভালবাসার মধ্যে সে মাধুর্য ও মূল্য অসম্ভব। আজকালকার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক আচারের গৃহস্থজীবনেও তাহা সম্ভব নয়। ঐহিক

*—বৃহদারণ্যক, ১।৪।৮, ১।৫।১৭; ২।৪।৬; ছান্দোগ্য, ৩।১৪, ২।১৭। ৮।১, ২; তৈত্তিরীয় ৩।১০।৫।

বা ধর্ম্মীয় 'রোমাণ্টিক' ভাবুকতা দিয়া সত্যজীবনের অভাব পূরণ করা যায় না। সংযম-ব্রহ্মচর্যের জীবনবিজ্ঞানেই সত্যজীবন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

নরনারীর যৌন-ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশেষ রকমের তান্ত্রিক-সহজিয়া সাধনার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ২৯৯-৩০৬), তাহাতে আত্মসচেতন অহঙ্কারের তৃপ্তি বা বিলাসের এতটুকুও স্থান নাই। তাহা এক জীবনবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই জীবনবিজ্ঞানেরও মূল কথা পরমশূন্যতার নিত্য মহাজীবনে নিজের দেহ-মন-প্রাণ-চেতনাকে লয় করা। যেহেতু স্থূলজীবনে যৌনকাম-মিলনের মধ্যে তাহার একটা কৃত্রিম আভাস ধরা পড়ে, সেজন্য ঐ কৃত্রিম আভাসকেই অবলম্বন করিয়া তীব্র বৈজ্ঞানিক পন্থায় তাহাকে সংযত ও রূপান্তরিত করিয়া মূল উৎসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ইহা প্রকারান্তরে যৌনবিলাসকেই স্থায়ী করিবার পদ্ধতি (technique) বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা একেবারে ভ্রান্ত। ইহা যৌনবিলাসকে সম্যক্ রূপান্তরিত করিয়া যৌনবিলাসের প্রতিক্রিয়া-মূলক (reactionary) প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইবার সাধনা। সাধক-সাধিকা উভয়েই ইহাতে লিঙ্গবোধাতীত ও যৌনভিত্তিক তৃপ্তি-মুক্ত হইয়া পরমশূন্যস্বরূপ আত্মায় রমণ করিতে সক্ষম হন। উপনিষদেও ব্যক্ত হইয়াছে—আত্মার মধ্যে উচ্চতম কাম-ক্রিয়ার কথা* কিন্তু তাহা আত্মজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

*—'আত্মরতি: আত্মমিথুন:', ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।২৫।২

সার্থক যৌন-ভালবাসারও ইহাই মূল সূত্র, সংযম-ব্রহ্মচর্যই তাহার ভিত্তি।

ভালবাসা একটী বিশেষভাবে মানবীয় বৃত্তি। যৌনকাম, ধনকাম, জনকাম, প্রভুত্বকাম ও শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানসাধনা, গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্রসাধনা এবং সর্ব্বমানবের আধ্যাত্মিক মহামুক্তি এ সমস্তই ভালবাসার রূপ-রূপান্তর মাত্র। ভালবাসাই জীবন ও মহাজীবন। 'সূত্রে মণিগণা ইব'—সব কিছুই এই ভালবাসায় গ্রথিত। এমনকি জীবনে যাহা কিছু অসুন্দর, যত কিছু ক্রূরতা—বীভৎসতা তাহাও ভালবাসারই ব্যাহত প্রকাশ। সুতরাং ভালবাসার সূত্রকে ঠিক্‌মত ধরিতে পারিলে সব-কিছুরই সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এজন্য ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ বলা হইয়াছে—'God is Love'—কিন্তু এই প্রেম বা ভালবাসা যে জীবনের যাবতীয় 'রস' বা আনন্দের মত মূলে পরমশূন্যের আত্মলয়-ক্রিয়ার মধ্য হইতেই উৎসারিত এবং তাহারই অভিমুখে ধাবিত এই পরম সত্যটী না বুঝিতে পারিলে ভালবাসার বিপর্যয়ই ঘটিবে, কারণ ইহা অবিজ্ঞানের অসত্য দৃষ্টি।* এই সত্যকার আত্মলয়ের অভিযান একমাত্র সংযম-ব্রহ্মচর্যের শক্তিতেই সম্ভব হইতে পারে। ভালবাসা—এমনকি যৌন ভালবাসার মধ্যে যে দেহমনের একাত্মতার স্ফুরণ হইতে দেখা যায় তাহা পরম শূন্যেরই যাদুমন্ত্রের প্রভাব, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তাহা দুইকে যেমন একে রূপান্তরিত করে, তেমনি একককেও পরমশূন্যে আত্মহারা করে।

*—পূর্বালোচনা (পৃ: ৪৪৬, ৪৮৪, ৪৮৭) দ্রষ্টব্য।

অন্যথা আত্মসচেতন একত্বের কাল্পনিক মোহে দ্বৈতের স্বার্থপরতাই বিকট রূপ ধারণ করে মাত্র। ইহাই কাম-ভালবাসা।

ভালবাসা যখন ও যতটা সত্যকার অহং-বর্জ্জিত হয় তখন তাহা সেই পরিমাণেই আত্মোপলব্ধির বা ঈশ্বরলাভেরও সহায়ক। ইহাই নিঃস্বার্থপর ভালবাসা। এই পরম দৃষ্টিতেই মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন 'একটী মনুষ্যকে বিশেষরূপে ভালবাসা, ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ'। † কিন্তু তিনিই আবার নিছক দেহভিত্তিক ভালবাসাকে অসার বলিয়াছেন। ‡ কাম-ভিত্তিক স্নেহ-মায়া ভালবাসার বিষয়ে আর একটী বিশিষ্ট আর্য সাবধান-বাণী আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৪৮৮)। কামমুক্তিই ভালবাসার লক্ষ্য ও সার্থকতা।

দাম্পত্য-জীবন :—

নরনারীর মিলিত 'বিবাহিত' জীবনকে ভিত্তি করিয়াই সমাজ-সংসার-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজ-সংসার-সভ্যতার শত দোষ-ত্রুটী (defects) ও সমস্যা থাকিলেও এই দাম্পত্য-জীবনই তাহাকে সহনীয়, ধারণীয়, এমনকি বাঞ্ছনীয় করিয়া তুলিয়াছে। তাহার প্রথম কারণ নরনারীর প্রেমমিলিত জীবনে এমন একটী শান্তিস্বস্তির আভাস, এমন একটী নির্ভরতা ও আশ্বাসের কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় যেখানে জীবনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মানবাত্মা সহজেই আশ্রয় পাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে।

*—শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ (শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী), পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ১৫৮।
†—ঐ, পৃ: ১৫৩।

জাগতিক জীবনে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের মত এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক সম্পর্ক দুর্লভ। মহাকবি ভবভূতির ভাষায়—

'প্রেয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা
সর্ব্বে কামা সেবধির্জীবিতং বা—
স্ত্রীণাং ভর্ত্তা ধর্ম্মদারাশ্চ পুংসাম্' ।

—(মালতীমাধব)।

অথবা—'অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগতং সর্ব্বাস্ববস্থাসু
যদ্‌বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।'

—(উত্তররামচরিত)।

ইহার দ্বিতীয় কারণ, সন্তানের সৃজন-পালন-বর্দ্ধনের মধ্য দিয়া নরনারীর আত্মা একটী সহজ স্বাভাবিক ও সুন্দর ত্যাগের, অর্থাৎ আত্মলয়ে আত্মপূর্ণতা-লাভের, পথ খুঁজিয়া পায় এবং সমাজ-সভ্যতাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত ধারক-পোষক-সংস্কারকদের সেবায় বর্দ্ধিত ও অভ্যুদয়শীল হইতে পারে। এজন্য দেখা যায় প্রকৃতি, পরিবেশ বা পরিকর্ষ যেমনই হোক্ না কেন, পিতামাতা-পূর্ব্বপুরুষের গৌরবে সন্তান-বংশধরকে এবং সন্তানের গৌরবে পিতামাতাকে প্রায়ই অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করিতে দেখা যায়। ইহা শুধু অন্ধ অহমিকা নয়, ইহা প্রকৃতির আত্মপূর্ত্তির স্বাভাবিক প্রকাশ।

দাম্পত্যজীবন লইয়াও আজ নানা গবেষণা সুরু হইয়াছে। বিবাহিত জীবন আগে ছিল কিনা, অথবা গোষ্ঠীবিবাহ (community marriage) আগে ছিল, পিতৃতন্ত্র (patriarchy) অথবা

মাতৃতন্ত্র (matriarchy) কোনটা আগে ছিল, একপত্নীকত্ব (monogamy) অথবা বহুপত্নীকত্ব (polygamy) কোনটা বিবাহের স্বাভাবিক রূপ, ইত্যাদি বহু আলোচনা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মহলে হইয়া গিয়াছে ও এখনও হইতেছে। বিখ্যাত পণ্ডিত-লেখক Westermarck বহু দেশবিদেশের নজীর ঘাঁটিয়া ও সামাজিক রীতি-নীতির গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে এক-পত্নীকতাই স্বাভাবিক মান এবং বহুপত্নীকতা ব্যতিক্রম। অপর দিকে পরবর্ত্তী লেখক Robert Briffault 'The Mothers' গ্রন্থে বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন মহাকাব্য ইত্যাদিতে, অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতাদিতে, উভয় প্রকারের নিদর্শনই পাওয়া যায়। তাহার পর্য্যালোচনায় না গিয়া আমরা এইটুকু অবশ্যই বলিতে পারি যে মাতৃতন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র, একপত্নীকত্ব বা বহুপত্নীকত্ব যাহাই আদি বা স্বাভাবিক মান হোক্, আসল কথা হইতেছে নরনারী বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধির প্রেরণা ও সহায়তা লাভ করিতেছে কিনা। এইখানেই বিবাহিত জীবনের সার্থকতার পরিচয়।

সন্তান-সৃজন ও সন্তান-পালনের মধ্য দিয়া নিজেদের কল্যাণ ও আত্মরক্ষার সঙ্গে সমাজের, রাষ্ট্রের ও বিশ্বেরও কল্যাণ ও রক্ষার প্রশ্ন জড়িত বলিয়াই বিবাহিত জীবনকে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এতখানি গুরুত্ব ও গৌরব দেওয়া হইয়াছে। বিবাহিত জীবনের মূল্য ও মাধুর্য্যকে এখনও স্বভাবতঃই জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু ভাবা হয়, কিন্তু ইহার মূল কোথায় তাহা ভাবিয়া দেখা হয় না।

কিন্তু এই সামাজিক দৃষ্টিতে সন্তানস্নেহ ও সন্তানপালন ছাড়া দাম্পত্যপ্রেমের যে নিজস্ব মূল্যের ও মাধুর্যের কথা আজকাল জোর গলায় ঘোষণা করা হয় তাহাও যে সমাজে চিরকালই ছিল ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্র বনগমনের সময় পুত্রবিরহকাতরতায় আকুল ও সহগমন-প্রার্থিনী পরমস্নেহময়ী জননী কৌশল্যাকে স্বামী দশরথের প্রতিই অনুকূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। জনক-নন্দিনী সীতাও শ্বশ্রূকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন পিতা-ভ্রাতা-পুত্রের তুলনায় স্বামীর ভালবাসার দান অতুলনীয়, সেজন্য তিনি স্বামীর অনুগমন করিবেন।* কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এইসব ক্ষেত্রে স্বার্থপর কামলোলুপতার ভালবাসা বিবৃত হয় নাই। সুসংযত ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত চারিত্রিক শক্তিই ছিল এই দাম্পত্য প্রেমের মূল। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে সতীত্বের প্রশ্নটি আলোচনা না করিয়া পারিতেছি না। সতীত্ব আসলে কোনও ভাবপ্রবণ আদর্শপরায়ণতা নয়, ইহা নারীচরিত্রের ঐ আত্মস্থ প্রেমশক্তির পরিচয়। ইহা সেজন্য কাম ও প্রেমের রাজ্যে পুরুষের ব্রহ্মচর্যসাধনার প্রতিরূপ, অর্থাৎ চিত্তের দুর্ব্বল স্বার্থপরতার চাঞ্চল্যকে নিরস্ত করাই ইহার প্রাণ। সুতরাং বিবাহিত নারীজীবনে ইহা সত্যের, প্রেমের ও আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের সাধনা, ইহা কোনও সামাজিক, ধর্ম্মীয় রীতির অনুসরণ মাত্র নয়। সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী ইত্যাদি আদর্শ জাতীয় নারীচরিত্রের মধ্যে আমরা তেজস্বী ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা

*—বাল্মীকি-রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২৪শ ও ৩৯শ সর্গ দ্রষ্টব্য।

দেখিয়া স্তম্ভিত হই। রামায়ণ-মহাভারতে ইহারা আদর্শ পুরুষ-চরিত্রগুলির ও শ্রদ্ধার পাত্রী-রূপে দেখা দিয়াছেন। অথচ ইহারা বাস্তব জীবনের বাস্তব সমস্যার মধ্যেই এই আদর্শ চরিত্রশক্তিকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই সতীত্ব নারীর মানসিক আত্মলয়ের শক্তি যাহা পুরুষের (স্বামীর) ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া করে, যেমন ব্রহ্মচর্য পুরুষের শারীরিক আত্মলয়ের শক্তি যাহা নারীর (স্ত্রীর) ব্যক্তিত্বকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধিত হয়। সুতরাং এগুলি আমাদের পূর্ব্বকথিত আত্মবিলয় বা আত্মধ্বংসের পরিবর্ত্তে পরমশূন্যের আত্মিক পূর্ণতার মধ্যে আত্মলয়েরই শক্তি-সাধনা। মধ্যযুগের সমাজধর্ম্মের অধোগতি সতীত্বকে এই জীবনসত্যের সাধনার পদবী হইতে অন্ধ, সামাজিক ভাবপ্রবণতায় নামাইয়া আনিয়াছে, সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই কালক্রমে তাহা নারীর ব্যক্তিত্বহীনতার ও স্বামী-দাসত্বের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং আধুনিক যুগের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় তাহা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উপেক্ষিত, এমনকি বর্জ্জিত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে পুরুষের মধ্যে যে যুগে সংযম-ব্রহ্মচর্যের সাধনার আদর্শ নাই, নারীর পাতিব্রত্য সেযুগে অর্থহীন গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। রামায়ণে কৌশল্যা ও সীতার মধ্যে কথোপকথনে অসতীত্বের যে রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, চিত্তচাপল্য ও হীন স্বার্থপরতাই তাহার প্রধান লক্ষণ। * সুতরাং সতীত্ব কোনও দুর্বল, ভাবপ্রবণ পতিদাসত্ব হইতে পারে না, তাহা

*—বাল্‌মীকি-রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯শ সর্গ দ্রষ্টব্য।

সংযমের আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্য, এবং নারীচরিত্রের একাগ্রতার শক্তিসাধনা।* কিন্তু এই সাধনা সমাজ-জীবনে উপযুক্ত আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছাড়া সম্ভব নয়। বাল্মীকি-রামায়ণে যুবক রামচন্দ্রের প্রশান্ত অথচ গভীর পত্নী-প্রীতি দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অথচ এতখানি সুন্দর-স্বাভাবিক অন্তরপূর্ণ প্রেমের মধ্যেও রামচন্দ্র সত্যকে সকলের উর্দ্ধে রাখিয়াছেন।† পিতামাতার প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা ও ভক্তির ক্ষেত্রেও তা'ই। এই সত্যজীবনের সাধনাই সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের গোড়ার কথা। এই সত্য-সাধনার মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা সম্ভব, নচেৎ বিবাহিত জীবন একেবারে অর্থহীন। এযুগের বিবাহিত জীবনে এজন্য সহস্র রকমের ব্যর্থতা খুবই স্বাভাবিক। বিবাহিত জীবনের 'রোমান্টিক' বর্ণনা-চাতুর্যের পাশাপাশি তাই বারাঙ্গনা-মিলনের সহিত বিবাহকে স্বচ্ছন্দে তুলনা করা এযুগে সম্ভব হইয়াছে।‡ আধুনিক সাহিত্যে নরনারীর প্রেমজীবনের সম্বন্ধে উৎকট বিতৃষ্ণা-পূর্ণ জিজ্ঞাসার কথাও আমরা ইতিপূর্ব্বে (পৃঃ ৪১৪-৫৮) কিছু বিশদভাবেই আলোচনা করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্নও স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। ডিভোর্স (Divorce)-এর বিপুল ব্যাপকতা আজ পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষে আমেরিকায়, এক মহামারীর আকার

---

*—'Frailty, thy name is woman' এই উক্তি এখানে খাটেনা।

†—বাল্মীকি রামায়ণ, ৩৪শ সর্গ দ্রষ্টব্য।

‡—G. B. Shaw (A Revolutionary's Handbook) দ্রষ্টব্য।

ধারণ করিয়াছে। এবিষয়েও আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১৮০-৮২, ২১৪)। সেই প্রসঙ্গের পুনরুক্তি না করিয়া আমরা ইহাই বলিতে চাই যে বিবাহ-বিচ্ছেদ অবস্থা-বিশেষে ও নৈতিক বিধিবিধানের মধ্যে সমর্থিত হইলেও মূল প্রশ্নের গুরুত্ব সমানে থাকিয়া যায়, অর্থাৎ—নরনারীর প্রেমমিলন একটী সাধনার বস্তু এবং এই সাধনার মধ্য দিয়া উভয়েরই মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব পরমশূন্যের মহাসত্যে ক্রমশঃ আত্মলয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকে. নচেৎ নরনারীর প্রেমমিলনের নিজস্ব পৃথক্ কোনও মূল্য নাই। সন্তানসন্ততি, ভ্রাতাভগ্নী, আত্মীয়স্বজন লইয়া পারিবারিক জীবন এই দিক্ দিয়া শুধু আমোদ-আহ্লাদের ক্ষেত্র নয়, ইহা বাস্তব জীবন-সাধনার এক একটী পবিত্র পীঠস্থান। এবং এই পীঠস্থানের প্রধান সাধক-সাধিকা স্বামী ও স্ত্রী। Havelock Ellis (হ্যাভলক এলিস)-এর মত প্রাচীন ধর্ম্মীয় সংস্কারবিরোধী এবং যৌনজীবনের সংস্কারবাদী মনীষীও বলিতেছেন—'At the best, it is probably that divorce is merely a necessary evil···for divorce is always a confession of failure. Very often, indeed, it involves not only a confession of failure in one particular marriage but of failure for marriage generally.', অর্থাৎ—'খুব ভাল ভাবে ধরিলেও বিবাহবিচ্ছেদ হয়ত একটী অনিবার্য অমঙ্গল মাত্র। ···কারণ বিবাহবিচ্ছেদ সব সময়েই একটী বিফলতার স্বীকৃতি।

বস্তুতঃ প্রায়ই ইহার মধ্যে কেবলমাত্র একটী বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যর্থকাম হওয়ার স্বীকৃতিই আছে তাহা নহে, পরন্তু সকল বিবাহের প্রতিই ব্যর্থতার ভাব রহিয়াছে।' * ইহার পর এলিস বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কেমন করিয়া পর-পর সমস্ত বিবাহগুলিতেই বিচ্ছেদের কারণ ঘটে তাহা দেখাইয়াছেন। অন্যত্র তিনি এক অলীক আশা পোষণ করিয়াছেন যে বিবাহ-বিচ্ছেদের স্বাধীনতা বাড়ার সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ অনেক কমিয়া যাইবে। † এই আশা কত অলীক তাহা অতি-আধুনিক ইতিহাসে সুস্পষ্ট (পৃঃ ২১৪)। বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রবল স্রোতকে ঠেকাইতে গেলে এক আদর্শবাদের প্রয়োজন, অথচ সে আদর্শবাদের দর্শন ও সাধনা পাশ্চাত্যে নাই।

ভারতে তাহা আছে। কোনও সামাজিক মধ্যযুগীয় প্রথারূপে মাত্র নয়, এক আত্মিক দর্শনের প্রেরণা-রূপে। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে এক দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 'জন্মজন্মান্তরের'। খ্রীষ্টান, পারসীক (জরথুষ্ট্র)-ধর্ম্ম এবং অন্যান্য ধর্ম্মেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পবিত্রতা, গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য বিশেষ-ভাবে স্বীকৃত। 'জন্মান্তরবাদ' অবশ্য সেখানে স্বীকৃত নয়, কিন্তু 'অনন্ত' স্বর্গে বা নরকে জীবনের কথা আছে। সুতরাং দেশ-কালাধীন জাগতিক জীবনে যাহা কিছু সত্য-পবিত্র-শাশ্বত তাহার এক 'অনন্ত' স্থায়িত্ব বা সত্তা সর্ব্বত্র কল্পনা করা যাইতে

---

*—Sex and Marriage গ্রন্থে Marriage and Divorce পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। †—op. cit, The Attitude to Divorce পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পারে। জন্মান্তরবাদই হোক্ অথবা অনন্তকর্মনরক-বাদই হোক্, মানুষের সৎ কর্ম্মসূত্রের মধ্যে একটা শাশ্বত মহা-প্রাকৃতিক যোগের ধারণা করা যায়, এবং এই যোগের সূত্র সত্য ও কল্যাণের হইলে ধ্বংস হয় না ইহাও ধারণা করা যায়। এই সত্য ও কল্যাণের যোগ যদি প্রকৃতির কোনও 'স্থূল' মৌলিক যোগসূত্রকে ধরিয়াও সাধিত হয় তবে তাহাও শাশ্বত। সুতরাং সত্য ও কল্যাণকে অবলম্বন করিয়া নরনারীর যে বিবাহিত সম্পর্ক তাহা আত্মসচেতন জৈব-জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, তাহা নিত্য-আত্মায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 'অনন্তকালের'। অন্য ভাষায় বলা যায় ঐ সম্পর্ক 'জন্মজন্মান্তরের'।

কিন্তু তাই বলিয়া এই সম্পর্ক জাগতিক কামনাময় জীবনের অসত্য ও অকল্যাণকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। একমাত্র পরমশূন্যমুখী আত্মলয়ের জীবনেই ঐ 'সম্পর্ক' শাশ্বতের রূপে দেখা দিতে পারে। প্রত্যেক 'আত্মা' নিজ নিজ কর্ম্মফল-অনুযায়ী 'দেহ' ধারণ করে ইহাই জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যা। তথাপি শাশ্বতের সম্পর্ক সাধিত হইলে তাহা কালধর্ম্মী নহে। তাহা কালাতীত। আত্মসচেতন (self-conscious) নিম্নপ্রকৃতিরই ভিন্ন-ভিন্ন কর্ম্ম-ফলগতি ঘটে। ঊর্দ্ধপ্রকৃতিতে আত্মিক যোগ নিত্য। দুইটাই যুগপৎ চলিতে পারে। ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা গ্রন্থান্তরে আলোচ্য।

বর্ত্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য সর্ব্বাবস্থায় বিবাহবিচ্ছেদ নিরোধ করা নহে। একটা উচ্চতর জীবনসত্যের আদর্শ সমাজে গৃহীত না হইলে 'বিবাহ' সেখানে অনেকটা জৈব মিলন মাত্র,

সুতরাং জৈবজীবনের অসুখ-অশান্তি-অসুবিধার প্রশ্নে সেখানে বিবাহবিচ্ছেদই একমাত্র মানবিক ও স্বাভাবিক সমাধান। প্রাচীন ভারতেও বিবাহবিচ্ছেদ স্বীকৃত হইত তাহার কিছু আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৮০-৮১) করিয়াছি। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণও তাঁহার একটী গ্রন্থে* বিষয়টীর পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারও মতে—'The marriage relation should be regarded normally as permanent. Divorce should be resorted to only in extreme cases of hardship, where married life is absolutely impossible'—'বিবাহ-সম্পর্কটীকে স্বাভাবিক অবস্থায় চিরস্থায়ী বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। চরম কষ্টের ক্ষেত্রেই বিবাহবিচ্ছেদের আশ্রয় লওয়া উচিত, যে অবস্থায় বিবাহিত জীবন একেবারে অসম্ভব।' †

তথাপি যে সমাজে সংযম-ব্রহ্মচর্য-সত্য ও ত্যাগের আদর্শ স্বীকৃত নয় সেখানে বিবাহবিচ্ছেদ বা বিবাহ কোনওটীরই বিশেষ সার্থকতা নাই ও থাকিতে পারে না বলিয়া আমরা মনে করি। প্রসঙ্গান্তরে হইলেও হ্যাভলক এলিস সত্যই বলিয়াছেন—'A fine marriage system can only be produced by a fine civilization of which it is the exquisite flower'—'একটি সুন্দর বিবাহ-প্রথা কেবলমাত্র একটী সুন্দর সভ্যতার মধ্যেই বিকশিত হইতে পারে, উহা তাহারই একটী

*—Religion and Society. pp: 181-185.
†—Ibid, p: 183-184.

চমৎকার ফুল।' * সুতরাং কামকামনার বিবাহ সামাজিক মানদণ্ড হইলে ব্যভিচারের মত বিবাহবিচ্ছেদও ব্যাপক ও সহজলভ্য হইতে বাধ্য। এই দৃষ্টিতেই বোধহয় কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে মিলিত জীবনযাপনে অপারগ দম্পতীর জন্য যে বিস্তৃত বিধান দিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহের ক্ষেত্রে—উচ্চাদর্শের ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য বিবাহের ক্ষেত্রে নহে। †

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে পরমহংস-শ্রীরামকৃষ্ণ, সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ, আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণ বিবাহিত জীবনে মনের মিল, সংস্কারের মিল, রুচি ও বয়সের মিল ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বটে কিন্তু নিছক দেহবাদী সাধারণ বিবাহকে গুরুত্ব বা মর্য্যাদা দান করেন নাই ইহা সুনিশ্চিত, যদিও হিন্দু-সমাজে প্রচলিত বিবাহকে তাঁহারা শাশ্বত আত্মিক মিলনের অভিমুখেই পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবাহিত জীবনে সংযম-সত্য-ত্যাগের সাধনাকেই তাঁহারা প্রাধান্য দিয়াছেন। উহাই তাঁহাদের মতে শাশ্বত আত্মিক মিলনের ভিত্তি। ‡

নিছক কামভিত্তিক জীবনাদর্শের ফলে মুহূর্মুহূ নূতন নূতন বিবাহ অথবা নূতন ধরণের বিবাহ—যথা companionate বা

*—Sex and Marriage গ্রন্থে Marriage and Divorce প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

†—Religion and Society, S. Radhakrishnan, p: 182 দ্রষ্টব্য।

‡—শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ (শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী), পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ১৫২-৫৩ এবং শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ সঙ্গ (শ্রীনিশাকর চৌধুরী), পৃ: ১৮-২০ দ্রষ্টব্য।

সাময়িক যৌন-সাহচর্যের বিবাহ— ক্রমশঃ পশ্চিমে রেওয়াজ হইয়া পড়িতেছে। ভারতে এই ঢেউ এখনও ততখানি প্রবলভাবে সমাজে আলোড়ন আনে নাই, ইহা কতকটা আশার কথা। কিন্তু এই সমস্ত পশ্চিমী হুজুগের পিছনে অন্ধের মত না ছুটিয়া ভারতীয় নরনারীকে সব-কিছুই বিচারের আলোকে পরখ করিয়া দেখিতে হইবে। কামভিত্তিক বিবাহ যে ভাবেই করা হোক্, তাহা যৌনকামের নকল শূন্যতায় ডুবিয়া মরিতে পারে মাত্র, প্রেমের পরমশূন্যতায় আত্মলয় করিয়া অমৃতত্বের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিতে পারে না। প্রাচীন ভারতে সমাজ-ধর্ম্মের ত্যাগের স্রোতে এই অমৃতত্বের সিদ্ধিলাভ ঘটিত। পরবর্ত্তী যুগে সমাজধর্ম্ম-রাষ্ট্রধর্ম্ম-গৃহধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে বজ্রযান-সহজিয়াদি মার্গের অসামাজিক প্রেমসাধনায় নরনারীকে মহামুক্তির এই পথ খুঁজিতে হইয়াছে।

কিন্তু কামভিত্তিক বিবাহের 'রোমান্স' আজ ব্যর্থ বলিয়া ধরা পড়িলেও মনুষ্য-সমাজকে তাহার নেশায় পাইয়া বসিয়াছে। প্রেমবিবাহ (love-marriage) বা বিবাহিত প্রেম (married love) যাহাই হউক, ইহা আজ প্রায়ই কামবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বিবাহবিচ্ছেদের মধ্য দিয়া এই বিলাসের নেশা আরও ব্যাপক ও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। এমন কি নব-যৌনজীবনের অন্যতম মন্ত্রগুরু হ্যাভলক এলিসকেও বিবাহের 'রোমান্স'-সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতে হইয়াছে—'The divorce movement......has helped to fortify the

romantic view of marriage ; it has concentrated attention on the erotic side of marriage as though that were......the sole content of marriage......Nothing seems clearer than that to-day we no longer have any use for romantic fiction in marriage.'—'বিবাহ-বিচ্ছেদের আন্দোলন...... বিবাহের সম্বন্ধে 'রোমান্টিক' ধারণাকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে ; ইহা বিবাহের কামভিত্তিক দিক্‌টীর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিয়াছে যেন......তাহাই বিবাহের প্রধান উপাদান......আজ-কাল আর বিবাহ-সম্বন্ধে কাল্পনিক 'রোমান্স'-এর কোনও মূল্যই নাই, ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না'। *

ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে প্রতিক্রিয়াও একদিকে প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। Count Keyserling তাঁহার বিখ্যাত 'The Book of Marriage' গ্রন্থে বিবাহকে তাঁহার নিজস্ব এক ভাবে কঠোর সাধনা বা তপস্যার স্তরে উন্নীত করিতে চাহিয়াছেন, যাহার উদ্দেশ্য দুইটী বিরুদ্ধ শক্তিকেন্দ্রকে একটী উচ্চতর ও মহত্তর যৌথ শক্তিতে পরিণত করা। Keyserling 'সুখের বিবাহ' মতবাদে বিশ্বাস করেন না। এই জার্মান লেখকের মতে বিবাহ 'সুখ'লাভের ব্যাপার নয়, ইহা দুঃখের অভিজ্ঞতা। ইহার মধ্য দিয়া মানুষ জীবনরহস্যের জ্ঞান

* —Sex and Marriage গ্রন্থে The Future of Marriage প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

লাভ করে।* Keyserling কে সমর্থনসূত্রে Havelock Ellis বলিয়াছেন—'Man thus achieves, beyond happiness, a futher happiness, which embraces suffering and gratifies his deepest instincts, ...It is the distinction of Keyserling that he ruthlessly, applies this general truth......to the problem of marriage. ......Marriage, he asserts, is really and properly, a tragic affair .. ...that is its value. অর্থাৎ—'মানুষ এইরূপে সুখের ঊর্দ্ধে আরও এক সুখের অধিকারী হয় যাহা দুঃখকে সানন্দে বরণ করার মধ্য দিয়া মানুষের গভীরতম স্বাভাবিক ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করে। ......ইহা Keyserling-এর একটী মূল্যবান বৈশিষ্ট্য যে তিনি নির্ম্মমভাবে এই সর্ব্বত্র-প্রযোজ্য সত্যটীকে ..... বিবাহ-সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। ......তিনি জোরের সহিত বলিয়াছেন যে বস্তুতঃ এবং ন্যায়তঃ বিবাহে দুঃখেরই মহিমা। ......সেইখানেই উহার মূল্য।'* পুনশ্চ—'He does not consider that marriage is or should be, merely a "happy" condition. It is more than a sexual union, it is the bond of two equal and independent personalities, striving through that mutual relationship to attain a

*—The Future of Marriage দ্রষ্টব্য। †—op. cit.

বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। ভারতপ্রজ্ঞা বহুপূর্ব্বে তাহার সন্ধান জানিত।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা একটী আধুনিক ও ক্রমবর্দ্ধমান-ভাবে 'জনপ্রিয়' সামাজিক সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। তাহা জন্মনিরোধ বা পরিবার-পরিকল্পনা, ইংরাজী ভাষায় যাহাকে বলা হয় 'birth control'। প্রশ্নটীর পক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। একদিকে মহাত্মা গান্ধীর মত নেতা ছিলেন ইহার তীব্র বিরোধী, অপর দিকে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মত বরেণ্য দার্শনিক পণ্ডিত ও 'ধর্মজ্ঞ' ব্যক্তিও ইহার সমর্থক। সেই সব জটিল আলোচনার মধ্যে না যাইয়াও আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে প্রশ্নটী মাতৃত্বের মহিমা রক্ষা করার সহিত জড়িত। জন্মনিরোধ বিশেষ অবস্থায় অবশ্যই প্রয়োজন হইতে পারে। বাস্তববাদী ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্ম বাস্তব প্রয়োজনের বিরোধী নয়। কিন্তু ভারতধর্ম শুধু বাস্তববাদী নয়, তাহা একান্ত অধ্যাত্মবাদীও বটে। এই ভারতীয় আদর্শবাদ কিন্তু পশ্চিমী ভাষার 'idealism' নয়, ইহা সত্যজীবনের ব্যাপক বাস্তব সাধনা। সুতরাং যুগ-অনুযায়ী এই সাধনার রূপ পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তাহার সত্যজীবননিষ্ঠা অপরিবর্ত্তিতই থাকে। এই সত্যজীবননিষ্ঠার মধ্যে আছে প্রধানতঃ মানুষের রিপু-ইন্দ্রিয়ের বিকৃত জীবনের সংস্কার-প্রচেষ্টা। মানুষ সম্পূর্ণভাবে ইহা না পারিলেও ইহাই তাহার একমাত্র জীবনসাধনা। ইহা বর্জ্জন করিলে তাহার জীবন মহামৃত্যুরই অভিযান, কারণ সংযমই মহাজীবনের একমাত্র শাশ্বত পথ। ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য

যাহা আমাদের দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি। স্বল্প-পরিমাণে হইলেও এই পথে চলাই ভারতীয় শাস্ত্রের বিধান।* এই দৃষ্টিতে জন্মনিরোধ যখন যেভাবে যতটাই প্রবর্ত্তিত হোক্, ইহাতে সংযম-সাধনার গুরুত্ব এতটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জন্মনিরোধের উদ্দেশ্য নিশ্চয় অমানুষের অসংযমপ্রসার নয়, ইহার প্রথম উদ্দেশ্য অধিকাংশ মানুষের জীবনে সংযমে অপারগতার ফলে বৃহৎ পরিবারের দুঃখকষ্ট লাঘব করা এবং দ্বিতীয়, জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে দেশে-দেশে তীব্র খাদ্যসমস্যার সমাধান। প্রথম ক্ষেত্রে সংযমের অপারগতা নিশ্চয় দুঃখের সহিত স্বীকৃত, গর্ব্বের সহিত সমর্থিত নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে কোনও মানবিক আন্দোলনই অসংযমের সমর্থক হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, Lenin-এর মত বিশ্ব-কমিউনিজম্-প্রবর্ত্তক জননায়কও তরুণ-তরুণী বা বয়স্কদের মধ্যেও যৌন অসংযম মোটেই সমর্থন করেন নাই। † আর জনসংখ্যা-বনাম-খাদ্য সমস্যার ক্ষেত্রেও নিশ্চয় অসংযমকে সমাধানের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সত্য দৃষ্টিতে দেখিলে জন্ম-নিরোধকেও একভাবে বাহ্যিক ও প্রকৃতির হাতে বাধ্যতামূলক সংযম বলিয়া ধরা যায়, যদি তাহা ঠিক্ ঠিক্ গৃহ-পরিবার সমাজ-রাষ্ট্র ও বিশ্বের কল্যাণের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া করা হয়। কারণ সন্তানস্রোতের বিস্তার সেখানে সংযত করিতে হয়।

*—মহাভারত, শান্তিপর্ব ৭৫ অধ্যায় ; গীতা, ২।৪০ দ্রষ্টব্য।

†—'Youth in Soviet Russia' quoted by S. Radhakrishnan in Religion and Society, pp : 196-97 দ্রষ্টব্য।

কিন্তু পারিবারিক সমস্যার বা খাদ্যসমস্যার সমাধানের অজুহাতে স্বার্থান্ধ যৌনকামনার অবাধ প্রশ্রয় ও যথেচ্ছাচারের মনোভাব কোনও নীতিতেই সমর্থন করা যায় না। তাহা গৃহ-পরিবার সমাজ-রাষ্ট্র ও বিশ্বের বিপর্যয়ই ডাকিয়া আনিতে বাধ্য, কারণ ইহা জীবন-সত্যের অস্বীকৃতি ও বিরুদ্ধাচার। মনে রাখা দরকার ভারতীয় শাস্ত্রের বহুস্থানে বাস্তব জীবন-প্রয়োজনে বহু বিসদৃশ ও আচার-বিরুদ্ধ ক্রিয়াকে 'আপদ্ধর্ম্ম'-রূপে সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের আনুকূল্য পাইলেই পুনরায় স্বভাব-ধর্মকে অনুসরণ করার প্রেরণা সঞ্চার করা হইয়াছে। অধর্ম অর্থাৎ অসংযত স্বার্থপরতার চাঞ্চল্য কখনও ধর্মের অর্থাৎ স্বাভাবিক সংযত জীবনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই লক্ষ্য করিবার বিষয় প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে অনেক বিশিষ্ট ঋষি-মহর্ষি 'অস্বাভাবিক' পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'বিবাহিত' জীবনেও সব সময় স্বাভাবিক সমাজরীতির অনুবর্ত্তন করেন নাই, তথাপি সংযম-ব্রহ্মচর্য-সত্য-ত্যাগের মানবিক সাধনায় তাঁহারা ঋষিত্বের শীর্ষদেশে উঠিয়া সমাজে চিরপূজ্য হইয়াছিলেন।* এমনকি 'কলসে জাত' অগস্ত্য-ঋষির কথাও আমরা শুনিতে পাই। 'Test Tube Babies' ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে কিনা বলা যায় না। কিন্তু কৃত্রিমভাবে কৃত্রিম দেহে প্রাণের প্রকাশ সম্ভব হইলেও প্রাণের চৈতন্যের মহিমা লোপ পাইবে না। কিন্তু এই কলস-জাত অগস্ত্য-ঋষির কথা হইতে বুঝা যাইবে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতি এতই

---

* — বজ্রসূচীকোপনিষদ্ দ্রষ্টব্য।

দুঃসাহসী ও বাস্তববাদী যে সে ক্ষেত্রেও মানুষের মনুষ্যত্ব-বিকাশের সাধনা ও ঋষিত্ব লাভ তাহার লক্ষ্য-বহির্ভূত নয়। কৃত্রিম মানব-শিশুরও মনুষ্যত্ব-বিকাশের সমস্যা থাকিয়া যাইবে, এবং ত্যাগ-সংযম-সত্য ব্রহ্মচর্যই সেই চিরন্তন পথ।

ইহা ছাড়া জন্মনিরোধই সাক্ষাৎভাবে ও সম্যক্‌ভাবে দারিদ্র্য সমস্যার একমাত্র সমাধান বটে কিনা এবিষয়ে জন্মনিরোধ-সমর্থক হ্যাভলক এলিসও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। * এই যুগসঙ্কটে মানুষের যে নৈতিক মান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহাকে রক্ষা ও পুনঃস্থাপিত করার জন্য ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রে জোরদার প্রচার-প্রচেষ্টার ব্যবস্থা থাকা দরকার। বলা বাহুল্য, ইহা কোনও সন্ন্যাসী-বৈরাগীর ধর্মপ্রচার নয়. ইহা সাধারণ জীবনে মনুষ্যত্বের 'মান'-রক্ষা, যাহার দায়িত্ব প্রাচীন ভারতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর অনেকখানি বর্ত্তাইত। † এবিষয়ে প্রাচীন যুগে দেশব্যাপী একই আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজনেতা ঋষি ও আচার্য-গণের ন্যায় দেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ইহার মোটেই উপযোগী নয়। এই ধর্মসংকটে তাঁহাদের পক্ষে জাতিকে পথনির্দ্দেশ ও পরিচালনার দায়িত্বের অবহেলা মারাত্মক ত্রুটী সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, মাতৃত্বকে লইয়াও 'sentimentality' বা ভাবপ্রবণতার যুগ পার হইতে চলিয়াছে। সাহিত্যেও স্থানে

*—The Problem of Sterilization, Sex and Marriage (Havelock Ellis) দ্রষ্টব্য।   †—তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্থানে ইহার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই মোহভঙ্গের যুগে ইহা স্বাভাবিক এবং এদিকে মাতা (ও পিতা) সজাগ না হইলে পারিবারিক জীবনেই শুধু বিপর্যয় ঘটিতে পারে তাহা নহে (ইতিমধ্যেই তাহা অনেকটা ঘটিয়াছে), পরন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের ভিত্তিই একেবারে টলিয়া যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এযুগের চরম অধোগতির মধ্যে এক উর্দ্ধগতির আকাঙ্খা রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে ও ধরিতে হইবে। মাতৃত্ব (ও পিতৃত্ব) একটী জীবনসাধনার বস্তু, ইহা আজ অনুভব করার দিন আসিয়াছে। এদেশের প্রচলিত একটী ছড়া আজও তাৎপর্যপূর্ণ—

'মা হওয়া নয় মুখের কথা।
শুধু প্রসব করলেই হয়না মাতা॥'

যৌন-ব্যাপারে অনেকটা উদারভাবাপন্ন ও বাস্তববাদী হইয়াও দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার সিদ্ধান্ত এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—'Women as mothers are more directly sensible of the iniquity and injustice of the present order, and can bring about a deep and far-reaching change of spirit, and work it into the new style of life. Then will the New Man be born.', অর্থাৎ—'মা-রূপে নারীরা আরও সাক্ষাৎভাবে এযুগের পাপ ও অন্যায়ের সম্বন্ধে অনুভূতিশীলা। তাঁহারা একটা গভীর ও সুদূরপ্রসারী মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন এবং তাহাকে নূতন জীবনধারার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন।

তখনি জন্মগ্রহণ করিবে নূতন মানবতা।' * আজ মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের উপর এইযে প্রকৃতির অমোঘ আঘাত, ইহাকে মহা-প্রকৃতির হাতে কামসর্ব্বস্ব জনক-জননীত্বের স্বরূপ-উদ্ঘাটনরূপেও দেখা যাইতে পারে। নিশ্চয় বোঝা যাইবে যে এই নূতন মানবতার জন্মদাত্রী ও পালনকর্ত্রী নারীকে হইতে হইবে তপস্বিনী মাতা এবং তাহারই জন্য চাই আকৌমার প্রস্তুতির সাধনা। সংযম, সত্য, পবিত্রতা, ত্যাগ ও বীরত্বই ভারতীয় নারীর সেই তপস্যা। মধ্যযুগের নিছক স্নেহপরায়ণা জননীর দিন অতীত হইয়াছে। স্নেহের ও সেবাপরায়ণতার সহিত আজ তপস্যার শক্তি সংযোজিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। আত্মিক ব্যক্তিত্বের এই শক্তির স্পর্শ নাই বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই আজ শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও 'সমাজবিরোধী' নারীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের সন্ধান করিতে হইয়াছে। † সর্ব্বশেষে একটু শরীরতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক আশঙ্কার ইঙ্গিত দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি। যুগের বাহ্যিক প্রয়োজনে জন্মনিরোধ ইত্যাদির যতই প্রসার হোক্, তাহার সহিত নৈতিক সংযমসাধনা অবশ্যই চলিতে পারে ও অধিকতর চলা উচিত একথা আমরা বলিয়াছি। তবে জন্মনিরোধাদির ব্যাপারে সম্ভাব্য শারীরিক-মানসিক প্রতিক্রিয়া ছাড়াও মূল মাতৃত্বের অনুভূতিতে ভবিষ্যতে কোনও আঘাত না লাগে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও সমাজনায়কদের বিশেষ অবহিত থাকা প্রয়োজন।

*—Religion and Society, p : 198.

†—'ল্যাবরেটরি' (ছোট গল্প), রবীন্দ্রনাথ, দ্রষ্টব্য। শরৎসাহিত্য সুপরিচিত।

উচ্চতর চিন্তা ও ভাবের কেন্দ্রে নড়চড় ঘটিলে কোনও আদিম (elemental) বিকার অসম্ভব নাও হইতে পারে। ইঁদুরের cerebral cortex সরাইয়া দিলে যে সন্তান জন্মে তাহার প্রতি ঐ ইঁদুর-জননীর কোনই 'মাতৃত্ব' অর্থাৎ সন্তানস্নেহ থাকে না, ইহা শরীরতত্ত্ব-পরীক্ষিত সত্য।* জন্মনিরোধ-যুগের সন্তানদেরও পিতামাতা এবং সাধারণভাবে সমাজের প্রতি কিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে তাহাও সমাজ-হিতৈষীদের গভীর গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। আমরা বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে অনেকভাবে হয়ত প্রকৃতির গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি† কিন্তু তাহা বিশেষ সাবধানতা—'proper precaution'-এর—সহিত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়াই করা হয়। মানুষের সূক্ষ্ম রহস্যময় জীবনে ইহা আরও কত বেশী প্রয়োজন তাহা যেন আমরা স্মরণ রাখি। আবার ভবিষ্যতের যুগপ্রয়োজন-অনুযায়ী কৃত্রিমতাবর্জ্জনের ক্ষমতা ও সদিচ্ছাও আমাদের বজায় রাখিতে হইবে। সভ্যতার ধারা বদ্‌লাইলেও সত্য জীবননীতি কখনও বদ্‌লাইবে না। যৌন-সংযম এইরূপ একটী শাশ্বত জীবননীতি।

জীবন লক্ষ্য :—

বিষয়টীর বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রয়োজন। কিন্তু তবুও একটী মূল সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিলে সমস্ত

*—A Text-Book of Physiology, Ed. K. M. Bykov, p : 447 দ্রষ্টব্য। সিদ্ধান্ত নিজস্ব।

†—Religion and Society, p : 190.

আলোচনা ও সিদ্ধান্তেরই বিরুদ্ধযুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। জীবনের লক্ষ্য মুক্তিলাভ, জ্ঞানলাভ, ঈশ্বরলাভ, ভক্তিলাভ অথবা ধনলাভ, মানলাভ, প্রভুত্বলাভ, ভোগলাভ ইত্যাদি নানা-ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে। আমরা যে জীবনলক্ষ্যের কথা বলিতেছি তাহা এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্য।

কিন্তু এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইলে যে জিনিষের প্রয়োজন হয় তাহাকেই ভারতপ্রজ্ঞা ধর্ম্ম বা 'শাশ্বত ধর্ম্ম' নাম দিয়াছে। এই শাশ্বত-ধর্ম্মই অন্যান্য ধর্ম্মের ভাষায় 'Eternal Law', কিন্তু তবুও ইহার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। জীবনের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নূতন নূতন রূপে সামঞ্জস্য-বিধান করিবার শক্তি ভারতধর্ম্মের মধ্যেই ছিল ও এখনও আছে। ইহারই জন্য ইহার সহিষ্ণুতা অপরিসীম, এইজন্যই ইহা শতআঘাতের মধ্যেও সমানে জাগ্রত রহিয়াছে। ইহার 'গোঁড়ামী' নাই বা ছিল না তাহা নহে (সমস্ত সত্যের প্রকাশেই তাহা থাকে), কিন্তু তথাপি ইহা যুগে-যুগে নানাভাবে নিজেকেই নিজে ভাঙ্গিয়াছে, নিজেকেই নিজে গড়িয়াছে। কারণ কোনও ধর্ম্মীয় মতবাদ ইহার সর্ব্বস্ব নয়, সত্য-জীবনবিজ্ঞান ও তাহার সাধনাই ইহার সব। এক যুগে ইহাই ছিল সমাজধর্ম্ম, পরবর্ত্তী বিভিন্ন যুগে ইহা জ্ঞানবাদী, ভক্তিবাদী, যোগবাদী, তন্ত্রবাদী সম্প্রদায়ধর্ম্ম। মূল সমাজধর্ম্মের একটা বিকৃত ছাঁচ কেন আজিও টিকিয়া আছে সেকথাও আমরা ইতি-পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১০৬, ২৩৭-৪০)। এযুগে

মাতাইতেছে, নূতন সমাজের স্বপ্ন দেখাইতেছে। কিন্তু তবুও বলিতে হইতেছে আরও বিরাট, বিশাল, সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ মহাজীবনের ক্ষেত্রে মানুষের দুঃসাহসের অভিযান এখনও আরম্ভ হয় নাই। হয়ত বর্ত্তমান সেই মহান্ ভবিষ্যতেরই প্রস্তুতি। কিন্তু মানুষ সংযত-শান্ত-শক্তিমান্ হইতে না শিখিলে এই নূতন ভবিষ্যতের পথে পা' বাড়াইতে পারিবে না। সেজন্য Havelock Ellis এর ভাষায় বলিতে হয়—'Man is indeed, a queer animal ; he is ready to explore the stars and penetrate into the stratosphere, but the practical investigation of his own intimate affairs comes last !' —'মানুষ, সত্যই, একটা অদ্ভুত জীব ; সে নক্ষত্রের রাজ্যে অনু-সন্ধান চালাইতে চায় এবং মহাকাশে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু তাহার কাছে তাহার অতি অন্তরঙ্গ নিজস্ব বিষয়গুলির বাস্তব গবেষণার স্থান একেবারে সবশেষে !' *

আজিকার দুঃসাহসী মৃত্যুভয়হীন মানুষকে বিরাট অন্তরা-কাশ † ও বিপুল অন্তর্জ্জীবনের ক্ষেত্রে অধিকতর দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে হইবে। ভাবীকালে তাহারই দিন আসিতেছে।

যুগসংযম :—

সংযমের মূল নীতি সবযুগেই সমান, তবুও তাহার বাহ্যিক ঠাট যুগে যুগে নানা রূপ গ্রহণ করিতে পারে, এবং এমন বি

*—The Attitude towards Divorce (Sex and Marriage) দ্রষ্টব্য। †—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩।

কখনও কখনও বাহ্যতঃ তাহাতে স্ববিরোধও দেখা যাইতে পারে। সুতরাং সংযমসাধনাই যেখানে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ সেখানে পরিবর্ত্তিত বা বিরুদ্ধ ধারার মধ্যে সংযমেরও নূতন ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগসঙ্কটে ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।

বর্ত্তমান যুগ পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে এক চরম পরিবর্ত্তনের কাল। প্রাচীন বা আদিম যুগ হইতে 'ধর্ম্মীয়' বিকাশ নানাভাবে ধাপে-ধাপে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইয়া 'মধ্যযুগীয়' সভ্যতার শিখরদেশে পৌঁছাইয়াছিল। এই যুগে সর্ব্বদেশের ধর্ম্মান্দোলনগুলির বিচিত্র অবদান নানাভাবে মনুষ্যসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। ঐ একই প্রেরণার উৎস হইতে শিক্ষা-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন-সংস্কৃতিও নানা দিকে স্ফুরিত হইয়া উঠে।

তারপর আসে রেণেসাঁস (Renaissance)-এর নূতন আন্দোলন যাহা সম্পূর্ণ নূতন-পথে মানুষের চেতনার বিকাশ সাধন করে। ইহা ঐশ্বরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির রহস্যবাদের স্থলে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তির বাস্তববাদকে স্থাপিত করে। ধর্ম্মেও আসে সংস্কার ("Reformation") ও স্বাধীনতা। এই নূতন যুগ-প্লাবনের স্রোতে ক্রমশঃ ধর্ম্ম একপাশে মন্দীভূত স্রোত (backwater)-রূপে অবস্থান করিতে থাকে। ধর্ম্মের মহিমা থাকিলেও গরিমা যেন হারাইয়া যায়। মনুষ্যসমাজে ধর্ম্মের কোনও কার্যকরী প্রভাব থাকে না। বলা বাহুল্য, ইহা ঠিক্ নাস্তিকতা নয়, ইহা এক নূতন পথের আস্তিকতা ও বিশ্বাস, ইহা ঠিক্ ভোগবাদও নয়, ইহা এক নূতন পথের ত্যাগবাদ ও

তপস্যা। এই নূতন আস্তিকতার বিশ্বাস ও নূতন ত্যাগের তপস্যার যুগে আমরা বাস করিতেছি। একদিকে বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা (technology) ও শিল্পবাদ (industrialism) এবং অপর দিকে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজবাদ (socialism)—এই দুই 'ধর্ম্ম'ই আজ সভ্যতার নিয়ামক। লক্ষ্য—'মানবতা' (humanism)। যুক্তিবিচার ইহার প্রতিষ্ঠা-ভূমি।

কিন্তু সভ্যতার এই নূতন ধারারও এক 'শীর্ষদেশে আমরা আরোহণ করিয়াছি। এইবার অবরোহণের পালা। এই নূতন 'ধর্ম্ম'ও সেজন্য এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যেখান হইতে আবার এক নূতনতর জীবনধর্ম্মের নূতনতর পথে সভ্যতাকে অগ্রসর হইতেই হইবে। যে যন্ত্রসভ্যতা আমাদের এতখানি গৌরব তাহারই সম্বন্ধে তাহার প্রাথমিক উদ্যোক্তৃগণের মনোভাব আজ কিরূপ নৈরাশ্যকর হইতে পারিত তাহা এ যুগের বৈজ্ঞানিক যুগ-আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা * এইরূপ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন— 'An old exponent of applied mechanics may be forgiven if he expresses something of the disillusion with which, now standing aside, he watches the sweeping pageant of discovery and invention in which he used to take

*—Sir Alfred Ewing, quoted in A Study of History (abridged), by Arnold Toynbee, p : 207

unbounded delight. It is impossible not to ask: whither does this tremendous procession tend? What, after all, is its goal?', অর্থাৎ—'যন্ত্রপ্রয়োগ-বিদ্যার কোনও পূর্ব্বতন উৎসাহী যদি আজ দূরে দাঁড়াইয়া এযুগের নিত্যনূতন বিচিত্র আবিষ্কারের ঢেউ দেখিয়া তাহাতে তাঁহার মনে যে নৈরাশ্য এবং মোহভঙ্গের ভাব জাগিতেছে তাহার কিছুটা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। অথচ এই আবিষ্কারে এক সময় তিনি অফুরন্ত আনন্দ পাইতেন। এই বিপুল শোভাযাত্রা কোথায় চলিয়াছে, কিই বা ইহার লক্ষ্য? —এইরূপ প্রশ্ন না করিয়া পারা যায় না।' সর্ব্বক্ষেত্রেই এইরূপ। 'আধুনিক মানুষ' (modern man) সব দিক্ দিয়া নিজের 'উন্নতি'র জালে আজ কতখানি অসহায়-ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে এবং নিদারুণ ভয়-সংশয়-অনিশ্চয়তার মধ্যে কাল কাটাইতেছে তাহা বিশ্ববিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—'Modern man is a culmination, but tomorrow he will be surpassed; he is indeed the end product of an age-old development, but he is at the same time the worst conceivable disappointment of the hopes of humankind. ......He has seen how beneficent are science, technology and organisation, but also how catastrophic they can

be. ......The Christian Church, the brotherhood of man, international social democracy and the 'solidarity' of economic interests have all failed to stand the baptism of fire—the test of reality..... At bottom, behind every such palliative measure, there is a gnawing doubt', অর্থাৎ—'আধুনিক মানব উন্নতির শীর্ষে উঠিয়াছে কিন্তু আগামী কাল সে অতিক্রান্ত হইবে। বাস্তবিক পক্ষে সে একটা যুগের চরম পরিণতি, কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির আশা-আকাঙ্খার যতদূর ব্যর্থতা কল্পনা করা যায়, সে তাহাই।... বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা ও সংগঠন কতদূর হিতকারী তাহা সে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহারা কতদূর ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহাও সে দেখিয়াছে। ...খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্ঘ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব আন্তর্জ্জাতীয় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং অর্থ নৈতিক স্বার্থের একত্ব—এ সমস্তই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সেই পরীক্ষা বাস্তব সত্যের পরীক্ষা। ... এই প্রত্যেকটী উপশমের উপায়ের পিছনে সব কিছুর তলায় একটা সর্বক্ষয়ী সংশয় বিরাজ করিতেছে।' * যে ভাবে যে উদ্দেশ্যে এই কৃত্রিম যুগধর্ম তাহার জয়যাত্রা সুরু করিয়াছিল, তাহা সেই ভাব ও উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া বিপথে ভয়ঙ্করভাবে অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছে, যেখানে তাহার ধ্বংসমুখী গতির বিপুল বেগ সংবরণ করিবার কেহ নাই। সুতরাং

---

*—C.G. Jung, *Modern Man in search of a Soul,* quoted in 'Religion and Society' by S. Radhakrishnan, p : 12

সেই নবযুগের গীতা ধ্বনিত হইবে।এই ধ্বংসেরই কুরুক্ষেত্রে।

এই নূতনতর যুগধর্ম্মের কিছু আভাস আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা-প্রসঙ্গে দিয়াছি। একথা অতি সত্য বর্ত্তমান যুগে সহসা শীঘ্র জীবনধারার মধ্যে কোন নূতন আধ্যাত্মিকতা আসা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতে যে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের কথা আমরা বলিতেছি তাহা প্রাচীন যুগের মত হইতে পারে না, বাস্তব জীবনের যে নূতনরূপ এযুগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার সহিত উহাকে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। এজন্য এযুগের জীবন-বিকারের মধ্য দিয়াই ভাবী যুগধর্ম্মের বিকাশ ঘটিবে।

যৌনকামের বিকার আজ প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই ছড়াইয়া রহিয়াছে। 'স্বাভাবিক' মানুষ বলিয়া জনসাধারণের যে বিরাট অংশ সমাজে পরিচিত তাহা নানাভাবে প্রচ্ছন্ন মানসিক বিকার ও তাহার মুলে যৌন বিকারের অধীন, আধুনিক মনস্তত্ত্বেরই ইহা সিদ্ধান্ত। 'হিষ্টিরিয়া' বা অস্বাভাবিক উত্তেজনা যে কত ব্যাপক তাহা Havelock Ellis-এর গ্রন্থে নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বুঝা যাইবে। — 'আমাদিগকে হয়ত স্বীকার করিতে হইতে পারে যে যৌন উচ্ছ্বাসগুলির দিক্ দিয়া এবং সাধারণ দৈহিক প্রকৃতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে স্বাভাবিক ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একটী অবস্থা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে যাহা প্রকৃতিতে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণযুক্ত এবং যে অবস্থা হিষ্টিরিয়া রোগে অসুস্থ বলিয়া গণ্য করা হয় তাহারই স্বাস্থ্যসম্পন্ন প্রতিরূপ।' *

* —"যৌন মনোদর্শন" (হ্যাবলক এলিস), 'স্বয়ংরতি'-বিষয়ক অংশ, পৃ: ৭০ (বসুমতী সাহিত্য মন্দির)।

এই 'হিষ্টিরিয়া' প্রায় সকল তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষকে ভিতরে কতখানি অস্বাভাবিক ও 'অমানুষ' করিয়া রাখিতে পারে সেদিকে কিন্তু আধুনিক সমাজ-মনস্তত্ত্ব মনোযোগ দেয় না। সমাজ ও রাষ্ট্র যে মানুষকে লইয়াই এই অতি সহজ তথ্যটীও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হিষ্টিরিয়ার তলায় সর্ব্বদাই চাপা পড়িয়া যায়। আত্মহত্যা ও উন্মাদ রোগ আজ আমেরিকায় ব্যাপক। সুতরাং দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই শুধু ইহার কারণ নয়। নানাবিধ অপরাধপ্রবণতার কথা না-হয় বাদই দিলাম। চব্বিশঘণ্টা অসহনীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার চাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুহুর্মুহু barbiturate, ঘুমের বড়ি গিলিয়া, dope, mari-juana ফুঁকিয়া সভ্যমানুষ কোনও রকমে টিকিয়া আছে। ধনবৈষম্যহীন 'নূতনসমাজ' গড়িয়াও রাশিয়া ব্যাপক মদ্যপান দূর করিতে পারে নাই। তরুণদের মধ্যে জীবনব্যর্থতাবোধ ও মদ্যপান-প্রবণতার সমস্যাও গুরুতর। * ইহার পশ্চাতে যৌন-বিকার না-লুকাইয়া পারেনা। কর্ম্মের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যৌনকামের মূল-সমস্যাকে অবহেলা নিশ্চয় মারাত্মক। কমিউনিষ্ট সভ্যতার নামে তরুণ (বা এমনকি বয়স্ক) সমাজে অবাধ যৌন-স্বেচ্ছাচারের সম্বন্ধে স্বয়ং Lenin-কে তীব্র আবেগময়ী ভাষায় সমালোচনা করিতে হইয়াছে। —'...This 'glass of water' theory has made our young people totally and utterly

* "—Inside Russia To-day", John Gunther, p. 72.

crazy. It has been the doom of many a young lad and lass', অর্থাৎ— 'গ্লাসের জল খাওয়ার মতবাদ' * আমাদের তরুণগণকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে উন্মাদ করিয়াছে। ইহা বহু তরুণ-তরুণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে।' † লেনিনের পর এই ব্যাপক যৌনপ্রবণতাকে U. S. S. R তাহার যান্ত্রিক অগ্রগতি দিয়া কতটা চাপা দিতে পারিয়াছে তাহা বলার উপায় নাই। John Gunther-এর গ্রন্থে অবশ্য আমরা দেখিতেছি পরবর্ত্তী কালেও '...the fact cannot be denied that a great deal of love-making goes on in the U. S. S. R, and that this starts at an early age', অর্থাৎ—'... এই বাস্তব ব্যাপারটী অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচুর যৌনপ্রেম চলিয়া থাকে এবং তাহা কম বয়সেই সুরু হয়।' ‡ অন্যান্য যৌনসমস্যারও অসদ্ভাব নাই। সুতরাং ধনকামের সমস্যার অনেকটা রাষ্ট্রীয় সমাধান ঘটিলেও যৌনকামের (ও লোককাম বা প্রভুত্বকামের) সমস্যার কতটা সমাধান হইয়াছে তাহা বিতর্কের বিষয়। কমিউনিষ্ট জগতের

* —'কমিউনিষ্ট সমাজে যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এক-গেলাস জল খাওয়ার মতই একটী সহজ ও সাধারণ ব্যাপার' এই কুখ্যাত মতবাদ (উদ্ধৃতির পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ)।

† —Clara Zetkin-কে লিখিত পত্র। Quoted in Religion and Society, p. 196.

‡ —Inside Russia To-day, (1962) p: 363.

অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে অশোধিত ধনকাম বা অসংযত যৌনকামকে প্রভুত্বকামের পথে ঠেলিয়া দিতেছে কিনা তাহাও গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম সে সবেরই মূলে ঐ মানব-মনের ব্যাপক 'হিষ্টিরিয়া'।

তথাকথিত 'অবদমিত' যৌনকামকে হিষ্টিরিয়ার কারণ বলিয়া ভাবিয়া লওয়া আজকাল রেওয়াজ হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির ভ্রান্তি কোথায় তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি (দ্বিতীয় অধ্যায়)। ফ্রয়েড নিজেও তাঁহার কামাবদমনতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব সুনিশ্চিত ছিলেন না তাহা প্রমাণিত হয় 'Infantile Sexuality' বা 'শৈশবের কামপ্রবণতা' মতবাদের মূলে তাঁহার পরিণত বয়সের প্রজ্ঞালব্ধ 'Death Instinct' বা 'মৃত্যুবৃত্তি'র মতবাদকে স্থাপন করার মধ্যে। * হ্যাভলক এলিসও তাঁহার গ্রন্থে ফ্রয়েডের এই যৌন-অবদমনতত্ত্বের 'একপেশে' ভাবের কথা ফ্রয়েডের সমসাময়িক যৌনতত্ত্ববিদ্‌গণের মতসহ ব্যক্ত করিয়াছেন। ফ্রয়েড মানুষের 'disposition' বা ব্যক্তিগত স্বভাবকে এক্ষেত্রে কতখানি স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি (দ্বিতীয় অধ্যায়)।

সুতরাং মানুষের অসংস্কৃত স্বভাব (unregenerate nature -এর উত্তেজনাপ্রবণতা (hysteria)-কে সংস্কৃত

---

* —The Life and Work of Sigmund Freud (Ernest Jones), p : 434,

(regenerate) না করিয়া আমরা এযুগে প্রকৃত জীবনসমস্যাকে এড়াইয়া চলিতেছি। ফল, সভ্যতার অপমৃত্যু। আজ মহাজীবনের পুনরুদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে এই যুগপ্রবৃত্তিকে সংযত করা একান্ত প্রয়োজন।

আধুনিক কালে যাহাকে 'যৌন-অবদমন'-জনিত 'হিষ্টিরিয়া' বা 'নিউরসিস্' ভাবা হয় তাহাই যে সমস্যার স্বরূপ নয় তাহা প্রমাণিত হয় ফ্রয়েড ও ব্রয়ার (Breur)-এর ও পরোক্ষ স্বীকৃতিতে। —'হিষ্টিরিয়ার' অবস্থার মানসিক প্রকৃতিতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই মৌলিক উপাদানটী দেখা যায়—তাহাদের প্রবৃত্তির প্রবণতা এবং যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া তাহাদের ধারণা এ উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব: এই ব্যাপার হইতেই হিষ্টিরিয়া রোগীর চরিত্রের শ্রেষ্ঠতরতা বুঝা যায়। ব্রয়ার ও ফ্রয়েড নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতে চাহেন যে, হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ "মনুষ্যসমাজের রত্ন"।' † যাহা হউক, আমরা দেখিলাম হিষ্টিরিয়া বা নিউরসিসের নামে জীবন-সত্যের সাধনায় বিমুখ হওয়ার পিছনে কোনও যুক্তিবাদই নাই।

এযুগের তথাকথিত 'স্বাভাবিক' বা 'normal' মানুষ তথাকথিত 'নিয়মিত' যৌনকামচর্চ্চার সহিত যে আত্মতৃপ্ত জীবন যাপন করেন তাহার অস্বাভাবিকতা আজ সর্ব্বাগ্রে উদ্‌ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। বয়স্ক সমাজে জীবনভ্রান্তি পুষিয়া রাখিয়া তরুণ সমাজে জীবনসত্যের প্রচার একপ্রকার বাতুলতা। এ বিষয়ে

†—যৌনমনোদর্শন (হ্যাভলক এলিস), স্বয়ংরতি-খণ্ড, পৃ: ৬১-২, (বসুমতী সাহিত্য মন্দির)।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। (পৃঃ ৪৫৭-৫৯)। সংযম-ব্রহ্মচর্যের কথা তুলিলেই বয়স্কেরা যে ছেলেদের দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া দেন—অর্থাৎ সমস্যাটা যেন তাঁহাদের নয়—ইহা একটী অমানুষিক সামাজিক অপরাধ।

যৌনকামকে পৃথিবীর ইতিহাসে—বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় ধর্ম্মে ও নীতিতে একটী 'পাপ' রূপে গণ্য করা হইয়াছে। শৈশবের কামবৃত্তিকেও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহান্ খৃষ্টীয় ধর্ম্মগুরু St Augustine পাপের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন এবং মানবজাতির আদি পিতামাতার মৌলিক পাপ (Original Sin) ইহার জন্য দায়ী ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার কথিত এই 'concupiscence' বা 'যৌনকাম-লালসা' একটী প্রাকৃতিক অস্বাভাবিকতা-রূপে সকল যুগের জীবন-সাধক মানুষের কাছে দেখা দিয়াছে, কারণ ইহা প্রাকৃতিক হইলেও স্বাভাবিক নয়। এই নিম্নস্তরের শক্তির বন্যাকে বাঁধ (dam) দিয়া ধরিয়া উচ্চস্তরের মানব-জীবনে ঊর্দ্ধরেতা-বৃদ্ধির কাজে লাগান—ইহা এযুগেরও একটী মূল সমস্যা। বিখ্যাত যৌনদার্শনিক Dr. J. D. Unwin-এর মতে—'the amount of civilized energy stored up in a society is related to the degree it has attained in compulsorily sacrificing the gratification of desire.', —অর্থাৎ 'কোনও একটী সমাজে সভ্যতার শক্তি সেই পরিমাণে সঞ্চিত থাকে যে পরিমাণে সেই সমাজে যৌনকাম চরিতার্থ করাকে অবশ্যকরণীয়-রূপে বলিদান

দেওয়া হয়।' * Aldous Huxley-রও এই মত। † M. Bureau-লিখিত গ্রন্থের শেষ ভাগে একটী উদ্ধৃতি গান্ধীজী স্মরণীয় করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ—'the future is for the nations who are chaste', অর্থাৎ—'যৌনসংযত জাতিরাই হইবে ভবিষ্যতের নিয়ন্তা।' § এ বিষয়ে অন্য মত থাকিলেও যোগসিদ্ধ সত্যদৃষ্টির সম্মুখে তাহারা টেকে না, ইহা আমরা Freud, Havelock Ellis ইত্যাদি যৌনবিশারদ-গণের আলোচনাসূত্রে দেখাইয়াছি।

কিন্তু এই 'পাপ'বোধকে মধ্যযুগীয় ধর্ম্মবোধের অঙ্গরূপে দেখিলে শুধু চলিবেনা। বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদিতার দৃষ্টিতে যৌনকামের (ও যৌনপ্রেমের) স্বরূপবোধ লাভ করিতে হইবে। তাহার বিসদৃশতা ও অসামঞ্জস্য অনুধাবন করিতে হইবে, কিছুরই দিকে মুখ ফিরাইবার দরকার নাই। তখনই আমরা দেখিতে পাইব যাহা বিসদৃশ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা মানুষের সত্যকার সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিবেই, এবং তাহাই মধ্যযুগীয় ভাষায় 'পাপ'। এই পাপের কণ্ঠরোধ করাই এযুগের ভাবুকতা। ইহাতে বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিকতার একান্ত অভাব। ইহারই ফলে সভ্যতার সঙ্কট দেখা দিয়াছে। মানুষ 'চালাক' হইয়াছে কিন্তু ঠিক্‌পথে চলিবার শক্তি হারাইয়াছে।

* —'Sex and Culture' এর লেখক Dr. J. D. Unwin সম্বন্ধে Havelock Ellis-এর উক্তি। 'Eros in Contemporary Life' দ্রষ্টব্য।

† —Quoted in 'Religion and Society' (Radhakrishnan).

§ —Self-Restraint V. Self-Indulgence, p : 40.

এই শক্তিকে ফিরাইয়া পাইবার পথ কোনও অসম্ভব দৈহিক সংযম নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'কাম' দেহ-মন-বুদ্ধিকে যুগপৎ আশ্রয় করিয়া বাস করে। সুতরাং শুধু স্থূল দেহের সংযমই সংযম নয় (এবং তাহা সবক্ষেত্রে সম্ভবও নয়), তাহার সহিত চাই সূক্ষ্ম মন ও বুদ্ধির সংযম। ইহার জন্য চাই এক নূতন জাতীয় ও সামাজিক তথা বিশ্বজনীন জীবনের আদর্শবাদ যাহা যৌনকাম তথা ধনকাম ও লোককামের অস্বাভাবিক মূল্য স্বীকার করিবে না। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিতে কামসংযমে ব্যর্থতাই 'পাপ' নয়, কামসংযমে ঔদাসীন্য ও ঔদ্ধত্যই প্রকৃত পাপ। এই পাপে বিশ্বমানব আজ সাধারণভাবে 'পাপী'। বুদ্ধিবিকৃতিকে দূর করাই আজ সেজন্য সংযমব্রহ্মচর্যের প্রথম ও প্রধান কথা—তাহার সহিত মানসিক ও দৈহিক সংযমের প্রচেষ্টা আপনা হইতে আসিবে। এজন্য আমরা 'গৃহীর ব্রহ্মচর্য', 'তরুণের ব্রহ্মচর্য', 'বিধবার ব্রহ্মচর্য', ইত্যাদি নামে ব্রহ্মচর্যকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া দেখিবারও পক্ষপাতী নই। ঔষধ খাইয়া শুক্রক্ষয়-নিবারণের কবিরাজী ব্রহ্মচর্যেও আমাদের আস্থা নাই।

বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনে নরনারীর যৌনকামমূলক ভালবাসার স্বরূপ লইয়া পশ্চিমী জগতে আজ যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। ফ্রয়েড ও হ্যাভলক এলিস ইত্যাদির যৌনগবেষণা হইতে আমরা এক বাস্তব বিচারদৃষ্টি লাভ করিয়াছি এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহাকে ভারতীয় যোগদৃষ্টির সহিত আমাদের

বিচারমত সমন্বিত করিয়াছি। আরও কিছু বাস্তব জ্ঞান ও তাহার সমন্বয় প্রয়োজন।

বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনে নরনারীর প্রেমসঙ্কট লইয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে মৌলিক সংশয় ও উৎকট বিতৃষ্ণা দেখা দিয়াছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। পাশ্চাত্যের সমাজেও বিবাহিত বা অবিবাহিত যৌনপ্রেমের যে দ্রুত অবনতি ও জটিল পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে তাহারও আমরা কিছু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। সর্ব্বদাই কি এদেশে কি বিদেশে একটা ফাঁকির খেলা চলিতেছে ইহা বলা যায়, অথচ ফাঁক যে কোথায় তাহা লইয়া কাহারও তেমন মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। বানার্ড শ' বলিয়াছেন যৌনসঙ্গমের সহজ সুযোগ দেয় বলিয়াই বিবাহ-প্রথা এত জনপ্রিয়। Arms and the Man—নাটকে তিনি রোমান্টিক প্রেমের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। হ্যাভলক এলিসও দেখাইয়াছেন পুরাতন যৌন রোমান্স আজ অচল ও অর্থহীন।* বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'নব্য-নীতিবাদ' (New Morality) কি বস্তু তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। সুতরাং রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন না হইয়া আজ আর উপায় নাই। এই পথে এখন আমরা আর একটু আগাইয়া দেখিব।

পুরুষের যৌন-চাঞ্চল্য চিরকালই সুবিদিত। কিন্তু নারীর যৌনকাম যতই প্রবল ও গভীর হোক্, একটা স্থিতিশীলতা

*—'The Future of Marriage', Havelock Ellis দ্রষ্টব্য।

ও ধীরতা নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং নারীদের যৌন-মনোভাবের পরিবর্ত্তন মানুষের সমাজেরই রুচিপরিবর্ত্তনের মানদণ্ড-রূপে গৃহীত হইতে পারে। নারী-স্বভাবের 'prudery' বা 'শালীনতার বাড়াবাড়ি' বহুকাল অচল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক নারী-স্বাধীনতার মধ্যে নারীর যৌনজীবনের স্বাধীনতা পূর্ব্বযুগের শালীনতার সীমা অনেকদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে। এবিষয়ে Havelock Ellis হইতে আমরা কিছু ভাবসংকলন করিতেছি। বিবাহিত জীবনে রোমান্সের আশা-ভরসা মেয়েরা আর করে না, রূঢ় বাস্তবকে লইয়া নূতনভাবেই চলিতে চায়। প্রেমে পড়ার ধার তাহারা ধারিতে চায় না কারণ 'tension' ও 'repression' অর্থাৎ শারীরিক-মানসিক উত্তেজনার 'টান' ও অবদমনের ব্যাপার তাহারা বুঝিয়াছে, এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতিতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে শিখিয়াছে। 'There is a new liberation of the female spirit to-day, and a new feminine aggressiveness'—'আজ নারী-চেতনার একটা নূতন মুক্তিলাভ ঘটিয়াছে এবং একটা নূতন আক্রমণশীলতা নারীদের মধ্যে দেখা দিয়াছে।' '……petting with its freedoms has increased, and mutual handling is no longer suppsed to be unholy and unclean'— '…আদর করার নানা স্বাধীনতা বাড়িয়াছে এবং পরস্পর হস্তের ব্যবহার আর অপবিত্র বা নোংরা বলিয়া ভাবা হয় না।' '...men are becoming more chaste

and women less chaste'—'...পুরুষের অপেক্ষা নারীরা বেশী যৌন-ব্যপারে অসংযত (অসতী) হইতেছে'। * শিক্ষিতা এবং সাধারণ, বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে আত্মমৈথুন (masturbation) প্রচুর দেখা যাইতেছে এবং যে চরম যৌনতৃপ্তির সংবেদন (orgasm) এতদিন পুরুষেরই শারীরিক অনুভূতি বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাও নারীদের মধ্যে দেখা দিতেছে। † বেশ্যাবৃত্তি রাশিয়ায় প্রায় উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু, আর একদিকে, অবৈধ সন্তান বলিয়া এখন আর কিছুই নাই, সুতরাং স্বাধীন যৌনমিলন অবিবাহিত জীবনেও সম্ভব হইয়াছে। কোনও কোনও দেশে ভ্রূণহত্যা (abortion) আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং অন্যত্র তাহা পরিকল্পিত হইতেছে। সর্বদেশেই বিবাহবিচ্ছেদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতেছে। সুতরাং যৌনমিলনের ও যৌনভালবাসার কোনও পবিত্রতাবোধ একরূপ নাই বলিলেই চলে।

এইত গেল একদিকের কথা। অপরদিকে নরনারীর যৌন-প্রেমের সুতীব্র আকর্ষণটীর মধ্যে ফ্রয়েড ছাড়াও অনেক গবেষক যে অন্ধকারের চিত্রগুলি উন্মোচিত করিয়াছেন তাহার সার্থকতা আর কিছু থাক আর নাই থাক, যৌনপ্রেমের যে পালিশ-করা বাহিরের রূপটী লইয়া এযুগের মানুষ 'স্বাভাবিক' জীবনের

---

*—'Eros in Contemporary Life', Havelock Ellis, (প্রয়োগ নিজস্ব)।

†—'The Supposed Frigidity of Women', Havelock Ellis. (প্রয়োগ নিজস্ব)।

অভিনয় করিয়া চলিয়াছে সেই 'বিমূঢ়' * 'স্বাভাবিকতা'র পালা এবার বোধহয় সাঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কয়েকটী উদাহরণ আমরা এখানে সন্নিবেশিত করিতেছি।

Stanley Hall-এর সুবিখ্যাত যৌনগবেষণায় দেখা গিয়াছে যৌনকাম ভয়, ক্রোধ, ও বিষাদের সহিত একই উপাদানে গঠিত, একটী হইতে অপরটীতে রূপান্তর অতি সহজ। আমাদের দেশে জিনিষটাকে অন্যভাবে বিচার করা হইয়াছে—অর্থাৎ যোগ-সাধনার উপায়রূপে। গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্রে ইচ্ছা (কাম) ভয়, ক্রোধ, একই সূত্রে গ্রথিত অজ্ঞানের বিষয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। † কিন্তু Stanley Hall এবং অন্যান্য আমেরিকান ও ইউরোপীয় গবেষক যে বাস্তব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইসব সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহা চমকপ্রদ এবং বহু শ্রমসাপেক্ষ। Stanley Hall দেখিয়াছেন—'স্বাভাবিক' পিতা-মাতার একমাত্র শিশুসন্তানের মৃত্যুতে একান্ত শোকবিহ্বল পিতা সেই তীব্র শোকের সময়েই সন্তানের মৃতদেহের সম্মুখেই সহসা স্ত্রীর প্রতি তীব্র যৌন উত্তেজনা অনুভব করিয়াছেন। এবং আরও বিচিত্র এই যে স্ত্রী—ঐ সন্তানের মাতা—এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি স্বামীর প্রগাঢ় 'ভালবাসা'কেই অনুভব করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুরাত্রেই শোকবিহ্বলা কন্যা উত্তেজিত যৌনপ্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে। প্রিয়জনকে কবর দিতে গিয়াও যৌনপ্রণয়ের

---

*—'বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি', —গীতা।

†—'বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো য সদা মুক্ত এব সঃ।' —গীতা।

অসম্ভাব নাই। গীর্জ্জায় ধর্ম্মীয় ভাবাবেগের মুহূর্ত্তেই যৌন উত্তেজনা প্রবল হইয়াছে। ব্যাপারগুলি হয়ত সব সময় ঘটেনা কিন্তু এগুলি যৌন-বিকার নয়। তথাকথিত 'স্বাভাবিক' যৌনজীবনের প্রেমভালবাসার জীবনেই এই সম্ভাবনাগুলি সুপ্ত আছে। অপর দিকে যৌনকামের মধ্যে আত্মপীড়নের এমনকি আত্মনাশের বা হত্যাবৃত্তির যে মনোভাব লুক্কায়িত আছে তাহারও অনেক বাস্তব প্রামাণ্য ঘটনা Havelock Ellis লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা, বেশ্যালয়ে যাইয়া গলায় প্যাড্ লাগাইয়া ঝুলিবার ও শ্বাসরোধের অনুভূতির মধ্যে 'আনন্দ' লাভ; অথবা স্বামীর সহিত সঙ্গমের পর তরুণী স্ত্রীর পাশের ঘরে রক্ষিত পোষা মুরগী-শাবককে গলা টিপিয়া হত্যা করার পর চরম কাম-তৃপ্তি। প্রেমিকার প্রেমিকের হাতে বেত্রাহত হইবার ইচ্ছা এবং নির্য্যাতিত হইবার গোপন ইচ্ছা এলিস জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। এমনকি নারী-মনের গভীরে বলাৎকৃতা (raped) হইবার ইচ্ছা বিদ্যমান ইহাও বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, নারীদের মধ্যে আত্মমৈথুন পুরুষের অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও বেশী অথচ পুরুষের তুলনায় সে বিষয়ে অনুশোচনা নিতান্তই অল্প, এমনকি প্রবল আত্মমৈথুন নারীদের খুবই সপ্রতিভ করে, এইসব তথ্যও আজ উদ্ঘাটিত। বিবাহিতা নারীদের মধ্যে যৌনসঙ্গমে তৃপ্তিবোধের অভাব, অনেক ক্ষেত্রে আত্মমৈথুনে অধিকতর তৃপ্তি ও পুরুষ-সঙ্গের বিভীষিকা ইত্যাদি বহু মানসিক গোপন তথ্য আজ বিচার-বিবেচনার অধীনে আসিয়াছে। বহুক্ষেত্রেই আজ পুরুষের মধ্যে যৌন অনুপযুক্ততা

(inadequacy) বা অক্ষমতা (impotence) দেখা দিয়াছে অথচ তাহা আসলে দুর্ব্বলতা বা পুরুষত্বহীনতা নয় যুগের উত্তেজনাময় জীবনই এই স্নায়বিক বিকৃতির জন্য দায়ী। উদাহরণ স্বরূপ, এলিস দেখাইয়াছেন সবলদেহ খেলোয়াড় (sportsman)-দের ক্ষেত্রেও এই বিকৃতি সম্ভব। সমকামিতা (homo-sexuality) বিষয়েও যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে। *

আমরা এই বাস্তব তথ্যগুলির মধ্য দিয়া কোনও নিস্ফল নৈতিক হাহুতাশে প্রবৃত্ত হইতেছি না। এরূপ স্বভাববিরুদ্ধ গতি পূর্ব্বে কোনও না কোনও আকারে ছিল না তাহাও বলা যায় না। কিন্তু এই বাস্তব বৈজ্ঞানিকতার যুগে যৌনকামনার স্বরূপ ও বর্ত্তমানের বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিবার পক্ষে ইহারা অবশ্যই সহায়তা করিবে। এবং এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ইহার অসত্যের দিকটা বাস্তব-ভাবেই বুঝিতে হইবে এবং সত্যের দৃষ্টিতে বাস্তব সংযম-সাধনার কোনও অবকাশ আছে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে।

আসলে এই সমস্ত যৌনতত্ত্বের উদ্ঘাটন প্রকৃতির নিয়মেই এক মঙ্গল-পরিণামের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম্ম-ভাবুকতা ও নীতিবিলাসিতার স্রোতে মানুষ যখন চেতনায় ও সমাজে একটা গতানুগতিক ঠাট বজায় রাখিয়া বাস্তব জীবনে অসংযম ও যৌনভোগের কাছেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং তাহাকেই 'সুস্থ স্বাভাবিক' জীবন বলিয়া আত্মতৃপ্ত হইয়া আছে তখন এইরূপ এক নীতিবিপ্লব মানুষের আত্মসন্তুষ্টিকে রূঢ়ভাবে

*—উপরিলিখিত তথ্যগুলি 'যৌন-মনোদর্শন' হইতে সংগৃহীত।

আঘাত দিয়া সচেতন করিতেছে। ইহাতে যেমন আছে একদিকে নিম্নস্তরের আত্মস্বীকৃতির সত্য, অপর দিকে তেমনি আছে ভবিষ্যতের আত্মবিকাশের সম্ভাবনা।

কিন্তু এই উদ্‌ঘাটন-যজ্ঞের হোতাগণ যে দেবতাদের আবাহন করিতেছেন আমরা কি তাহাদের গ্রহণ করিতে প্রস্তুত? অথবা সেই দেবতারা কি অভীষ্ট পূরণ করিতে সক্ষম? এলিসের ন্যায় আধুনিক যৌনবিজ্ঞানীরাও এই সমস্ত 'বিকার'কে স্বাভাবিকতার কিছু ব্যাতিক্রম (deviation)-রূপেই দেখার পক্ষপাতী। অকারণ বিভীষিকার বদলে এই স্থির বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি কিছুটা সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যখনি দেখিতে পাওয়া যায় খঞ্জকে যষ্টি (crutch) দিয়া হাঁটাইবার মত নানা বাহ্যিক উপায় প্রয়োগ হইতেছে, জন্মগত খঞ্জতার ব্যাপক প্রসারের কোনও প্রতিবিধান নাই তখন চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

একথা অতি সুস্পষ্ট যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আজ অস্বাভাবিক কামজীবনকে স্বাভাবিকতার একটা ছাপ দিয়া নিত্য-ব্যবহার্য এবং প্রধান উপজীব্য বস্তুতে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এই অন্ধ উদ্দাম প্রচেষ্টা নিজের মধ্যেই নিজের ব্যর্থতার বীজ বহন করিতেছে। কারণ কামজীবনের স্বরূপের প্রতি তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নাই, আছে আবেগের কল্পনা। বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা কিছু বিচিত্র বটে।

কিন্তু যৌন-গবেষণাকারীগণ তাহা জানেন। তাই তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টা হইতেছে কামজীবনের অনিবার্য ব্যর্থতা

ও বিসদৃশতাকে নূতন উপায়ে কিছু সহনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তোলা। আধুনিক মানুষের যৌন-জীবনের নানা তীব্র সমস্যায় সহানুভূতিসম্পন্ন Havelock Ellis সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। Freud ও মানুষের স্বভাবের উন্নতি সাধনে নিজ অক্ষমতা অকপটভাবে স্বীকার করিয়া মানুষের মনের অস্বাভাবিক জটিলতাকে কিছু সরল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেকথা আমরা বলিয়াছি (পৃঃ ৫৪৯)। এলিস যৌন রোমান্সে অবিশ্বাসী হইলেও যৌন প্রেমে বিশ্বাসী। কিন্তু নরনারীর প্রেমের পথে তাহাদের স্বভাবগত বিরোধিতা (antagonism) এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বলিয়া তিনি মনে করেন। তাঁহারই ভাষায় বলা যায় নর ও নারী যৌনপ্রেমের মধ্যে পরস্পরকে গ্রাস করে (swallows)—পুরুষ প্রথমটা তাহার শক্তিশালী বাহুর বন্ধনে, নারী শেষ দিকে আরও সুনিশ্চিতরূপে তাহার গর্ভের মধ্যে। * এই স্বভাবগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে বহু বিবাহিত জীবনই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সুতরাং একমাত্র আশা-ভরসা কিছু 'art of love' বা প্রণয়ের কলা-কৌশল আয়ত্ত করা। কিন্তু তিনিই আবার অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন প্রণয়-রাগ (courtship) দিয়া স্বামীস্ত্রী যৌনসঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলেও অনেক স্ত্রী যৌনতৃপ্তি লাভ করে না, তাহারা বরং আত্মমৈথুনের মধ্যেই চরম যৌন-সংবেদন (orgasm) লাভ করে। † এযুগে প্রায় সকল পুরুষের মধ্যে ব্যাপক যৌন ঊনতা

---

*—'Some Difficulties of Marriage' দ্রষ্টব্য।

†—'The Supposed Frigidity Women' দ্রষ্টব্য।

(sexual inadequacy) এবং নারীদের মধ্যে যৌন অনিচ্ছা (frigidity) তৃপ্তিদায়ক যৌনমিলনের বিশেষ বাধা বলিয়া তিনি ইহার প্রতিকারে 'unconventional' বা অপ্রচলিত পন্থায় যৌনসঙ্গমেরও পক্ষপাতী। তাঁহার মতে '......it is much if they effect erotic satisfaction and conjugal harmony.'— যদি এইসব উপায়ে যৌনপ্রীতি তৃপ্ত হয় এবং দাম্পত্য সমন্বয় সাধিত হয় তবে তাহাও যথেষ্ট।' * ভাষা হইতেই বুঝা যাইবে এলিস এক চরম নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থায় একটা চলনসই প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এযুগের দাম্পত্য-জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ব্যভিচার বা তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি অনুরাগকে পরস্পর স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া পরস্পরের প্রতি প্রেমের অকপটতা (sincerity) দেখাইবারও তিনি সুপারিশ করিয়াছেন। † যৌনসঙ্গমকে এলিস সাধারণ ক্ষুধাতৃষ্ণার মত মাত্র একটা 'স্বাভাবিক' জৈবিক ক্রিয়া ভাবিতে প্রস্তুত নন, বরং ইহার মধ্যে একটা 'দৈবী' সৃজনী-শক্তির আভাস তিনি পাইয়াছেন। অথচ এই যৌন-সঙ্গমের মধ্যে যে 'কুৎসিত ভাব' অনিবার্যভাবে মিশ্রিত থাকে তাহাকে সরাইবার জন্য তিনি অন্যদের স্থূল মতকে কতকটা সমর্থন করিয়াছেন। তাহা এই যে মলমূত্রত্যাগের দ্বারগুলির সহিত যৌনকেন্দ্রের সান্নিধ্যের জন্যই এই কুৎসিৎ ভাব জাগে, সুতরাং মলমূত্রত্যাগকে কুৎসিত না ভাবিতে শিক্ষা দিতে হইবে। §

*—'Sex Education' দ্রষ্টব্য।

†—'The Future of Marriage' দ্রষ্টব্য।

§—'Eros in Contemporary Life' দ্রষ্টব্য।

বিবাহের গুরুত্ববোধ সত্ত্বেও তিনি স্বাধীন বিবাহবিচ্ছেদকে সমর্থন করিয়াছেন এবং এই স্বাধীনতার ফলে বিবাহবিচ্ছেদ কমিয়া যাইবে বলিয়া ভ্রান্ত আশা পোষণ করিয়াছেন। যৌন মিলনই জীবনের বা বিবাহিত জীবনেরও সব কিছু নয় এবং যৌন শক্তির যৌন প্রকাশ ছাড়াও মানুষ আরও নানা উচ্চতর ও মহত্তর ক্ষেত্রে তাহার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য প্রমাণিত করিতে পারে * এইজাতীয় ধারণা সত্ত্বেও তিনি এযুগের তরুণ-তরুণীর অসংযত ও অবাধ দৈহিক মিলন সমর্থন করিয়াছেন কারণ, অন্যান্য সুবিধার সহিত, ইহা বেশ্যাবৃত্তি ও যৌনব্যাধির সম্ভাবনা দূর করিবে। † এইরূপ আরও অনেক অসামঞ্জস্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, এবং এগুলি সবই ইহাই প্রমাণিত করে যে যৌন জীবনের একটা নৈরাশ্যময় পরিস্থিতিকে কিছুটা সহনীয় করিবার চেষ্টা হইতেছে মাত্র। এই পথে যে যৌন অসংযমের উৎকট যুগসমস্যার সুসমাধান হইবে না একথা একরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অতি আধুনিক যৌনগ্রন্থ-লেখকেরা আরও একটু বেপরোয়া হইয়াছেন এইমাত্র, যথা আধুনিক সমাজে নারীদের যৌনকামের খেয়াল মিটাইবার জন্য পুংবেশ্যার আবির্ভাব ঘটিয়াছে ইত্যাদি তথ্যের আলোচনা তাঁহারা করিয়াছেন। ‡ কিন্তু

---

*—'The Future of Marriage', 'Eros in Contemporary Life' এবং The Problem of Sexual Potency' দ্রষ্টব্য।

†—'Eros in Contemporary Life' দ্রষ্টব্য।

‡—An Encyclopaedia of Sexual Knowledge, Ed. Norman Haire, 'প্রবন্ধ' (অন্নদা শঙ্কর রায়), পৃ: ৬৭-৭০ দ্রষ্টব্য।

এখানেও একটা নৈরাশ্যময় পরিস্থিতিকে খেয়াল-খুশীমত সাজাইয়া গুছাইয়া খাড়া করা ছাড়া এগুলির মধ্যে সত্যকার পথের কোনও সন্ধানই নাই। আমরা আধুনিক নিম্নস্তরের যৌনগ্রন্থের কথা এখানে বাদই দিতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে, একটী প্রশ্ন জাগিতে পারে ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দিনেও ত যৌনবিলাসের নানা স্বীকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্যই। কামশাস্ত্র, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নৃত্যগীত, এমনকি ধর্ম্মসাধনা, সর্ব্বত্রই সেযুগের ভারত যৌন কামানুশীলনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি একথা সত্য যে এই ঋজু, বলিষ্ঠ কামজীবনের পাশাপাশি একটী বিরাট ও ব্যাপক স্রোত সমগ্র ভারতীয় সমাজ-জীবনের বক্ষে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে সত্যকার প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা ভারতীয় সমাজ-সাধনা। ব্রহ্মচর্য, সত্য, ত্যাগ ও বীরত্বই ছিল এই সমাজ-জীবনের মূল ও কাণ্ড যাহার উপর জাতীয় জীবনের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম, সাহিত্য-শিল্প-কলার শাখাপ্রশাখা ফলেফুলে বিস্তারিত হইয়াছিল। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি জীবনের সমস্ত বিষয়কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রকৃতির কোলে লইয়া খেলা করিত। মহাজীবনের লক্ষ্যপথে সেযুগের ঋজু, বলিষ্ঠ মানুষ যেমন মহাপ্রকৃতির নিয়মে প্রেম-প্রণয়কে গ্রহণ করিয়াছে তেমনি অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যানও করিয়াছে। মধ্যযুগীয় ঘৃণা-খুঁৎখুঁতেমি যেমন সেখানে নাই, এযুগের কুটিল ভাবাবর্ত্তও তেমনি সেখানে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কামসূত্র রচিত হইয়াছে বলিয়া

ভারত কামকেই প্রধান করিয়া তোলে নাই। চৌর্যসূত্র * রচিত হইয়াছে বলিয়া ভারত চৌর্যকে গৌরব দেয় নাই, পাপ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে ও প্রতিহত করিয়াছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য, যৌনবিজ্ঞান, যৌনমনস্তত্ত্ব ইত্যাদি হইতে যে চিত্র আমরা পাইলাম তাহা নৈরাশ্যের চিত্র এবং একটা অসহায় আপোষের চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই চরম অধোগতির মধ্যেও একটা ঊর্দ্ধগতির আকাঙ্খা আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সর্ব্বত্রই একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার তীব্র আগ্রহ। এই আশার অলোকেই আমরা পাশ্চাত্য গবেষণার অনেকগুলি বিষয়কে চোখের সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে চাহিতেছি।

এই পাশ্চত্য গবেষণার আলোচনা হইতে আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুকূলে একটী মূল ও সর্ব্বপ্রধান তথ্যকে পাইলাম। তাহা এই যে যৌন ভালবাসার গভীরে একটী হত্যাবৃত্তি বা মরণবৃত্তি নিবিড়ভাবে লুক্কায়িত আছে। ইহা অপরকে ও নিজেকে নাশ করার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই ভাবেই 'আনন্দ' পাইতে ও 'আনন্দ' দিতে চায়। আধুনিক যৌন মনস্তত্ত্ব sadism ও masochism বা ধর্ষকাম ও মর্ষকামের মধ্য দিয়া এই তত্ত্বেরই প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

---

*—'চৌর্যবিদ্যা'—যোগাচার্য-বিরচিত, Monier Williams-এর অভিধান দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যৌনকামের মধ্যে এই যে মরণবৃত্তি ইহা যোগদৃষ্টিতে আর এক দিক্ দিয়া দেখা যায়, তখন ইহা মূলতঃ কোনও ভীষণ, বিসদৃশ ব্যাপার নয়। ইহা মানুষের চেতনার গভীরে যে উর্দ্ধমুখী আত্মলয়ের মধ্য দিয়া পূর্ণতালাভের প্রচোদনা রহিয়াছে তাহারই নিম্নমুখী প্রতিরূপ। এই প্রতিক্রিয়ামূলক নিম্নের রূপকেই আমরা বলিয়াছি আত্মবিলয়ের বা আত্মধ্বংসের কামনা। একদিকে পরমশূন্যের পূর্ণতায় আত্মলয়, অপর দিকে চরম অভাবের ক্ষুদ্রতায় আত্মবিলয়, এই দুইটী কাঁটা একই সঙ্গে দুই বিভিন্ন দিকে ঘুরিতেছে। এই যৌগিক গুহ্য-রহস্যের বিষয়টী আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছু বিশদভাবেই আলোচনা করিয়াছি। * এই উল্টা পথে কামকে লইয়া চলিতে গেলে তাহার একমাত্র পরিণাম ছেলেখেলার মধ্য দিয়া একটা কদর্যতা, ভীষণতা ও ব্যর্থতার রাজ্যে প্রবেশ করা। ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে পার্থিব জীবনের সম্বন্ধে একটা ক্রোধ—ফল যাহার ক্ষমতাপ্রিয়তা. এবং একটা লোভ,—ফল যাহার বিত্তপ্রিয়তা, বা ধনের লালসা। এই দুইটীকে আমরা ঔপনিষদিক পরিভাষায় কিছু বিস্তৃতক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছি লোককাম (অর্থাৎ জনকাম) এবং ধনকাম। এই বিষয়গুলির আলোচনায় আমরা আর একবার পরে আসিতেছি। কিন্তু মধ্যযুগীয় ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-সাধনার জের টানিয়া আজ পর্যন্ত আমরা এই কাম-ক্রোধ-লোভতত্ত্বকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিদমনের দিক্ দিয়া দেখিয়া আসিতেছি, তাহাদের

---

*—'অমৃতের পথে', পৃ: ৪৪২-৫০ ; ৪৬২-৬৬ ; ৪৮৪-৮৮ দ্রষ্টব্য।

সমাজধর্ম্মগত ভূমিকার কথা ভাবি নাই, আর এই জন্যই ধর্ম্ম-সাধনা ব্যষ্টি তথা সমষ্টির জীবনে ব্যাপকভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই। ইহাই বর্ত্তমান ভারতীয় জাতীয় জীবনে ধর্ম্ম-সাধনার ব্যর্থতার সূত্র। অথচ এই সমাজ-সাধনায় মহামুক্তির ধর্ম্ম ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও সমৃদ্ধির যুগে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিরাজিত ছিল। ইহা যে শুধু আধুনিক 'সমাজসেবা' বা 'জনসেবা'র ধর্ম্ম নয় তাহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও গভীর, ইহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (পৃঃ ১১২, ৩০৯)। এই ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ও মানবিক সমাজসাধনার ধর্ম্ম, কোনও মতবাদাশ্রয়ী সমাজধর্ম নয় তাহারও আমরা পূর্ব্বে আভাস দিয়াছি। জাতীয় ও বিশ্বজনীন ব্রহ্মচর্য-সাধনার কথায় আসিতে হইবে বলিয়া এগুলিকে আমাদের ধারণার মধ্যে রাখা দরকার।

সে যাহা হউক, একটা শক্তিশালী যন্ত্রকে উল্টাইয়া চালাইতে গেলে যে বিপর্যয় ঘটে কামের সম্বন্ধে সভ্যতায় আজ সেই ভুলই হইতেছে। এবং যেহেতু যৌনকাম জীবনের কেন্দ্রবস্তু * সেই হেতু মানুষের সমগ্র জীবনই আজ পরিকল্পনার নামে উল্টাপথে পরিচালিত হইতেছে এবং মানবীয় সভ্যতায় এক পাশবিক বীভৎসতার আবির্ভাব ঘটিতেছে। ইহাও বুদ্ধিমান্ মানুষের কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্র ইহাকে বলিয়াছেন—তামসী বুদ্ধি, যাহা অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক বলিয়া

*—হ্যাভলক এলিস, 'Sex and marriage'-এর প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য।

মনে করে এবং সব কিছুকে বিপরীতভাবে দেখে। * যৌন রাজ্যেরই একটা সাধারণ উদাহরণ দিই। যৌনসঙ্গমের 'আনন্দ' যে একপ্রকার কুৎসিত (disgusting) অনুভূতির সহিতও অনিবার্য্যভাবে জড়িত আছে তাহা এযুগের মানুষ 'না-দেখি' করিতে চায় এবং যৌন-মিলনের মূলে যে 'পাপ' বোধ লুকাইয়া আছে তাহাকেও উড়াইয়া দিতে চায়। এজন্য যে নিম্নস্তরের কষ্টকল্পিত, স্থূল বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহার কথা আমরা হ্যাভলক এলিসের কথা-প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৬১৫)। এলিসও নিজে ঐ নিতান্ত বাহ্যিক যুক্তিকে বিশেষ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অথচ ইহার প্রকৃত যৌগিক-মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অতি সহজ ও অর্থপূর্ণ। পরমশূন্যমুখী মহাজীবনের 'রস' যাহাকে উপনিষদে একমাত্র 'আনন্দ' বলা হইয়াছে †, সেই নিবিড়-গভীর রসবোধ যখন চরম অভাবমুখী ক্ষুদ্রজীবনের সংঘাতে নিজেকে সহসা অবনমিত করে—সেই গভীর অসামঞ্জস্যের তীব্র আত্ম-অবমাননা বোধ হইতেই 'কুৎসিত' বোধের উৎপত্তি। তাহা ছাড়া মেরুদণ্ডে ঊর্দ্ধদিকের 'চক্র-পদ্ম' সূক্ষ্ম শুদ্ধশক্তির এবং অধোদিকের 'চক্র-পদ্ম' স্থূল অশুদ্ধশক্তির ক্রিয়াকেন্দ্র। প্রশ্ন উঠিতে পারে, অধিকাংশ মানুষইত বয়স হওয়ার সহিত এই বিসদৃশ যৌনকামের

---

*—"অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।

সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥" —গীতা, ১৮।৩২

†—তৈত্তিরীয়।

সীমানা পার হইয়া বয়স্ক (adult) জীবনের নানা 'স্বাভাবিক' কাজকর্ম্ম-স্নেহভালবাসা লইয়া জীবন কাটায় এবং ঐ ভাবে বিসদৃশ যৌনকামকে অনেকটা ভুলিয়া থাকে অথবা পাশ কাটাইয়া চলে। ইহাও ত একপ্রকার 'স্বাভাবিক', 'সংযত' জীবন! তবে সভ্যতায় এই বীভৎসতা আসে কোথা হইতে?

এইখানেই আমরা জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনা প্রবর্ত্তনের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু বয়স্ক-সমাজের এই আত্মতৃপ্ত বদ্ধমূল ধারণা কতদূর ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক তাহার প্রতি আমরা পূর্ব্বে বিশেষভাবে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়াছি।* আধুনিক ফ্রয়েডীয় ধারণাতেও জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে কতখানি কামজীবনের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য। সভ্য-সম্ভ্রান্ত-শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ নরনারী যাঁহারা আজ বিশ্বের সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-জীবনের ধারক-বাহক-পরিচালক তাঁহারাও নিজ নিজ হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন কামের বিসদৃশ ক্রিয়া তাঁহাদের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কিনা। উত্তর আসিবে, কাম ত আর সমূলে নষ্ট হইবার জিনিষ নয়, সুতরাং ওরূপ একটা 'স্বাভাবিক' জিনিষ খাওয়া-দাওয়ার মতই † থাকিয়া গেলে ও নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে দোষ কি? যৌনকাম কখনও একেবারে

---

*—"অমৃতের পথে", পৃ: ৪৫৭-৬২, ৬০৩-৪, ৬০৯-১২ দ্রষ্টব্য।

†—হ্যাভলক এলিস কিন্তু যৌনকামকে ঠিক্ খাওয়া-দাওয়ার সহিত এক পর্য্যায়ের বলিয়া মনে করেন না (Eros in Contemporary Life)।

চলিয়া যায় না একথা সত্য হইতে পারে, দেহাত্মবোধ বা দেহচেতনার অহঙ্কার থাকিতে অপ্রত্যাশিত যৌনকামের আক্রমণও আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা প্রাকৃতিক হইলেও মনুষ্যত্বের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক নয়, যে পর্যন্ত না ইহা এক মানবিক লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত হয়। ইহাই আমাদের পূর্ব্বকথিত অভাববোধের উত্তেজনা হইতে কামকে পরমশূন্যের সাম্যে উন্নীত করা। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সাধু-সন্তদেরও কামের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে প্রথম সাধনার জীবনে বিশেষ বিব্রত হইতে হয়। কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা ইহাকে প্রাকৃতিক মনে করিলেও কখনও স্বাভাবিক মনে করেন না এবং ঐ অপ্রত্যাশিত আক্রমণের প্রতিরোধে তীব্র কঠোরতার মধ্য দিয়া আত্মশাসন করেন। এই আত্মশাসনের মধ্য দিয়া আত্মমর্যাদাকে রক্ষা করার চেষ্টা সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমান তীব্র না হইতে পারে, কিন্তু একটা অস্বাভাবিক প্রবণতাকে আয়ত্তে না আনা পর্যন্ত মানুষের সত্যকার আত্মমর্যাদা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। ভিতরে এইরূপ আত্মমর্যাদাহীন হইলে বাহিরে বুদ্ধি-বিদ্যা-ধন-মান-উচ্চপদের আত্মমর্যাদার কোনও সত্য মূল্য থাকে না। এরূপ ব্যক্তির পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন ও জনসেবায় ত্যাগ ও কর্ম্মক্ষমতা ইত্যাদি স্বার্থান্ধ কামজীবনেরই অহঙ্কার-চরিতার্থতা মাত্র। * সেজন্য পৃথিবীব্যাপী এত পরিবার-সেবার দায়িত্ব ও জনসেবার

*—'অমৃতের পথে', পৃ: ১৪০-৪১ দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তব্য সত্ত্বেও ক্রূর স্বার্থপরতা ও দম্ভই আজ প্রচ্ছন্নভাবে সব কিছুকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এই সব প্রচেষ্টা নোঙর ফেলিয়া দাঁড়টানার মত। জলের উপর আলোড়ন যথেষ্ট কিন্তু জীবন-তরণীর অগ্রগতি নাই। বাস্তব কার্যক্ষেত্রে কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণই বাড়িতেছে কিনা তাহাও বলা যায় না। এইজাতীয় রাজসিক ও তামসিক অর্থাৎ আসুরিক স্বভাব কেমন করিয়া সমগ্র সমাজকে ভিতরে বিষাক্ত করিয়া রাখে তাহা গীতায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। * যৌনজীবনের গুপ্ত প্রভাব কেমন করিয়া সমগ্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুস্থ নাগরিকতাবোধকে খর্ব্ব করে তাহার জীবন্ত বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে M. Bureau-র গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি (পৃঃ ১৩০-৩২)। যৌনভারাক্রান্ত জীবনধারা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে কেমন করিয়া ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত করে তাহার আলোচনাও আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে করিয়াছি। পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবে আমেরিকান পারিবারিক জীবন কতখানি বিপন্ন হইয়াছে এবং নারীরাও তাহার ফলে কতখানি ব্যর্থ ও অসহায় বোধ করিতেছে তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় (পৃঃ ১৭৭)। সুতরাং কামজীবনের প্রভাবাধীনতা কোনও ক্রমেই স্বাভাবিক মানবতার জন্ম দিতে পারে না এবং গোড়ায় এরূপ অস্বাভাবিকতা থাকিলে আগায় স্বাভাবিকতার ফলও ফলিতে পারে না। সভ্যতার এরূপ বিষবৃক্ষে কোনও অমৃতফলের প্রত্যাশা করা সেজন্য দুরাশা মাত্র।

*—গীতা, ১৬।৮।

তবে কি আমরা সকল মানুষকে 'সাধু-সন্ত' বানাইবার অলীক কল্পনা করিতেছি? মোটেই তাহা নয়। জাতীয় ব্রহ্মচর্য 'সাধু-সন্ত' সৃষ্টির জন্য নয়, ইহা মানুষকে মানুষ হিসাবে একটা মুক্তিপথের সন্ধান দিবার জন্য এবং পরিবার-রাষ্ট্র-সমাজ-বিশ্বজীবন সব কিছুকে লইয়া – সব কিছুর মধ্য দিয়া—একটা মুক্ত জীবনের পথে অভিযান করিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। সেই অভিযানই মহামুক্তি, তাহার জন্য পৃথক্ ধ্যানাসনে সর্ব্বদা বসিয়াও থাকিতে হয় না। ইহাই এযুগের বাস্তব মুক্তি—বাস্তবজীবনের মুক্তি—কলকারখানা-রাজনীতি-বিজ্ঞান-যন্ত্রবিদ্যা এমনকি বাস্তব-জীবনে ব্যষ্টি ও সমষ্টির নানা অনিবার্য দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই ইহার অমৃতের অভিযান। ইহা নিতান্তই বাস্তব জীবনসত্যের সাধনা। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ আধ্যাত্মিক সাধননীতিরও এযুগে অভাব নাই। * স্বামী বিবেকানন্দের সময় হইতে বহু সন্ন্যাসী নানাভাবে ইহাকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমাদের প্রতিপাদ্য কাম-সংযম কোনও স্থূল দৈহিক সংযম মাত্র নয়, ইহা একটা 'attiude' বা বিশেষ মনোভাব। ইহা কামমুক্তি নয়, ইহা কামের প্রধান্যকে অস্বীকার। মানুষের আত্মসচেতন অহঙ্কার নিতান্ত অন্ধভাবে এই কামের প্রাধান্যকে জীবনে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। ইহা তাহার মনের গভীরে Adler-কথিত 'Inferiority Complex' বা আত্ম-মর্যাদাহীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং কামসংযমের

---

*—অনুযোজনা-পত্র (Appendix) দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত অর্থ মানুষের ভিতরের এই আত্মদৈন্যকে জয় করা। এই আত্মদৈন্যই আত্মসচেতনতা (self-consciousness) এবং ব্রহ্মচর্যসাধনা আসলে নিজের আত্মসচেতনতার শোধনের সাধনা। কৈশোর ও যৌবনেই এই সাধনার আরম্ভ এবিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ বয়ঃসন্ধি (puberty)-সময়েই মানুষের মধ্যে একটা আত্মমুক্তির অধ্যাত্মচেতনা ও আত্মদৈন্যের জৈবকাম চেতনা একসঙ্গে প্রকাশ পায়। ইহা আধুনিক সমাজ-মনস্তত্ত্বেরই একটী সিদ্ধান্ত। * সুতরাং এই স্তরে যৌনকামের সহিত একটা পরিষ্কার বোঝাপোড়া না হইলে—চিরজীবন তাহাকে ধামাচাপা দিয়া একটা গোঁজামিল অবস্থায় চলিতে হয় এবং সেই গোঁজামিল ভিত্তির উপর পরবর্ত্তীকালে আত্মসচেতন অহঙ্কার এক নকল জীবনের সহিত চমৎকার খাপ খাওয়াইয়া লইতে অভ্যস্ত হয়। মূলে সত্যজীবনের প্রতিষ্ঠা হারাইয়া ইহাকেই সে 'স্বাভাবিক' জীবন বলিয়া মনে করে। † জীবনের সবকিছু ঐহিক উন্নতি হইলেও সেখানে জীবনসত্যের বিকাশ ঘটেনা, মনুষ্যত্বের নানা অভিনয় করিলেও ভিতরে মানুষ অমানুষই থাকিয়া যায়। বার্ণার্ড শ' যে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলিয়াছেন 'চল্লিশ বৎসর পার হইলেই প্রত্যেকটী মানুষ একটী পাকা সয়তানে পরিণত হয়, ‡ একথার

*—'Encyclopaedia of Religion and Ethics', Vol 3, p: 464 দ্রষ্টব্য।

†—আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় সমগ্র জীবন এভাবে একটা 'rationalization' বা সত্যের ভান।

‡—'Everyman over forty is a scoundrel' (Revolutionist's Handbook, Man and Superman) দ্রষ্টব্য।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখানেই। যৌনকাম এবং তাহার সহিত ধনকাম ও প্রভুত্বকামকে জীবনের প্রথম হইতে মনের মধ্যে যদি মানুষ ধামাচাপা দিয়া রাখে তবে পরিণত বয়সে এক ক্রূর সয়তানীর সাপই সেখানে বাসা বাঁধিয়া বসে। যৌনকামের সহিত ধনকাম ও প্রভুত্বকামের সংযম যে জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনার একটী প্রধান অঙ্গ ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি (পৃঃ ৭১, ৮৫, ৮৬)। সেকথায় আমরা পরে আর একবার আসিতেছি। এই দৃষ্টিতে মানুষের পারিবারিক জীবনের 'স্নেহ-ভালবাসা', 'কর্ত্তব্যানুষ্ঠান' এবং সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের 'আদান-প্রদান', 'দায়িত্বপালন' ইত্যাদি সবেরই মূলে রহিয়াছে এক আত্ম-সচেতন মিথ্যা জীবনের আত্মাভিমান, ইহা বার বার আমাদের স্মরণীয়, কারণ যুগব্যাধি এইখানেই বাসা বাঁধিয়া আছে। ইহাই এযুগের সর্ব্বব্যাপী 'ডিপ্লোম্যাসি'। ইহা অবৈজ্ঞানিক। ইহাই আধুনিক গণ-জীবনের ব্যাপক উদ্‌ভ্রান্তি, কপটতা, ব্যর্থতা ও বীভৎসতার উৎস।

সুতরাং যুগ-সংযমের প্রাক্কালে আমাদের এই অবৈজ্ঞানিক আত্মসচেতনতা হইতে মুক্ত হইতেই হইবে। ইহা জীবনকে স্থূল ভাবে ব্যর্থ করে শুধু তাহা নয়, ইহা সার্থকতাকেও সূক্ষ্মভাবে বিষায়িত করে এবং তাহাই আরও মারাত্মক। এজন্য জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনায় স্থূল দৈহিক সংযমই একমাত্র বিষয় নয়, সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্বের শোধনই আসল বস্তু। ব্যাপক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিচার ও প্রচার ইহার প্রধান সহায়।

যুদ্ধ বন্ধ করা, দারিদ্র্য দূর করা, অশিক্ষা-অস্বাস্থ্যের প্রতিকার করা এগুলি প্রাথমিক অবশ্য প্রয়োজন হইলেও মনুষ্য-সমাজের একমাত্র গভীর প্রয়োজন নয়। গভীরের প্রয়োজন হইতেছে আত্মসচেতনতার শোধন এবং কামসম্মোহের সংযম। সমাজের ঊর্দ্ধস্তরে ইহা প্রসারিত হইলে যুদ্ধ-দারিদ্র্য-অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য ইত্যাদি সমস্যাও আরও সহজভাবে ও দ্রুত সত্যকার সমাধানের পথে অগ্রসর হইবে। এই শোধন ও সংযম যৌনকাম, ধনকাম ও লোককাম বা প্রভুত্বকামের সম্মোহ হইতে মুক্তি এবং যেহেতু যৌনকামই জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যা * সেহেতু যৌনকামের সম্মোহ মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া অন্য দুই কামের প্রতিকারও অসম্ভব। নচেৎ এযুগের গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বজীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি-সাম্যের আদর্শ ও প্রচেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র হইবে ও তাহাই হইতেছে।

কামসংযমের জন্য যে পরমশূন্যে আত্মলয়ের কথা আমরা বলিয়াছি তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যা বর্ত্তমান গ্রন্থে সম্ভব নয়। † তবুও তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে দিয়াছি। এই পরমশূন্যবাদ যে কোনও শূন্যচিন্তা, শূন্যকল্পনা বা মৃত্যুভাবনা নয় তাহাও আমরা বলিয়াছি। সংক্ষেপে বলা যায় এই পরমশূন্যেই সবকিছু বিধৃত। এই শূন্যই পূর্ণ ‡, উপনিষদের মতে এই শূন্যতার

---

*—Havelock Ellis, General Preface—'Sex and Marriage.'

†—গ্রন্থকারের 'মহাসত্য-দর্শন' গ্রন্থে আলোচ্য।

‡—'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই'—রবীন্দ্রনাথ।

'রস'ই এই বিশ্ব। তাহাই আনন্দের ও সত্যের প্রাণবস্তু। *
এই শূন্য এবং পূর্ণের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে শূন্যবাদী 'যোগ-বাশিষ্ঠ'-মহাগ্রন্থে। তাই সেখানে পূর্ণের মহিমাগান করিয়া বলা হইয়াছে—'পূর্ণে পূর্ণং প্রসরতি'—পূর্ণের মধ্যে পূর্ণের খেলাই এই বিশ্বজীবন। ইহা বেদের 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে'—এখানে পূর্ণ, সেখানে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের অভিব্যক্তি—এই মন্ত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বেদের মধ্যে সৃষ্টির আদিতে আত্মপ্রকাশের এষণারূপী কামের কথা রহিয়াছে বলিয়া অনেকে তাহা কামবিলাসিতার একটা কৈফিয়ৎ রূপে ব্যবহার করিতে চান। † কিন্তু বেদের মূলে যে মহাশূন্যের—পরমশূন্যের পরমগম্ভীর দার্শনিক দৃষ্টি এবং বিশ্বসৃজনে আদি পুরুষের আত্মবলিদানের যে রূপক দৃষ্টি ‡ তাহা নিশ্চয় কামের ঊর্দ্ধে এই পরমশূন্যে আত্মলয়ের বা আত্মত্যাগের 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টি খুলিয়া দিতে পারে। ভারতের বাহিরেও এই রহস্য-দৃষ্টির অভাব নাই। জালালুদ্দিন রুমীর মত সাধকের কবিতাতেও এই পরমশূন্যের পরমসত্য আভাসিত হইয়াছে। § বৌদ্ধ মহাযান-শূন্যবাদ সুপরিচিত। খ্রীষ্টীয় গুহ্যসাধক (mystic) Eckhart ও Ruysbroeck-এর মতেও

*—তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, কঠ উপনিষদ্ দ্রষ্টব্য।

†—অন্নদাশঙ্কর রায়, 'প্রবন্ধ' পৃ: ৩০৬।

‡—'নাসদীয় সূক্ত', ঋগ্ বেদ, 'পুরুষ সূক্ত', ঋগ্ বেদ।

§—The Principal Upanishads, Radhakrishnan, p: 57 দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টীয় ত্রিতত্ত্বের পিছনে একটী ঈশ্বরতত্ত্বের অতল গহ্বর (an Abyss of Godhead) রহিয়াছে। * বিখ্যাত আইরিশ কবি W. B. Yeats যিনি যৌনকামকে অতীন্দ্রিয় কামেরই জাগতিক প্রতিরূপ বলিয়া ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিক জগৎ ছিল এক পরমশূন্যে প্রতিষ্ঠিত। † Dionysius, the Areopagite-এর 'Divine Darkness' বা 'ঐশ্বরিক অন্ধকার' পরমশূন্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সুফীরাও 'আল হক্' বা এক পরম সত্যের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। Aldous Huxley, 'The Perennial Philosophy' বা শাশ্বত দর্শনের দৃষ্টিতে এক Divine Ground বা দিব্যভূমির কথাও বলিয়াছেন। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে সর্ব্বশূন্যতার এক পরমপূর্ণ মহাসত্যেই ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পুরুষ, দেবতা সব কিছু বিরাজমান। এই সাধারণ মহাভিত্তিতেই জাতীয় ব্রহ্মচর্যের শক্তিসাধনা ও শান্তিসাধনা। এই সর্ব্বশূন্যতা কোনও ধারণা বা কল্পনা নয়, ইহা বাস্তবজীবনে সব কিছু আসক্তির মোহকে ত্যাগ করিয়া পরমসত্যের শক্তি ও শান্তিতে উদ্ভাসিত হওয়ার সাধনা।

পরমশূন্যের অভিমুখী জীবনই চরম অভাববোধের স্তরে এক প্রতিক্রিয়া-রূপে দেখা দেয় এবং তাহাই কাম! তাহাই

---

*—'Bhagavad-Gita'—Introduction by Aldous Huxley (N A. L.), p: 14 দ্রষ্টব্য।

†—'W. B. Yeats' by A. G. Stock, p: 218 দ্রষ্টব্য।

নূতন যুগের সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে বিভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ একটা সুস্পষ্ট আত্মবিশ্বাস ও স্থির আত্মমর্যাদার ভাব লইয়া অগ্রসর হইতে পারিবে।

অথচ এই সাধনা নূতন কিছু নয়। ইহা সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসাধনার সার বস্তু, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মীয় সংস্কারের ও আচার-অনুষ্ঠানের জটিলতা-বর্জ্জিত।

এই যুগ-সাধনায় মানুষকে আত্মসচেতনতা বর্জ্জন করিয়া বিশ্বসচেতনতায় সংযুক্ত হইতে হইবে। ইহা নিজের 'আমি'কে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু বিশ্বের 'আমি'কে তাহার সহিত যোগ করা। ইহাও কোনও ধ্যানে-জ্ঞানে-তত্ত্বালোচনায় মাত্র নয়, অথবা মধ্যযুগীয় 'মানুষকে ভালবাসা'-তেও নয়, তাহার জন্য জীবনের মূলে স্থাপন করা প্রয়োজন বাস্তব শূন্যবাদকে ও নিজেকে শূন্য করার সাধনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যকে। বৈদিক-ঔপনিষদিক শূন্যতত্ত্বের পরমপূর্ণতার কথা বাদ দিয়াও বলা যায় বৌদ্ধ-মাধ্যমিক শূন্যতাও এই সমগ্র বিশ্ব। সুতরাং কোনও দিক দিয়াই বিশ্বকে পরিত্যাগের কোনও প্রশ্নই নাই। বিশ্বজীবনের আন্দোলিত মহাসমুদ্রের তলদেশ হইতে বিশ্বমানবের জন্য আনন্দ, শক্তি ও সাম্যের অমৃত আহরণ করাই এই সাধনার উদ্দেশ্য। ইহাকেই প্রাচীন ভারতীয় পরিভাষায় বলা হইত 'যজ্ঞ' এবং এই 'যজ্ঞ'কেই বলা হইত ঈশ্বর। * পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্মই যে ঈশ্বরে সর্ব্বসমর্পণের

*—'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'। শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা, স: শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, পৃ: ১০০, ১৭৩ যজ্ঞতত্ত্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহাও এই 'যজ্ঞ'। অথচ প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা ইহাতে ঈশ্বর বা দেবতার ধারণাকেই প্রধান করিয়া তুলে নাই। মানুষের সংকল্প এবং সংকল্পাত্মক মন্ত্রই ছিল যজ্ঞের প্রাণ। পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্র ইহার প্রমাণ। আর ঐ যজ্ঞ ছিল ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত। * সর্ব্ববিধ পূর্ণতালাভের জন্যই ছিল এই কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্ম কামনাযুক্ত হইলেও তৃষ্ণা, অভাববোধ বা লালসার অস্থিরতা ইহার মধ্যে ছিল না। আজ আমরা আনন্দলাভের জন্য নানাবিধ কর্ম্ম করি কিন্তু এই স্বভাবপূর্ত্তির যজ্ঞকর্ম্ম করি না। এইখানেই বিশ্ব-জীবনের মূলসূত্র হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন। এই জন্যই শত কর্ম্মফললাভের মধ্যেও আমরা বঞ্চিত, জীবনব্যর্থতাই এযুগের স্বীকৃত নিয়তি।

এই সর্ব্ববিধ পূর্ণতালাভের সাধনায় আত্মাহুতিকেই ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হইয়াছে ব্রহ্মচর্য। নিজেকে শূন্য করিয়া সত্য-কর্ম্ম করাই এই আত্মাহুতি। ইহারই দ্বারা সর্ব্ববিধ ভোগকর্ম্মও সার্থকতায় সুন্দর হইয়া উঠে একথা আমরা পূর্ব্বে মহাভারত হইতেও প্রতিপন্ন করিয়াছি (পৃঃ ২৭১-৭২)। কিন্তু এই আত্মত্যাগ কোনও সাধারণ কর্ম্মীর প্রাণ ঢালিয়া কর্ম্ম করা মাত্র নয়, ইহা জীবনের অন্তরালে যে পরমপূর্ণতা পরমশূন্যতায় বিরাজ করিতেছেন তাহারই সহিত নিজেকে যুক্ত করা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই যোগসূত্র স্থাপনই ব্রহ্মচর্য। এজন্য ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হইয়াছে

*—'যজ্ঞ: কর্ম্মসমুদ্ভব:', গীতা, ৩।১৪।

আত্মাভিমান। তাহাই আত্মসচেতনতা। আবার তাহাই 'মায়া' যাহা অস্তিত্ব না থাকিলেও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং 'মায়া' প্রকৃতপক্ষে কোনও 'দার্শনিক' তত্ত্বচিন্তার বিষয় নয়, ইহা বাস্তব জীবনসত্যের সহিত সংলগ্ন ভুল। এই ভুলই 'পাপ'। ইহারই জন্য যাবতীয় কাম-কামনার, বিশেষে যৌনকামের পিছনে 'পাপ'বোধ লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য। এই কামই সেজন্য যাবতীয় স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতা, সংকীর্ণতা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা ও কপটতার মূল উৎস। এই উৎসের শোধন না হইলে সভ্যতাকে এই চরম গ্লানির হাত হইতে মুক্ত করা সম্ভব নয়, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু ইহা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব নয়। মধ্যযুগীয় ধর্ম্মসাধনার জের টানিয়া ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা বা কাম-কামনা বর্জ্জন করিতে বলিলে এযুগে বিশেষ ফল হইবে না। এযুগ ব্যাপক সমাজসাধনার যুগ বহুর মধ্যে সাধনার সিদ্ধিই এযুগের অভিপ্রেত, ইহাকেই মহাসিদ্ধসাধক বলিয়াছেন 'মহাজাগরণ, মহাসমন্বয়, মহামুক্তি।' এজন্য ভাবপ্রবণ পাপতত্ত্বের পরিবর্ত্তে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পাপের স্বরূপজ্ঞানই এযুগে অধিক প্রয়োজনীয়। মাত্র তন্ত্রমন্ত্র-জ্ঞানভক্তি-যোগমার্গ-পূজানুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়াই এযুগের আকাঙ্খিত সাধনা আসিবে না। মনোগত (subjective) সাধনার সহিত বস্তুগত (objective) সাধনার, ব্যক্তিগত সাধনার সহিত সমাজগত সাধনার সমন্বয়ই ইহার বৈশিষ্ট্য। এজন্য একদিকে যেমন চাই কামতত্ত্বের স্বরূপ-

জ্ঞান, অপর দিকে চাই কামের সুনিয়ন্ত্রণে যুগপৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টির ব্যাপক সংযুক্ত সাধনা। এযুগে এরূপ এক নূতন সাধনার চাহিদা মহাপ্রকৃতির নিয়মে মানুষের মনে দেখা দিয়াছে।

ব্যষ্টি-সমষ্টি জীবনে এই সাধনার পথ মোটামুটী আমরা আলোচনা করিতেছি। সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য একমাত্র নির্দ্দিষ্ট পন্থা এক্ষেত্রে নাই এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ প্রতিযোজনের অবকাশ ও স্বাধীনতা এই সাধনার মধ্যে অবশ্যই আছে। প্রচলিত মধ্যযুগীয় দুঃখ-পাপ-বন্ধনবাদ এই সাধনার পরিধিভুক্ত নয়, সেজন্য নির্ভীক ব্যক্তিস্বাধীনতা ইহার প্রাণবস্তু। দুঃখ পাপ ও বন্ধনের ইহা কারণ নির্ণয় করে ও বাস্তব বৈজ্ঞানিক প্রতিকার করে কিন্তু রহস্যবাদী (mystic) ভাবসাধনা ও আচার-অনুষ্ঠানকে ইহা ব্যক্তিগতই মনে করে। ইহা humanistic বা মানবিক এবং realistic বা বাস্তবিক। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়-গুরু-মহাপুরুষ-সাধু-সন্তের প্রদর্শিত বিভিন্ন বিভিন্ন পথে—যথা জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, প্রেমযোগ, রাজযোগ, ধ্যানযোগ, সমর্পণযোগ, কর্ম্মযোগ, তন্ত্রযোগ মন্ত্রযোগ ইত্যাদির আশ্রয়ে—এই সাধনা হইলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার অনুকূল হইলে তাহাতে বিশেষ শক্তির সাহায্য পাওয়া যাইলেও এই বাস্তব সমাজসাধনার যুগে যে 'মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্বয় ও মহামুক্তি' আজ বিশ্বমানবের একান্ত আকাঙ্খিত বস্তু, তাহার সাধনা একান্তই বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হওয়া প্রয়োজন। তবেই দেশে ও বিশ্বে

ব্রহ্মচারী অমর নিত্যজীবনে নিত্যস্বাধীন, 'স্বরাট্'.তিনি যাহা-যাহা চান সমস্তই সংকল্পশক্তির প্রভাবে লাভ করেন, তাঁহার চাওয়াও সত্য, পাওয়াও অব্যর্থ, তিনি সর্ব্বলোকে স্বাধীন, 'কামচার'। * পরমসত্যে তিনি 'সত্যসংকল্প, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম' ‡ জীবনব্যর্থতা সেযুগে অজ্ঞাত। অবশ্য প্রাচীনকালে বৈদিক মন্ত্র-ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত এই ব্রহ্মচর্য-প্রতিষ্ঠ যজ্ঞকর্ম্ম সাধিত হইত, এযুগে তাহা অসম্ভব। সুতরাং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যাহা প্রাণবস্তু সেই ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠ সংকল্প-শক্তিকেই এযুগের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহাই হইবে এযুগের সার্থক যজ্ঞ। তখন এই বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতির যুগের যাবতীয় বাস্তব কর্ম্মেও উর্দ্ধের দিব্যশক্তিকেই আমরা অনুভব করিব ও তাহার মধ্যে জীবনের যাবতীয় আনন্দভোগের মধ্যে সার্থকতা লাভ করিব।

এই ব্রহ্মচর্যসাধনার জন্য যাহা মূলতঃ প্রয়োজন তাহা আসক্তিবর্জ্জিত আনন্দময় কর্ম্ম। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ব্রহ্মচর্যকে নির্গুণসাধনাই বলা হইয়াছে। † এই নির্গুণসাধনা ও পরমশূন্যে আত্মত্যাগের সাধনা একই বস্তু। ইহাই পরম-পূর্ণতার তত্ত্ব। ইহাই পরবর্ত্তীকালের ও মধ্যযুগের জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-সেবা-আত্মসমর্পণের ভাবসাধনা। গীতায় এই ভাবসাধনাকে ঐ বৈদিক কর্ম্মসাধনার সহিত সমন্বিত করা হইয়াছে।

---

*—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৮।৪।

†—শান্তিপর্ব্ব (মহাভারত), ২১৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ‡—শাণ্ডিল্যবিদ্যা।

আমাদের পূর্ব্বকথিত যজ্ঞতত্ত্বকে আমরা একটী বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিবার ও গ্রহণ করিবার এখন প্রস্তাব করিতেছি। যজ্ঞের প্রাণবস্তু শুধু অগ্নিতে মন্ত্র-সহযোগে ঘৃত-ঢালা নয় সে কথার আভাস আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এক মহাজীবনের সহিত সংযোগের সংকল্পই ইহার প্রাণবস্তু। গৃহস্থের নিত্য করণীয় হোম-যজ্ঞ এযুগে আর সম্ভব নয়, এবং জনসাধারণের (public) জীবনে অশ্বমেধ, রাজসূয় বাজপেয় ইত্যাদি বিরাট যজ্ঞও আজ অচল। কিন্তু মানবিক সংকল্পশক্তির প্রকাশ যদি যজ্ঞের প্রধান কথা হয় তবে যজ্ঞকে একটী উর্দ্ধমুখী জীবনবাদ বা মহাজীবনবাদও বলা চলে। এজন্য প্রাচীন শাস্ত্রে দেশ-জাতি-সমাজ-রাষ্ট্রের জীবনে অভ্যুদয়ের লক্ষ্য লইয়া রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় ইত্যাদি বিরাট্ যজ্ঞের ব্যবস্থা হইত। কিন্তু জাতীয় জীবনে মহাজীবন-প্রকাশক এই যজ্ঞগুলির মধ্যেই পরবর্ত্তীকালে বিরাট্ আধ্যাত্মিক শক্তিরও সম্ভাবনা স্বীকৃত হইয়াছে। এজন্যই ব্যক্তিগত জীবনের আধ্যাত্মিক সাধনা 'বাজপেয়'-যজ্ঞের মহান্ ফল দিতে পারে এরূপ ইঙ্গিতও সম্ভব হইয়াছে।* সুতরাং জাতীয় জীবনে উর্দ্ধমুখী প্রাণশক্তির স্ফুরণের সহিত ব্যক্তি-জীবনের আধ্যাত্মিক বিকাশের সম্পর্ক ইহার মধ্যে স্বীকৃত। বাল্মীকি-রামায়ণেও † আমরা পাই মহারাজ দশরথ নিজ পাপনাশের জন্যও অশ্বমেধ-যজ্ঞের বপা-ধূপ আঘ্রাণ করিতেছেন। †

---

*—বৃহদারণ্যক, ৬।৪।৩।

†—আদিকাণ্ড, চতুর্দ্দশ সর্গ।

উপনিষদাদি শাস্ত্রেও এই সব মহাযজ্ঞের মহামূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। কালক্রমে যজ্ঞের এই বিরাট ও বাস্তব জাতীয় তাৎপর্য মধ্যযুগের পতনের দিনে হারাইয়া যায় এবং যজ্ঞকে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনায় ব্যাখ্যা করা হয়। কালক্রমে তাহাও ম্লান হইয়া কতকগুলি গতানুগতিক 'মাঙ্গলিক' অনুষ্ঠানের সহিতই 'যজ্ঞ' জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। যজ্ঞের বিরাট্ উদ্দেশ্য যে জাতীয় জীবনে ঊর্দ্ধমুখী শক্তির সাধনা ও সিদ্ধি তাহা আজ বিস্মৃতির গর্ভে লীন। কিন্তু জাতীয় জীবনযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক অংশকে বাদ দিয়া আজ বাস্তব জীবনগঠনে তাহাকে রূপ দিতে পারা সম্ভব ও অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়াছে। গীতার মধ্যেও দেশ-জাতি-সমাজ-রাষ্ট্র ও বিশ্বের কল্যাণে যাবতীয় ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের প্রচেষ্টাকে যজ্ঞদৃষ্টিতে মহিমান্বিত করা হইয়াছে এবং লোকসংগ্রহের নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞের এই মূল জনজীবনকল্যাণের সাধনা আজ জাতীয় ও বিশ্বজীবনে গৃহীত হইবার সময় আসিয়াছে। এই মহাজীবনের সাধনাই আজ শ্রেষ্ঠ 'যজ্ঞ' এবং এই 'যজ্ঞই' আজ ব্যক্তিগত জীবনেও ব্যাপক পাপমুক্তি, অজ্ঞানমুক্তি ও আধ্যাত্মিক মহামুক্তির পথ সুগম করিতে পারে। কিন্তু দেশ-জাতি-রাষ্ট্র-বিশ্বের এই মহাযজ্ঞ' একমাত্র জাতীয় ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতেই সম্ভব হইবে। যাবতীয় যজ্ঞকর্ম্ম—অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখী মানবীয় শক্তির প্রকাশ—যে আসলে ব্রহ্মচর্যই একথা আমরা পূর্ব্বেই ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ হইতে প্রমাণিত করিয়াছি (পৃঃ ২৪৬)। সুতরাং জাতীয় ব্রহ্মচর্যের নীতি গৃহীত হইলেই আজিকার বিজ্ঞান-অর্থনীতি-রাজনীতির

যাবতীয় প্রচেষ্টাও প্রাচীন মহাযজ্ঞের রূপ গ্রহণ করিতে পারে। * এই ব্রহ্মচর্য-সাধনায় জ্ঞানের কার্যকারিতা, ফলাসক্তি-বর্জ্জিত কর্ম্মের উপযোগিতা ও যাবতীয় চারিত্রিক উৎকর্ষের আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার কথাও আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ২৭০—৭৭)। এই মহাজীবন সাধনায় ফলকামনার কোনও স্থান থাকিবে না ইহা একান্ত ভ্রান্ত কথা। ইহা মধ্যযুগীয় ব্যক্তি-ধর্ম্মসাধনার অপপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। মধ্যযুগীয় 'ধর্ম্ম' বর্ত্তমানের মানুষকে অতিমাত্রায় 'নিষ্কাম'-ভাবুকতায় অভ্যস্ত করিয়াছে। কামনা ছাড়া কোনও কর্ম্ম—এমনকি মহৎ বা শুভ কর্ম্মও হইতে পারে না ইহাই মনুসংহিতার মত। † তবে একথাও বলা হইয়াছে যে কামনাপরায়ণতা অথবা কর্ম্মফলে 'আসক্তি' বর্জ্জনীয়, কারণ ইহাতেও আধ্যাত্মিক লাভ হয় না। গীতা যে আরও এক দুঃসাহসী কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ কামনাপরায়ণতা এবং আসক্তি বর্জ্জিত হইলে যৌনকামের মধ্যেও ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত হইতে পারে তাহার আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৪৮৯)।

সুতরাং এপর্যন্ত আমরা পাইলাম মানুষের জাগতিক জীবনের ঋদ্ধি-সিদ্ধিকে লইয়াই ভারতীয় জাতীয় ব্রহ্মচর্যের জীবন-সাধনা। ইহা সত্যকার ভোগ ও ত্যাগের সাধনা যাহার

---

*—এবিষয়ে পূর্ববর্তী দ্বিতীয় অধ্যায় (সমাজ ও সংস্কৃতি) এবং অন্যান্য অধ্যায়ের আলোচনাও দ্রষ্টব্য।

†—মনুসংহিতা, ২।৩ দ্রষ্টব্য।

চরম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ—ভোগে ত্যাগ, ত্যাগে ভোগ। ইহাই 'শ্রেয়ঃ' বা 'নিঃশ্রেয়স' লাভের পথ। ইহা লাভের জন্য মানুষের কৃত্রিম আত্মসচেতনতা হইতে মুক্তি অবশ্যই প্রয়োজন এবং এজন্য দুই দিক্ হইতে আক্রমণই বিশেষ কার্যকরী পথ। একদিকে 'ফলাসক্তি'-বর্জ্জনের অভ্যাস-দ্বারা আত্মসচেতনতার প্রভাবকে ক্ষীণ করা, অপর দিকে ত্রিবিধ কামের আধিপত্যকে জয় করিয়া সত্যকার আনন্দ-কর্ম্মের বিস্তার সাধন করা। মূলে ইন্দ্রিয়ের আধিপত্যকে লইয়া চলিলে ফলাসক্তি-বর্জ্জনও সম্ভব হইবে না। আমরা ইন্দ্রিয়বশ্যতার সংযমের কথাই বলিতেছি, আজিকার ভীতিজনক ইন্দ্রিয়সংযমের কথা বলিতেছি না। ভারতীয় শাস্ত্রেও ইন্দ্রিয়সংযম বলিতে ইন্দ্রিয়ভোগ-সর্বস্বতা এবং ইন্দ্রিয়-মদান্ধতাকে সংযত করার কথাই বুঝান হইয়াছে। * ইহাই সত্যকার ভোগ ও সত্যকার ত্যাগকে সম্ভব করিয়া তোলে। প্রাচীন ভারতের ভোগ ও ত্যাগ ছিল এজন্য একই সত্যজীবনের এপিট-ওপিট। ইহারই ভিত্তিতে ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ বা চারিটি জীবনসার্থকতা ('পুরুষার্থ') লাভ করাই ছিল প্রাচীন ভারতের জীবন-নীতি, একথা আমরা বহুস্থানে শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি। কিন্তু এই শাশ্বত জীবনবাদকে নূতনভাবে ভারতে ও বিশ্বসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে একটা জীবন-দর্শন ও জীবন-বিজ্ঞান তথা জাতীয় ঐতিহ্যজ্ঞানও প্রয়োজন। নচেৎ

*—'ইন্দ্রিয়ের দ্বার, রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার॥'—এই প্রশ্নই সেজন্য সেখানে আসে না।

এই বুদ্ধিবিভ্রমের যুগে কিছু না জানিয়া-বুঝিয়া কৃত্রিম কঠোরতায় ইন্দ্রিয়সংযম বা ব্রহ্মচর্য হয় না অথবা তাহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। শাস্ত্রও সেই কথাই বলিয়াছেন। * এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক-মানসিক প্রবৃত্তির অন্ধ আক্রমণকে অবশ্যই নিরস্ত করিতে হয়, এবং সেজন্য আত্মশাসনের কঠোরতাও অবশ্য প্রয়োজন। অন্ধ আবেগকে তীব্র বিরুদ্ধ অভ্যাসের দ্বারা সংযত ও নিরস্ত করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় স্নায়ুযন্ত্র যে জন্মগত অধোমুখী জীবন-পরিবেশে 'conditioned' বা ভাবিত হইয়া আছে তাহাকে 'যান্ত্রিক'ভাবেই 'uncondition' বা ভাবান্তরিত করিতে পারা যায়। অসংযমের বিরোধী পুনঃ পুনঃ 'যান্ত্রিক' অভ্যাসেই ইহা সম্ভব। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ইহাকেই বলা হয় 'তপস্যা'। ইহা 'রহস্যময় ধর্ম্মীয়' ব্যাপার নয়। ইহা পরমশূন্যের মহাযন্ত্র হইতে এই জীবনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ। আমরা পূর্ব্বেই এই পরমশূন্য-তত্ত্বের কিছু বিশদ আলোচনা করিয়াছি এবং সেই স্তরের পরম-জীবনে যে এক নিশ্চেতন মহাযন্ত্রই নিত্যক্রিয়াশীল তাহার আভাসও দিয়াছি (পৃঃ ৫২৬, ৫৪১)। মহাসত্যের তমোময় (সত্ত্বাতীত) † ভাবই নিম্নের স্থূল সাধারণ জড়ভাবে রূপান্তরিত। ইহারই গর্ভে উর্দ্ধের পরমশূন্যের ভাব নিম্নের চরম-অভাববোধে পরিণত। এই জন্যই যান্ত্রিক জড়বিজ্ঞানের সব কিছুকেই 'বিচারে'

---

*—মনুসংহিতা, ২।৯৬, ১০০

†—বেদ-উপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। ঋগ বেদ, ১০।১২৯; মনুসংহিতা, ১।৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

ও 'অভ্যাসে' মহাযান্ত্রিক পরম-বিজ্ঞানের মহাজগতে যুক্ত করা যায়। ইহাই সংযমসাধনার ক্ষেত্রে এযুগের সমাধান ও সমন্বয়ের পথ। ইহাই জাতীয় ও বিশ্বজনীন ব্রহ্মচর্যের পথ।

কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য শুধু যৌনকামসংযমের ব্যাপার নয়। ইহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে ধনকাম-সংযম ও লোককাম-সংযমের প্রশ্ন।* এগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহাই ব্রহ্মচর্য-সাধনার (মধ্যযুগীয় নয়) সামাজিক, জাতীয় ও বিশ্বজনীন তাৎপর্য। এগুলির গুরুত্ব আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আর একবার লক্ষ্য করিব।

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখিতে হইবে এযুগের বিশ্বব্যাপী যৌনকাম, ধনকাম ও জনকামের বিকার ও বিশৃঙ্খলা নূতন যুগ-সংযমের পথে মহাজীবনের অভিযানকেই ত্বরান্বিত করিয়া তুলিতেছে। ইহাতে হতাশার কোনও কারণ নাই। নানা বাধা-বিকারের মধ্য দিয়াই এই সত্যজীবনের সাধনাকে যতটা সম্ভব অগ্রসর করিতে হয় এবং তাহাও শ্রেয়োলাভের অনুকূল ইহা মহাভারতের কথা (পৃঃ ২৭০-৭১)। আজকাল 'asceticism' বা 'শুষ্ক কঠোরতা' বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও ভারতীয় শাস্ত্রে সমর্থিত নয় তাহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং জাতীয় জীবন-যজ্ঞে ও বিশ্বজীবন-মহাযজ্ঞে আত্মাহুতির মধ্য দিয়া জীবনের পরমসার্থকতা ও অমৃতত্বের পরমসুখ লাভ করিবার জন্যই যুগ-সংযমের সাধনা একান্ত প্রয়োজন এবং তাহা সম্ভব।

---

*—প্রথম অধ্যায়, পৃ: ২০-২১, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ৮৫-৮৬, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ: ২৫১ দ্রষ্টব্য।

সভ্যতার ভবিষ্যৎ :—

ব্রহ্মচর্য-সাধনার জাতীয় ও বিশ্বজনীন রূপের আলোচনা-সূত্রে আমরা ধনকাম ও লোককাম বা প্রভুত্বকামের সংযমের প্রশ্নে আসিয়া পড়িয়াছি। আধুনিক যুগের সভ্যতায় যে দুইটী শক্তি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা অর্থনীতি ও রাজনীতি। সাধারণভাবে এই দুইটী বিষয়ের আলোচনাও আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। * এখন আমরা ঐ দুইটী শক্তির যে বিশিষ্ট রূপ বিশ্বসমাজে ক্রিয়া করিতেছে তাহাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'কমিউনিজ্‌ম' বা ধনসাম্যবাদ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে 'ডেমোক্র্যাসি' বা গণতন্ত্রবাদ সেই দুইটী শক্তি। ইহারাই যে প্রধানতঃ মানুষের সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত করিবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রেরও পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। সেই বাহ্যিক (formal) সমন্বয়ও কতটা কার্যকরী হইতে পারে তাহাও আমরা দেখিব। বলা বাহুল্য, আমাদের বিচার বা আলোচনা শুধুমাত্র আধুনিক ধনবিজ্ঞান (economics) ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (politics) লইয়া নহে। আমরা তাহাদের দার্শনিক স্বরূপ-নির্দ্ধারণেও কিছু চেষ্টিত থাকিব।

Karl Marx প্রধানতঃ কমিউনিজ্‌মের প্রবক্তা। তাঁহার Capital (Das Kapital)-গ্রন্থে তিনি ধনতন্ত্রের ভিত্তিরূপে তাঁহার বিখ্যাত মূল্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এই মূল্যতত্ত্ব

*—'অমৃতের পথে', প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(Theory of Value) সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে Surplus Value of Labour বা বাড়তি শ্রমের মূল্যই Capital বা 'পুঁজি'র সৃষ্টি করে। বিশেষ আগ্রহে সূক্ষ্ম গবেষণার সাহায্যে তিনি ইহা সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। Marx-এর সমালোচনা—বিশেষে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে—এখানে সম্ভব নয়, ইহা তাহার ক্ষেত্রও নয়। কিন্তু তথাপি কয়েকটী কথা না বলিলে যে দার্শনিক রহস্য-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ব্যর্থ হইবে। মার্ক্স মূল্যকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—ব্যবহার-মূল্য (Use-Value) ও বিনিময়-মূল্য (Exchange-Value)। এই বিনিময়-মূল্যই গত কয়েক শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্য (trade and commerce) ও শিল্প (industry)-প্রসারের মধ্য দিয়াই বিরাট মূলধন (capital) সৃষ্টি করিয়া ধনিক-শ্রেণীর জন্ম দিয়াছে। তাহারই ফলে শ্রমসর্ব্বস্ব 'সর্ব্বহারা' শ্রমিক-শ্রেণীতে পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছে। ইহারা একপ্রকার 'মানুষ-মাল' (human commodity) এবং ইহাদের হইতে যান্ত্রিক নিয়মে যে বাড়তি 'মূল্য' সৃষ্টি হয় তাহাই শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়া ধনিক-শ্রেণী (capitalist) করায়ত্ত করে, ইহারা হয় শোষিত। বর্ত্তমান যন্ত্রসভ্যতা ও শিল্পনির্ভর সমাজ যেভাবে বিরাট শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে মনুষ্য সমাজের বিরাট অংশ 'মানুষ' বলিয়া গণ্য হয় না।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যাহারা অল্পবিস্তর ধনী বা 'পুঁজিবাদী'

তাহারাও কি 'মানুষ'? তাহারাও কি, আর একদিকে, পুঞ্জীভূত অর্থের হাতে যন্ত্রদাসের মত কাজ করিতেছে না? অর্থ বা ধন যে নিজেই একটা জীবন্ত শক্তি এবং নিজেকে বাড়াইবার জন্য ইহা রক্তবীজের মত কাজ করিয়া চলে ও মানুষকেই শোষণ করে, 'লাভ' (profit) যে সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিতে পরিণত হইয়া পুনরায় 'লাভ' করাইতে চায়, এই বিচিত্র অর্থদানবের খেলা মার্কস্ সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। * বাহিরে স্ফীত হইয়া চলিলেও ভিতরে এই পুঁজিবাদীরা 'শোষিত',—যন্ত্রদানবের পরিবর্তে অর্থ-দানব ইহাদের শোষণকারী। আমরা ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থান্ধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অথবা শ্রমিক-শ্রেণীর দৈহিক ও মানসিক দুরবস্থার সমর্থনে একথা একেবারেই বলিতেছি না। কিন্তু 'মানুষ' যে ইহারা কেহই নয় ইহা সুস্পষ্ট। কেহ স্ফীত অমানুষ, কেহ শীর্ণ অমানুষ। আবার 'রাজনৈতিক' মানুষদেরও যে 'মানুষ' বলা যায় না, একথায়ও আমরা শীঘ্রই আসিতেছি। ধনকামের পরিবর্তে লোককাম বা প্রভুত্বকাম সেখানে মানুষের অন্তর শোষণ করিতেছে। সুতরাং পৃথিবীব্যাপী অমনুষ্যত্বের এক অমানুষিক লীলাখেলাই আজ চলিতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারে একটা সূক্ষ্ম ও সত্য যৌগিক-দার্শনিক দৃষ্টির প্রয়োজন।

প্রথম কথা, মার্ক্স নিজেও 'Commodity' বা 'মাল'-এর মধ্যে যে একরূপ 'আধ্যাত্মিক' রহস্যময় সত্বাকে দেখিয়াছেন †

---

*—'Capital', vol I, pp: 150-54 দ্রষ্টব্য।
†—'Capital', Bk. I, p: 72 দ্রষ্টব্য।

এবং Fetishism of Commodities বা 'মাল'-এর বাহ্যরূপ-উপাসনার কথা বলিয়াছেন, সেই তত্ত্বের মধ্যে তিনি মানুষের শ্রমকেই মূল বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছেন। মার্ক্সীয় বা কমিউনিষ্ট অর্থনীতি ও রাজনীতিতে শ্রমের যে মূল্য ও মর্য্যাদা ধরা হইয়াছে তাহা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রমেরও এই মূল্য ও মর্য্যাদা আসে কোথা হইতে ঐ দুই নীতি তাহার সঠিক রহস্য নির্ণয়ে মন দেয় নাই। ইহার কারণ অবশ্য এই যে মার্ক্স যে 'dialectics' বা 'বিরোধ-তত্ত্ব' প্রচার করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন তাহা 'materialism' বা 'জড়বাদী' জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে শ্রম বা কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়াও তাহার পিছনে আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মসচেতনতার বলিদানকেই মূল রহস্য বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। এজন্য গীতা বলেন, 'কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্ম অক্ষর বা পরমতত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত'। * আবার সেইখানেই বলা হইয়াছে কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়—'যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ' এবং যজ্ঞেই পরমব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই যজ্ঞ যে প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইহা মূলতঃ পরমশূন্যে প্রতিষ্ঠিত পরমসত্যের আদি আত্মত্যাগ বা নিজের মধ্যে নিজের লয়। এইখানেই জীবনের মূল স্বস্তি বা আরামতত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠাভূমি। কারণ পরমতত্ত্বের ঐ আত্মবিসর্জ্জনমূলক আত্ম-

---

*—'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥' —গীতা, ৩।১৫।

বিসৃজনই যাবতীয় কর্ম্মের স্বরূপ। * সুতরাং কর্ম্মের মধ্যে যে নিশ্চেতনতার স্বস্তি-আরাম-আনন্দ তাহাই কর্ম্ম বা শ্রমের প্রকৃত মূল্য। Carlyle সত্যই বলিয়াছেন—মানুষ যখন কর্ম্ম করে তখন সে ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করে। শ্রমের এই মূল্যই তিন স্তরের মধ্য দিয়া তিন 'গুণ' † আশ্রয় করিয়া তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় শাস্ত্র সর্ব্ববিষয়ে এই 'গুণ'তত্ত্বে একান্ত বিশ্বাসী। সুতরাং শ্রমেরও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিন প্রকার ভেদ আছে। আবার এখন যাহা সাত্ত্বিক, পরে তাহাই তামসিক, এখন যাহার মধ্যে তামসিক ক্রিয়া পরে অবস্থা-পরিবর্ত্তনে তাহার মধ্যেই সাত্ত্বিক বা রাজসিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে পারে—'গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে'। এই দৃষ্টিতে ধনীর সাত্ত্বিক-রাজসিক শ্রম অবস্থা বিশেষে তামসিক-রাজসিক হইতে পারে, আবার শ্রমিকের তামসিক-রাজসিক শ্রম নূতন পরিবেশে ও অবস্থায় এক সাত্ত্বিক-রাজসিক ভাবেও দেখা যাইতে পারে। সুতরাং শ্রমের বা কোনও জিনিষেরই কোনও স্থির বা একমাত্র নির্দ্দিষ্ট মূল্যায়ন নাই। এজন্য 'Commodity' বা 'মাল'-এর মধ্যে যে স্বাস্থ্যবিধানের ক্ষমতা তাহাই তাহার মূল্যায়নের ভিত্তি, কিন্তু এই স্বস্তিও সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক ভেদে বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। সুতরাং সত্যদৃষ্টিতে শ্রমও যেমন ত্রিবিধ তাহার মূল্যও সেরূপ ত্রিবিধ। এবং এই দৃষ্টিতেই সব কিছুর বিচার

---

*—'ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।' —গীতা, ৮।৩।

†—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

হওয়া উচিৎ। নচেৎ শ্রমতত্ত্ব সমাজ জীবনের গভীরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার গভীরের সমাধানও দিতে পারে না। শ্রমকেই মূল্যের চরম তত্ত্ব মনে করাকেও আমরা একপ্রকার 'Fetishism of Labour' বা শ্রমের বাহ্যরূপের উপাসনা বলিয়া মনে করিতে পারি।

ইহা ছাড়া, নিছক বাস্তব দিক্ দিয়াও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে profit বা লাভের উৎপত্তি ঘটে তাহার মধ্যেও ঐ স্বস্তিমূল্য তিন 'গুণ' অনুযায়ী তিন রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। সুতরাং Condillac-এর যে মত * মার্ক্স উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন—তাহা সবটাই অমূলক বলা যায় না। অবশ্য 'লাভ' যে তামসিক-রাজসিকও হইতে পারে এবং তখন তাহাতে স্থূল শ্রমের মূল্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না এবং বাড়তি শ্রমের শোষণ (exploitation)-কেই তাহার উৎস বলিয়া তখন ধরা যায় একথাও সত্য।

সে যাহা হউক, ধনের বা অর্থের সম্মোহশক্তি—যাহাকে আমরা ধনকাম বলিয়াছি—তাহা মার্ক্সীয় চিন্তাধারাতেও ধরা দিয়াছে। এই সম্মোহ-শক্তিকে মার্ক্স চমৎকার বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। † এবং এই সূত্রে, প্রকারান্তরে, ধনকাম এবং যৌনকাম যে একই সূত্রে গ্রথিত, যৌনসম্ভোগেচ্ছা যে ধন-সম্ভোগের ইচ্ছায় রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহাও তাঁহার লেখায়

*—'Commerce adds value to products',
'Capital', Bk. I, p 160 দ্রষ্টব্য।

†—'Capital', Bk. I, p: 133 দ্রষ্টব্য।

আভাসিত হইয়াছে। * তথ্যটী আমাদের ত্রিবিধ কামতত্ত্বের সংযমের আলোচনার বিষয়ে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রসঙ্গক্রমে, আমরা এখানে ধনিকের শোষণ নিবারণের জন্য ধনকামের নিবারণের প্রশ্নে আসিয়া পড়িলাম। আধুনিক রাশিয়ার নূতন 'humanistic' বা 'মানবিক' নীতিবাদে মানুষকে 'সৎ ও নিঃস্বার্থ' করিবার রাষ্ট্রীয় চেষ্টা রহিয়াছে। 'Personal Acquisitiveness' বা ব্যক্তির ধনস্পৃহাকে সেখানে একপ্রকার অশুভ (evil) বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। —'There is in the USSR a widespread and persistent discouragement of the personal acquisitiveness……. The Communists…… are inclined to see in it the root of nearly all social evil. What is "not done" under Soviet Communism is the seeking of personal riches'— 'USSR-এ (রাশিয়ায়) ব্যক্তিগত ধনস্পৃহাকে ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরুৎসাহিত করা হয় …। কমিউনিষ্টেরা……ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত সামাজিক অনাচারের মূল দেখিয়া থাকেন। সোভিয়েট কমিউনিজ্‌মের ক্ষেত্রে যাহা "অকাজ" তাহা এই ব্যক্তিগত ধনাকাঙ্ক্ষা।' † সুতরাং রাশিয়া

*—'The hoarder, therefore, makes, a sacrifice of the lusts of the flesh to his gold fetish.'—Ibid.

†—'Soviet Communism' by Sidney and Beatrice Webb, p: 853.

তথা কমিউনিজ্‌মের ক্ষেত্রে পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাস না থাকিলেও ধর্ম্মজীবন—যাহাকে আমরা পূর্ব্বে ভারতীয় প্রাচীন চিন্তাধারার অনুবর্ত্তনে বলিয়াছি 'সত্য ও স্বাভাবিক' জীবন—তাহার অনেক নীতিই বাস্তবে কার্যকরী করার চেষ্টা হইতেছে। ধনকাম-নিবারণ, মদ্যপান-নিবারণ, প্রকাশ্যে (অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের বিপরীত) নরনারীর প্রণয়লীলা-নিবারণ এসবই সোভিয়েট রাশিয়ার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন-নীতির পরিচায়ক। তফাতের মধ্যে ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া জনমতের নিন্দা-সমালোচনার উপরেই তাহাদের প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। *

সুতরাং ধনকামকে রাশিয়া কেবলমাত্র কৃত্রিমভাবে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারাই সরাইয়া দিয়াছে তাহা নহে, মানুষের মধ্যে ঐ প্রবৃত্তিকে নূতন সামাজিক নীতিবাদের দ্বারা হীনবল করার ব্যবস্থাও করিয়াছে। অতএব সোভিয়েট রাশিয়াতেও মানুষকে নানাভাবে নিজের স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তিকে সংযত করিতেই হয়। কিন্তু এই ধনকামবৃত্তির সহিত যৌনকামবৃত্তি ও প্রভুত্বকামবৃত্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত ইহা কমিউনিষ্ট জীবন-দর্শনে স্বীকৃত কিনা জানিবার উপায় নাই। মানুষের 'আনন্দ'-শক্তি সুস্থ-স্বাভাবিক পথ না পাইলে তাহা যৌনকাম, ধনকাম অথবা প্রভুত্বকামের তিন পথেই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ইহা মনস্তত্ত্বসম্মত কথা। 'সাধারণের কল্যাণে সকলকেই কাজ করিতে হইবে' এই কমিউনিষ্ট নীতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের সহজাত আদিম

*—Ibid, p: 852.

বৃত্তিগুলির সংযমের উপর জোর না দিলে এই নীতি ঠিক্‌মত ভিতর হইতে ফলপ্রসূ হইতে পারে না। যৌনকামের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে লেনিনের আবেগময়ী উক্তির আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৬০০—১)। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টীয় 'asceticism' বা মধ্যযুগীয় কৃচ্ছ্র সাধনাকে সমর্থন না করিয়াও লেনিন যে আনন্দময় জীবনীশক্তি লাভের জন্য স্পষ্ট ভাষায় আমাদের প্রতিপাদ্য জাতীয় ব্রহ্মচর্য বা যৌনসংযমের আদর্শকেই সমর্থন করিয়াছেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন—'As a communist I have not the least sympathy for the glass of water theory, although it bears the fine title "satisfaction of love." In my opinion the present widespread hypertrophy in sexual matters does not give joy and force to life, but takes it away. In the age of revolution that is bad, very bad.' —'কমিউনিষ্ট হিসাবে, তৃষ্ণা পাইলেই জল খাওয়ার মত কামচরিতার্থ করার, মতবাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই, যদিও উহাকে "প্রেমের পরিতৃপ্তি" বলিয়া জমকাল নামে অভিহিত করা হয়। ......আমার মতে যৌন ব্যাপার লইয়া বর্ত্তমান কালের ব্যাপক বাড়াবাড়ি জীবনে আনন্দ ও শক্তি দিতে পারে না, পরন্তু তাহাকে হরণ করিয়া লয়। বিপ্লবের যুগে ইহা খারাপ, অতি খারাপ।' *

---

*—Soviet Communism, by Sidney and Beatrice Webb, p: 848.

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এখানে যৌনকামের সংযমকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার বিষয়ীভূত করা হয় নাই, উহাকে একটী সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-সাধনার নীতি হিসাবেই স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং প্রকারান্তরে ধনকাম ও যৌনকামের সংযমের প্রয়োজনীয়তা সোভিয়েট রাশিয়ায় বিশেষ ভাবেই স্বীকৃত—যদিও তাহা সেখানে মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতের অঙ্গীভূত নহে। অবশ্য সেখানে এই সংযমসাধনার নীতি কতটা কার্যকরী হইয়াছে বলার উপায় নাই। বস্তুতঃ উগ্র কমিউনিষ্ট মতবাদীগণ ১৯১৭-এর পর নূতন রাষ্ট্র-গঠনের সময় যৌন-ব্যাপার ও বিবাহ-সমস্যাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর ছাড়িয়া দিতেই বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। * কিন্তু তাহাতে অসংযম ও অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। জনসাধারণের মত লইয়া যে দেশে সব কিছু আইন প্রবর্ত্তিত করার রেওয়াজ সেই সোভিয়েট রাশিয়াতেও ১৯৩৪ সালে হঠাৎ জোর করিয়া সমকামিতা (homo-sexuality)-কে বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া আইন পাশ করিতে হয়। † ইহার অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইলেও ব্যাপারটী যে বিসদৃশতার লক্ষণযুক্ত ইহাতে সন্দেহ নাই। Vodka (মদ্য)-খাওয়ার বিরুদ্ধে আইন থাকিলেও গোপনীয় ভাবে ব্যাপক মদ্য প্রস্তুত ও মদ্যপানের কুফল লক্ষ্য করিয়া ঐ

*—Ibid, p: 847 দ্রষ্টব্য।

†—Op. Cit, p: 852 দ্রষ্টব্য।

আইন রহিত করিতে হয়, * ব্যাপক বিবাহ-বিচ্ছেদের হিড়িক দেখিয়া সন্তান-সৃজনের পর স্ত্রী-পরিত্যাগী বা স্বামী-ত্যাগিনীদের উপর নানা আইনগত দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করিতে হয়, যদিও বহুক্ষেত্রে সে দায়িত্ব ফাঁকি দিবার চেষ্টাই প্রকাশিত হইয়াছে। † অতিনিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ (incest) স্বীকৃত হওয়া এবং বিনা রেজিষ্ট্রেশনেও স্বেচ্ছামূলক যৌন-সঙ্গমকেই বিবাহ বলিয়াই প্রায় স্বীকৃতি দেওয়া-সত্বেও দ্রুত বিবাহিত জীবনের মর্যাদা ও দাম্পত্য-জীবনের স্থায়িত্বের অনুকূলে ব্যাপক প্রচার চালাইতে হয়। Abortion বা ভ্রূণ-বিনাশ আইন-সঙ্গত করা হইলেও নানারূপে তাহার অন্যায় ও ব্যাপক প্রয়োগকে যথেষ্ট নিরস্ত করিতে হয়। ‡ নানারূপ অন্যায় কার্য ও অপরাধের জন্য যে আধুনিক সোভিয়েট রাশিয়ায় জনমতের নৈতিক শাস্তি জোরদার করিতে হইতেছে এবং এরূপ অপরাধকারীগণ যে বিভিন্ন সোভিয়েট প্রতিষ্ঠানের এমনকি 'পার্টি'র সভ্য তাহা ক্রুশ্চফ্ (Khrushchov) নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন। পারিবারিক জীবনও খুব পবিত্র ও স্থায়ী ('pure and lasting') হওয়ার তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন। § উন্নত ও সুশৃঙ্খল জাতীয় জীবনের জন্য যে সংযম-সাধনার প্রয়োজন এই কয়েকটী দৃষ্টান্তই তাহা প্রতিপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট।

---

*—Ibid, p: 853 দ্রষ্টব্য। †—Ibid, p: 850 দ্রষ্টব্য।

‡—Ibid, p: 852, 849; Op. Cit, p: 672-73, 964-65 দ্রষ্টব্য।

§—'On the Programme of the Communist Party of the Soviet Union' (1961), p: 76, 86, 87 দ্রষ্টব্য।

যৌনকাম ও ধনকামের সংযমের নীতি পালিত না হইলে প্রভুত্বকাম (love of power) যে সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহাও কমিউনিজ্‌মের বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রশাসনের দৃঢ়তা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা পৃথক্ বস্তু। দ্বিতীয়টী একটী কামবৃত্তি এবং ইহার প্রভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্বাভাবিক সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। আধুনিক ইতিহাসে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কমিউনিষ্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত রাশিয়া ও চীনের মধ্যে, তীব্র শত্রুতা তাহার সাক্ষ্য দেয় কিনা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বিশ্বশান্তি কতকটা কার্য্যকরী করিতে হইলে ঐ তিন কামবৃত্তির সংযমের আদর্শ অবশ্যই গৃহীত ও তাহার নীতি ও সাধনা অবশ্যই পালিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। এবং ইহাই জাতীয় ও বিশ্বজনীন ব্রহ্মচর্যের আদর্শ। বলা বাহুল্য, ইহা মধ্যযুগীয় ব্যক্তিগত asceticism বা কৃচ্ছ্রসাধনার কথা নয়, পূর্ব্বে আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছি। * কমিউনিজ্‌মের আপত্তি ইউরোপের মধ্যযুগীয় ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধে, জাতীয় ও বিশ্বজনীন জীবনসাধনা ও সংযমনীতির বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং যে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ ও নীতির প্রবর্ত্তনের কথা আমরা বলিতেছি, ধর্ম্মীয় মত বা সাম্প্রদায়িকতা বাদ দিয়া তাহা অবশ্যই কমিউনিজ্‌মের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত সমন্বিত হইতে পারে। আমরা বলিব নূতন যুগে এই দুইটী আদর্শ মূলতঃ পরস্পরের পরিপূরক এবং

*—'অমৃতের পথে', তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মানুষের ইতিহাসে নবযুগের মহাসমন্বয়ের ভিত্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ব্রহ্মচর্যের আদর্শ ও নীতি অত্যন্ত বাস্তব এবং কোনও রহস্যবাদ বা রহস্যময় দেবতা বা ঈশ্বরবাদের উপরও ইহা একান্ত নির্ভরশীল নয়। প্রাচীন বেদ-উপনিষদ্-সাংখ্য-পাতঞ্জল-বৌদ্ধ-জৈনাদি সাধন-শাস্ত্রের আলোচনাসূত্রে আমরা ইহা আলোচনা করিয়াছি। অপর-পক্ষে এই কামসংযমের জীবনের সহিত ভারত ধনের একপ্রকার 'সংবিভাগ' বা সমবণ্টনকেও জাতীয় আদর্শ ও নীতি বলিয়া দীর্ঘকাল গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। * সুতরাং এই যুগসঙ্কটে ভারতীয় চিন্তাধারাই এক নূতন মানবিক আদর্শের সমন্বয়ের সন্ধান দিতে সক্ষম।

এই নূতন যুগ-আদর্শ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধীরে স্থিরে আসিবে অথবা কমিউনিজ্‌ম-প্রদর্শিত বিপ্লবের পথে বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার ওলট-পালট ঘটাইয়া আসিবে, এ প্রশ্নে অতি-প্রচলিত ভ্রান্তির নিরসন প্রথমেই প্রয়োজন। ভারত নাকি শান্তিবাদী (pacifist) দেশ এবং বিপ্লব (revolution) ভারত কখনও সমর্থন করেনা। কিন্তু এই দুইটী ধারণা এবং বাস্তবে ইহাদের অন্তর্বিরোধ বর্ত্তমানে ভারতের জাতীয় জীবনে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিতেছে। আজকাল যে pacifism বা শান্তিবাদ বিশ্বের সমস্ত যুধ্যমান জাতির মুখেই শুনিতে পাওয়া

*—প্রথম অধ্যায়, পৃ: ১৮-২৫ ; তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ১১২, চতুর্থ অধ্যায়, ১৯৩-৯৬, ২০১।

যায় তাহা প্রধানতঃ পাশ্চত্যদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের এবং প্রাচ্যদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যার পরিণাম মাত্র। এই ভাবপ্রবণ শান্তিবাদ সেজন্য কুত্রাপি সুফল দিতে পারে নাই। মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্ম্মেও অনুরূপ ভাবপ্রবণ অহিংসাবাদের কথা শোনা যায়, কিন্তু ভারতের জাতীয় ধর্ম্মজীবন তখন মৃতকল্প বলিয়াই অহিংসার এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছিল। সত্যকার অহিংসা সকল ধর্ম্মের, বিশেষতঃ ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্মের, একটী মূল নীতি। কারণ ইহা জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বহুর মধ্যে সমত্ববোধের ভাব হইতে সঞ্জাত। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম যে যুগে জীবনধর্ম্মের সহিত একীভূত ছিল সে যুগে যুদ্ধকে ও যুদ্ধে জীবননাশকে সব সময় ভীতি বা বিতৃষ্ণার চক্ষে দেখা হয় নাই। একমাত্র 'অধার্ম্মিক' অর্থাৎ অস্বাভাবিক কামনার বশে যুদ্ধকেই নিন্দনীয় বলা হইয়াছে। বেদ-রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-চণ্ডী যুদ্ধের ভাবে ও বিবরণে পরিপূর্ণ। অবশ্য সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি-স্থাপনের প্রচেষ্টা অবশ্যই একটী মহৎ আদর্শ ছিল কিন্তু সে শান্তি ধর্ম্মের অর্থাৎ স্বাভাবিক, মানবিক জীবনের শান্তি। অস্বাভাবিক ও অমানুষিক পরিবেশে যুদ্ধকে এবং 'অধার্ম্মিক' রাজার বিতাড়ন ও অন্যায় রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্ত্তনকেও প্রাচীন ভারত সমর্থন করিয়াছে। এই স্বাভাবিক ও মানবিক জীবনকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ভারতের 'ধর্ম্মসংস্থাপন' এবং এজন্য অন্যায়কারী ('দুষ্কৃৎ')-গণের বিনাশই ছিল ভারতের লক্ষ্য।* কিন্তু এযুগে আমরা যাহাকে বিপ্লব

*—'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্', —গীতা।

বা আমূল রাষ্ট্রীয় আলোড়ন বলি ভারতে তাহা অস্বীকৃত এবং যখন তাহা বা তদনুরূপ কিছু ঘটে তাহা দুর্ভিক্ষ-মহামারীর মত একটা নৈসর্গিক অমঙ্গল বলিয়াই ভারত মনে করিয়াছে। * ইহার কারণ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ মানবীয় সত্যের ও সাম্যের আদর্শ। ইহার মূল নীতি নিত্যসত্য যদিও তাহার প্রয়োগবিধির মধ্যে মিথ্যা ও অসাম্য ঢুকিলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করা যায় ও তাহা কর্ত্তব্য। সুতরাং আজিকার যন্ত্রযুগের 'পুঁজিবাদ' বা ধনতন্ত্র (capitalism) যদি ব্যাপক মানুষের জীবনে মিথ্যা ও অসাম্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে তবে তাহাকে প্রাকৃতিক 'গুণকর্ম্ম'-গতিতে উপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশে অপসৃত করা একটা 'ধর্ম্ম'-কার্য বলিয়াই পরিগণিত হইবার কথা। এখানে আমরা প্রাচীন যুগের নীতিকেই অনুসরণ করিয়া কথা বলিতেছি, বাহ্যিক কোনও পদ্ধতিকে নহে। কারণ যুগ-পরিবেশ এখন সম্পূর্ণ নূতন। মূল নীতিকে গ্রহণ করিয়া ভারতে কেমন করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম-সাধনা যুগে-যুগে সম্পূর্ণ নূতন-নূতন পথে পা বাড়াইয়াছে তাহার কিছু বর্ণনাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। বৈদিক যুগে বিভিন্ন দেবশক্তির নিকট প্রার্থনার একটা প্রধান সুরই ছিল অন্ধকারের ও বাধার শক্তিকে অপসারিত করিয়া অবাধ বা 'অনিবাধ' † 'অমৃত' জীবনের প্রবর্ত্তন করা, 'ইহ'জগতে এবং 'পর'জগতে, বাহ্যলোকে ও অন্তর্লোকে। পুরাণে দেবাসুরের সংগ্রামেও সেই একই কথা।

---

*—'দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে'।

†—বেদ মীমাংসা, অনির্বাণ, পৃ: ২৫১।

রামায়ণ-মহাভারতের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং 'Revolution' বা বিপ্লবের অর্থ যদি হয় সত্যজীবন-বিরোধী 'পাপ'শক্তিকে সত্যজীবনানুবর্ত্তী 'ধর্ম্ম'শক্তির দ্বারা অপসারিত করা তবে সেরূপ বিপ্লবে ভারতধর্ম্মের সমর্থন অবশ্যই আছে, শুধু সমর্থন নয়, যথাকালে যথাভাবে তাহা অবশ্য-করণীয়ও বটে। বলা বাহুল্য, সকল ধর্ম্মেই এই অন্যায়ের অন্ধকারকে প্রতিহত করিয়া ন্যায়ের আলোকে বিস্তৃত করার দিব্য-বিধানের কথা রহিয়াছে। তবে বিভিন্ন পরিবেশে তাহা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই মাত্র প্রভেদ।

কিন্তু আধুনিক কমিউনিজ্‌মের মধ্যে এই দিব্য-বিধানের কোনও স্থান নাই। ভাল-ভাল 'মানবিক' নীতির কথা সেখানে অবশ্যই আছে কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় সেই 'মানবিক' নীতি কেন অনুসরণীয় তবে কমিউনিজ্‌মের কাছে কোনও সদুত্তরের আশা করা যায় না। সোভিয়েট সমবায়বাদ (collectivism) ও মানবতাবাদ (humanism)-এর জয়গান গাহিয়া Khrushchov বলিয়াছেন—"One for all and all for one' and 'Man is to man a friend, comrade and brother"—"প্রত্যেক সকলের তরে, সবাই প্রত্যেকের তরে' এবং 'মানুষ মানুষের বন্ধু, সহযোগী ও ভাই"। * কথা খুবই ভাল ও খুবই সত্য, কিন্তু নিছক sentiment বা

*—On the Programme of the Communist Party of the Soviet Union (1961), N. S. Khrushchov, p: 85.

ভাবোক্তি ছাড়া ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কোথায়? প্রাচীন ধর্ম্মীয় মতবাদের কথা বাদ দিয়াও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এগুলিকে দেখা দরকার, নচেৎ জীবননীতির ভিত্তির অভাবে জীবন-সত্যেরও প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। একথা সত্য যে প্রাচীন ধর্ম্মীয় মতবাদের ঈশ্বর-আত্মা-অমরতা-দেবদানব-স্বর্গনরক ইত্যাদির মামুলী বিশ্বাস এযুগে মানুষের সমাজে বিশেষ সার্থকতা দেখাইতে পারে নাই এবং তাহারই জন্য কমিউনিজ্‌ম ইহাদের একেবারে বাদ দিয়া চলিতে চায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে জীবনের পশ্চাতে বৃহত্তর 'বৈজ্ঞানিক' রহস্য আছে বা থাকিতে পারে যে বিষয়ে কমিউনিজম্ বর্ত্তমানে অজ্ঞ ও সেজন্যই উদাসীন।* সুতরাং ভবিষ্যতে অন্তর্বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বাস্তব ধর্ম্মের সন্ধান পাইলে কমিউনিজ্‌মের নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাহা গ্রহণ না করিবার হয়ত কারণ থাকিবে না। ভারতীয় বেদাদি শাস্ত্র ও দর্শনের মূলে এবং অল্পবিস্তর পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্র ও দর্শনের মূলে যে পরমশূন্যতার পরমসত্যের কথা রহিয়াছে যাহা পরম-বাস্তব ও পরম-'বৈজ্ঞানিক', সুতরাং এক অসাম্প্রদায়িক সমাজধর্ম্মের জীবন সাধনার ভিত্তি হইতে পারে তাহা আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে আভাসিত করিয়াছি। †

ভারতীয় শাশ্বত সমাজধর্ম্মের ভিত্তিতে আজ এক নূতন

---

*—Soviet Communism, Sidney and Beatrice Webb, pp: 815-16 দ্রষ্টব্য।

†—এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থকারের পরবর্তী 'মহাসত্য দর্শন'-গ্রন্থে অনুসন্ধেয়।

সাম্যধর্ম্মী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার কোনই বাধা নাই। ভারতীয় "শাশ্বতধর্ম্ম" আদি বৈদিক যুগ হইতে জীবনবাদ-জ্ঞানবাদ-তন্ত্রবাদ-ভক্তিবাদ-কর্ম্মবাদের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া আবর্ত্তনধারায় পুনরায় এক নূতন জীবনবাদের বিকাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। এযুগের সেই নূতন জীবনবাদই যুগ-প্রয়োজনে একদিকে পদার্থবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকে এবং অপর দিকে সমাজবিজ্ঞানকে বাস্তব সমাজধর্ম্মের আওতায় আনিয়া নূতনভাবে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে পারে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শাশ্বত নিয়মেই এই সমাজধর্ম্ম পুরাতনকে বর্জ্জন করিয়া নূতনভাবে রূপায়িত হইবে। সুতরাং কমিউনিষ্ট ধারায় মাত্র ভৌতিক বিজ্ঞান ও বাহ্যিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্য দিয়া মানবীয় চরিত্রের সাধনা একটী একদেশদর্শী প্রচেষ্টা মাত্র। সত্য-জীবনের নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ ছাড়া সাম্যবাদী রাষ্ট্রাদর্শ বিশ্বসমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে অক্ষম। এই সত্যজীবনের বা স্বাভাবিক জীবনের জাতীয় নিয়ন্ত্রণকেই আমরা বলিয়াছি জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনা। কমিউনিষ্ট রাশিয়ায় শ্রমিকদলের এক-নায়কত্ব (dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পরেও আজ আদর্শচরিত্র মানুষের আদর্শসমাজ গঠিত করার দিকে নজর দিতে হইতেছে। *

* —'On the Programme of the Communist Party of the Soviet Union (1961)', N, S. Khrushchov দ্রষ্টব্য।

মানবীয় চরিত্রসাধনার আদর্শে অনুপ্রাণিত, সমাজে ও রাষ্ট্রে ত্রিবিধকামনিয়ন্ত্রণের ব্রতধারী মানুষের দল গঠিত হইলে যে সাম্যধর্ম্মী ও গণধর্ম্মী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে তাহাই হইবে ভাবী বিশ্বসভ্যতায় ভারতের অপূর্ব্ব অবদান।

প্রশ্ন উঠিতে পারে রাশিয়া এবং চীন ত ছিল 'ধর্ম্মপ্রাণ' জাতির দেশ। সেখানে যদি নিছক কমিউনিষ্ট সমাজসভ্যতা গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় তবে ভারতে কেন তাহা হইবে না? ইহার প্রথম উত্তর এই যে ভারতের অধ্যাত্মসভ্যতা যুগে-যুগে অজস্র আধ্যাত্মিক চরিত্রের সৃজন করিয়া চলিয়াছে, আজও তাহার সে ধারার বিরতি নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত শক্তির ধারা এক শাশ্বত সমাজধর্ম্মের স্রোতের অনুপূরক হওয়ার দিন আসিতেছে। তৃতীয়তঃ, সোভিয়েট রাশিয়ায় 'বৈজ্ঞানিক' নীতিধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্মসাধনার নিগূঢ় প্রবণতা ও ভাবী সম্ভাবনার কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। নূতনযুগের কমিউনিষ্ট চীনের রাষ্ট্রীয় নীতিতেও কনফুসীয় সমাজধর্ম্ম ও চীনের প্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শ কতকটা রেখাপাত করিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। চতুর্থতঃ, ভারতের বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে এমন একটা বাস্তববাদী, বিশ্বকল্যাণকামী সমাজধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা এখন না হউক ভবিষ্যতে কোনও দিন, মনুষ্যত্বের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সাম্যবাদী, গণতান্ত্রিক

সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বগঠনে সক্ষম এবং ভারতের 'ধর্ম্ম' আজ তাহার আদি সামাজিকরূপে নূতনভাবে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ। সুতরাং বৈদেশিক কমিউনিজ্‌মের আদর্শে যাঁহারা ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্রকে ঢালিয়া সাজিতে চান তাঁহাদের অবশ্যই সত্যদৃষ্টির অভাব আছে বলিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা ডেমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্রের কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। আধুনিক জগতে গণতন্ত্রের ইতিহাসে আমরা পাই একটা ন্যায়ধর্ম্ম-সম্মত মানবিক প্রাণশক্তির স্ফুরণ। যে প্রাণশক্তি একযুগে রাজতন্ত্রের জন্ম দেয় তাহাই কালক্রমে ন্যায়-ধর্ম্মচ্যুত হইলে ক্রমশঃ প্রজাগণের মধ্যে বিদ্রোহকে জাগাইয়া তোলে, রাষ্ট্রশক্তি ক্রমশঃ প্রজাসাধারণের নেতা বা প্রতিনিধিগণের আয়ত্বে আসিয়া যায় ও প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রও এক ন্যায়ধর্ম্ম-সম্মত প্রাণশক্তির ধারক-বাহক না হইলে তাহারও পতন অনিবার্য। এই জন্যই এযুগের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একপ্রকার সমাজতান্ত্রিক (socialist) আদর্শকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে, কারণ, ন্যায়ধর্ম্ম-সম্মত জনকল্যাণই তাহাদের টিকিয়া থাকিবার ভিত্তি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি কথার পরিবর্ত্তে রাজধর্ম্ম, প্রজাধর্ম্ম কথাগুলিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কারণ ন্যায়সঙ্গত মনুষ্যত্বের প্রাণশক্তির সাধনাই ভারতের 'ধর্ম্ম'। গণতন্ত্রের সহিত এমনকি পাশ্চাত্যের মতবাদী (dogmatic) ধর্ম্মেরও কোনও মৌলিক বিরোধ আছে তাহা

মনে হয় না। Bryce দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া গণতন্ত্রের আদর্শগুলি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়াও সার্থক হইতে পারে। * ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্র-স্থাপনে প্রটেষ্টাণ্ট ও 'পিউরীটান'-গণের অবদান অনেকখানি। এমনকি 'নূতন জগৎ' আমেরিকায় যাইয়াও তাঁহাদের 'ধর্ম্মীয়' স্বাধীনতার প্রেরণাই জগতে গণতন্ত্রের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যাপ্ত করিতে অনেকটা সহায়তা করে। অবশ্য ধর্ম্মই এই সব আন্দোলনের একমাত্র উৎস ছিল না। কিন্তু 'মতবাদী' ধর্ম্ম—যথা খ্রীষ্টধর্ম্ম—মনুষ্য সমাজে বাস্তবে পালিত হয় নাই ইহা রূঢ় সত্য। † 'ধর্ম্ম' কথাটা যে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এযুগে কতকটা নিষিদ্ধ বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহার কারণ ধর্ম্মীয় মতবাদ লইয়া গণতন্ত্রের আদি যুগে প্রজায়-প্রজায় ও রাজায়-প্রজায় সংঘর্ষ কম হয় নাই। ধর্ম্মে মতবাদের কলহই হইয়া পড়ে তখন প্রধান বস্তু, ধর্ম্মসাধনা নয়। ইহারই ফলে যে কল্যাণময় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য গণতন্ত্রের মধ্য দিয়া প্রারম্ভিক যুগে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল তাহা ধর্ম্মীয় মতবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা-বুদ্ধি হইতে স্বাভাবিক নিয়মেই দূরে সরিয়া পড়ে। সুতরাং মনুষ্যসমাজে প্রকৃত মানবিক ধর্ম্মসাধনার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় লৌকিক (secular) গণতন্ত্রের দিকেই ক্রমশঃ সর্ব্বত্র ঝোঁক পড়িতে থাকে। কতকটা একই কারণে পরবর্ত্তীকালে কমিউনিজ্‌ম ও ধর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণার ভাব লইয়া

*—Modern Democracies, James Bryce, Chapter IX দ্রষ্টব্য।
†—'But Christianity never has been put in practice', Ibid, Bryce, p: 98.

আত্মপ্রকাশ করে। আবার নিছক গণতন্ত্রের অর্থহীনতা লক্ষ্য করিয়া এযুগে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (democratic socialism) একটা রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে প্রাধান্য লাভ করিতেছে। ভারতেও এই আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। 'Welfare State' বা জনকল্যাণ-রাষ্ট্রের কথাও শোনা যায়। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যেই যাহা পরিষ্কার সত্যরূপে ধরা দিতেছে তাহা এই যে গণতন্ত্র একটা প্রজাকল্যাণ বা জনকল্যাণের অনুকূল প্রাণশক্তির বিকাশ। কিন্তু এই প্রাণশক্তির বিকাশ আধুনিক যুগের ইতিহাসে একটা দ্বিপাক্ষিক সংঘর্ষ-হিংসা-স্বার্থপরতা-অহঙ্কারের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ইহা বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য। পৃথিবীর রাজতন্ত্র-যুগের ইতিহাসও এই পাপ হইতে মুক্ত নয় একথাও সমান সত্য। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নিশ্চয় এক দিক্ দিয়া মানবজীবনের ও মানবসভ্যতার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাইয়াছে তাহা আজ ব্যাপকভাবে জনজীবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার নিত্যসঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে এইখানেই সমস্যা। ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার যুগে যে নিত্য-সংঘর্ষ আমরা দেখিয়াছি যাহা রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গার মধ্য দিয়াও রাজনৈতিক মোকাবিলা চাহিয়াছে, পার্লামেণ্ট বা লোকসভার মধ্যে মাননীয় সভ্যগণের মধ্যেও বিসদৃশ ধ্বস্তাধ্বস্তি—জবরদস্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, * তাহারই অনুবৃত্তি আমরা এখনও আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর

*—A History of the English-Speaking Peoples, Winston S. Churchill, Vol. Two, pp: 165-66, 187 দ্রষ্টব্য।

সর্বদেশে সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি। ফরাসী-বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এই সংঘর্ষ আরও বীভৎস রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আমেরিকান স্বাধীনতা-আন্দোলনের পিছনেও এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের অস্বাভাবিকতা ক্রমশঃ স্বাভাবিক জীবনের ক্ষেত্রে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। ফ্রান্সের গণবিপ্লব শেষে উৎকট গণ-উচ্ছৃঙ্খলতা ও নেপোলিয়ানের একনায়ক-তন্ত্র তথা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদেরও জন্ম দেয়। আমেরিকান গণতন্ত্রী জাতীয়তাবাদের মধ্যেও উত্তর ও দক্ষিণের শত্রুতা রক্তক্ষয়ী অন্তর্বিপ্লব (civil war) সৃষ্টি করে এবং আব্রাহাম লিন্‌কন (Abraham Lincoln)-কে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়। 'Populist'দের মত উগ্র জঙ্গী-দলেরও সেখানে উদ্ভব ঘটিতে দেখা যায়। কালক্রমে আবার স্বাধীনতার অগ্রদূত, গণতন্ত্রের রক্ষক, এই জাতিই 'ডলার'-সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়াছে এবং আর এক দিকের গণরক্ষক, রাশিয়া ও চীনের 'লাল'-সাম্রাজ্যবাদের সহিত জীবন-মরণ সংঘর্ষে আজ জড়াইয়া পড়িয়াছে। জনগণের স্বাধীনতার নামে এই দুই 'সাম্রাজ্যবাদ' আজ আণবিক বোমার যুগে মানুষের সভ্যতাকে বর্বরতার প্রান্ত-দেশে টানিয়া আনিয়াছে এবং পৃথিবীতে এক দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্কের রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। অপরদিকে ইংরাজী গণতন্ত্র ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে এবং ভারতেরই বক্ষে যে 'পার্টি'-তন্ত্রের বিষ ছড়াইয়া দিয়াছে তাহা ভারতের জাতীয় জীবনের রক্তকেই বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু তথাপি একথা সত্য যে কমিউনিজ্‌মের মধ্যে যেমন

এক যুগসত্যের আংশিক রূপ ধরা দিয়াছে, তেমনি গণতন্ত্রবাদের মধ্যেও তাহা সাধারণ মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতার রূপে ধরা দিয়াছে। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব এবং সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইংরাজী বিপ্লবের মধ্যে এই সাধারণ মানুষের অধিকার (Rights of Man), মর্যাদা (Dignity of Man) এবং স্বাধীনতা (Freedom of Man)-র বাণীই বিশ্বের আকাশে ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই গণতন্ত্রবাদ নিত্যসংঘর্ষের জনকরূপে আজ বিশ্বসভ্যতার একটী স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হইয়াছে, একথা অনস্বীকার্য। ইহাকে ইহার এই গুরুতর পাপের হাত হইতে মুক্ত না করিলে বিশ্বসভ্যতার এই আশীর্ব্বাদ অভিশাপ হইয়াই থাকিবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জনকল্যাণের নামে রাজনৈতিক প্রভুত্ববৃত্তির চরিতার্থতাও একপ্রকার কাম এবং যৌনকাম, ধনকাম ও প্রভুত্বকাম একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ। * যৌনকামের সহিত ধনকামের নিগূঢ় সম্পর্কের আমরা কার্লমার্ক্সের কথাতেও আভাস পাইয়াছি (পৃঃ ৬৪৯) এবং লেনিন এই যৌনকামের সমস্যায় কতখানি বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন তাহাও দেখিয়াছি (পৃঃ ৬৫০)। রাজনৈতিক প্রভুত্বকামের ক্ষেত্রেও ঐরূপ এক নিগূঢ় সত্যকে আজ উপলব্ধি করার সময় আসিয়াছে।

মানুষের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটী গোড়ার কথা। কিন্তু এই স্বাধীনতা জনসাধারণের অন্তর্নিহিত শান্তি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা

*—'অমৃতের পথে', পৃঃ ২১, ১৮৩-৮৭, ১৯৯ দ্রষ্টব্য।

ও সুশাসনের ইচ্ছাকে সরাইয়া যখন সংগ্রামবৃত্তি (instinct of pugnacity)-কেই আশ্রয় করে তখনই মহা অনর্থের সূত্রপাত হয়। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও দেখা যায় স্বাধীনতার একটা পৃথক্ উগ্রমূর্ত্তি সমাজের বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক (politician)-দের হাতে অনেক ক্ষেত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। জন-সাধারণ বিদ্রোহ করিয়াছে, কিন্তু অগ্রণী হইয়া সমাজজীবনের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রজীবনকে বরণ করিতে চাহিয়াছে, ইহা প্রায় দেখা যায় না। * সুতরাং সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তে পৃথিবীতে যে নিত্য রাজনৈতিক জীবনের উত্তেজনা আবির্ভূত হইয়াছে তাহা সমাজের উর্দ্ধস্তরের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা-চরিতার্থতার খেলার প্রতিক্রিয়া মাত্র। সমাজের 'শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত-উচ্চ-মধ্যবিত্ত' সম্প্রদায়ের অতৃপ্ত কামজীবনের সহিত নিত্য ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষপ্রিয়তার সম্পর্ক কতখানি তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার ম্যাজিক-শক্তি আজ সকলকেই সম্মোহিত করিয়াছে। এই শক্তির বলে নানা অঘটন ঘটান যায় কিন্তু মানুষকে সুখী করা যায় না, ইহাও আজিকার জগতের তীব্র ও তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়া উঠিয়াছে।

গণতন্ত্রই আজিকার মানুষের ধর্ম্ম ও জীবনবেদ ইহা সত্য। মানুষের স্বাধীন আত্মবিকাশের মহিমা ইহার মধ্যে স্বীকৃত। কিন্তু এই স্বাধীন আত্ম-বিকাশের মহিমা যে শুধু রাজনৈতিক ভোটদানের অধিকার এবং অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকারের উপর

*—'Modern Democracies', James Bryce, pp: 27-36. দ্রষ্টব্য।

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কতকগুলি মানবোচিত গুণের উপর প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা রাখে ইহাই আজ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। *

জনসাধারণ যে ভোটের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রকাশ করিয়া থাকে তাহার সুষ্ঠু কার্যকারিতার পথে যে বহু বাধা আছে, সে প্রশ্নে আমরা যাইতেছিনা। † কিন্তু ভোটের শক্তিটীর স্বরূপের মধ্যে বিশেষ গবেষণা আজিও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাহা 'fetishism of commodities', রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাই 'fetishism of votes' বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 'মাল'-এর মূল্যতত্ত্বে যাইয়া মার্ক্‌স যেমন তাহার বাহ্যরূপের স্থলে ভিতরের রূপটীকে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়াছেন, 'ভোট'-এরও ক্ষেত্রে সেরূপ অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। 'মাল'-এর মূল্য লইয়া অর্থনৈতিক পুঁজিবাদের খেলার ন্যায় 'ভোট'-এর শক্তি লইয়াও রাজনৈতিক পুঁজিবাদের খেলা চলিতে পারে। পুঞ্জীভূত অর্থশক্তির ন্যায় পুঞ্জীভূত ভোট-শক্তিও জনসাধারণের জীবনের ধারক হওয়ার নামে শোষক হইতে পারে। এযুগের রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী রাজনৈতিকের দল অনেক ক্ষেত্রে ভোটের পুঁজিপতি-রূপে জনকল্যাণের নামে কাজ করিতে পারেন। State বা রাষ্ট্র যে নিজেই একটী বিরাট শোষণযন্ত্র তাহা মার্ক্‌সও জানিতেন, তাই তিনি চরম লক্ষ্য হিসাবে

---

*—Ibid. J. Bryce, p: 666 দ্রষ্টব্য।

†—Ibid, pp: 170-182 দ্রষ্টব্য।

withering of the state—রাষ্ট্রশক্তির অবলুপ্তি কামনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ধনশক্তির ন্যায় রাষ্ট্রশক্তিরও সমস্যা-সমাধান আজ আশু প্রয়োজন।

আধুনিক গণতন্ত্রযুগের নিদারুণ ও বিপুল সমস্যা সম্বন্ধে সুবিখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিক Ketelbey-র গ্রন্থ হইতে আমরা কিছু সংকলিত করিতেছি।—'Science, Industrialism, and Democracy—in all its twisting meanings and unforeseen developments—have come hand in hand and triumphed.......They have broken down ...the detachment of ancient cultures ... and undermined the traditional disciplines .... Large-scale organizations and remote control have diffused responsibility, and indiscriminate distractions and the multiplying contacts of the modern world have diverted attention from that vigilance which is the essential condition of human liberty.......The new humanist creeds have bred new intolerances ; the great plebiscitary powers and mass verdicts, new tyrannies ; the anonymous administrations, new irresponsibilities. Privilege and officialdom have

married, and begotten a new helplessness in the individual.' '......বিজ্ঞান, শিল্পবাদ এবং গণতন্ত্র —তাহার যাবতীয় বিকৃত ব্যাখ্যা এবং অকল্পিত পরিণতি সঙ্গে লইয়া—একত্রে হাত মিলাইয়া আবির্ভূত হইয়াছে এবং বিজয়লাভ করিয়াছে। ......তাহারা প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির নির্লিপ্ততাকে......ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং চিরাচরিত সংযম-রীতিগুলির গোড়া আল্‌গা করিয়া দিয়াছে। ......বৃহদাকার সংগঠন এবং বহুদূরবর্ত্তী পরিচালনশক্তির প্রয়োগ দায়িত্ববোধকে বিস্রস্ত করিয়া দিয়াছে, এবং এলোমেলো চিত্তবিক্ষেপ ও আধুনিক জগতের সহিত হাজার রকমের সংযোগ সেই জাগ্রত একাগ্রতার উপর মনোযোগ রক্ষা করিতে দেয় নাই, যাহা মানবিক স্বাধীনতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। ......নূতন নূতন মানবিকতাবাদ নূতন নূতন উগ্র অসহিষ্ণুতার জন্ম দিয়াছে ; ভোটের বিরাট বিরাট ক্ষমতা এবং বিশাল বিশাল গণবিচার ও গণ-'রায়' নূতন নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়াছে; নৈর্ব্যক্তিক শাসন ব্যবস্থায় নূতন নূতন দায়িত্বহীনতা দেখা দিয়াছে। আমলাতন্ত্রের সহিত বিশেষ ক্ষমতার যোগের ফলে ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে এক নূতন অসহায় অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে।'

পুনশ্চ—'The people have had their egoisms no less renowned than other potentates ; they have proved corruptible by bribery and servile under intimidation, the age that opened to the

cry that "Man is born free" has produced totalitarian tyrannies perhaps unmatched for ruthlessness."—'জনসাধারণেরও নানা অহঙ্কার-বৃত্তি অন্যান্য ক্ষমতার অধিকারীদের তুলনায় কিছু কম যায় না, তাহারা ঘুষের দ্বারা প্রভাবিত এবং ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা বশীভূত হইয়াছে...... যে যুগ "মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন" এই ধ্বনি দিয়া আরম্ভ হইয়াছিল তাহাই সমগ্র ক্ষমতার অধিকারীদের স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়নের জন্ম দিয়াছে যাহার নির্ব্বিচার নির্ম্মমতার সম্ভবতঃ তুলনা নাই।' *

সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তিকে লইয়াও আজ নিদারুণ সমস্যা দেখা দিয়াছে। মামুলী 'গ্রাম-পঞ্চায়েৎ' করিয়া প্রচলিত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে ইহার সমাধান হইতে পারে না। কারণ, যে রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিষ কেন্দ্রীভূত, মামুলী 'গ্রাম-পঞ্চায়েৎ'-প্রথায় সেই বিষই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তিকে শোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সুস্থমস্তিষ্ক সমাজ-শক্তির প্রয়োজন। এই সুস্থ সমাজশক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে নগরে-নগরে ও গ্রামে-গ্রামান্তরে কতকটা দল-নিরপেক্ষ জনমত (public opinion) গঠনের মধ্য দিয়া। Bryce সুস্থ গণতন্ত্রের ক্রিয়ার জন্য এইরূপ জনমতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। †

*—A History of Modern Times, C. D. M. Ketelbey, M. A,, F. R. Hist. S , p: 24,

†--Ibid, J. Bryce, pp: 181-82 দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ইহা ত গেল নিছক রাজনৈতিক আলোচনা। নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিবিচারেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় একটা বিভ্রান্ত দেউলিয়া মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে। ন্যায়ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকারের ইচ্ছা কোথাও নাই। সর্ব্বত্র diplomacy বা চাতুর্যই প্রধান বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ইহারও আশু প্রতিবিধান প্রয়োজন। নচেৎ রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রিয়তার নিত্যনূতন অন্তর্দ্বন্দ্বে গণতন্ত্রের অকাল-সমাধি রচিত হইতে বাধ্য। উপর্যুপরি তুইটী বিশ্বযুদ্ধ এবং পুনরায় আরও ঘোরতর আণবিক বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা তাহারই অশুভ ইঙ্গিত বহন করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ Harold J. Laski গণতন্ত্রের ও ধনসাম্যের বিশেষ সমর্থক হইয়াও ভাবীযুগের জগৎ সম্বন্ধে যে কয়েকটী মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

—'There is neither freedom nor happiness save as we make them ; there is neither freedom nor happiness save as we make peace. We have to learn to think of it as a creative adventure, involving sacrifices as momentous, risks as great as were ever involved in war. We cannot be free save as we are just ; and the price of justice is equality.......The victory

of peace depends upon an intense and widespread will to peace ; .....The idea of sacrifice for the sake of righteousness is not yet a part of the mental habits of mankind. ......We have learned by tragic experience the fragility of civilised habits ; .....There could be, after all, a common interest in the good life. . .. ', অর্থাৎ—'আমরা নিজেরা না সৃষ্টি করিলে স্বাধীনতা বা সুখ কিছুই হইতে পারে না ; আমরা নিজেরা শান্তি স্থাপন করা ছাড়া স্বাধীনতা বা সুখ আসিতে পারে না। আমাদের ইহাকে একটী নূতন সৃষ্টির অভিযান-রূপে ভাবিতে শিখিতে হইবে—যে অভিযানে যুদ্ধের মতই বিরাট-বিরাট ত্যাগ ও বড়-বড় বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ......আমরা ন্যায়পরায়ণ না হইলে স্বাধীন হইতে পারিব না ; এবং সাম্যের মূল্য দিয়াই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। .... শান্তির বিজয়লাভ গভীর ও ব্যাপক শান্তি-ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ; ......ন্যায়ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগের ধারণা এখনও পর্যন্ত মানুষের মনের অভ্যাসের অঙ্গীভূত হয় নাই। ......আমরা দারুণ দুঃখময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সভ্য-মানবের আচার-ব্যবহার যে কত ক্ষণভঙ্গুর তাহা বুঝিয়াছি ;...... আর যাহাই হউক, সৎ ও ভাল জীবন যাপনের প্রতি সকলের একটা সাধারণ আগ্রহ সৃষ্টি করা যাইতে পারে ;......।' *

---

*—'An Introduction to Politics', Harold J. Laski, pp: 104-5.

Laski একজন মানবদরদী, বিশ্ববিশ্রুত, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী। তিনি চাহিয়াছেন ন্যায়ধর্ম্ম (justice) এবং ন্যায়ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে তিনি চাহিয়াছেন সাম্য। এই সাম্যকে তিনি যেমন ধনের ও ক্ষমতার বৈষম্যহীনতার রূপে দেখিয়াছেন, তেমনি নৈতিক দৃষ্টিতেও বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাম্য স্থাপনের জন্য উচ্চ পদ বা রাষ্ট্রকে হইতে হইবে নত, ধনীকে হইতে হইবে ত্যাগী। ইহা যে সহজ নয় তাহা তিনি জানেন, কারণ ক্ষমতার অধিকারী তাহার ক্ষমতার সুযোগ সহজে ছাড়িতে চায় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ক্ষমতার অধিকারীগণ আজ যুদ্ধ করিয়া হারিলে অথবা জিতিলেও দেশের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী অত্যাচার (tyranny) এবং দেশের বাহিরে বিশ্বের মধ্যে অরাজকতা (anarchy) সৃষ্টি হয়। ল্যাস্কি, উদাহরণ-স্বরূপ, একদিকে রাশিয়া ও অপরদিকে জার্ম্মাণী বা ইটালীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকান গোঁড়ামি এবং রাশিয়ান মতান্ধতা (fanaticism)—কোনটীকেই তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। ন্যায়ধর্ম্ম ও সততার জন্য মানুষের ত্যাগ স্বীকারের মধ্যেই তিনি একমাত্র আশার আলো দেখিতে পাইয়াছেন। † পৃথিবীর সভ্যতা আজ চরম ধ্বংসের মুখে দাঁড়াইয়া এরূপ একটা পরীক্ষায় হয়ত নামিবে এরূপ আশাও তিনি করেন।

অপর দিকে বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিক Toynbee

†—Ibid. p: 103, 04.

এযুগের গুরুতর বিশ্বসমস্যার সমাধানে এক ধর্ম্মীয় বিশ্বসমাজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক যুগের গণতন্ত্র যে একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, আদর্শ রাষ্ট্রবিধান নয়, ইহার সংঘর্ষময় উৎপত্তির ইতিহাসের মধ্যেই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে এযুগের জাতীয়তাবাদ বা nationalism-এর জন্ম *, এবং এই গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদই যে যন্ত্রযুগের industrialism বা শিল্পবাদের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যাপকতর ও ভীষণতর আকারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অত্যাচার-উৎপীড়ন, শোষণ-শাসন, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ হইয়াছে, এবং এমন কি এই গণতন্ত্রই যে শিক্ষাপ্রসারাদি জনকল্যাণের পদ্ধতিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধন ও দুর্নীতিময় আমোদপ্রমোদ-বিকীরণের কাজে লাগাইয়া ব্যাপকভাবে ও সুকৌশলে জনমানসকে দাসত্ব করাইবার পন্থা ('elaborate and ingenious machinery for mass-enslavement) বাহির করিয়াছে †, এই সব সুচিন্তিত তথ্য আমরা পাই টয়েন্‌বীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গবেষণার গ্রন্থ হইতে। ‡ প্রাক্-শিল্প (Pre-Industrial) যুগের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বর্ত্তমানে অচল ও ক্ষতিকর এবং গণতন্ত্র নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সাম্যতন্ত্রের দিকে

*—এই মেকী ন্যাশন্যালিজ্‌মের অনুকরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বহু পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়াছেন। 'অমৃতের পথে', পৃ: ২৩৪-৩৫ দ্রষ্টব্য।

†—Aldous Huxley-র অনুরূপ মত তুলনীয়। 'অমৃতের পথে', পৃ: ২১১-১৭।

‡—'A study of History', Arnold Toynbee, Abridgement of Vol I-VI, pp: 283-93 দ্রষ্টব্য।

যাইতে বাধ্য ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি আধুনিক কমিউনিজ্‌ম বা সাম্যতন্ত্রের অনেক ভয়ঙ্কর গলদের ইঙ্গিত দিয়াছেন। নিছক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থাকেও খাড়া করা যায় না ইহাই টয়েন্‌বীর অভিমত। আদর্শ বিশ্বসমাজ-গঠনের জন্য 'অর্থনৈতিক বালুস্তূপ' ('economic sands')-এর পরিবর্ত্তে 'ধর্ম্মের প্রস্তরভিত্তি' ('religious rock') প্রয়োজন, এই মতই তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের খ্রীষ্টীয় 'Great Society' বা 'মহাসমাজ'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। *

সুতরাং বর্ত্তমানের বিজ্ঞজনের 'আপ্তবাক্য' হইতেও প্রমাণিত হয় যে মানবিক নীতিধর্ম্মের ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ-গঠন ছাড়া এযুগের নিষ্কৃতির আর পথ নাই। কিন্তু এই মানবিক নীতিধর্ম্ম যে কোনও প্রাচীন বা আধুনিক ধর্ম্মমতবাদ (dogmatic religion) অথবা ধর্ম্মীয় প্রথা বা প্রতিষ্ঠানকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না ইহা অতি সুস্পষ্ট। এযুগ সত্যই এক বিশ্বব্যাপী 'মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্বয়, মহামুক্তি'র যুগ এবং তাহারই প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এযুগের গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ, এই দুই আদর্শের মধ্য দিয়া। মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়ধর্ম্ম ও সাম্য এই নবজাগরণের প্রথম ধাপ। ধর্ম্ম-শিক্ষা-সমাজ-রাষ্ট্র-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বড়-ছোট সব রকমের

*—Ibid.

'কায়েমী স্বার্থ' ('vested interest') আজ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবেই, কারণ তাহা স্বার্থপরতা-সঙ্কীর্ণতা-রিপু-ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার অহঙ্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুক্তজীবনের প্রবাহ তাহার মধ্যে নাই।

কিন্তু এই 'কায়েমী স্বার্থ' হইতে জগতের মুক্তির পথ কোনও ভাবপ্রবণ রাজনীতি-অর্থনীতির আদর্শবাদ হইতে পারে না, এবং কোনও মতবাদী (dogmatic) সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মও হইতে পারে না। এই দিক্ দিয়া ল্যাস্কি (Laski) ও টয়েন্‌বী (Toynbee) কিছুটা ভ্রান্ত আশা পোষণ করিয়াছেন বলিতে হইবে। কারণ যে অসাম্য, অধীনতা ও অন্যায় আজ মানুষের জীবনকে কলুষিত ও দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে তাহা ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ সকলেরই একটী সাধারণ ব্যাধি, যে 'ধার্ম্মিকতা' আজ সমাজসমস্যার সমাধানে অক্ষম হইতেছে তাহা সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতেই বর্ত্তমান। সুতরাং আজ সকল মানুষের মধ্যেই সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক মানবিক সমাজধর্ম্মের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। ইহাই এযুগের বাস্তব মহামুক্তির সাধনা। কিন্তু ইহা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে এই সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যও এক নূতন ও 'বৈপ্লবিক' সমাজধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই সমাজধর্ম্মের নীতিকে অন্তরে গ্রহণ করা ও বাহিরে রূপ দিতে চেষ্টা করা, ইহাই হইবে এযুগের নূতন মানবিক ধর্ম্মসাধনা।

মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম যে ত্রিবিধ কামের সংযম ও দমনের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই 'বৈজ্ঞানিক' তত্ত্বও আজ সুস্পষ্টভাবে মানুষের চিন্তার রাজ্যে ও কর্ম্মের রাজ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি-মানবের ভাব-জীবনের সঙ্গে সমাজ-মানবের বাস্তব-জীবনেও তাহার প্রতিষ্ঠা চাই। এজন্য যৌনকাম, ধনকাম ও জনকাম বা প্রভুত্বকামের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভের প্রেরণা ও প্রচেষ্টাই বর্ত্তমান যুগের গৃহনীতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-শিক্ষানীতি-শিল্পনীতির নিয়ামক হইতে হইবে। ইহা শুধু 'সাধু' ইচ্ছা বা ধর্ম্মীয় ভাব-বিলাসের মধ্য দিয়া নহে, পরন্তু এক নূতন জীবন-বিন্যাসের মধ্য দিয়া। প্রাণহীন গতানুগতিকের জের টানিয়া আজ আর কোনও লাভ হইবে না, কারণ দেশে ও বিশ্বে সভ্যতার সঙ্কট আজ চরমে উঠিয়াছে।

কিন্তু এই নূতন সমাজধর্ম্ম কোনও তথাকথিত 'আধুনিক', 'বাস্তববাদী' রাজনীতি-অর্থনীতির তাগিদেও সৃষ্ট হইতে পারে না। তাহা হইবে একান্তই অগণতান্ত্রিক ও মানুষের প্রকৃত সাম্য-স্বাধীনতার বিরোধী। এই নূতন যুগের জীবনধর্ম্ম মানুষের আত্মস্থ সমাজ-জীবনের মধ্য হইতেই স্ফুরিত ও রূপায়িত হইতে হইবে। সেজন্য আজ প্রয়োজন দেশের সর্ব্বত্র স্বনিয়ন্ত্রিত (autonomous) অজস্র সমাজধর্ম্মের মিলনকেন্দ্র সৃষ্ট হওয়া। গ্রাম-শহর-দেশ ও বিশ্বের যাবতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিক ও ধর্ম্মনৈতিক সমস্যার মুখোমুখী হইয়া এই সমস্ত কেন্দ্রের মানুষেরা মানবিক ধর্ম্মের দৃষ্টিতে সব কিছুর আলোচনা

ও পন্থা-নির্দ্ধারণ করিবেন। এইগুলিই হইবে এযুগের নূতন গণধর্ম্মের বীজভূমি। ঐ গণধর্ম্মই হইবে সত্যকার সাম্য, স্যায় ও স্বাধীনতার জন্মদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা।

ভারতবর্ষকেই হইতে হইবে এই নূতন গণধর্ম্মের সাধনায় অগ্রণী। কারণ, ভারতেই এক মহাসমন্বয়ের বাণী ধ্বনিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ব্যক্তিধর্ম্মের আদর্শ আছে কিন্তু সমাজধর্ম্মের আদর্শ আর নাই, ইস্‌লামের মধ্যে সমাজসাম্যের আদর্শ আছে কিন্তু তাহা সম্প্রদায়গত, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মধ্যে মানবসেবার আদর্শ আছে কিন্তু তাহাও সম্প্রদায়-ভাবে ভাবিত, বৌদ্ধধর্ম্মে বৈজ্ঞানিক সাধনা আছে কিন্তু তাহা একান্ত তত্ত্বগত (metaphysical), বাস্তবজীবন-গত নয় এবং এইরূপ সকল ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই এক একটা বিশেষ অভাবের দিক্ রহিয়া গিয়াছে। আজ যে মানুষের জগতে বাস্তব সমাজ-ধর্ম্মের নূতন যুগ আসিয়াছে তাহাতে মত বা বিশ্বাস, সম্প্রদায় বা প্রথা, তত্ত্ব বা ভাবুকতা বড় কথা নয়। আজ নূতন যুগের মানুষের নূতন সমাজধর্ম্ম গঠিত হইতে হইবে এবং এই মানবিক (humanistic) সমাজবাদই মানবিক রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির মধ্য দিয়া আদর্শ সাম্য-স্যায়-স্বাধীনতার জন্ম দিবে। এই নূতন সমাজের জীবননীতি হইবে আমাদের পূর্ব্বকথিত যৌনকাম, ধনকাম ও জনকামের সংযমের মানবীয় নীতি এবং তাহারই ভিত্তিতে গঠিত নূতন রাষ্ট্রের নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিমানবের সহিত সমাজমানবের জীবনসাধনা। জাতিধর্ম্ম-মতপথ-রীতিনীতি-

দেশসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে এই সমাজধর্ম্মের সাধনা আজ বিশ্বেরও গ্রহণীয়। মানুষ স্বেচ্ছায় ইহা গ্রহণ না করিলে সামগ্রিক বিপ্লব (total revolution) অনিবার্য্য, যাহার ধ্বংসলীলার হাত হইতে কোনও দেশ-জাতি-সম্প্রদায়-ধর্ম্ম-সমাজ-রাষ্ট্রই পরিত্রাণ পাইবে না।

কিন্তু ঠিক্ সেরূপ কিছু হইবার নয়, কারণ এই যুগসঙ্কটে ভারতের বক্ষে এক নূতন যুগের মহাজাগরণ ও মহাসমন্বয়ের বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। এই নূতনের আবির্ভাব সহজ নয়, এখনি সম্ভবও নয়। কিন্তু মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ সহস্র-সহস্র বৎসরের ইতিহাস যে যুগে আমূল এক সংস্কারের পথে চলিয়াছে সে যুগের প্রস্তুতি-পর্ব্বও দীর্ঘ হইতে বাধ্য।

ভারতের বক্ষে এই নূতন সমাজধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতের 'হিন্দু' সমাজকেই অগ্রণী হইতে হইবে, কারণ তাহারাই ভারতে 'সংখ্যাগুরু' সমাজ এবং মহাসমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী। মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধির বৃথা জের না টানিয়া আজ 'হিন্দু' সমাজকে সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় শাশ্বত-ধর্ম্মের মানবিক সমাজবাদের সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক নূতন শক্তি-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। এই ধর্ম্ম কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদের ধর্ম্ম হইতে পারে না, এজন্য মধ্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত 'হিন্দু' সমাজের মধ্যে উদ্ভূত যাবতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মৌলিক ব্যাখ্যার দ্বারা তাহাদিগকে ভারতের শাশ্বত মানবিক সমাজধর্ম্মের সহিত সমন্বিত করিতে হইবে। ইহা হইবে ভারতীয় সাম্যবাদ

ও গণতন্ত্রের ধারক এবং এক বিশ্ব-আদর্শের বাহক। 'হিন্দু'-সমাজের যাহা 'সামাজিক' রীতি-নীতি-সংস্কৃতি ও 'সাম্প্রদায়িক' সাধনার ধারা তাহা পাশাপাশি চলিতে থাকিলেও এই মূল জাতীয় জীবনধর্ম্মের স্রোতকে আজ সমাজের বক্ষে নূতন করিয়া প্রবাহিত করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিতেও পাশাপাশি বহু সম্প্রদায়-ধারার মধ্য দিয়া এক মূল সমাজধর্ম্মের শক্তিশালী স্রোতকে আমরা প্রবাহিত দেখিতে পাই। সমস্ত ঋষি-মহর্ষি-আচার্য, এমনকি 'অবতার'গণও এই এক সমাজধর্ম্মের কাছে মাথা নত করিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারতে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

'হিন্দু'-সমাজের মধ্যে এই অসাম্প্রদায়িক সমন্বয় সাধিত হইলে ভারতে সমস্ত সমাজ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হইবে। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি সমস্ত সমাজের যাহা 'সামাজিক' রীতি-নীতি-সংস্কৃতি ও 'সাম্প্রদায়িক' সাধনার ধারা তাহা অব্যাহত রাখিয়াও মূল জাতীয় জীবনধর্ম্মের মানবিক সমাজবাদের ক্ষেত্রে সকলেরই মিলিত হওয়া সম্ভব। এই জাতীয় জীবনধর্ম্মের সাধনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোনও সম্প্রদায়েরই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ঘৃণাবিদ্বেষের স্থান থাকিবে না, সকলকেই তাহা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এই পরিবর্ত্তনের মূল দায়িত্বও 'হিন্দু'-সমাজের। জাতীয় সমাজধর্ম্মের সাধনায় 'হিন্দু'-সমাজকে সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থপরতা ও জড়তাহইতে মুক্ত হইয়া এমন এক নূতন আনন্দময় প্রাণ-

শক্তিতে সঞ্জীবিত হইতে হইবে যাহার সংস্পর্শে অন্যান্য সমাজ-সম্প্রদায়ও অনুপ্রাণিত হইবে।

স্বভাবতঃই এই জাতীয় সমাজধর্ম্মের সাধনায় 'হিন্দু'-সমাজের মধ্যযুগীয় 'জাতিভেদ' ইত্যাদি প্রাণহীণ প্রথা, বিভিন্ন আচার, মত ও বিশ্বাস, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক মতবাদ, এসবের কোনও পৃথক্ বা বিশেষ স্থান থাকিবে না। অদ্বয়জ্ঞানের পরমসত্যে আনুগত্য *, রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে সাম্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, সেই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে যৌনকাম-ধনকাম-লোককামের প্রভাব দূর করার প্রচেষ্টা, এবং এই প্রচেষ্টার সার্থকতার জন্য ভারতের শাশ্বত-ঋষিবাদের ও পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত ত্যাগ-সংযম-সত্য-তপস্যা, পবিত্রতা-ঋজুতা-জ্ঞান-ভক্তি, উদ্যম-বীরত্ব-অহিংসা-নিঃস্বার্থপরতার সাধনা, গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্র ও বিশ্বের কেন্দ্রবর্ত্তী মহাসত্য-স্বরূপের সেবায় আত্মোৎসর্গ—ইহাই হইবে বর্ত্তমান ও ভাবী ভারতের সমাজধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনধর্ম্ম। বলা বাহুল্য, কোনও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত সমাজ-সংস্কারবাদী বা আধুনিক পরিবর্ত্তনবাদী রাজনীতিকদের দ্বারা ইহা সম্ভব নয়। ভারতের অমর সংস্কৃতির গর্ভ হইতেই এই নূতন জীবনধর্ম্মের উদ্ভব ঘটিতে হইবে। যুগ-প্রয়োজনে ইহার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

এই গণধর্ম্মের সাধনায় প্রত্যেকে নিজ-নিজ স্বভাব-স্বাধীন সংস্কার ও প্রতিভার অনুশীলন করিয়া আত্মোন্নতি ও আত্মসুখ-

---

*—"সত্যং পরং ধীমহি"।

'আমি চাই ধর্ম্মান্দোলন, ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতি ও সমাজ-গঠন। কিন্তু শুধু মুখে "ধর্ম্ম কর" 'ধর্ম্ম কর" ব'লে চীৎকার করলে কি ফল হবে? আজ জাতি ও সমাজের সামনে যে সব সমস্যা তার সমাধান যদি ধর্ম্মের মধ্যে না দেখিয়ে দেওয়া যায় * * * কে ধর্ম্ম মানতে যাবে? * * * চরিত্রবলই মানুষের প্রকৃত বল। * * * ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা চরিত্রবল তৈরী হয়। * * * দুর্ব্বলতা আসাই অপরাধ নয়, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়াই অপরাধ। * * * যেখানে সংগ্রাম নাই, সেখানে সাধনাও নাই।'

—স্বামী প্রণবানন্দ।

'ধর্ম্মের চরিত্রই প্রধান। * * * স্কুল-কলেজে শিক্ষা হচ্ছে কেবল চাকুরীর জন্য। * * * কাম-ক্রোধের অবৈধ ব্যবহারই পাপ। * * * মনে উদয় হইলেই অপরাধী নহে। তাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক, আনন্দসহ যোগ দেওয়াই পাপ। সংগ্রাম করিতে গিয়া পরাস্ত হই, তাহাও অপরাধ নহে। * * * চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে চেষ্টা করিব।'

—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

'ভারত জগতের প্রচলিত জ্ঞানবিজ্ঞান কোনও কিছুকেই অবহেলা করিবে না কিন্তু তাহার জীবনভিত্তির গঠন হইবে ব্রহ্মচর্য। * * * দেশব্যাপী চরিত্র আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার তোমাদের এক শুভ অবসর আসিয়াছে। * * * দুই-দশবার যাহাদের পতন ঘটিয়াছে, তাহারা তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহারা পতিত অবস্থাকেই জীবনের শাশ্বত স্বভাব বলিয়া এক কথায় বিনা যুদ্ধে মানিয়া নিয়াছে।'

—স্বামী স্বরূপানন্দ।

অনুযোজনা পত্র (২)

(প্রশ্নোত্তরে আলোচনা) *

প্রঃ ব্রহ্মচর্য বা যৌনকাম-সংযমের মোটামুটি উপায় কি?

উঃ প্রথমতঃ এটা নিয়ে বিব্রত না হওয়া, আবার উদাসীন-উদ্‌ভ্রান্ত না হওয়া। জৈব চেতনার এটা একটা fundamental অংশ, জৈব চেতনার transformation-এর সঙ্গে সঙ্গে এটা আয়ত্ত হ'তে থাকে। সুতরাং জৈব চেতনার বা আত্মসচেতনতার (ধর্ম্মীয় পরিভাষায় অহঙ্কারের) ঊর্দ্ধমুখী transformation-এ মন দিতে হয়। এর জন্যে স্থির, প্রশান্ত, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সংযমের চেষ্টায় লেগে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। যে কোনও মহৎ self-transcending আদর্শে বা কাজে নিজেকে identify করা বিশেষ সহায়ক। যাঁদের ঈশ্বরভক্তি বা গুরুভক্তি আছে তাঁরা সেই ভাবে তন্ময়তার মধ্য দিয়ে বিশেষ ফল পাবেন।

---

* অনেক বিষয়েরই বিশদ আলোচনা গ্রন্থমধ্যেই পাওয়া যাবে।

উঃ সম্ভব শুধু নয়, একদিকে সহজও বটে। অর্থাৎ, নরনারীর ভেদবোধ নিয়ে কামভাবুকতার স্থান অন্ততঃ বাস্তব জীবনে আর বেশী থাকছে না। এতে সাময়িক বিভ্রান্তি ঘটলেও একটা ব্যাপক ও গভীর বাস্তবজ্ঞান ও সমত্ববোধ আসছে, যার ফলে স্বাভাবিক সংযম আরও সহজ হ'য়ে উঠতে পারে, যৌনকাম নিয়ে self-consciousness বা আত্মসচেতনতা অনেকটা সঙ্কুচিত হ'চ্ছে। অবশ্য এর বিপদ্‌ও একদিকে আছে, কিন্তু সেখানেও বাস্তববাদী জ্ঞানবিচার ও সংযমের চেষ্টা অনেক কাজে লাগতে পারে। এ সমস্তই একটা ভাবী ব্যাপক ও বাস্তব সংযমযুগের সূচনা। তবে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি জাগ্রত করা প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে তা খুবই বিস্তার লাভ করবে।

প্রঃ বীর্যসংযমে কিভাবে কাজ হয়?

উঃ Generative বা Reproductive Cell গুলিই specialized হ'য়ে nerve, brain ইত্যাদি তৈরি করে। সুতরাং ঐ Cell গুলি system-এ absorbed হ'লে nerve ও brain এর সূক্ষ্ম শক্তি অবশ্যই অনেক বাড়ে। আবার nerve ও brain-এর পিছনে, অর্থাৎ physical চেতনার যন্ত্রটার পিছনে যে mental বা psychic mechanism ক্রিয়া করছে, বীর্যধারণের সংকল্পশক্তি ও সাফল্য

সেই psychic mechanism-এর মধ্যেও এক 'specialized' ঊর্দ্ধগামী অতিচেতন শক্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় ক'রে তোলে। একেই কতকটা 'কুলকুণ্ডলিনী'-জাগরণ বলা যায়। এর ফলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এক 'sublimation' ঘটে যা'তে মানুষের চেতনা তার শূন্যস্বরূপের দিকে ধাবিত হয়। এই গতিরই নানা by-product-রূপে (Bergson-এর Elan Vital এর ক্রিয়া-বর্ণনা দ্রষ্টব্য) কবি, দার্শনিক, শিল্পী, কর্ম্মী, বিজ্ঞানী, সাধক, ইত্যাদি ভাবের স্ফুরণ ঘটে। এঁদের মধ্যে আংশিক failure ঘটলেও তা মূল গতিকে affect করে না। এমন কি ভোগজীবনের যেটুকু প্রকৃত তৃপ্তি ঘটে তা'ও এই গতিকেই আশ্রয় ক'রে। কিন্তু ভোগজীবনে আকাঙ্খা ও আসক্তির ফলে এই গতি ব্যাহত ও বিলুপ্ত হ'তে থাকে, মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা বিপন্ন হ'য়ে ওঠে। শান্তি, শক্তি ও জ্ঞান দ্রুত হ্রাস পায়। চেতনার তরলতা ও নিম্নমুখী প্রবণতা এতে বাড়তে থাকে। অবশ্য এ-সত্বেও এক এক প্রকারে পূর্ব্বোক্ত শক্তিগুলির ক্রিয়া হ'তে পারে কিন্তু তখন তা' রজস্তমোগুণের স্তরেই ঘটে। ভারতীয় 'ঊর্দ্ধরেতাঃ' কথাটির আসল অর্থ জীবনের ও চেতনার ঊর্দ্ধগতি, অর্থাৎ যৌন ব্যাপার থেকে মনকে তুলে নেওয়া। যেমন ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য-অভ্যাসের পর গৃহজীবনে নিয়ন্ত্রিত ভোগ, পরে

'বানপ্রস্থস্য উর্দ্ধরেতস্ত্বম্'। এর স্থূল যৌগিক-দৈহিক অর্থও আছে। গ্রন্থে একটা 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যারও চেষ্টা করা হয়েছে (অমৃতের পথে, পৃঃ ৫৩১-৪৬)।

প্রঃ সংযম ব্রহ্মচর্যের অভাবে উন্মাদ, আত্মঘাতী মনোবৃত্তি, নানা স্নায়বিক-মানসিক বিকার দেখা দেয় একথা কি সত্য?

উঃ মনস্তাত্ত্বিক case study ক'রে এর পক্ষে ও বিপক্ষে নানা facts পাওয়া যায়। আধুনিক tendency হ'চ্ছে কোন বিভীষিকা সৃষ্টি না করা। এই উদ্দেশ্যটা ভাল সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও একথা অনেকটা স্বীকৃত যে মনের দুর্ব্বলতা-তরলতা-ভাসমানতা এবং আলস্য-জড়তার ক্ষেত্রেই schizophrenia দেখা দেয় এবং উন্মাদ আত্মঘাতী বৃত্তি ও নানা স্নায়বিক-মানসিক বিকারের কতকটা এই কারণ। যৌন অসংযম এর সহায়তা করে এ নিশ্চয়ই বলা যায়। শারীরিক দিক্ দিয়েও যৌনব্যাধি নানা উপসর্গ ঘটায়। বিখ্যাত pathologist, William Boyd-এর মতে shyphilis শতকরা দশভাগ উন্মাদরোগের জন্য দায়ী (A Text Book of Pathology, p : 173 দ্রষ্টব্য)। অস্বাভাবিক যৌন উত্তেজনা ও 'sex gluttony' নানা স্নায়বিক-মানসিক বিকার ও আত্মঘাতী বৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে, ব'লেছেন Dr. Sorokin (World Aflame, Billy

Graham, p : 35 দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ মীরাবাই-এর গানে আছে, যৌনসংযম করলেই যদি 'ভগবানকে পাওয়া যায়' তাহ'লে অনেক খোজা (eunuch) তা' পেত। অনেক বোকা-হাবা-জড়প্রকৃতি লোক সম্বন্ধেও ত' তাই বলা যায়।

উঃ মীরাবাই প্রেমভক্তির সাধনার কথা ব'লেছেন এবং তা'তে সংযম একান্ত প্রয়োজন। আর বোকা-হাবা-জড়প্রকৃতির লোকদের যৌনক্রিয়া যা' থাকে তা' তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। সেজন্য যৌন cells ও কামশক্তির যে higher specialization-এর কথা আমরা ব'লেছি তা' সেখানে সম্ভব হয় না মনে হয়। সংযম-ব্রহ্মচর্যের ফলে চেতনায় ঊর্দ্ধগামী শক্তির প্রকাশ এজন্য আলস্য-নিদ্রা-তন্দ্রা-জড়তার বশীভূত থাকলে ঠিক্ সম্ভব হয় না। বহ্মচর্য প্রধানতঃ একটি mental ব্যাপার, তারই আনুষঙ্গিকভাবে physical, একথাটা মনে রাখা দরকার। Vasectomy বা artificial sterilization-এও মানসিক-দৈহিক বিকার নিরসনের কোনও প্রশ্নই নেই।

প্রঃ আজকাল যে প্রচার করা হয়, syphilis ইত্যাদি যৌনব্যাধি আসলে তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়, সব ক্ষেত্রে হ'তেই হবে তার কোনও মানে নেই, নানা কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামণ বন্ধ করা যায় ইত্যাদি, এসব কথা কি ঠিক ?

উঃ এসব dangerous half-truth-এ বিশ্বাস করা ঠিক্ নয়। বিখ্যাত অষ্ট্রীয়ান্ ডাক্তার, ফ্রয়েডের সহকর্ম্মী, Dr. Wilhelm Stekel, M. D. খুব আবেগের সঙ্গে এই সব কথা বলতেন। কিন্তু Freud নিজেই বলেছেন (অবশ্য অন্য কারণে) যে Dr. Stekel ছিলেন একজন দারুণ নৈতিক বিকারগ্রস্ত মানুষ (Ernest Jones-এর গ্রন্থ The Life and Work of Sigmund Freud দ্রষ্টব্য)। সে কথা ঠিক্ আর ভুল যাই হোক্, এসব বিপজ্জনক ক্ষেত্রে authority-র নাম শুনলেই নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া ঠিক্ নয়, কারণ নানা authority-র নানা কারণে নানা মত। নিজের বিবেককে মেনে চলতে হয়। আর যৌনব্যাধি নিবারণের জন্য আধুনিক coutraceptives ও antibiotics যে মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, তা' প্রমাণিত হয় ঐ সবের ব্যাপক প্রয়োগ সত্ত্বেও আমেরিকা ইত্যাদি দেশে যৌনব্যাধি হু হু ক'রে বেড়ে যাওয়ায়। Prostitutes-দের disinfect করা পাশ্চাত্য দেশেও বিশেষ সম্ভব হয় নি।

প্রঃ ভারতবর্ষে বোধহয় অত মারাত্মক অবস্থা নয়।

উঃ এখানের অবস্থা বর্ত্তমানে আরও সাংঘাতিক। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। Maharastra Govt-এর Press note (A. B. Patrika, 3.1.66)

থেকে জানা যায়, T. B., Leprosy, Cancer জড়িয়ে যত লোক না ভোগে, তার চেয়ে বেশী ভোগে Syphilis থেকে। Gonorrhoea-র incidence আরও বেশী। শতকরা নব্বই ভাগেরই বেশী বেশ্যা যৌন ব্যাধিগ্রস্ত। আর সব চেয়ে ভাববার কথা, কিশোর-বালক-যুবকদের মধ্যেই নূতন রোগের আক্রমণ ঘটছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী।

প্রঃ যৌনসংযম নিয়ে bother না ক'রে এটাকে biological function ভেবে freely allow ক'রে গেলে ক্ষতি কি? এতে ত অনেকে ভালই থাকেন মনে করেন।

উঃ যৌন ব্যাপারটা শুধুমাত্র biological বা physical ব্যাপার হ'লে কোনও সমস্যাই থাকত না। কিন্তু গভীর সমস্যা দাঁড়ায় এটি deeply psychological ব'লে। এ বিষয়ে আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায় রয়েছে। আর একে freely allow ক'রেও 'ভাল থাকা' একটা 'deadening of sensibilities'-ও হ'তে পারে। আশৈশব যৌনসংযমের training-এর ব্যবস্থা করার মত কোনও সমাজধর্ম্ম যেখানে নেই সেখানে সংযমের চেষ্টা একটা inhibition আনতে বাধ্য। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজে তাই ঘটেছিল এবং তার জেরও অনেকদিন চ'লেছিল। তারই reaction-এ ঐ inhibition থেকে মুক্তি পাবার একটা ঝোঁক দেখা

দেয়। ফ্রয়েড ইত্যাদির মনীষা এপথে অনেকটা সহায়তা করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা একটা negative লাভ, positive কিছু নয়। ফ্রয়েড নিজেও স্বীকার ক'রেছেন তাঁর method-এ কিছু মানসিক integration লাভ হয় বটে, কিন্তু মানুষের চরিত্রকে মহৎ করতে পারে না ('অমৃতের পথে' পৃঃ ৫৪৯-৫০ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ কমিউনিজ্‌ম আজ নূতন বৈজ্ঞানিক সমাজ গড়তে চলেছে, সুতরাং আজ আবার এসব সংযমের কথা কেন?

উঃ এসব সংযমের কথা আমরা কোনও মধ্যধুগীয় ধর্ম্মের জের টেনে বলছিনা। আমরা একটা নূতন জীবন-দর্শনের কথা বলছি যা' বাস্তব ও আদর্শবাদী, ভারতের অধুনা-লুপ্ত শাশ্বত ধর্ম্মের তা' অঙ্গীভূত। রাশিয়ায় কমিউনিজ্‌ম react ক'রেছিল প্রাণহীন মধ্যযুগীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। আর এক কথা, কমিউনিজ্‌মের বাস্তব রূপদাতা Lenin যৌন-অসংযম, এমন কি love-making-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ('অমৃতের পথে', পৃঃ ৬৫০ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ Birth-control, abortion ইত্যাদির ব্যাপক স্বীকৃতির যুগে সংযম-ব্রহ্মচর্য থাপ খায় কি?

উঃ যুগটা যদি নেহাৎ ঐরকম কিছুই হত তাহ'লে বলার-করার কিছু থাকত না। কিন্তু এ যুগ মানুষের সভ্যতায়

একটা crisis-এর যুগ, একটা নূতন centre of gravity খুঁজছে, নচেৎ এ দাঁড়াতেই পারে না। একটা নূতন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক-বৈজ্ঞানিক দর্শনের আজ একান্ত প্রয়োজন। ভারতের শাশ্বত ধর্ম্মের সেই বাস্তব দৃষ্টি থেকেই আমরা এই বিভ্রান্ত যুগে সংযমব্রহ্মচর্যের কথা বলছি। এই দৃষ্টিতে birth-control, abortion-এর যুগেই ঐ সংযম-ব্রহ্মচর্যের একান্ত প্রয়োজন। (গ্রন্থমধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে, পৃঃ ১৪৩, ৫৮৪-৮৬)। আর family-র size ছোট করলেও পরিবারবর্গের মন ছোট না হয় দেখতে হবে, নচেৎ 'happy family' অসম্ভব। Birth-control, abortion ইত্যাদির পিছনে কল্যাণবুদ্ধি থাকা দরকার, স্বেচ্ছাচারী বৃত্তি নয়। Life Force আজ তমস্তরে নেমে এক নূতন আদিম প্রকাশের পথ খুঁজছে ব'লে এই সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই নূতন প্রাণের প্রকাশকেও ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে উঠতে হবে। সংযমব্রহ্মচর্যের জাতীয় বা আন্তর্জ্জাতীয় নীতি ও সাধনাই ভবিষ্যতে সেই উর্দ্ধগতির উপায় হবে। সেজন্য এই আদর্শ ও সাধনাকে আজ তুলে ধ'রে রাখতে হবে। এটা একটি বিরাট মানবিক দায়িত্ব—ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার রক্ষার জন্যে। এর জন্যে আদর্শবাদী, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত মানুষ ও বিশেষে তরুণদের দ্বারা একটা Save Civilization Move-

ment হওয়া দরকার। ব্যাপক birth-control ও abortion-এর ফলে 'sanctity of life'-এর বোধ নষ্ট হ'তে পারে, সুতরাং তার bad effect counter-act করার জন্যেও এরূপ আন্দোলন চলা দরকার।

প্রঃ নরনারীর ভালবাসায় কি ভাল কিছুই নেই ?

উঃ অবশ্যই আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। একে ধ'রেই সমাজের রসমাধুর্যময় জীবন। পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগ্নী এসবই ত ভালবাসার রূপ। কিন্তু সমাজজীবনের এই অমৃতকে যৌন-জীবনের বিষ-কটাহে ঢাললে একে বিষে পরিণত করা হয়। সুতরাং সেই মারাত্মক সম্ভাবনার সম্বন্ধে সব সময়েই constant vigilance দরকার। এর সঙ্গে সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক জীবন এমন connected যে সব কিছুকেই তা' বিষিয়ে দেয় ('অমৃতের পথে', পৃঃ ১০৩-৩৫ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ নরনারীর অসংযত যৌন আকর্ষণও একটা গভীর ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। একে resist করা বা এর সঙ্গে fight ক'রে চলা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ? কোন্ সূত্রে কোথায় আকর্ষণ হয় তা'ও বলা যায় না। আর বৈধ সম্পর্কগুলি ছাড়া অবৈধ প্রণয়সম্পর্কগুলোর মধ্যে কি রসমাধুর্য নেই ? বরং তা'তেই তো বেশী আছে বলা যায়, বৈষ্ণব শাস্ত্র তার প্রমাণ। আর রবীন্দ্রনাথের মত বড় ও মহান্ কবি-সাহিত্যিকেরাও

ত এর মূল্য অস্বীকার করেন নি।

উঃ ঐ যৌন-আকর্ষণ গভীর ও স্বাভাবিক মোটেই নয়, তবে আকস্মিক ও প্রাকৃতিক অবশ্যই বটে। ঝড়-তুফান যেমন আসে ও যায় এও তেমনি। তবুও ঝড়-তুফানকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগই বলি। সুতরাং এ থেকে সাবধান থাকারই প্রশ্ন এবং সেই হিসাবেই resist বা fight ক'রে যাওয়ার কথা ওঠে। যুদ্ধের সময় যেমন যোদ্ধা বা নাগরিক সকলকেই military বা civil defence-এর নানারকম উপায় অবলম্বন করতে হয় এবং তার training নিতে হয়, জীবনের শান্তি-শক্তি-সুখধ্বংসকারী অস্বাভাবিক কামের আক্রমণের বিরুদ্ধেও সে রকম আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করতে হয় এবং তার অভ্যাস করতে হয়। এরূপ কামাকর্ষণ ও কামভালবাসা কোথায় কখন হয়, এরূপ কিছুও নয়। মূলতঃ scientific determinism এর ব্যাপার, অর্থাৎ কতকগুলো বিশেষ complex বা বিশেষ-রকমের সংস্কার যেখানে যেমন নিজেদের অনুকূল পরিবেশ পায় সেইখানেই সেইরকম কামাকর্ষণ বা কামভালবাসার সৃষ্টি করে। আর অবৈধ প্রণয়ে একটা তীব্র রসমাধুর্য আছে একথা ঠিক্, শ্রীচৈতন্যদেবের 'যঃ কৌমারহরঃ' গানই তার প্রমাণ। কিন্তু বৈষ্ণবসাধনায় এটা প্রতীকমূলক বা symbolic, এই 'অনিত্যমসুখম্' জীবনের ঊর্দ্ধে উঠে যাওয়ার

তীব্র আবেগের symbol (গ্রন্থমধ্যে এর আলোচনা করা হয়েছে, পৃঃ ২৯১-৯৩)। সুতরাং এ থেকে অবৈধ প্রণয়সম্পর্কগুলোর রসমাধুর্য্যের সত্যতা প্রমাণ হয় না। আর সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি ব'লে জীবনের কোনও আবেগ-উচ্ছ্বাসকেই সাহিত্য অস্বীকার করে না, স্বচ্ছন্দ expression দেয়। কিন্তু জীবনে এসবকে moral standard ভেবে নেওয়া ভয়ানক ভুল। সাহিত্য প্রতিচ্ছবি, জীবন নয়। জীবনে সাহিত্যরস ছাড়া আরও অনেক রস-সৌন্দর্য-মাধুর্য্যের উৎস আছে। জীবনের কাজকর্ম্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, সাধনা-মুক্তির মধ্যেও প্রচুর রস-সৌন্দর্য-মাধুর্য আছে। সাহিত্যে আমরা morality চাইনা, অথচ সাহিত্যকে এতখানি moral value দিয়ে ফেলি, এ এক বুদ্ধি-বিভ্রম। আর রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ কবিরা এক-এক গভীর জীবনদর্শনেরও ঋষি, একথা ভুলে গেলে চলবে না।

প্রঃ এসব যৌনপ্রণয়ের ভুলচুকের পর ত' অধিকাংশই একটা বৈধ-বিবাহিত জীবন যাপন করেন, তবে এত ভাবার কি আছে ?

উঃ ভাবার এই আছে যে ঐ 'বৈধ-বিবাহিত' জীবনও সমানে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ভুল সংযমশিক্ষাহীন, সংযমের জীবনদর্শনহীন কামসর্ব্বস্ব জীবনের ভুল। এর সঙ্গে ধনকাম ও প্রভুত্বকামের মিথ্যাও সমানে মিশে

থাকে। এই কাম ব্যর্থ ও বিষাক্ত, এবং সমগ্র গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বকেও ব্যর্থ ও বিষায়িত করে। সুতরাং যৌনপ্রণয় নিয়ে মূল সমস্যা নয়, যৌনকামের ভ্রান্ত মূল্যবোধ নিয়েই সমস্যা—কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত জীবনে।

প্রঃ এই মূল্যবোধ ঠিক্ হবে কি ক'রে ?

উঃ এর জন্যে এক নূতন জীবনদর্শন দরকার, মামুলী মধ্যযুগীয় নীতিকথার সংযমপালন বা ব্রহ্মচর্য্যের কথা ব'ল্লে কিছু হবে না। সেই জীবনদর্শনের আভাস এই গ্রন্থে কিছু দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

প্রঃ সে যুগের ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস এসব কি এযুগে সম্ভব ?

উঃ ঐ scheme-এ বা ঐ pattern-এ সম্ভব নয়, কিন্তু তার মূল spirit নিয়ে চলা নিশ্চয় সম্ভব ও অবশ্য প্রয়োজন। তার আভাসও আমরা গ্রন্থে দিয়েছি। তার ভিত্তি হ'চ্ছে এক নূতন সমাজধর্ম্মের জীবনদর্শন যা' বাস্তব জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আধুনিক কালের সর্ব্বদেশের সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব। পুরাতন কোনও scheme-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

প্রঃ তবুও মনে হয়, এই রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের যুগে মানুষের চেতনা যখন নানাদিকে বিস্তার ও সাফল্য লাভ করছে, তখন দৈহিক কামসংযমের ক্ষুদ্র ব্যাপারে মনকে জড়িত ক'রে রাখা কোনও প্রসারশীল

মনোভাব নয়।

উঃ দৈহিক ব্যাপার হিসাবেই সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা হ'চ্ছেনা। চেতনার সত্যিকার বিস্তার ও সার্থকতা যে পথে হ'তে পারে সেই পথের কথাই বলা হ'চ্ছে।

প্রঃ অনেকে বলেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হাঁচি হাইতোলা-excretion ইত্যাদির মত যৌনকাম একটা physiological urge, এই tension-এর একটা relief দরকার, নচেৎ শরীর-মন খারাপ হ'তে পারে, একথা কি ঠিক্?

উঃ মনের অস্বাভাবিকতার দিক দিয়ে কিছুটা ঠিক্, কিন্তু অনেকটাই মনের স্বাভাবিকতার দিক্ দিয়ে ভুল এবং মারাত্মক ভাবে ভুল। যৌনকাম যদি ঐ রকম physiological urge-মাত্র হ'ত তবে সহজেই সামান্যতেই তার প্রয়োজনমত উপশম হ'ত। কিন্তু একটা বিরাট ও গভীর psychological (spiritual-এর কথা বাদ দিয়েও) ব্যাপারও এখানে জড়িত রয়েছে সে কথা পূর্ব্বেই ব'লেছি। এজন্যে এর তৃপ্তিতেও তৃপ্তি ঘটেনা, শত রকমের মিলনের প্রচেষ্টার মধ্যেও একটা ব্যর্থ কিছু না-পাওয়ার ভাব ভিতরে থেকে যায়। এই সোজা কথাটা ধামা-চাপা দিয়ে চলা একটা 'unscientific' চরম অজ্ঞতা নয় কি? Consciously বা unconsciously

চেতনার গভীরে এই ব্যর্থতার আগুন জ্বলতেই থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষিপ্তভাবে বাড়তে থাকে। এই কথাটাই কয়েক হাজার বছর আগে সত্যজীবন-বিজ্ঞানী ভারতের ঋষিরা ব'লেছিলেন—

'ন জাতু কামাঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥'

সুতরাং tension-নিবৃত্তি একমাত্র স্বাভাবিক urge-এর ক্ষেত্রেই really হ'তে পারে, এবং এখানে 'স্বাভাবিক' মানেই 'সংযমমুখী, নিয়ন্ত্রিত'। আর abnormal mental urge অবশ্য থাকতে পারে, আর তার কতকটা বিকৃত expression-ও হ'তে পারে, তাতে কিছুটা 'relief'-ও হ'তে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি এই tension-নিবৃত্তি একটা negative লাভ মাত্র, positive লাভ এতে কিছুই নেই। সুতরাং repression-এর ধূয়া তুলে এ বিপজ্জনক ভুল যেন করা না হয়। এসব ক্ষেত্রে কতকটা psychiatric ভাবে চ'লতে গেলেও সঙ্গে-সঙ্গে নিজের বিবেক-মত (যাঁরা যতটা প্রকৃতিস্থ) আত্ম-সংযমের চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হয়। এই ভাবেই মানসিক-স্নায়বিক বিকারও শীঘ্র ও সুনিশ্চিত-ভাবে সারতে থাকে। মনে রাখতে হবে, প্রায় সব মানুষই কোনও-না-কোনও আকারে মানসিক-স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত, আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও।

সমস্ত ব্যাপারটার কিছু বিশদ আলোচনা গ্রন্থমধ্যেও পাওয়া যাবে (দ্বিতীয় অধ্যায় ও ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ দেহমনের বাইরে এ-সংযম কী কাজে লাগতে পারে ?

উঃ আধ্যাত্মিক জীবনের বিরাট কাজের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, গৃহনীতি-সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানের জীবনেও এর প্রয়োজন ও সার্থকতা অত্যন্ত বেশী। কারণ, কাম শুধু যৌনকাম নয়, ধনকাম ও প্রভুত্বকামও বটে এবং তিনটির কেন্দ্রে যৌনকাম। সুতরাং জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংযম-নিয়ন্ত্রণের একান্তই প্রয়োজন রয়েছে। গ্রন্থমধ্যে নানাস্থানে এর আলোচনা রয়েছে। এ এক মানবিক Super-Technology-র ব্যাপার। আর নিছক Sex-life-এর দিকে দেখলেও বিপুল বিভ্রান্তি, ব্যর্থতা, লজ্জা, পরাজয়ের গ্লানি, মনস্তাপ ও মনোবিকারই হ'চ্ছে এর পরিণতি। আমেরিকার psychiatrist ডাক্তারেরাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এমনকি Hollywood-এর বহু অভিনেতা- অভিনেত্রীদের জীবন থেকেই (S. L. Mc. Millen, M. D.-এর একটি আধুনিক রোগচিকিৎসার 'ধর্ম্মীয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। বিবাহিত ব্যক্তি ও অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের অজস্র ব্যর্থতা ও ব্যাধির কথা ত আছেই।

প্রঃ যৌনসংযম কি জীবনবিরোধিতা নয় ? Repres-

sion-এ কি ক্ষতি হয় না?

উঃ যৌনসংযম বা কোনও সংযমই negative কিছু নয়, কিন্তু মধ্যযুগের 'ধর্ম্মীয়' মামুলী নীতিকথার জন্যে ঐরকম মনে হয়, কাজও হয় না। সংযমের পিছনে একটা নূতন Philosophy of Life-ও আজ আসছে, তখন একে highly positive ও 'scientific' ব'লে বোঝা যাবে এবং তা ব্যাপক successful-ও হবে। (গ্রন্থমধ্যে সংযমতত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪৪৬-৫০ ; ৫৯৪-৬৪০)। আর repression-এর কারণ যে শুধু বাইরে নয়, নিজের স্বভাব বা disposition-এর মধ্যে এ ফ্রয়েডকেও স্বীকার করতে হয়েছে (পৃঃ ৫৮-৬০ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ কবিরা, এমনকি রবীন্দ্রনাথের মত কবিও, নর-নারীর নানা রকমের যৌন-আবেদন, বিশেষে নারী-দেহাশ্রিত স্তনচুম্বনাদির বর্ণনা দিয়েছেন কেন?

উঃ শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, বিশ্বের সর্ব্বকালের সকল শ্রেষ্ঠ কবিই নরনারীর যৌন আকর্ষণের নানা বর্ণনা দিয়েছেন স্বচ্ছন্দভাবে। Goethe, W. B. Yeats, Walt Whitman এঁদের কাব্যে যৌনকামাশ্রিত বর্ণনা বেশ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। বৈদিক যুগ থেকে কালিদাস-ভবভূতি পর্যন্তও এর যথেষ্ট নিদর্শন মেলে, পরবর্ত্তী যুগের কথা বাদই দিলাম।

সাহিত্য জীবনের স্বচ্ছন্দ বর্ণনা। সুতরাং সাহিত্যিকের রসবোধ এর প্রকাশে দ্বিধা করেনা। কিন্তু প্রায়ই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ঠিক্-ঠিক্ কবি-সাহিত্যিকস্বভাব একটা না একটা গভীর জীবনদর্শনকে আশ্রয় ক'রে চলেছে। সেইখানেই ঘ'টে যায় এই যৌনবর্ণনার রূপান্তর। Goethe-র 'Eternal woman that lifts above' যে সাধারণ কামিনীর শক্তির বর্ণনা নয়, এ বেশ বোঝা যায়। রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে এক মহান্ দার্শনিক আদর্শবাদ সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত। এমনকি Kafka, ওমর খৈয়ামেও জীবনদর্শন রয়েছে। Bernard Shaw-এর মত প্রচলিত যৌনসংযম-বিরোধী সাহিত্যিকও ব'লেছেন মানুষকে অতিমানব স্তরে তুলতেই হবে, নচেৎ অসংস্কৃত-স্বভাব (the Yahoo) মানুষের ভোটের উপর নির্ভর ক'রলে গণতন্ত্র wrecked হবেই। আর এজন্যে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্ভট প্রস্তাবও দিয়েছেন—বিবাহের romantic side বন্ধ ক'রে দিয়ে State-breeding-এর ব্যবস্থা করা। (A Revolutionist's Hand-book, Man and Superman, দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক ইত্যাদি কাব্যেরও পশ্চাদ্‌-ভূমি একটা সামাজিক জীবনদর্শন, সেগুলি anti-social কিছু নয়।

প্রঃ সংযম কি যৌবনের ধর্ম্ম ?

উঃ সংযম যৌবনেরই সাধনা, 'যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ'। Aristotle তাঁর তরুণ ছাত্র Alexander-কেই সংযমের জীবনধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে সংযম সমগ্র জীবনেরই ধর্ম্ম। আর সংযমে প্রতিষ্ঠিত মানুষ কখনও প্রচলিত অর্থে 'বৃদ্ধ' হয় না—'Live in the spirit, and thou shalt never grow old'। এই সংযত জীবনের জ্ঞান বা wisdom বেশী ছিল ব'লেই বয়স্কেরা পূর্ব্বে এত পূজ্য হ'তেন। আজ তা' নেই ব'লেই তাঁরা তরুণদেরও শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। আজ বয়স্ক মানে সাধারণতঃ চতুরতায় ও স্বার্থপরতায় 'বিজ্ঞ'। বার্ণার্ড শ' ঠিক্‌ই ব'লেছেন, 'Every man over forty is a scoundrel'।

প্রঃ সাহিত্যে 'অশ্লীল' ব'লে কিছু আছে কি?

উঃ একটু আগেই সাহিত্যে যৌন-বর্ণনার আলোচনা করলাম। একটা জীবনদর্শনের ভিত্তিতে রসবোধ থাকে ব'লে সব সময় একে 'অশ্লীল' বলা যায় না। এমন কি এযুগের পাশ্চাত্য ও এ-দেশীয় সাহিত্যেও যে 'অশ্লীলতা' তার পিছনে একটা নূতন জীবন-দর্শনের উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধান রয়েছে ব'লেই এগুলিকে ঠিক্‌ 'অশ্লীল' বলা যাচ্ছেনা, ব'লে লাভও হ'চ্ছেনা (গ্রন্থমধ্যে আলোচনা, পৃঃ ৪০৯-৩৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু একটা balanced জীবনদর্শন এলে নিছক যৌনকামের বিকৃত বর্ণনার বিশেষ মূল্য থাকবে না,

সাহিত্য জীবনের স্বচ্ছন্দ বর্ণনা। সুতরাং সাহিত্যিকের রসবোধ এর প্রকাশে দ্বিধা করেনা। কিন্তু প্রায়ই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ঠিক্-ঠিক্ কবি-সাহিত্যিকস্বভাব একটা না একটা গভীর জীবনদর্শনকে আশ্রয় ক'রে চলেছে। সেইখানেই ঘ'টে যায় এই যৌনবর্ণনার রূপান্তর। Goethe-র 'Eternal woman that lifts above' যে সাধারণ কামিনীর শক্তির বর্ণনা নয়, এ বেশ বোঝা যায়। রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে এক মহান্ দার্শনিক আদর্শবাদ সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত। এমনকি Kafka, ওমর খৈয়ামেও জীবনদর্শন রয়েছে। Bernard Shaw-এর মত প্রচলিত যৌনসংযম-বিরোধী সাহিত্যিকও ব'লেছেন মানুষকে অতিমানব স্তরে তুলতেই হবে, নচেৎ অসংস্কৃত-স্বভাব (the Yahoo) মানুষের ভোটের উপর নির্ভর ক'রলে গণতন্ত্র wrecked হবেই। আর এজন্যে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্ভট প্রস্তাবও দিয়েছেন—বিবাহের romantic side বন্ধ ক'রে দিয়ে State-breeding-এর ব্যবস্থা করা। (A Revolutionist's Hand-book, Man and Superman, দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক ইত্যাদি কাব্যেরও পশ্চাদ্-ভূমি একটা সামাজিক জীবনদর্শন, সেগুলি anti-social কিছু নয়।

প্রঃ সংযম কি যৌবনের ধর্ম্ম ?

উঃ সংযম যৌবনেরই সাধনা, 'যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ'। Aristotle তাঁর তরুণ ছাত্র Alexander-কেই সংযমের জীবনধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে সংযম সমগ্র জীবনেরই ধর্ম্ম। আর সংযমে প্রতিষ্ঠিত মানুষ কখনও প্রচলিত অর্থে 'বৃদ্ধ' হয় না—'Live in the spirit, and thou shalt never grow old'। এই সংযত জীবনের জ্ঞান বা wisdom বেশী ছিল ব'লেই বয়স্কেরা পূর্ব্বে এত পূজ্য হ'তেন। আজ তা' নেই ব'লেই তাঁরা তরুণদেরও শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। আজ বয়স্ক মানে সাধারণতঃ চতুরতায় ও স্বার্থপরতায় 'বিজ্ঞ'। বার্ণার্ড শ' ঠিকই ব'লেছেন, 'Every man over forty is a scoundrel'।

প্রঃ সাহিত্যে 'অশ্লীল' ব'লে কিছু আছে কি?

উঃ একটু আগেই সাহিত্যে যৌন-বর্ণনার আলোচনা করলাম। একটা জীবনদর্শনের ভিত্তিতে রসবোধ থাকে ব'লে সব সময় একে 'অশ্লীল' বলা যায় না। এমন কি এযুগের পাশ্চাত্য ও এ-দেশীয় সাহিত্যেও যে 'অশ্লীলতা' তার পিছনে একটা নূতন জীবন-দর্শনের উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধান রয়েছে ব'লেই এগুলিকে ঠিক্ 'অশ্লীল' বলা যাচ্ছেনা, ব'লে লাভও হ'চ্ছেনা (গ্রন্থমধ্যে আলোচনা, পৃঃ ৪০৯-৩৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু একটা balanced জীবনদর্শন এলে নিছক যৌনকামের বিকৃত বর্ণনার বিশেষ মূল্য থাকবে না,

সমাজে তা' গৃহীতও হবে না। শ্লীল এবং অশ্লীল আপনা থেকেই আলাদা হ'য়ে যাবে। সে যুগ শীঘ্র আসছে।

প্রঃ ভারতীয় মন্দিরগাত্রে কোথাও কোথাও 'অশ্লীল' কারুকার্য দেখা যায় কেন? প্রাচীন ভারতেও নারীদেহের নিরাবরণতার দিকে ঝোঁক চিত্রশিল্পে ফুটে উঠেছিল কেন?

উঃ এগুলির মধ্যে কোনও সমাজবিরোধী বাহাদুরীর ভাব ছিল না। সমাজজীবন একটা জীবনদর্শনে প্রতিষ্ঠিত ছিল ব'লে যৌন সম্পর্কের রসবোধও তার উপর স্বচ্ছন্দে রূপায়িত হ'তে পেরেছিল। এসব আজ-কালকার 'টপ্‌লেস্' বা 'মিনিস্কার্ট' বা 'নিউডিজ্‌ম্'-এর anti-repression fashion নয়। আর ধর্ম্ম-মন্দিরের গাত্রে যৌনচিত্র ইউরোপেও দেখা যায় নি তা' নয় (হ্যাভলক এলিসের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। তবে ভারতবর্ষে খাজুরাহো এবং পুরীর মন্দিরের মত বেশী case নেই। আর সেখানেও অধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবনরহস্যের চিত্র দেওয়ার ভাব অথবা তান্ত্রিক ইত্যাদি influence থাকতে পারে। ভারতবর্ষ কোনও দিন কামকে তার সমগ্র জীবনদর্শন থেকে বাদ দেয়নি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই তার 'চতুর্ব্বর্গ'। এই গভীর জীবনদর্শনের জন্যেই তান্ত্রিক-বৈষ্ণব-সহজিয়া ইত্যাদি সাধনাতেও যৌনকাম এতটা place

পেয়েছিল যদিও তা' ভারতের সমাজধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-ধর্ম্মের পতনের যুগেই সম্ভব হয়েছিল।

প্রঃ শুধু কামসংযম বা 'ব্রহ্মচর্য' করলেই মানুষের জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য হবে?

উঃ পূর্ব্বেই বলেছি কামসংযম তিন প্রকার, —যৌনকাম, ধনকাম ও জনকাম বা প্রভুত্বকামের সংযম। আর এর মধ্যে মানবিক চরিত্রের সব কিছুই implied আছে তা' ভূমিকায় দেখান হয়েছে। এমনকি আজকালকার mental efficiency, social justice, national ও international virtues-ও এর মধ্যে র'য়েছে (পৃঃ ২৭১, ২৭৬-৭৭ দ্রষ্টব্য)। অর্জ্জুনের চরিত্র এ বিষয়ে খুব interesting হবে (পৃঃ ৩৫৮–৫৯ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ 'জনকাম জিনিষটা কি?

উঃ এটা 'লোককাম'। 'লোক' কথাটির কয়েকটি অর্থ আছে। যথা—'সপ্তলোক' 'স্বর্গলোক' 'মর্ত্ত্যলোক' ইত্যাদি। আবার, মানুষের জগৎ বা জনসাধারণ। যথা—'লোকসংগ্রহ' (গীতা, ৩।২০-২৫ দ্রষ্টব্য)। এই লোককাম বা জনকাম আজকালকার অন্যায় জন-প্রিয়তা বা popularity-র ইচ্ছা অথবা প্রভুত্বের আকাঙ্খারূপেও দেখা দেয়। প্রথমটাতে masochistic, দ্বিতীয়টাতে sadistic ভাবের প্রাধান্য। খুব lower level-এ অর্থাৎ দৈহিক স্তরে এটা

heterosexuality-র মত homosexuality-রূপেও দেখা দিতে পারে।

প্রঃ ধনকাম, জনকাম, যৌনকাম বাদ দেওয়া মানে তা'হলে ধনের উৎপাদন ও ভোগ, popularity ও কর্ত্তৃত্ব-শক্তি, সংসার ও সন্তান-সৃজন এসব বাদ দেওয়া ?

উঃ মোটেই তা' নয়। প্রচীন ভারতের সমাজ ও জাতীয়-জীবন তার প্রমাণ (পৃঃ ৭৫-৭৮, ১১৬-১৮, ১৮৫-২০১ ২৬৩-৬৪, ২৭২ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ কিন্তু প্রাচীন ভারতে capitalism, exploitation, সাধারণ মানুষের অমর্যাদা এই সব প্রবল ছিল না কি ?

উঃ মোটেই না, বরং সেযুগের পরিবেশ মত হ'লেও এর উল্টো ভাবই প্রবল ছিল এবং মানবিকতার দিক দিয়ে তা' ছিল আন্তরিক ও সামাজিক একটা জীবনসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত (পৃঃ ৬৭-৯৩, ১১২-১৮, ১৮২-২০১ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ আচ্ছা, ধর্ম্মীয় নীতি দিয়ে মানুষের মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তারপর এই সভ্যতাকে রক্ষা করা, এ কি একটা feasible proposition ? তার চেয়ে বাইরের রাজনীতি - অর্থনীতি - বিজ্ঞান - শরীরবিদ্যা ইত্যাদির দিক্ থেকেই সব কিছু control করাই ঠিক্ নয় কি ? আজ হয়ত ব্যর্থতা হ'চ্ছে, পরে ত

সার্থকতা আসতে পারে ?

উঃ মধ্যযুগের ব্যক্তিগত, ভাবপ্রবণ বা গুহ্যসাধনাপ্রবণ ধর্মীয়নীতির দ্বারা এযুগে বিশেষ কিছু করা যাবে না একথা ঠিক্। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে বাইরের একটা বাস্তব জীবনধর্মের সমাজ-সাধনা সবই করতে পারে। এই ধর্মের কথাই আমরা গ্রন্থমধ্যে ব'লেছি। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, শরীর-বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান সব কিছুকেই ক্রমশঃ এই বৃহত্তর যুগধর্মের আওতায় এনে সংস্কার ক'রে কার্যকরী ক'রে নিতে পারা যাবে। আর আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানাদির চেষ্টা ক্রমাগত ব্যর্থ হ'চ্ছে দেখেও যদি সুদূর ভবিষ্যতে আমরা সার্থকতার আশা নিয়ে চলতে পারি, তবে এই সমন্বিত জীবনধর্ম্মের ভবিষ্যৎ সার্থকতার আশা নিয়ে চলা যাবে না কেন ? ধর্ম্মের যে অধোগতি ও ব্যর্থতা মানুষ দেখেছে বলা হ'য় তা মধ্যযুগীয় ধর্ম্ম, ভারতের শাশ্বত ধর্ম্মের নবরূপায়ণ নয়। এর সার্থকতা ভাবী জগতে অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য একথা ঠিক যে এযুগে নিছক ব্যক্তিগত বা মনোগত ভাব-সংশোধনের উপর বেশী নির্ভর করা যাবে না। এযুগের পরিবেশ প্রাচীন যুগ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এযুগ যন্ত্রযুগ, শিল্পযুগ, বিজ্ঞানযুগ। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞাননীতির সামাজিক প্রয়োগ ছাড়া

এযুগের মানুষকে ঠিক্‌পথে রাখা যাবে না। কিন্তু এর সঙ্গে আরও বড় সত্য হ'চ্ছে মানসিক শুদ্ধি-সংশোধনের উপর সব কিছু হ'তে হবে।

প্রঃ এই ব্যাপক যন্ত্রবাদ, বস্তুবাদ, নাস্তিবাদের যুগে ধর্ম্ম-সাধনার sanction কোথায়?

উঃ ভারতীয় 'শাশ্বত ধর্ম্ম' সেই sanction দিতে পারে, কারণ তা পরমশূন্যের মহাসত্যে, পরমবস্তুর মহা-যান্ত্রিকতায় প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থান্তরে আলোচ্য (ভূমিকা ও ষষ্ঠ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ এই speed. haste, competition-এর যুগে কি শান্ত-সমাহিত ধর্ম্মসাধনা সম্ভব?

উঃ নূতন বাস্তব জীবনধর্মের সাধনার বরং এগুলি অনু-কূল। অনাসক্ত কর্ম্মশক্তিকে এরা জাগ্রত করে ও তুলে ধরে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জীবন-সংগ্রামের বর্ণনা প্রচুর।

প্রঃ এ যুগের বিরাট population-সমস্যার সমাধান birth-control ছাড়া কি সম্ভব?

উঃ হয়ত নয়, মনে হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে self-control বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আসে কেন? এটা 'আপদ্ধর্ম্ম' মাত্র (পৃঃ ১৪৩, ১৬১, ৫৮৪-৮৭ দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান Roman Catholic ধর্ম্মগুরু একটা সমাধানের অভাবে একে সরাসরি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ বলতে বাধ্য হ'য়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় নীরব।

শাশ্বত ধর্ম্মের বাস্তববাদ এর একটা সমাধান দিতে পারে। কিন্তু সমস্যাটীকে আর এক দিক্ দিয়েও দেখা যায়। মানুষের abnormality যে rate-এ বেড়ে যাচ্ছে তাতে অনতিদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক ও বেপরোয়া জন্মনিরোধ-হত্যা আত্মহত্যা-অকর্ম্মণ্যহত্যা-ভ্রূণহত্যা -পিতৃহত্যা-ভ্রাতৃহত্যা - বন্ধুহত্যা-স্বামীহত্যা- স্ত্রী হত্যা ইত্যাদি এবং ক্রমাগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সকলের উপরে হঠাৎ আন্তর্জ্জাতিক আণবিক মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটা painful balance restored হওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং abnormality-control-এ মনোযোগ দেবারও সময় এসেছে।

প্রঃ মেয়েদেরও সংযম-ব্রহ্মচর্য আছে কি ?

উঃ অবশ্যই আছে। গ্রন্থমধ্যে এর physiological দিক্‌টাও কিছু আলোচনা করা হ'য়েছে (পৃঃ ৫২৪-২৫ দ্রষ্টব্য)। আর সংযম-ব্রহ্মচর্যের আনুষঙ্গিক যে সব চারিত্রিক গুণের কথা আগে ব'লেছি তা মেয়েদের দ্বারাও যথেষ্ট অনুশীলিত হ'তে পারে।

প্রঃ মেয়েদের সতীত্বের উপর এত জোর দেওয়া হ'ত বা এখনও হয় কেন ?

উঃ একভাবে দেখলে পুরুষের ব্রহ্মচর্যের অনুকল্প হ'চ্ছে মেয়েদের সতীত্বের নিষ্ঠা। অবশ্য পুরুষেরও সংযম-নিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়নি তা' নয় (পৃঃ ১৬০

দ্রষ্টব্য)। তবে জাগতিক স্নেহভালবাসার রাজ্যে নারীরা অধীশ্বরী শক্তি, বৃহদারণ্যকেও সেকথা আছে। এক্ষেত্রে মেয়েদের একটা স্বভাব-গভীরতা রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে নিষ্ঠাশক্তি নারীত্বের মূল্য ও মর্যাদারও ভিত্তি। অবশ্য এর মানে এই নয় যে নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নেই। রামায়ণ মহাভারতের যুগে সেরূপ ছিল না। মধ্যযুগেই নারীর দৈহিক **chastity** ও পুরুষাধীনতার বাড়াবাড়ি দেখা দেয়, শুধু ভারতে নয়, সর্ব্বদেশেই। তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এখন দেখা দিয়েছে (পৃঃ ৩৯৬, ৫৪২, ৫৮৯ দ্রষ্টব্য)। মেয়েরা ঘরে-বাইরে তাদের ব্যক্তিত্বের দাম আজ সুদে-মূলে আদায় ক'রে নিচ্ছে। আর স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একমনে ঘর করলেই সতী হওয়া যায় তা'ও নয় (পৃঃ ১৭৩-৭৪ দ্রষ্টব্য)। নারীর দৈহিক **chastity**-র বিশেষ প্রয়োজনীয়তার অবশ্য কিছু **psycho-physiological** কারণও দেখান যায়।

প্রঃ স্ত্রীপুরুষের free মেলামেশা কি ক্ষতিকর ?

উঃ **Promiscuous relation** নিশ্চয় ক্ষতিকর। তা'তে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই **personality-force** থাকলেও **humanity-force** থাকে না। আর অকারণ হালকা মেলামেশাও অজ্ঞাতসারে ক্ষতিকর। 'দ্রব্যগুণ' কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। স্ত্রীপশুযূথের মধ্যে কোনও উত্তেজক কারণ না থাকলেও পুংপশুর মাত্র

presence-ই ovary-development stimulate করে দেখা গেছে, এই বৈজ্ঞানিক finding-টী বেশ significant (A Text Book of Physiology Ed. Bykov, p : 450 দ্রষ্টব্য)। ভারতীয় সংযম-বিজ্ঞান মেলামেশাকেও মৈথুন ব'লে গণ্য করেছে।

প্রঃ যৌনসংযমে কি scientific চিন্তা-গবেষণার scope নেই ?

উঃ কতকটা অবশ্যই আছে এবং ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তবুও সংযমসাধনা হ'চ্ছে মূলতঃ ও প্রধানতঃ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা সংকল্পশক্তির ব্যাপার। Cerebral cortex sex-stimulation-এ অনেকটা সক্রিয়। Pituitary সব কিছু control করে, কিন্তু pituitary আবার, ইচ্ছা-আবেগশক্তির কেন্দ্র, hypothalamus-এর প্রভাবাধীন। যাই হোক্, cortical disinhibition করিয়ে যখন cattle-এর sex-activity অনেক বাড়ান গেছে, তখন proper disinhibition-এর দ্বারা একে অনেক কমানও যেতে পারে। আর sexual ব্যাপারে 'ecologo-sexual' বা পারিবেশিক যৌন প্রভাবের conditioning কাজে লাগতে পারে, অবশ্য 'পারিবেশিক অর্থে 'সাংস্কৃতিক' ব্যাপারকেও বুঝতে হবে। Sex-function-এর সঙ্গে চোখের retina-র connection রয়েছে। আরও এই রকম কত কি ভাববার

দেয়। ফ্রয়েড ইত্যাদির মনীষা এপথে অনেকটা সহায়তা করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা একটা negative লাভ, positive কিছু নয়। ফ্রয়েড নিজেও স্বীকার ক'রেছেন তাঁর method-এ কিছু মানসিক integration লাভ হয় বটে, কিন্তু মানুষের চরিত্রকে মহৎ করতে পারে না ('অমৃতের পথে' পৃঃ ৫৪৯-৫০ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ কমিউনিজ্‌ম আজ নূতন বৈজ্ঞানিক সমাজ গড়তে চলেছে, সুতরাং আজ আবার এসব সংযমের কথা কেন?

উঃ এসব সংযমের কথা আমরা কোনও মধ্যযুগীয় ধর্ম্মের জের টেনে বলছিনা। আমরা একটা নূতন জীবন-দর্শনের কথা বলছি যা' বাস্তব ও আদর্শবাদী, ভারতের অধুনা-লুপ্ত শাশ্বত ধর্ম্মের তা' অঙ্গীভূত। রাশিয়ায় কমিউনিজ্‌ম react ক'রেছিল প্রাণহীন মধ্যযুগীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। আর এক কথা, কমিউনিজ্‌মের বাস্তব রূপদাতা Lenin যৌন-অসংযম, এমন কি love-making-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ('অমৃতের পথে', পৃঃ ৬৫০ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ Birth-control, abortion ইত্যাদির ব্যাপক স্বীকৃতির যুগে সংযম-ব্রহ্মচর্য খাপ খায় কি?

উঃ যুগটা যদি নেহাৎ ঐরকম কিছুই হত তাহ'লে বলার-করার কিছু থাকত না। কিন্তু এ যুগ মানুষের সভ্যতায়

একটা crisis-এর যুগ, একটা নূতন centre of gravity খুঁজছে, নচেৎ এ দাঁড়াতেই পারে না। একটা নূতন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক-বৈজ্ঞানিক দর্শনের আজ একান্ত প্রয়োজন। ভারতের শাশ্বত ধর্ম্মের সেই বাস্তব দৃষ্টি থেকেই আমরা এই বিভ্রান্ত যুগে সংযমব্রহ্মচর্যের কথা বলছি। এই দৃষ্টিতে birth-control, abortion-এর যুগেই ঐ সংযম-ব্রহ্মচর্যের একান্ত প্রয়োজন। (গ্রন্থমধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে, পৃঃ ১৪৩, ৫৮৪-৮৬)। আর family-র size ছোট করলেও পরিবারবর্গের মন ছোট না হয় দেখতে হবে, নচেৎ 'happy family' অসম্ভব। Birth-control, abortion ইত্যাদির পিছনে কল্যাণবুদ্ধি থাকা দরকার, স্বেচ্ছাচারী বৃত্তি নয়। Life Force আজ তমস্তরে নেমে এক নূতন আদিম প্রকাশের পথ খুঁজছে ব'লে এই সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই নূতন প্রাণের প্রকাশকেও ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উঠতে হবে। সংযমব্রহ্মচর্যের জাতীয় বা আন্তর্জ্জাতীয় নীতি ও সাধনাই ভবিষ্যতে সেই ঊর্দ্ধগতির উপায় হবে। সেজন্য এই আদর্শ ও সাধনাকে আজ তুলে ধ'রে রাখতে হবে। এটা একটি বিরাট মানবিক দায়িত্ব—ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার রক্ষার জন্যে। এর জন্যে আদর্শবাদী, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত মানুষ ও বিশেষে তরুণদের দ্বারা একটা Save Civilization Move-

ment হওয়া দরকার। ব্যাপক birth-control ও abortion-এর ফলে 'sanctity of life'-এর বোধ নষ্ট হ'তে পারে, সুতরাং তার bad effect counteract করার জন্যেও এরূপ আন্দোলন চলা দরকার।

প্রঃ নরনারীর ভালবাসায় কি ভাল কিছুই নেই ?

উঃ অবশ্যই আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। একে ধ'রেই সমাজের রসমাধুর্যময় জীবন। পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগ্নী এসবই ত ভালবাসার রূপ। কিন্তু সমাজজীবনের এই অমৃতকে যৌন-জীবনের বিষ-কটাহে ঢাললে একে বিষে পরিণত করা হয়। সুতরাং সেই মারাত্মক সম্ভাবনার সম্বন্ধে সব সময়েই constant vigilance দরকার। এর সঙ্গে সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক জীবন এমন connected যে স. কিছুকেই তা' বিষিয়ে দেয় ('অমৃতের পথে', পৃঃ ১০০-৩৫ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ নরনারীর অসংযত যৌন আকর্ষণও একটা গভীর ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। একে resist করা বা এর সঙ্গে fight ক'রে চলা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ? কোন্ সূত্রে কোথায় আকর্ষণ হয় তা'ও বলা যায় না। আর বৈধ সম্পর্কগুলি ছাড়া অবৈধ প্রণয়সম্পর্কগুলোর মধ্যে কি রসমাধুর্য নেই ? বরং তা'তেই তো বেশী আছে বলা যায়, বৈষ্ণব শাস্ত্র তার প্রমাণ। আর রবীন্দ্রনাথের মত বড় ও মহান্ কবি-সাহিত্যিকেরাও

ত এর মূল্য অস্বীকার করেন নি।

উঃ ঐ যৌন-আকর্ষণ গভীর ও স্বাভাবিক মোটেই নয়, তবে আকস্মিক ও প্রাকৃতিক অবশ্যই বটে। ঝড়-তুফান যেমন আসে ও যায় এও তেমনি। তবুও ঝড়-তুফানকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগই বলি। সুতরাং এ থেকে সাবধান থাকারই প্রশ্ন এবং সেই হিসাবেই resist বা fight ক'রে যাওয়ার কথা ওঠে। যুদ্ধের সময় যেমন যোদ্ধা বা নাগরিক সকলকেই military বা civil defence-এর নানারকম উপায় অবলম্বন করতে হয় এবং তার training নিতে হয়, জীবনের শান্তি-শক্তি-সুখধ্বংসকারী অস্বাভাবিক কামের আক্রমণের বিরুদ্ধেও সে রকম আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করতে হয় এবং তার অভ্যাস করতে হয়। এরূপ কামাকর্ষণ ও কামভালবাসা কোথায় কখন হয়, এরূপ কিছুও নয়। মূলতঃ scientific determinism-এর ব্যাপার, অর্থাৎ কতকগুলো বিশেষ complex বা বিশেষ-রকমের সংস্কার যেখানে যেমন নিজেদের অনুকূল পরিবেশ পায় সেইখানেই সেইরকম কামাকর্ষণ বা কামভালবাসার সৃষ্টি করে। আর অবৈধ প্রণয়ে একটা তীব্র রসমাধুর্য আছে একথা ঠিক, শ্রীচৈতন্যদেবের 'যঃ কৌমারহরঃ' গানই তার প্রমাণ। কিন্তু বৈষ্ণবসাধনায় এটা প্রতীকমূলক বা symbolic, এই 'অনিত্যমসুখম্' জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়ার

তীব্র আবেগের symbol (গ্রন্থমধ্যে এর আলোচনা করা হয়েছে, পৃঃ ২৯১-৯৩)। সুতরাং এ থেকে অবৈধ প্রণয়সম্পর্কগুলোর রসমাধুর্য্যের সত্যতা প্রমাণ হয় না। আর সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি ব'লে জীবনের কোনও আবেগ-উচ্ছ্বাসকেই সাহিত্য অস্বীকার করে না, স্বচ্ছন্দ expression দেয়। কিন্তু জীবনে এসবকে moral standard ভেবে নেওয়া ভয়ানক ভুল। সাহিত্য প্রতিচ্ছবি, জীবন নয়। জীবনে সাহিত্যরস ছাড়া আরও অনেক রস-সৌন্দর্য-মাধুর্য্যের উৎস আছে। জীবনের কাজকর্ম্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, সাধনা-মুক্তির মধ্যেও প্রচুর রস-সৌন্দর্য-মাধুর্য আছে। সাহিত্যে আমরা morality চাইনা, অথচ সাহিত্যকে এতখানি moral value দিয়ে ফেলি, এ এক বুদ্ধি-বিভ্রম। আর রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ কবিরা এক-এক গভীর জীবনদর্শনেরও ঋষি, একথা ভুলে গেলে চলবে না।

প্রঃ এসব যৌনপ্রণয়ের ভুলচুকের পর ত' অধিকাংশই একটা বৈধ-বিবাহিত জীবন যাপন করেন, তবে এত ভাবার কি আছে ?

উঃ ভাবার এই আছে যে ঐ 'বৈধ-বিবাহিত' জীবনও সমানে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ভুল সংযমশিক্ষাহীন, সংযমের জীবনদর্শনহীন কামসর্ব্বস্ব জীবনের ভুল। এর সঙ্গে ধনকাম ও প্রভুত্বকামের মিথ্যাও সমানে মিশে

থাকে। এই কাম ব্যর্থ ও বিষাক্ত, এবং সমগ্র গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বকেও ব্যর্থ ও বিষায়িত করে। সুতরাং যৌনপ্রণয় নিয়ে মূল সমস্যা নয়, যৌনকামের ভ্রান্ত মূল্যবোধ নিয়েই সমস্যা—কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত জীবনে।

প্রঃ এই মূল্যবোধ ঠিক্ হবে কি ক'রে?

উঃ এর জন্যে এক নূতন জীবনদর্শন দরকার, মামুলী মধ্যযুগীয় নীতিকথার সংযমপালন বা ব্রহ্মচর্যের কথা ব'লে কিছু হবে না। সেই জীবনদর্শনের আভাস এই গ্রন্থে কিছু দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

প্রঃ সে যুগের ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস এসব কি এযুগে সম্ভব?

উঃ ঐ scheme-এ বা ঐ pattern-এ সম্ভব নয়, কিন্তু তার মূল spirit নিয়ে চলা নিশ্চয় সম্ভব ও অবশ্য প্রয়োজন। তার আভাসও আমরা গ্রন্থে দিয়েছি। তার ভিত্তি হ'চ্ছে এক নূতন সমাজধর্ম্মের জীবনদর্শন যা' বাস্তব জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আধুনিক কালের সর্ব্বদেশের সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব। পুরাতন কোনও scheme-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

প্রঃ তবুও মনে হয়, এই রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের যুগে মানুষের চেতনা যখন নানাদিকে বিস্তার ও সাফল্য লাভ করছে, তখন দৈহিক কামসংযমের ক্ষুদ্র ব্যাপারে মনকে জড়িত ক'রে রাখা কোনও প্রসারশীল

মনোভাব নয়।

উঃ দৈহিক ব্যাপার হিসাবেই সংযম-ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলা হ'চ্ছেনা। চেতনার সত্যিকার বিস্তার ও সার্থকতা যে পথে হ'তে পারে সেই পথের কথাই বলা হ'চ্ছে।

প্রঃ অনেকে বলেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হাঁচি হাইতোলা-excretion ইত্যাদির মত যৌনকাম একটা physiological urge, এই tension-এর একটা relief দরকার, নচেৎ শরীর-মন খারাপ হ'তে পারে, একথা কি ঠিক্?

উঃ মনের অস্বাভাবিকতার দিক দিয়ে কিছুটা ঠিক্, কিন্তু অনেকটাই মনের স্বাভাবিকতার দিক্ দিয়ে ভুল এবং মারাত্মক ভাবে ভুল। যৌনকাম যদি ঐ রকম physiological urge-মাত্র হ'ত তবে সহজেই সামান্যতেই তার প্রয়োজনমত উপশম হ'ত। কিন্তু একটা বিরাট ও গভীর psychological (spiritual-এর কথা বাদ দিয়েও) ব্যাপারও এখানে জড়িত রয়েছে সে কথা পূর্ব্বেই ব'লেছি। এজন্যে এর তৃপ্তিতেও তৃপ্তি ঘটেনা, শত রকমের মিলনের প্রচেষ্টার মধ্যেও একটা ব্যর্থ কিছু না-পাওয়ার ভাব ভিতরে থেকে যায়। এই সোজা কথাটা ধামা-চাপা দিয়ে চলা একটা 'unscientific' চরম অজ্ঞতা নয় কি? Consciously বা unconsciously

চেতনার গভীরে এই ব্যর্থতার আগুন জ্বলতেই থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষিপ্রভাবে বাড়তে থাকে। এই কথাটাই কয়েক হাজার বছর আগে সত্যজীবন-বিজ্ঞানী ভারতের ঋষিরা ব'লেছিলেন—

'ন জাতু কামাঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥'

সুতরাং tension-নিবৃত্তি একমাত্র স্বাভাবিক urge-এর ক্ষেত্রেই really হ'তে পারে, এবং এখানে 'স্বাভাবিক' মানেই 'সংযমমুখী, নিয়ন্ত্রিত'। আর abnormal mental urge অবশ্য থাকতে পারে, আর তার কতকটা বিকৃত expression-ও হ'তে পারে, তাতে কিছুটা 'relief'-ও হ'তে পারে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি এই tension-নিবৃত্তি একটা negative লাভ মাত্র, positive লাভ এতে কিছুই নেই। সুতরাং repression-এর ধূয়া তুলে এ বিপজ্জনক ভুল যেন করা না হয়। এসব ক্ষেত্রে কতকটা psychiatric ভাবে চ'লতে গেলেও সঙ্গে-সঙ্গে নিজের বিবেক-মত (যাঁরা যতটা প্রকৃতিস্থ) আত্ম-সংযমের চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হয়। এই ভাবেই মানসিক-স্নায়বিক বিকারও শীঘ্র ও সুনিশ্চিত-ভাবে সারতে থাকে। মনে রাখতে হবে, প্রায় সব মানুষই কোনও-না-কোনও আকারে মানসিক-স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত, আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও।

সাহিত্য জীবনের স্বচ্ছন্দ বর্ণনা। সুতরাং সাহিত্যিকের রসবোধ এর প্রকাশে দ্বিধা করেনা। কিন্তু প্রায়ই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ঠিক্-ঠিক্ কবি-সাহিত্যিকস্বভাব একটা না একটা গভীর জীবনদর্শনকে আশ্রয় ক'রে চলেছে। সেইখানেই ঘ'টে যায় এই যৌনবর্ণনার রূপান্তর। Goethe-র 'Eternal woman that lifts above' যে সাধারণ কামিনীর শক্তির বর্ণনা নয়, এ বেশ বোঝা যায়। রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যে এক মহান্ দার্শনিক আদর্শবাদ সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত। এমনকি Kafka, ওমর খৈয়ামেও জীবনদর্শন রয়েছে। Bernard Shaw-এর মত প্রচলিত যৌনসংযম-বিরোধী সাহিত্যিকও ব'লেছেন মানুষকে অতিমানব স্তরে তুলতেই হবে, নচেৎ অসংস্কৃত-স্বভাব (the Yahoo) মানুষের ভোটের উপর নির্ভর ক'রলে গণতন্ত্র wrecked হবেই। আর এজন্যে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্ভট প্রস্তাবও দিয়েছেন—বিবাহের romantic side বন্ধ ক'রে দিয়ে State-breeding-এর ব্যবস্থা করা। (A Revolutionist's Handbook, Man and Superman, দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক ইত্যাদি কাব্যেরও পশ্চাদ্-ভূমি একটা সামাজিক জীবনদর্শন, সেগুলি anti-social কিছু নয়।

প্রঃ সংযম কি যৌবনের ধর্ম্ম?

উঃ সংযম যৌবনেরই সাধনা, 'যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ'। Aristotle তাঁর তরুণ ছাত্র Alexander-কেই সংযমের জীবনধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে সংযম সমগ্র জীবনেরই ধর্ম্ম। আর সংযমে প্রতিষ্ঠিত মানুষ কথনও প্রচলিত অর্থে 'বৃদ্ধ' হয় না—'Live in the spirit, and thou shalt never grow old'। এই সংযত জীবনের জ্ঞান বা wisdom বেশী ছিল ব'লেই বয়স্কেরা পূর্ব্বে এত পূজ্য হ'তেন। আজ তা' নেই ব'লেই তাঁরা তরুণদেরও শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। আজ বয়স্ক মানে সাধারণতঃ চতুরতায় ও স্বার্থপরতায় 'বিজ্ঞ'। বার্ণার্ড শ' ঠিক্‌ই ব'লেছেন, 'Every man over forty is a scoundrel'।

প্রঃ সাহিত্যে 'অশ্লীল' ব'লে কিছু আছে কি?

উঃ একটু আগেই সাহিত্যে যৌন-বর্ণনার আলোচনা করলাম। একটা জীবনদর্শনের ভিত্তিতে রসবোধ থাকে ব'লে সব সময় একে 'অশ্লীল' বলা যায় না। এমন কি এযুগের পাশ্চাত্য ও এ-দেশীয় সাহিত্যেও যে 'অশ্লীলতা' তার পিছনে একটা নূতন জীবন-দর্শনের উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধান রয়েছে ব'লেই এগুলিকে ঠিক্ 'অশ্লীল' বলা যাচ্ছেনা, ব'লে লাভও হ'চ্ছেনা (গ্রন্থমধ্যে আলোচনা, পৃঃ ৪০৯-৩৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু একটা balanced জীবনদর্শন এলে নিছক যৌনকামের বিকৃত বর্ণনার বিশেষ মূল্য থাকবে না,

সমাজে তা' গৃহীতও হবে না। শ্লীল এবং অশ্লীল আপনা থেকেই আলাদা হ'য়ে যাবে। সে যুগ শীঘ্র আসছে।

প্রঃ ভারতীয় মন্দিরগাত্রে কোথাও কোথাও 'অশ্লীল' কারুকার্য দেখা যায় কেন? প্রাচীন ভারতেও নারীদেহের নিরাবরণতার দিকে ঝোঁক চিত্রশিল্পে ফুটে উঠেছিল কেন?

উঃ এগুলির মধ্যে কোনও সমাজবিরোধী বাহাদুরীর ভাব ছিল না। সমাজজীবন একটা জীবনদর্শনে প্রতিষ্ঠিত ছিল ব'লে যৌন সম্পর্কের রসবোধও তার উপর স্বচ্ছন্দে রূপায়িত হ'তে পেরেছিল। এসব আজকালকার 'টপ্‌লেস্' বা 'মিনিস্কার্ট' বা 'নিউডিজ্‌ম্'-এর anti-repression fashion নয়। আর ধর্ম্মমন্দিরের গাত্রে যৌনচিত্র ইউরোপেও দেখা যায় নি তা' নয় (হ্যাভলক এলিসের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। তবে ভারতবর্ষে খাজুরাহো এবং পুরীর মন্দিরের মত বেশী case নেই। আর সেখানেও অধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবনরহস্যের চিত্র দেওয়ার ভাব অথবা তান্ত্রিক ইত্যাদি influence থাকতে পারে। ভারতবর্ষ কোনও দিন কামকে তার সমগ্র জীবনদর্শন থেকে বাদ দেয়নি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই তার 'চতুর্ব্বর্গ'। এই গভীর জীবনদর্শনের জন্যেই তান্ত্রিক-বৈষ্ণব-সহজিয়া ইত্যাদি সাধনাতেও যৌনকাম এতটা place

পেয়েছিল যদিও তা' ভারতের সমাজধর্ম্ম ও রাষ্ট্র-ধর্ম্মের পতনের যুগেই সম্ভব হয়েছিল।

প্রঃ শুধু কামসংযম বা 'ব্রহ্মচর্য' করলেই মানুষের জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য হবে?

উঃ পূর্ব্বেই বলেছি কামসংযম তিন প্রকার, —যৌনকাম, ধনকাম ও জনকাম বা প্রভুত্বকামের সংযম। আর এর মধ্যে মানবিক চরিত্রের সব কিছুই implied আছে তা' ভূমিকায় দেখান হয়েছে। এমনকি আজকালকার mental efficiency, social justice, national ও international virtues-ও এর মধ্যে র'য়েছে (পৃঃ ২৭১, ২৭৬-৭৭ দ্রষ্টব্য)। অর্জ্জুনের চরিত্র এ বিষয়ে খুব interesting হবে (পৃঃ ৩৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ 'জনকাম জিনিষটা কি?

উঃ এটা 'লোককাম'। 'লোক' কথাটির কয়েকটি অর্থ আছে। যথা—'সপ্তলোক' 'স্বর্গলোক' 'মর্ত্ত্যলোক' ইত্যাদি। আবার, মানুষের জগৎ বা জনসাধারণ। যথা—'লোকসংগ্রহ' (গীতা, ৩। ২০-২৫ দ্রষ্টব্য)। এই লোককাম বা জনকাম আজকালকার অন্যায় জন-প্রিয়তা বা popularity-র ইচ্ছা অথবা প্রভুত্বের আকাঙ্খারূপেও দেখা দেয়। প্রথমটাতে masochistic, দ্বিতীয়টাতে sadistic ভাবের প্রাধান্য। খুব lower level-এ অর্থাৎ দৈহিক স্তরে এটা

heterosexuality-র মত homosexuality-রূপেও দেখা দিতে পারে।

প্রঃ ধনকাম, জনকাম, যৌনকাম বাদ দেওয়া মানে তা'হলে ধনের উৎপাদন ও ভোগ, popularity ও কর্তৃত্ব-শক্তি, সংসার ও সন্তান-সৃজন এসব বাদ দেওয়া ?

উঃ মোটেই তা' নয়। প্রচীন ভারতের সমাজ ও জাতীয়-জীবন তার প্রমাণ (পৃঃ ৭৫-৭৮, ১১৬-১৮, ১৮৫-২০১ ২৬৩-৬৪, ২৭২ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ কিন্তু প্রাচীন ভারতে capitalism, exploitation, সাধারণ মানুষের অমর্যাদা এই সব প্রবল ছিল না কি ?

উঃ মোটেই না, বরং সেযুগের পরিবেশ মত হ'লেও এর উল্টো ভাবই প্রবল ছিল এবং মানবিকতার দিক দিয়ে তা' ছিল আন্তরিক ও সামাজিক একটা জীবনসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত (পৃঃ ৬৭-৯৩, ১১২-১৮, ১৮২-২০১ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ আচ্ছা, ধর্ম্মীয় নীতি দিয়ে মানুষের মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তারপর এই সভ্যতাকে রক্ষা করা, এ কি একটা feasible proposition ? তার চেয়ে বাইরের রাজনীতি - অর্থনীতি - বিজ্ঞান - শরীরবিদ্যা ইত্যাদির দিক্ থেকেই সব কিছু control করাই ঠিক্ নয় কি ? আজ হয়ত ব্যর্থতা হ'চ্ছে, পরে ত

সার্থকতা আসতে পারে ?

উঃ মধ্যযুগের ব্যক্তিগত, ভাবপ্রবণ বা গুহ্যসাধনাপ্রবণ ধর্মীয়নীতির দ্বারা এযুগে বিশেষ কিছু করা যাবে না একথা ঠিক্। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে বাইরের একটা বাস্তব জীবনধর্মের সমাজ-সাধনা সবই করতে পারে। এই ধর্মের কথাই আমরা গ্রন্থমধ্যে ব'লেছি। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, শরীর-বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান সব কিছুকেই ক্রমশঃ এই বৃহত্তর যুগধর্মের আওতায় এনে সংস্কার ক'রে কার্যকরী ক'রে নিতে পারা যাবে। আর আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানাদির চেষ্টা ক্রমাগত ব্যর্থ হ'চ্ছে দেখেও যদি সুদূর ভবিষ্যতে আমরা সার্থকতার আশা নিয়ে চলতে পারি, তবে এই সমন্বিত জীবনধর্মের ভবিষ্যৎ সার্থকতার আশা নিয়ে চলা যাবে না কেন ? ধর্মের যে অধোগতি ও ব্যর্থতা মানুষ দেখেছে বলা হ'য় তা মধ্যযুগীয় ধর্ম, ভারতের শাশ্বত ধর্মের নবরূপায়ণ নয়। এর সার্থকতা ভাবী জগতে অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য একথা ঠিক যে এযুগে নিছক ব্যক্তিগত বা মনোগত ভাব-সংশোধনের উপর বেশী নির্ভর করা যাবে না। এযুগের পরিবেশ প্রাচীন যুগ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এযুগ যন্ত্রযুগ, শিল্পযুগ, বিজ্ঞানযুগ। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞাননীতির সামাজিক প্রয়োগ ছাড়া

এযুগের মানুষকে ঠিক্‌পথে রাখা যাবে না। কিন্তু এর সঙ্গে আরও বড় সত্য হ'চ্ছে মানসিক শুদ্ধি-সংশোধনের উপর সব কিছু হ'তে হবে।

প্রঃ এই ব্যাপক যন্ত্রবাদ, বস্তুবাদ, নাস্তিবাদের যুগে ধর্ম্ম-সাধনার sanction কোথায়?

উঃ ভারতীয় 'শাশ্বত ধর্ম্ম' সেই sanction দিতে পারে, কারণ তা পরমশূন্যের মহাসত্যে, পরমবস্তুর মহা-যান্ত্রিকতায় প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থান্তরে আলোচ্য (ভূমিকা ও ষষ্ঠ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ এই speed. haste, competition-এর যুগে কি শান্ত-সমাহিত ধর্ম্মসাধনা সম্ভব?

উঃ নূতন বাস্তব জীবনধর্মের সাধনার বরং এগুলি অনু-কূল। অনাসক্ত কর্ম্মশক্তিকে এরা জাগ্রত করে ও তুলে ধরে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জীবন-সংগ্রামের বর্ণনা প্রচুর।

প্রঃ এ যুগের বিরাট population-সমস্যার সমাধান birth-control ছাড়া কি সম্ভব?

উঃ হয়ত নয়, মনে হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে self-control বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আসে কেন? এটা 'আপদ্ধর্ম্ম' মাত্র (পৃঃ ১৪৩, ১৬১, ৫৮৪-৮৭ দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান Roman Catholic ধর্ম্মগুরু একটা সমাধানের অভাবে একে সরাসরি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ বলতে বাধ্য হ'য়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় নীরব।

শাশ্বত ধর্ম্মের বাস্তববাদ এর একটা সমাধান দিতে পারে। কিন্তু সমস্যাটীকে আর এক দিক্ দিয়েও দেখা যায়। মানুষের abnormality যে rate-এ বেড়ে যাচ্ছে তাতে অনতিদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক ও বেপরোয়া জন্মনিরোধ-হত্যা আত্মহত্যা-অকর্ম্মণ্যহত্যা-ভ্রূণহত্যা -পিতৃহত্যা-ভ্রাতৃহত্যা - বন্ধুহত্যা-স্বামীহত্যা- স্ত্রী হত্যা ইত্যাদি এবং ক্রমাগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সকলের উপরে হঠাৎ আন্তর্জ্জাতিক আণবিক মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটা painful balance restored হওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং abnormality-control-এ মনোযোগ দেবারও সময় এসেছে।

প্রঃ মেয়েদেরও সংযম-ব্রহ্মচর্য আছে কি ?

উঃ অবশ্যই আছে। গ্রন্থমধ্যে এর physiological দিক্‌টাও কিছু আলোচনা করা হ'য়েছে (পৃঃ ৫২৪-২৫ দ্রষ্টব্য)। আর সংযম-ব্রহ্মচর্যের আনুষঙ্গিক যে সব চারিত্রিক গুণের কথা আগে ব'লেছি তা মেয়েদের দ্বারাও যথেষ্ট অনুশীলিত হ'তে পারে।

প্রঃ মেয়েদের সতীত্বের উপর এত জোর দেওয়া হ'ত বা এখনও হয় কেন ?

উঃ একভাবে দেখলে পুরুষের ব্রহ্মচর্যের অনুকল্প হ'চ্ছে মেয়েদের সতীত্বের নিষ্ঠা। অবশ্য পুরুষেরও সংযম-নিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়নি তা' নয় (পৃঃ ১৬০

দ্রষ্টব্য)। তবে জাগতিক স্নেহভালবাসার রাজ্যে নারীরা অধীশ্বরী শক্তি, বৃহদারণ্যকেও সেকথা আছে। এক্ষেত্রে মেয়েদের একটা স্বভাব-গভীরতা রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে নিষ্ঠাশক্তি নারীত্বের মূল্য ও মর্যাদারও ভিত্তি। অবশ্য এর মানে এই নয় যে নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব নেই। রামায়ণ মহাভারতের যুগে সেরূপ ছিল না। মধ্যযুগেই নারীর দৈহিক **chastity** ও পুরুষাধীনতার বাড়াবাড়ি দেখা দেয়, শুধু ভারতে নয়, সর্ব্বদেশেই। তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এখন দেখা দিয়েছে (পৃঃ ৩৯৬, ৫৪২, ৫৮৯ দ্রষ্টব্য)। মেয়েরা ঘরে-বাইরে তাদের ব্যক্তিত্বের দাম আজ সুদে-মূলে আদায় ক'রে নিচ্ছে। আর স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একমনে ঘর করলেই সতী হওয়া যায় তা'ও নয় (পৃঃ ১৭৩-৭৪ দ্রষ্টব্য)। নারীর দৈহিক **chastity-র** বিশেষ প্রয়োজনীয়তার অবশ্য কিছু **psycho-physiological** কারণও দেখান যায়।

প্রঃ স্ত্রীপুরুষের free মেলামেশা কি ক্ষতিকর ?

উঃ **Promiscuous relation** নিশ্চয় ক্ষতিকর। তা'তে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই **personality-force** থাকলেও **humanity-force** থাকে না। আর অকারণ হালকা মেলামেশাও অজ্ঞাতসারে ক্ষতিকর। 'দ্রব্যগুণ' কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। স্ত্রীপশুযূথের মধ্যে কোনও উত্তেজক কারণ না থাকলেও পুংপশুর মাত্র

presence-ই ovary-development stimulate করে দেখা গেছে, এই বৈজ্ঞানিক finding-টা বেশ significant (A Text Book of Physiology Ed. Bykov, p : 450 দ্রষ্টব্য)। ভারতীয় সংযম-বিজ্ঞান মেলামেশাকেও মৈথুন ব'লে গণ্য করেছে।

প্রঃ যৌনসংযমে কি scientific চিন্তা-গবেষণার scope নেই ?

উঃ কতকটা অবশ্যই আছে এবং ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তবুও সংযমসাধনা হ'চ্ছে মূলতঃ ও প্রধানতঃ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা সংকল্পশক্তির ব্যাপার। Cerebral cortex sex-stimulation-এ অনেকটা সক্রিয়। Pituitary সব কিছু control করে, কিন্তু pituitary আবার, ইচ্ছা-আবেগশক্তির কেন্দ্র, hypothalamus-এর প্রভাবাধীন। যাই হোক্, cortical disinhibition করিয়ে যখন cattle-এর sex-activity অনেক বাড়ান গেছে, তখন proper disinhibition-এর দ্বারা একে অনেক কমানও যেতে পারে। আর sexual ব্যাপারে 'ecologo-sexual' বা পারিবেশিক যৌন প্রভাবের conditioning কাজে লাগতে পারে, অবশ্য 'পারিবেশিক অর্থে 'সাংস্কৃতিক' ব্যাপারকেও বুঝতে হবে। Sex-function-এর সঙ্গে চোখের retina-র connection রয়েছে। আরও এই রকম কত কি ভাববার

রয়েছে। অবশ্য ঠিক্‌মত research-এর মূলে সংযমের আদর্শ ও ইচ্ছা এবং যৌগিক-দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দরকার (Facts-এর জন্যে Bykov-এর Physiology ও Boyd-এর Pathology দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ 'যুগ-যন্ত্রণা' বা anxiety-র ব্যাপক ব্যাধি সারবে কিসে?

উঃ নূতন বাস্তব জীবনধর্ম্মে। Self-conscious ভাবের শোধনে। Dostoevsky বহুদিন আগে এই চেয়েছিলেন (পৃঃ ৪২৩) দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ Marcus Aurelius, St. Augustine, গোস্বামী ৺বিজয়কৃষ্ণ, Tolstoy, গান্ধীজী ইত্যাদি মহা-মানবদের জীবনে মনে হয় কামাবেগ অতিরিক্ত ভাবে দেখা দিয়েছিল। এর কারণ কি?

উঃ এর কারণ জীবনবিরোধী 'পাপ'-প্রবৃত্তিকে যাঁরা মূলে উৎখাত করতে চান তাঁদের উপর আক্রমণও হয় তীব্রতম।

প্রঃ মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগ্নী ইত্যাদি সম্পর্কের মধ্যে যৌনকামের সম্ভাবনাকে আগের যুগে 'in-cest'-এর 'পাপ' বলা হ'য়েছে। এখন sex-science এর দৃষ্টিতে কতকটা নিরপেক্ষভাবে দেখা হয়। কোনটা ঠিক্?

উঃ দু'টাই ভুল, আবার দু'টাই ঠিক্। Sex-science-এর স্থিরতা নিয়েই 'পাপ'কে জয় করতে হয়।

তবে Id, Libido, Ego, Super-Ego দিয়ে সব কিছুর সত্য ব্যাখ্যা হয় না (পৃঃ ৬২ দ্রষ্টব্য)। এ অনেক যৌনতত্ত্ববিৎ স্বীকার ক'রেছেন।

প্রঃ স্বপ্নস্খলন কি দূষনীয় নয়?

উঃ স্বাভাবিক স্বপ্নস্খলনও মনে কামপ্রভাবের লক্ষণ। অনেক যৌনবৈজ্ঞানিকও (যেমন Dr. Moll) একে natural মনে করতে রাজী নন।

প্রঃ মেয়েদের ত এসব সমস্যা নেই?

উঃ ঠিক্ এভাবে না থাকলেও মেয়েদের সমস্যা একদিকে আরও গভীরতর, কারণ কামস্বপ্নের delusion জাগ্রত জীবনেও তাঁদের অনেক সময় বহন করতে হয়। আত্মমৈথুন সম্বন্ধেও মেয়েদের সমস্যা মোটেই কম নয়। মেয়েদের প্রায় সমস্ত দেহে কামের কেন্দ্র, (erogenous zones), আর internal বহু organs-এও estrin-এর প্রাচুর্য (Havelock Ellis ও Boyd দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ মেয়েরা আজকাল পুরুষদের সঙ্গে সমকক্ষতা করছেন, এতে দোষের কিছু আছে কি?

উঃ প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট উচ্চস্তরে উঠেছিল (পৃঃ ১৭১-৭২, ১৭৮-৮০ দ্রষ্টব্য)। Physiology বলে নারীর মধ্যে সুপ্ত পুরুষভাব পুরুষের মধ্যে সুপ্ত নারীভাবের চেয়ে অনেক বেশী প্রকট (Boyd-এর Pathology

গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ঐ সমকক্ষতা খুবই সম্ভব, কতকগুলি ক্ষেত্রে। কিন্তু এযুগের tragedy হ'চ্ছে পুরুষ ও নারীর desexualization, যেটা সভ্যতার পক্ষে মারাত্মক (World Aflame, Billy Graham, p: 54 দ্রষ্টব্য)। এমন কি আজকাল নারীর যৌনস্বভাবে পুরুষের যৌনস্বভাব grow করেছে কোনও কোনও authority-র মতে (Dr. Elkan in The Supposed Frigidity of Women, by H. Ellis দ্রষ্টব্য)। পশ্চিম দেশে অতিমাত্রায় স্বাধীন মেয়েরা এবং সেই সঙ্গে পুরুষেরা খুবই অসুখী হ'য়ে পড়ছেন এও ভাববার কথা (পৃঃ ২৭৭ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ অবৈধ সন্তানের percentage খুব বেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং contraception ও ঐরূপ সন্তানদের legitimate ঘোষণা করাই ঠিক্ নয় কি?

উঃ বর্ত্তমানে ব্যাপক অসংযমের জগতে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু গভীরে ভাবার অনেক কিছুই রয়েছে। Contraception সত্ত্বেও পাশ্চাত্যে অবৈধ সন্তানের জন্ম বেড়েই চলেছে (World Aflame, p: 36 দ্রষ্টব্য)। আর অন্যের sexual promiscuity-কে মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে সমাজেরও একটা resistance রয়েছে। সুতরাং আইন ক'রেও কতটা ফল হবে বলা যায় না। অজস্র ভ্রূণশিশুকে নষ্ট

করা হ'চ্ছে, তাদের সম্বন্ধেই বা সহানুভূতি জাগছে না কেন? এক চতুর্থাংশের বেশী সন্তান আমেরিকায় 'legal' parents-এর মিলিত সংসারে থাকতে পাচ্ছে না (World Aflame, p: 35 দ্রষ্টব্য), এরও কারণ চিন্তা করতে হবে।

প্রঃ Masturbation বা আত্মমৈথুনের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?

উঃ গ্রন্থে এবিষয়ের কিছু আলোচনা র'য়েছে (পৃঃ ২৫২-৫৫, ৫০৮-১০)। অনেকে একে স্বাভাবিক ব'লে অবাধ ছাড়পত্র দিতে চাইলেও Havelock Ellis সেভাবে সমর্থন করেন নি। দৈহিক, স্নায়বিক, মানসিক নানা ব্যাধির সম্ভাবনা কম ক'রে দেখা হ'লেও একেবারে excluded হয়নি। Tension-relief বা sedative হিসাবে এটাকে (এবং সাধারণভাবে sex-gratification-কে) আজকাল সমর্থন করার চেষ্টা করা হয়। Tension-relief সম্বন্ধে আগে যা' বলা হ'য়েছে (অনুযোজনা পত্র (২), পৃঃ ১০, ১৬-১৭) তা এখানেও প্রযোজ্য। এসব যে মানুষকে এক যান্ত্রিক স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে তার আর সন্দেহ নেই। Regulated ভাবে কামবিকার নিয়ে চলা একটা কথার ফাঁকি মাত্র। Idealistic ও ভাবপ্রবণদের মধ্যেও এর সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে কিন্তু একে overcome করার struggle-এর মধ্যে মহত্ত্ব

আছে। Hysteria-রোগিণীদের সম্বন্ধে Freud ও Breur যা' ব'লেছেন ("তারা মনুষ্যসমাজের রত্ন") তা' এক্ষেত্রেও খাটে (পৃঃ ৬০৩ দ্রষ্টব্য)। স্বপ্নস্খলনের চেয়ে এতে mental perversion-এর সম্ভাবনা বেশী ব'লে ভারতীয় শাস্ত্রে এর ক্ষেত্রে বেশী কঠোর 'প্রায়শ্চিত্ত' বিহিত হ'য়েছে (পৃঃ ২৭৬-৭৭ দ্রষ্টব্য)। যাই হোক, এর সংযমে hypochondria-গ্রস্ত হ'তে নেই। কিছু psychiatric technique adopt ক'রে আত্মবিচারের সঙ্গে আধ্যাত্মিক level-এ চেষ্টা চালিয়ে গেলে কমবেশী সময়ে এ থেকে অবশ্যই মুক্ত হওয়া যায়।

প্রঃ Asceticism বা কৃচ্ছ্রসাধনাই কি কাম্য ?

উঃ নিছক asceticism ভারতীয় শাস্ত্র সমর্থন করেনি (পৃঃ ২৭০-৭৬ দ্রষ্টব্য)। গৃহধর্ম্মী 'স্নাতক'দের 'দীনতা-হীনতা'র নিন্দা করা হ'য়েছে, যদিও সংযমের কঠোরতা জীবনের সর্ব্বস্তরে স্বীকৃত হ'য়েছে, এমন কি ভোগকে সার্থক করার জন্যেও (পৃঃ ২৭০-৭২ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ Abnormal যৌনবিকারগুলো আসে কেন ?

উঃ আত্মহীনতার compensation-এর জন্য, নিজেকে হেয় করার মধ্য দিয়ে। এমন কি যা'কে normal কামভাব বলা হয় তার মধ্যেও এটা আছে। অধিকাংশ জীবনেও আজকাল কামভাব কতকটা psychopathic বলা যায়। এতে আত্মনাশী masochism রয়েছে

(পৃঃ ৬১০–১২ দ্রষ্টব্য)। মনের বিকারগুলি দেহের নানা configuration-এ 'fixed' হ'য়ে পড়ে।

প্রঃ চলচ্চিত্র (cinema) ইত্যাদিতে যৌনপ্রেমের অশ্লীলতার এত সমালোচনা হয় কেন ? চিত্তবিনোদন কি দোষের ?

উঃ চিত্ত-বিনোদন দোষের নয়, কিন্তু চিত্ত-বিলোড়ন মারাত্মক। এতে সবচেয়ে victimized হ'চ্ছে ছেলেমেয়েরা। বয়স্কদেরও অনেকেরই connivance র'য়েছে। কিছুদিন আগে Paris-এর কোনও youth-centre এ 'Festival of Free Expression' হ'য়ে গেল। তরুণ-তরুণীদের দ্বারা দর্শকদের সাম্নে অবর্ণনীয় যৌনব্যাপারের demonstration দেওয়া হ'ল (World Aflame, p : 203 দ্রষ্টব্য)। আমেরিকায় প্রদর্শিত একটি বিতর্কিত Swedish film-এ actual sexual intercourse দেখান হ'য়েছে (আনন্দবাজার, ৫।৫।৬৮ দ্রষ্টব্য)। আধুনিক theatre-এও উৎকট যৌনতার লক্ষণ দেখা গেছে (পৃঃ ৪১৯-২৬ দ্রষ্টব্য)। এসবই repression-এর বিকৃত relief মাত্র।

প্রঃ এসব ঘটছে কেন ? এর প্রতিকার কি ?

উঃ একটা নূতন যুগ আসছে, এজন্যে আদিম প্রাণশক্তি একটা নূতন পথ খুঁজছে (অনুযোজনা পত্র (২), পৃঃ ১১ দ্রষ্টব্য)। এর প্রতিকার একটা নূতন সমন্বয়ের

জীবনদর্শনে পাওয়া যাবে।

প্রঃ এই ব্যাপক দারিদ্র্যের যুগে ধনকাম-সংযমের প্রশ্ন আসে কি ক'রে ?

উঃ এ সংযম দরিদ্র জনসাধারণের জন্য নয়, যাঁরা তাদের নিয়ে সাম্য-সত্য-স্বাধীনতার জগৎ গড়বেন তাঁদের জন্য। এর সঙ্গে থাকবে যৌনকাম ও প্রভুত্বকামেরও সংযম। এ নাহ'লে গোড়ায় গলদ থেকে যাবে।

প্রঃ Sex-pleasure-এর স্বরূপটী কি ?

উঃ সমস্ত self-conscious pleasure-এরই স্বরূপ হ'চ্ছে 'escape from personality', 'expression of personality' নয়। এজন্যেই ভোগের এত অনিবার্য ব্যর্থতা। কথাগুলি poetry-প্রসঙ্গে T. S. Eliot-এর।

প্রঃ তান্ত্রিক বা 'ফ্রয়েডীয়' মতে sex-gratification-কে কি আত্মোন্নতির কাজে লাগান যায় না ?

উঃ যায়, তবে অত্যন্ত শক্ত ও বিপদ্‌সঙ্কুল। তন্ত্রের আলোচনা ও ফ্রয়েডের আলোচনা-প্রসঙ্গে এটী দেখান হয়েছে (পৃঃ ২৯৭-৩০৭, ৫৪-৬৩)। শ্রীঅরবিন্দও এর বিপদ্ সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁসিয়ার ক'রে দিয়েছেন। ('যোগসাধনার ভিত্তি', পৃঃ ১০১-১০৮ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ যৌন অসংযমের সঙ্গে কি anti-social tendencies-এর যোগ আছে ?

উঃ নিশ্চয়! কারণ, যৌনকামের সঙ্গে ধনকাম ও প্রভুত্ব-কামের যোগ রয়েছে। তিনটী কামই বিকৃত আকারে দেখা দিতে পারে (পৃঃ ১৩০-৩৫ দ্রষ্টব্য)। আমেরিকায় অসংখ্য ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক ব্যক্তির স্নায়ুমনোবিকার ঘটছে, ব্যভিচার-মিথ্যাচার-প্রবঞ্চনা-হিংসাকে স্বাভাবিক ভাবা হ'চ্ছে (World Aflame, pp: 36, 37, 42 দ্রষ্টব্য)। অন্যদেশেও কমবেশী একই অবস্থা। L. S. D.-ভক্ত 'হিপি'-ধর্ম্ম আরেক সমস্যা।

প্রঃ নারীপুরুষের পরস্পরকে যৌনতৃপ্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে পরস্পরকে পাবার আকুল চেষ্টা এযুগে উগ্র হ'য়ে উঠেছে কেন?

উঃ আধ্যাত্মিক ও মনোদৈহিক কামতত্ত্বের অজ্ঞতা থেকে (পৃঃ ৪১, ৫২৩-৫৫, ৫৬২, ৬১৪ দ্রষ্টব্য)।

প্রঃ এযুগে বিশ্বব্যাপী তরুণ ও ছাত্রসমাজের বিদ্রোহের কারণ কি?

উঃ বয়স্ক-সমাজে ও আধুনিক সভ্যতায় আত্মকেন্দ্রিক, ধনকাম-যৌনকাম-প্রভুত্বকামের প্রভাবই এর জন্যে দায়ী! বড়দের মধ্যে কোনও বাস্তব সত্যজীবন-ধর্মিতার স্পর্শ আজ ছোটরা পাচ্ছে না। বড়রা পুরাতন respectability-র 'form' বজায় রাখতেই ব্যস্ত, অথচ ছোটরা তার মধ্যে জীবনের অর্থই খুঁজে পায় না (World Aflame, p: 69-70 দ্রষ্টব্য)। পড়াশুনাও এজন্যে তাদের কাছে meaning-

[ছ]	৭	প্রশ্নবধ্যে	প্রশ্নমধ্যে
,,	৮	প্রাভপন্ন	প্রতিপন্ন
,,	১২	ধ্বংস সম্ভাবনার	ধ্বংসসম্ভাবনার
,,	১৮	plato	Plato
[চ]	২	Kruschov এর	Kruschov-এর
[ণ]	৩	অন্যায়কারি-	অন্যায়কারিতা-
[ত]	২৪	করিতেছে	করিতেছে।
[থ]	৯	'চরিত্রসংরক্ষা	'চরিত্ররক্ষা'
[ধ]	৪	মহাসত্য পরমগুরুদেবের	মহাসত্য-শ্রীগুরু-পরমদেবের
,,	৮	লোককামসংযমের	লোককাম (জনকাম) সংযমের
,,	৯	কেহ চিন্তা	কেহ বিশেষ চিন্তা
[ন]	১৪	মহাগৌরবময	মহাগৌরবময়
[প]	২০	পৃ: ৬৬৭-৭৫	পৃ: ২১১-১৬ এবং ৬৬৭-৭৫
[ভ]	১০	কার্যকরী হয় নাই।	কার্যকরী হয় নাই।*
,,	পাদটীকা	(সংযোজ্য)	*ডা: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মর্মান্তিক ফাঁক লক্ষ্য করিয়াছেন। 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' পৃ: ৪৮১-৮২ দ্রষ্টব্য।
[য]	৫	ঋষিধারার	সমস্ত পরম-ঋষির
,,	১৬	নিজস্ব,	নিজস্ব বিশেষভাবে ভাবিত,
,,	১৭	সংশ্লিষ্ট	একরূপ
,,	২২	সকৃতজ্ঞভাবে	কৃতজ্ঞতার সহিত

প্রথম অধ্যায়

১	৩	আরও বেশী কিছু	আরও অন্য কিছু
১	৪	উত্তেজনা	উত্তেজনাকেই

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ (অসম্পূর্ণ)	শুদ্ধ (সংযোজিত)
৪	১৬	রাক্ষসী	রাক্ষস
৫	২১	ব্যক্তিজীবনে	ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে
৬	৯-১০	আদর্শ ব্যক্তিজীবনই	আদর্শ সমাজধর্মী ব্যক্তিজীবনই
৬	১১	ব্যক্তিচেতনা	সমাজধর্মী ব্যক্তিচেতনা
৭	১২	ব্যক্তির একটা	ব্যক্তির মহাচেতনার একটা
১০	৯	হইতেছে না।	হইতেছে না। উদাহরণ-স্বরূপ
১১	৫	পুনর্জ্জাগরণ মুহূর্ত্তে	পুনর্জ্জাগরণের মুহূর্ত্তে
১৫	২২	মানবধর্ম্মের	মানবিক সমাজধর্ম্মের
১৮	৩	মানবধর্ম্মকে	মানবিক সমাজধর্ম্মকে
২০	২১	জনপ্রিয়তা	জনপ্রিয়তার কামনা
ঐ	২২	Popularity	Love of Popularity
ঐ	পাদটীকা	(সংযোজনীয়)	লোককামের এইরূপ অর্থপ্রসঙ্গে গীতা, ৩।২০-২৫, ৭।২৫ দ্রষ্টব্য।
৩৪	১৭	এতখানি	সুতরাং এই
৩৭	১৩-১৭	"Marriage......কিছুই নয়" এই শ্লেষপূর্ণ উক্তিকে	"Marriage .... কিছুই নয়" কতকটা এই রকমের শ্লেষপূর্ণ উক্তিকে
৪৪	১	of diminutive sun	a diminutive sun
৭০	হেড লাইন	সমাজ ও সংস্কৃতি	অমৃতের পথে
১০০	Foot Note	Arrian Mc Crindle	Arrian, Mc Crindle
১০৭	১৬	'হিন্দু'	শাশ্বত
১১০	১	বিনিময় করিতে	বিকাইয়া দিতে
১১২	৮	সংস্কার-সম্পন্ন	সংস্কার-সম্পন্ন
১১৩	১২	psychology	Psychology
১১৪	৩	কিন্তু	(বাদ দিতে হইবে)
১১৬	১	'হিন্দু'	শাশ্বত

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ (অসম্পূর্ণ)	শুদ্ধ (সংযোজিত)
১১৭	২০-২১	ডা; রাধাকুমুদ মুখার্জি	ডা: রমেশচন্দ্র মজুমদার
১১৮	১২-১৪	'History .. পৃ: ৫৭১'	(Foot Note-এ যাইবে)
১২১	হেড লাইন	শিক্ষা ও সাধনা	ব্যষ্টিশিক্ষা ও সমষ্টিসাধনা
১২২	৮ লাইনের পর	(শূন্য স্থানে)	**পরিবার (Family)**
১২৪	১	' সমাজ '	' গোষ্ঠী '
১৪৬	৩	(সংযোজনীয়)	রবীন্দ্রনাথও 'রাশিয়ার চিঠি'-তে সেখানের নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশেষ প্রশংসা করিয়াও তাহার 'গুরুতর গলদ'-এর কথাও বলিয়াছেন।
ঐ	পাদটীকা	(চতুর্থ অনুচ্ছেদ) 'রবীন্দ্রনাথ'	(বাদ দিতে হইবে)
১৫৫	১০	বানপ্রস্থাদি	গৃহস্থ-বানপ্রস্থাদি
১৬০	৭	' norm ' বা স্বাভাবিক মান	সংযমের মান
১৬২	১০	christian	Christian
,,	১৪	. . . Ethics	Ethics, Vol 5
১৭১	২	মনুষ	মানুষ
১৯৯	৫	নিবিদ্ধ	নিবদ্ধ
২০৬	৯	কমিউনিজমে্র	কমিউনিজ্মের
ঐ	১৭	বলা বাহুলা	(বাদ দিতে হইবে)
২১৭	৮	সুতরা:	সুতরাং
২২৫	৬-৭	দৈনিক বসুমতী, ১১।১০।৬৫	(পাদটীকায় যাইবে)
২৩৯	১২	হয়ত বা	(বাদ দিতে হইবে)
২৪১	১৭	তে ই	তবেই
২৪৯	১৮	প্রবৃত্তি	প্রবৃত্ত
২৫৮	৮	সংশিষ্ট	সংশ্লিষ্ট

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ (অসম্পূর্ণ)	শুদ্ধ (সংযোজিত)
২৬২	৭	প্রযুক্ত হইয়াছে	(বাদ দিতে হইবে)
২৬৩	৪	......করিবে না।	(সংযোগ করিতে হইবে) বামদেব্য সামের আদর্শ যে সমাজ গ্রহণ করে নাই, মহাভারতে তাহারও প্রমাণ আছে—পৃ: ৩৫৯, ৩৬১-৬২ দ্রষ্টব্য।
২৬৮	১৪	এই	(বাদ দিতে হইবে)
২৮৪	৬	বর্ণনাশ্রমের	বর্ণাশ্রমের
ঐ	২০	বৌদ্ধ	বৌদ্ধ
২৯৬	১০	কলাবধি	(উচ্চারণ অনিশ্চিত)
৩০৪	১৪	যৌনসংযমের বিরুদ্ধে	যৌন অসংযমের বিরুদ্ধে
৩১১	৭	সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ	(পাঠান্তর) সর্বে চ সুখিন: সন্তু
৩১২	৮-৯	নব বর্ণাশ্রম	নব সমাজধর্ম
৩১৭	১৭	বর্ণাশ্রম	(বাদ দিতে হইবে)
৩৭৬	২	বিভাস্বক।	স্বাভাবিক
৪০৪	১৭	উগ্র	সূক্ষ্ম
৪০৬	৭	রেণেসঁা।	রেণেসাঁস
৪২৫	২২	T. S. Eliot-এ	(বাদ দিতে হইবে)
৪৩৭	পাদটীকা	৩০।১।৬৫	৩০।৯।৬৫
৪৪৮	,,	মন-আনন্দম	মনআনন্দম্
৪৬১	৭	বিবেচিত	প্রতিভাত
৪৬৪	১৯	কিন্তু	(বাদ দিতে হইবে)
৪৭৩	Foot Note	Test	Text
৪৭৫	১৩	vas deferens-এর	seminal tubules-এর
ঐ	১৪	(seminal tubules)-মধ্যে	vas deferens-মধ্যে

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ (অসম্পূর্ণ)	শুদ্ধ (সংযোজিত)
৫৩১	৩	(will force) এর	(will force-এর)
৫৩৭	৬	বজ্রানাড়া	বজ্রানাড়ী
৫৫০	৩	সুতরাং	(বাদ দিতে হইবে)
৫৫৯	১৪	প্রীতি করা	প্রকাশ করা (?)
৫৬২	১৫	পাইতে চাই।	পাইতে চায়।
৫৭১	১২-১৩	বারাঙ্গনা-মিলনের সহিত	কতকটা বারাঙ্গনা-মিলনের সহিত
ঐ	Foot Note	Revolutionary's	Revolutionist's
৫৮৬	১৬	* (চিহ্ন)	(পরবর্তী লাইনের শেষে হইবে)
ঐ	পাদটীকা	......দ্রষ্টব্য।	(পরে সংযোগ করিতে হইবে) —রামায়ণ মহাভারতেও কলসজাত ঋষির কথা আছে। .....
ঐ	২০	চৈতন্যের মহিমা	চৈতন্যের মহিমা ও সাধনায় প্রয়োজনীয়তা
৬০২	২০	......nature-এর	......nature)-এর
৬১২	২	নয়	নয়।
৬১৪	৪	Freud ও	Freud'এ
৬২৬	১২	চমৎকান	চমৎকার
৬৪২	২০	(Das Kapital—	(Das Kapital)—
৬৭৩	১২	সৃষ্টি	সৃষ্টিই
৬৭৪	Foot Note	A study...... —	A Study ... ...
৬৮০	১৬	জীবনধর্মের	সমাজধর্মের
৬৮২	১৮	আর্ধ-বাণী	আর্য বাণী

অনুযোজনা পত্র (২)

৭	১৪	বহ্মচর্য	ব্রহ্মচর্য

নাম-নির্দেশিকা (Index)

অগাষ্টিন (Augustine, St.)—
৩২৫-২৬, ৩২৮, ৪১৫, অনু(২)-৩০
অত্রি—২৬৪, ২৭১
অথর্ববেদ—২৪৭-৪৮
অন্ দি ... On the Programme of the Communist Party of the Soviet Union—৬৫৭, ৬৫৯
অনসূয়া—২৬৪
'অনির্বাণ'—৩৪৪-৪৫, ৬৫৬
'অনুশাসন'—৩১৪
অভিমন্যু—৩৬১
অরুন্ধতী—২৬৪
অরেলিয়াস (Aurelius, M.)—৩০
অর্জুন—৩৫৭-৬১
অর্থশাস্ত্র—২০০, ৩৬৮, ৫০৪
অল্লমপ্রভু—২৮৭
অশোক—১৯৭-৯৮
অষ্টাধ্যায়ী—১২৪, ১৭৮
অষ্টাবক্র—৩৬৪
অ্যাডভান্সড হিষ্ট্রি...(Advanced History of India, An)—
৩১৪, ৩১৮
অ্যাডলার (Adler)—৫০, ৬২৫,
অ্যানাউইল (Anouilh)—৪১২-২২,
৪২৬
অ্যানা কারেনীনা (Anna Karenina)
—৪১২, ৪৬০
অ্যারিষ্টটল (Aristotle)—৩৩৭,
ভূমিকা—(ড), অনু (২)—২১
অ্যালেকজাণ্ডার (Alexander)—
অনু (২)—২১
আইনষ্টাইন (Einstein)—২৭
আঙ্গিরস—২৬৯
আনন্দমঠ—৩১৬
আয়ুর্বেদ—৫২৬-৩০
আরনল্ড (Arnold, Mathew)—
২১৭, ৫১২
আর্মস্ (Arms and the Man)
—Shaw দ্রষ্টব্য।
আরিয়ান (Arrian)—৯৯, ১০৪
ইউ নু (U. Nu)—২০৬
ইউয়িং (Ewing, Alfred, Sir)—
৫৯৬
'ইউলিসিস' 'Ulysses'—৪২৯,
৪৩১-৩২
ইন্টারন্যাশনাল (International Journal of Social Psychiatry)—১৭৭
ইণ্ডিয়ান ... (Indian Philosophy)
২৭৮-৭৯, ২৮২, ২৯০

ইয়ং ... (Young India)—৩৮, ১১১,
ইয়ুং (Jung. C. G.)—৫০, ৬১, ৬২, ৫৯৮
ইয়ুটাং— (Yutang, Lin)—৩৩৯
ইয়েট্‌স (Yeats, W. B; A. G. Stock)—৬৩০, অমু (২)—১৯
ইলিয়ট (Eliot, T. S.)—৪০২, ৪০৩, ৪১৪, ৪২১, ৪২৫-২৬, ৪২৯, ৪৬৬, অমু(২)—৩৬
ঈশোপনিষৎ—৭৭, ২৬০-৬১, ৪৪৯, ৪৮৫
ঈষ্টার .. (Oesterlen)—৩৬
"উইলিয়াম্‌স (Williams, Monier) —২০৮, ৬১৮
উইমেন (Women in Love)— ৪১৩-১৪
উইস্‌ম্যান্ (Weisman)—৪৭৮
উজ্জ্বল নীলমণি—৩৮০
উড্‌রফ (Woodroff, John, Sir,) — ৫৪১
উত্তররামচরিত—৩৮৩, ৫৬৭
উর্বশী—৩৫৮-৫৯
ঋগ্বেদ—২৪৮-৪৯, ২৫৮-৫৯, ২৪৩, ৬২৯, ৬৪০
ঋচীক—২৭০
ঋষ্যশৃঙ্গ—৩৭০-৫৩
এখার্ট (Ekhart)—৬২৯
এডিংটন ... (Eddington, A. S.)— ৫৪৩, ৫৪৫
এনসেন্ট ... (Ancient Indian Education)—৭৪, ২২৬-২৮, ২৪৭-৪৯, ২৭৬, ৩৪৪, ৩৬৯, ৩৮৮
এন্‌সেন্ট...(Ancient Indian Historical Tradition, Pargiter)-১০১
এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ...(Encyclopaedia of Religion and Ethics)— V1—৩৩৮ ; V2—৩৩৬ ; V3—৩২৫, ৩২৮, ৩৩১-৩৩, ৩৪০, ৫০১-০২, ৫১১, ৬২৬ ; V5—১৬২, ১৬৭-৬৮, ৩২৬ : V6—৩২৫, ৩২৯ ; V9—৩২৮ ; V12—৩৩৪
এলকান্ (Elkan, Dr.) —অমু (২) —৩২
এলিস (Ellis, Havelock)—২৫৪, ২৫৬, ৪২৪, ৪৯২-৯৩, ৫০১, ৫০৪-০৬, ৫৭২, ৫৭৯, ৫৮৭, ৫৯৪, ৫৯৯, ৬০২, ৬০৫-০৯, ৬১১, ১৬, ৬২০-২২, ৬২৮, ভূমি (ক), অমু (২)—২২, ৩১-৩

এসোটেরিক ... (Esoteric Anthropology)—৪৭
ও'নীল ... (O'Neill, Eugene) —৪২২
ওপ্‌ন কোর্ট ... (Open Court Journal, The)—৪৫
অপেনহাইমার (Oppenheimer)—২৭
ওঁকারনাথ, ঠাকুর, শ্রীশ্রী—৩২৩
ওমর খৈয়াম—অনু (২)—২০
ওয়ার্লড ... (World Aflame)— ভূমিকা— (ড), অনু (২)—৬, ৩২-৩৩, ৩৫, ৩৭
ওয়েষ্টারমার্ক (Westermarck)— ৫৬৮
ওয়েষ্টল্যাণ্ড (Wasteland, The) — ৪১৪-১৫
কচ ও দেবযানী—৩৬২
কঠোপনিষৎ—৬২৯
কঁদিলাক (Condillac)—৬৪৭
কংফুচে (Confucius)—৩৩০
কমিউনিষ্ট ... (Communist Manifesto)—২২৪
কবিরাজ, গোপীনাথ, ডা:—৩২৪
কবীরবচনসমুচ্চয়—৩৮১
কবীর—১০৫, ২৯৪, ৩৮৭-৯০
কাফকা (Kafka)—অনু (২)—২৫
কালিদাস—৩৬৯-৭০, ৩৭৫-৭৮, ৩৮২-৮৩, ৪১০, অনু (২)—১৯
কামসূত্র—৫০২-০৪
কামু (Camus)—৪২১-২২
কুন্তী—১৫১, ৩৬০, ৩৬২, ৫৬৬
কুমারসম্ভব—৩৪৯, ৩৭০-৭২, ৩৭৫
কুম্ভ, রাণা—৩৭৭
'কৃষ্ণচরিত্র'—২৬৯
কেজারলিং (Keyserling, Count) ৫৬৮-৭৯
কেনোপনিষৎ—২৬৫-৬৭
কেট্‌লবী (Ketelbey, C. D. M.) —৬৬৮-৭০
কোরাণ, পবিত্র—৩২৬-২৮
কৌটিল্য—৮৮, ১০১, ১৮৭, ১৯৯-২০০, ৩৬৮, ৫০৪
'ক্যাপিট্যাল' ... (Kapital, Das)— ৬৪২, ৬৪৪, ৬৪৭-৪৮
ক্যারেক্টার ... (Character and the Unconscious)—৫৬-৬০
ক্যাসেলস্‌ ... (Cassell's Encyclopaedia of Literature)—৪৫৪
ক্রয়িট্‌সার ... (Kreutzer Sonata, The)—৪১১

ক্রুশ্চেভ (Kruschov)—৬৫৭, ৬৫৯, ভূমিকা—(চ)
ক্লাসিক্যাল ... (Classical Accounts of India)—৯৯-১০০
গঙ্গাদেবী—৩৬৯
গর্গমুনি—২৮০
গস্‌পেল .. (Gospel of Buddha) —১১১
গাথাস্‌ ... (Gathas of Zarathustra, The)—৩৩৩
গাস্থার ... (Gunther, John, Inside Russia)—৬০০-০১
গান্ধী, মহাত্মা— ২৩-২৪, ৩৭, ১০৭, ১১০, ১৪৬, ২৫৪, ২৬৮, ২৭৬, ৩১৬, ৪১১, ৫৮৪, অনু (২)—৩০
গীতগোবিন্দ—৩৭৭, ৩৮০
গীতা, শ্রীমদ্‌ভগবৎ—৪৬, ৪৯, ৫২-৫৩, ৬৪-৬৫, ৭৬, ৮৩, ৮৮, ৯০-৯১, ১০৭-০৮, ১১১, ১১৪, ১২১ ১৩৩-৩৫, ১৪০-৪১, ১৮৭, ২০৮, ২৭৬, ২৮৫, ৩১৬, ৩১৮, ৪৪২, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৫৩, ৪৮৩, ৪৮৮-৮৯, ৪৯২, ৫১২, ৫১৭, ৫১৯, ৫২৬, ৫৫৫, ৫৫৯, ৬১০, ৬২১, ৬২৪, ৬৩৪, ৬৩৭-৩৮, ৬৪৫-৪৬, ৬৫৫, অনু (২) —২৩
গুপ্ত, নলিনীকান্ত ('আধুনিক সাহিত্য') —৩৯৮
গেডিস্‌ (Geddes)—৪৬৯
গোয়েটে (Goette)—৪৬৯
গোস্বামী, বিজয়কৃষ্ণ, শ্রীশ্রী—১৭৪, ৩২২-২৩, ২৪০, ৫১৫, ৫৩৪, ৫৭৬, অনু (১)—৵, অনু (২)—১০
গ্যাসকইন (Gascoigne, Bamber) —Twentieth Century Drama দ্রষ্টব্য।
গ্যেটে (Goethe) — ৪০৯, ৪৬৭, অনু (২)—১৯, ২০
গ্রেহাম ... (Graham, Billy)— World Aflame দ্রষ্টব্য।
ঘটোৎকচ—৩৬২
ঘৃতাচী—৩৬৩
ঘোষ, জগদীশচন্দ্র—৬৩৩
ঘোষাল ... (Ghosal, U. N, Dr) —২৪৩
চণ্ডীদাস—৩৭৯-৮০
চন্দ্রগুপ্ত—১০১
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ডা:—৩৯০-৯১

চরক (Caraka)—৫২৬
চর্যাগীতি—৩৮৪-৮৬
'চরিত্রহীন'—৩৯৬
চারুদত্ত—৩৭৫
চার্চিল (Churchill, History of the English-Speaking Nations)-৬৬৩
চিত্রাঙ্গদা—৩৫৭, ৩৫৯
চৈতন্য, মহাপ্রভু, শ্রীশ্রী—১২০, ১৮০, ২৯০-৯৩, ৩৩২, ৩৭৯-৮০, ৩৯০, খণ্ড (২) — ১৩
চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীশ্রী—১৮০, ২৮৮, ২৯০-৯৩, ৩৩২, ৩৭৯-৮০, ৩৯০, ৪৪৫
চোখের বালি—৩৯৬, ৪১২
চ্যাটার্জি (Chatterjee, C. C., Dr. Human Physiology)—৫২২, ৫২৪
'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'—২২১
ছান্দোগ্য উপনিষৎ—২৫৯-৬৩, ২৬৯, ২৭৭, ২৮৭, ৩৫৯, ৫১৬, ৫১৯, ৫৬৩-৬৪, ৫৯৪, ৬৩৫
জনক—৭৩, ৩৬৫, ৩৬৭
জনসন (Johnson, Lyndon B) —১৪৪-৪৫
জয়দেব— ৭৯-৮১
জয়েস্ .. (Joyce, James)—৪২৯, ৪৩১-৩২
জর্জ ... (George, A. G. Ph. D 'T. S. Eliot, His Mind and Art')—৪১৫-১৬, ৪৬৬
জরৎকারু—৩৫২, ৩৫৪
জরাবৃদ্ধি—৩৩৩, ৩৪৩
জীন্স .. (Jeans, James, Sir) —৬৪, ৫৪৪-৪৫
জেনারেশন .. ('Generation and Regeneration')—৪৫, ৫১, ৫২৫
টয়েন্‌বী ... (Toynbee, Arnold) —৫৯৬, ৬৭৩-৭৬, ভূমিকা—(ভ)
টলস্টয় (Tolstoy, Leo. Count)- ৪১০-১২, ৪৩০.৪৬০, খণ্ড (২)—
টুলাউ ... (Toulouse, Dr.) —৩৯-৪০
টুওয়ার্ডস্ ... ('Towards Moral Bankruptcy')—৩৭, ৩৯-৪২
টেক্সট বুক ... (Text Book of Pathology. A)—৪৭৯, খণ্ড (২) —৬, ৩০, ৩১
টেক্সট বুক ... (Text Book of Physiology, A, Ed. K. M. Bykov Academician, Eng Tran.)—৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৫-৭৬,

৫২৩, ৫২৫, ৫৩৬, ৫৪১, ৫৫৬, অমু (২)—২৯-৩০
টোয়েন্টিয়েথ ... ('Twentieth Century Drama')— ৪১৯-২৪, ৪২৬,-২৭
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—৩১৮
ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, মহর্ষি, ('মহর্ষির আত্মজীবনী'—৩১৩-১৫, ৩৯৫, ৪০০
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—১৪৬, ১৪৮, ১৬৭, ২০৪, ২২১, ২৩২-৩৬, ২৪১, ৩৩০, ৩৪৭-৪৯, ৩৬৯-৭৩, ৩৭৬-৭৭, ৩৮২-৮৩, ৩৯১-৯২, ৩৯৫-৯৭, ৩৯৯, ৪০১, ৪০৬-০৯, ৪১২, ৫৫৭, ৫৮২ ৫৮৯, ৬২৮, অমু (২)—১০, ২০, ৩৮.
ডষ্টয়েভস্কি (Dostoevsky) —৪৫৩, ৪৬০, অমু (২) —৩০
ডাইয়োনিসিয়াস ...... (Dionysius the Areopagite)—৬৩৩
ডানিং ... (Dunning, W. A., Dr.) —অমু (২) —৩৮
ড্যুভ্যাল .. (Duval, Sylvanus) —৪০
ডেলি ... (Daily Mail, The. K. Allsop)—৪৩৫
'তরুলতার'—২৯৮-৩০৩
'তপোবন' – ৪০৭
তিলক, লোকমান্য—১০৭, ৩১৬
তুকারাম—৩১৩
তুলসীদাস, মহাত্মা—৩৯০
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—৫১, ৭৪-৭৬ ৮১, ২৬৩-৬৫, ৪৪৬, ৪৪৮, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৮৪, ৪৮৭, ৫৬০, ৫৬৩, ৫৮৩, ৬২১, ৬২৯
দত্ত অক্ষয়কুমার—৩৯৫
দত্ত, অশ্বিনীকুমার—৪৬, ৩১৬
দত্ত, নলিনাক্ষ (ডা:)—২৮৪
দশরথ—১৬০, ৩৫০-৫১, ৫৬৯, ৬৩৬
দাদু—২৯৪
দাশগুপ্ত, শশিভূষণ (ডা:)—৩৮২, ৩৮৬
দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ (ডা:)—৩৮৫
দুষ্যন্ত— ৮৩
দ্রৌপদী—১৭২ ২০৭ ৩৮৩, ৫৬৯
ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু – ৩৬২
'নববর্ষ' —২৩৪. ২৩৬. ৪০৭
নবোকভ (Nobokov, Vladimir) —৪৩৪
নানক, গুরু—১০৫, ২৯৪-৯৫, ৩৮৭
নামদেব—৩১৩

নারদ—২৮৮
নিকল্‌স (ডাঃ)—৪৭
নিগমানন্দ, স্বামী—৩০৭, ৩২৩, ৪৪০
নিবেদিতা, সিস্টার—৩১৯
নিম্বার্কাচার্য—২৮৮
নেহেরু, জওহরলাল—১০৯
পতঞ্জলি— ১৭৯
পত্রিকা...(Patrika, Amrita Bazar)—১৭৭,
অনু (২)—৮, ৩৮
পত্রিকা, আনন্দবাজার—২০৩, ২৩০,
৪৩৫-৩৭, ৫৮১, অনু (২)—৩৫
পরাশর—২৭৪, ৩৫৩, ৩৫৫
পল (Paul, St.)—৩২৫
পাইথাগোরাস (Pythagoras)—
৩৩৬
পানিকর (Panikkar, K. M.)—
১০০
পাণিনি ('India as known to Panini', V. S. Agarwala)
—'অষ্টাধ্যায়ী' দ্রষ্টব্য
পাল, বিপিনচন্দ্র—৩১৬
'পূর্ব ও পশ্চিম'—২৪১
পূর্ব মীমাংসা—২৮১
পাউণ্ড (Pound, Ezra)—৪৩১০
পোলিটিক্যাল...('Political History of Ancient India')
—১০১
পোপ...(Pope, Paul VI)—২৬,
অনু (২)—২৬
প্যাভলভ (Pavlov)—৪৭৪, ৪৮৩
প্রণবানন্দ, স্বামী, আচার্য—১৪১,
২৫২, ২৬৯, ২৩৭, ২৪০, ২৫৫,
৩২১-২২, ৪৮৮, ৪৯২, ৫১৫,
৫২৮, ৫৭৬, অনু (১)—৵০
প্রতীপ—৩৬১
প্রভাকর—২৮৮
প্রশ্নোপনিষৎ—২৪৯, ২৬৭-৬৮,
ভূমিকা—(য)
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—২৩৪-৩৫
প্রিন্সিপ্যাল...'Principal Upanishads, The'—১৩৪, ২৫০,
২৬৬-৬৭, ৩২৯
প্রিন্সিপ্‌লস্‌—'Principles of Genetics'—৩১
প্রেসিডেণ্ট...'President Radhakrishnan's Speeches and Writings'—৩১৫

প্লটিনাস (Plotinus)—৩৩৯,
প্লেটো (Plato)—৩৩৬,
ভূমিকা—(ভ)
ফাউষ্ট (Faust)—৪১০
ফার্ডিনাণ্ড-মিরাণ্ডা—৩৬৩
ফিডো (Phaedo)—৩৩৬
ফ্রম...'From Medicine Man
to Freud'—৬২
ফ্রয়েড (Freud)—৪৮, ৫০, ৫৫,
৫৯-৬৩, ৬৫, ২৫৪, ৩৯৪, ৪০৩,
৪৫০-৫১, ৪৬৬, ৪৮১, ৫৪৯,
৫৫৭, ৫৮৩, ৬০১-০৩, ৬০৫-০৬,
৬০৯, ৬১৪, ৬২২, ভূমিকা)—(খ),
অঙ্ক (২)—৮, ১০, ১৯, ৩৪, ৩৬
ফ্রোম (Fromm, E)—৬২
ফ্লবাৎ (Flaubert)—৪২৯
বঙ্কিমচন্দ্র—১৬৭, ২৩৯, ৩৮১, ৩৮৩,
৩৯৫, ৪০০
'বঙ্কিমরচনাবলী'—বঙ্কিমচন্দ্র দ্রষ্টব্য
বজ্রসূচিকোপনিষৎ—৫৮৬
বদন—২৮৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর—৪০৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাকান্ত, ঠাকুর
—২৪০, ৩২৩
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ডাঃ—৩৯০-
৯৫, ৩৯৯-৪০০, ৪০৯-১০
বভ্রুবাহন—৩৫৫
বয়েড (Boyd, William)—
'Text Book of Pathology'
দ্রষ্টব্য
বল্লভাচার্য—১২০
বশিষ্ঠ—১৭৩, ২৬৪
বসন্তসেনা—৩৭৬
বসাক (Basak. R. G. Dr.)—
১৯৮
বসু, আনন্দমোহন—৩১৬
বসু, বুদ্ধদেব—৪২৮
বসু, মণীন্দ্রমোহন ('Post-Chaitanva Sahajiva Cult')—
৩০৪-০৫
বসুমতী, দৈনিক—২২৫, ৪০৬
বসু, রাজনারায়ণ—৩১৮
বসু, রাসবিহারী—৩২৪
বাইকফ (Bykov, K. M., Academician)—A Text Book
of Physiology দ্রষ্টব্য
বাইবেল, পবিত্র—৫৬০
'বাঙ্গালীর রুচি'—৩৯৯-৪০০, ৪০৯-
১০

বাট্লার (Butler, Samuel)—৩০, ৩১
বাণভট্ট—৩৬৯
বাণী ও রচনা, স্বামী বিবেকানন্দের—বিবেকানন্দ, স্বামী, দ্রষ্টব্য।
ব্যাৎস্যায়ন—৩৬৮, ৫০১, ৫০৩, ৫০৪
'বাংলার বাউল ও বাউলগান'—৩৮৬, ৩৮৯
'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—৩৯৯, ৪০৩ ৫৮২
বার্গসঁ (Bergson)—৪৩৩, অঙ্ক (২)—৫
বালী—২৭০
বাল্মীকি—৩৫৮
বাসবদত্তা—৩৭৫
বিক্রমাদিত্য—৩৮২
বিজয়মঙ্গল, শ্রীশ্রী—২৪০, ৩২৩, ৫৩৪
বিদগ্ধমাধব—৩৮০
বিদ্যাপতি—৩৭৯-৮০
বিদ্যাসাগর—১৬৬, ৩৯৫
বিনে (Binet, Alfred)—৩০, ৪৩, ৭৬
বিবেকানন্দ, স্বামী—৮৯, ১১৪, ১১৬, ১৪৬, ১৬৩, ১৮১, ২০২-০৩, ২০৯, ২৩৭, ২৪০, ৩১৮-২১, ৪৯২, ৬২৫, অঙ্ক (১)—১৫
বিরজানন্দ, স্বামী—৩২৩
বিশ্বামিত্র—৩৫৩-৫৫, ৩৫৬-৫৭,
বিষ্ণুপুরাণ—২৭৮-৭৯, ৩৮১
বীয়নড...(Beyond the Pleasure Principle)—৪৫০
বীল (Beale, Lionel, Sir)—৩৬, ৩৭
বুদ্ধদেব—১০, ১১১, ৪৫২,
বুদ্ধবাণী—১১২
বৃহস্পতি—ভূমিকা (৩)
বেণীসংহার—৩৮৩
বেদ—৩৪৫-৪৬
বেদ-উপনিষদ্—৪৪৪, ৪৯০, ৪৯২
বেদব্যাস—৩৫৩, ৩৫৫, ৩৬২-৬৩, ৩৬৫
'বেদমীমাংসা'—৩৪৪-৭৫
বেসান্ট (Besant, Annie)—৩১৬-১৮
'বৈরাগ্য'—৪০৮
বোদ্লেয়ার (Baudlaire)—৪২৮-২৯

বৌদ্ধ দোহা—৩৮৪
'বৌদ্ধ ধর্ম ও চর্য্যাগীতি'—৩৮৬
বৃহদারণ্যক, উপনিষৎ—২০, ৩৪, ৭৪, ৮৪, ১৬১, ১৬৪, ১৭১, ২৪৯-৫৩, ২৫৫-৫৮, ২৫৯, ২৬১, ৪২৮, ৪৫২, ৪৬৬; ৪৮৭, ৫৪৫, ৫৬১, ৫৬৯; ৬২৯, ৬৩৬, অনু(২)—২৮
ব্যুরো (Bureau, M. Paul)—৩৭, ৩৯, ৪১, ১৩০-৩১, ৪৫৬, ৬২৪
ব্রয়ার (Breur)—৬০৩, অনু (২)—৩৪
ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ—৩৮১
ব্রাইস্ (Bryce, James)—'Modern Democracies' দ্রষ্টব্য
ব্রিফল্ট (Briffault, Robert)—৫৬৮
ব্রেভ্...(Brave New World)—২১১-১৬
ভক্তিযোগ—৪৬, ৩১৬
ভগবৎ...('Bhagavad Gita')—৬৩০
ভগবান দাস (ডাঃ)—৩২৩
ভট্টকুমারিল—২০৮
ভট্টনারায়ণ—৩৮৩
ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক—৩৮৬, ৩৮৯
ভবভূতি—৩৬৯, ৩৮৩, ৫৬৭, অনু (২)—১৯
ভাগবত, শ্রীমৎ—৭৫, ১৯৩, ২৮০, ৩৮১, ৫৯২
'ভারতসংস্কৃতি'—৩৮৫
'ভারত-সংস্কৃতি'—৩৯০ ৯১
'ভারতবর্ষের ইতিহাস'—১৩৬
'ভারতের সংস্কৃতি'—২৯৪-৯৫, ৩৮৯, ভাস ৩৭৫-৭৬
ভিনটারনিৎজ (Winternitz, M)—৩৮৩
ভিরি (Viry, Dr.)—৪২
ভীম—৩৬২, ৩৮৩
ভীষ্ম—২৭১-৭২ ৩৬১-৬২, ৩৬৪
ভ্যান...Vander Hoop, J H.—'Character and the Unconscious' দ্রষ্টব্য
মজুমদার, অমিয়কুমার—৩৮৫

মজুমদার, আর, সি, ডাঃ (Majumdar, R. C., Dr.)—১১৭, ১৭৯, ২৪৪
মডার্ণ ..'Modern Democracies'—৬৬২, ৬৬৬-৬৭, ৬৭০ ; ভূমিকা—(প). (ক)
মডার্ণ... 'Modern Man in Search of a Soul'—Jung দ্রষ্টব্য।
মণিরত্নমালা—৫৫৩
মদালসা—২৬৭
মধ্বাচার্য—১২০, ১৮৮
মনুসংহিতা—১১২-১৩, ১২২, ১২৫, ১৫১, .১৫৪-৫৫, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৯-৭১, ১৮১, ১৯৪, ২০৫, ২১৬, ২৫৩, ২৬৮, ২৭২, ২৭৫-৭৭, ২৯৯, ৩১৪, ৩৩০, ৫৮৩, ৫৯৩, ৬৩৮, ৬৪০ ভূমিকা—(জ)
মল (Moll, Dr.)—অনু (২)—৩১
মম (Maugham, Somerset)—'The Razor's Edge' দ্রষ্টব্য।
'মহর্ষির আত্মজীবনী'—ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, মহর্ষি, দ্রষ্টব্য।
মহানির্বাণতন্ত্র—২৯৮, ৩০৩, ৩১৪
মহাভারত—২৫, ১০০-০১, ১০৪, ১০৮, ১৫১, ১৫৬, ১৫৯-৬০, ১৬৪, ১৮৬-৯১, ২৯৩, ১৯৫-৯৭, ২০০-০১, ২০৭-০৮, ২১৯, ২৩৮, ২৬৯-৭৪, ২৭০-৭৮, ২৮০, ৩৬২, ৩৮১, ৩৮৩, ৫৩০, ৫৯৩, ৬৩১, ৬৪১ ; ভূমিকা—(ণ), (ত), (দ) ; অনু (২)—২৬
মাঘ—৩৬৯
ম্যানি—৩২৮
মার্ক্স (Marx, Karl) —৫৫, ২২৪ ৬৪২-৪৫, ৬৪৭, ৬৬৭
মালতীমাধব—৩৮৩, ৫৬৭
মিনিং ... 'Meaning of the Glorious Koran', M. M. Picthall)—৩২৭
মিষ্টিরিয়াস ..'Mysterious Universe, The'—৬৪
মুখার্জি, রাধাকুমুদ, ডাঃ (Mukherjee, Radhakumud, Dr.)—'Ancient Indian Education' দ্রষ্টব্য।
মুন্সী...(Munshi, K. M., Dr.) —২৪৩

মুণ্ডক উপনিষৎ—২৪৯, ৫২০
মাণ্ডুক্য উপনিষৎ—২৪৯
মৃচ্ছকটিক— ৩৭৭
মেইলার নর্‌ম্যান্—৪৩৭
মেটারলিঙ্ক ... (Maeterlinck, Maurice)—৬৪৩
মেনন, লক্ষ্মী—৫৮১,
মৈত্রেয়ী—২৬৪
ম্যাক্...(Mc Millen S. L., M. D.)—অস্থ (২)—১৮
ম্যান্...(Man and Superman) —Shaw দ্রষ্টব্য।
ম্যানিকিজ্‌ম (Manichaeism) —২২৮
ম্যারেজ .. ('Marriage and Morals', Russell)— ১২৭-২৮, ১৩৫-৩৬, ১৪৯-৫০, ১৭৫-৭৬
ম্যালার্মে—৪০৩
যজুর্বেদ—২৪৮-৪৯
যবাত্তি—৬৬৩
যাজ্ঞবল্ক্য—২০, ৭৩, ৮৩, ২৫০-৫১, ২৬৪, ২৭০, ৩৫৪, ৪২৮
যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা—১৮১, ২০১
যাস্ক—৩৪৫
যীশুখৃষ্ট—১৮১, ৪১১
যুগান্তর (পত্রিকা)—৬৬০
যুধিষ্ঠির—২০৭, ২৭১, ৩৬৪, ৩৮৩
যোগবাশিষ্ঠ—৪৮৬, ৬২৯
'যোগসাধনার ভিত্তি'—৩২৩
'যোগীগুরু'—৩০৭, ৪৪৬
'যৌন মনোদর্শন', হ্যাভলক এলিস (বসুমতী সাহিত্য মন্দির)—৫৯৯ ৬০৩, ৬১০-৬১২
রঘুনাথ—২৯৩
রঘুবংশ—৩৭৩-৭৪
রত্নাবলী—৩৭৭
রবীন্দ্ররচনাবলী—৩৭৫, ৩৩৩, ৩৯২ ৪০৮
রমণ, মহর্ষি—৩২৩
রম্ভা—৩৫৪
রাণাডে-গোখেল—৩১৫, ৩১৭-১৮
রাধাকৃষ্ণণ . (Radhakrishnan Dr.)—৫১, ৯৭, ১৬১, ২২৫ ২৫০, ২৫২, ২৬৬, ২৭৮-৭৯, ২৮২, ২৯০, ৩১৫, ৫৫৭, ৫৭৫-৭৬, ৫৮১-৮২, ৫৮৪-৮৮, ৫৮৯-৯০, ৬০৫, ৬২৯ ; ভূমিকা—(গ), (ঘ), (ঙ)

রামচন্দ্র—১৬০, ১৭২-৭৪, ২৬৯, ৩৬৫-৬৬, ৩৮৩, ৩৯০, ৫৬৯

রামতীর্থ, স্বামী—৩১৮

রামদাস—৩১৩

রামপ্রসাদ—২৯৩

রামানন্দ—১০৫, ২৯৪, ৩৮৯-৯০

রামানুজাচার্য—১২০, ২৮৮, ২৯১

রামায়ণ—১০০-০১, ১০৪, ১১৬-১৭, ১৬৪, ১৭৩, ১৮৭, ২০৮, ২৬৯, ৩৬৫, ৩৬৯, ৩৮৩, ৫৬৯-৭১, ৬৩৬

রামায়ণ-মহাভারত—৩৪৬-৫০, ৩৫৪, ৩৫৬-৫৭, ৩৫৯, ৩৬৯-৭০, ৩৭৬, ৩৮২, ৩৯০, ৪৪২, ৪৯, ৪৯২, ৫৬৮

রায়, অন্নদাশঙ্কর—৪২৮, ৬১৬, ৬২৯

রায়চৌধুরী (Roy Choudhury, H. C., 'Political History of Ancient India'—১০১

রায়, রামমোহন, রাজা—৩১৩-১৪, ৩৯৫, ৪০০

রায়, রামানন্দ—৩৩২

রাসেল (Russell, Bertrand)—২১০, ৪৩৩, ৫১৮, ৬০৭ এবং 'Marriage and Morals' দ্রষ্টব্য।

রিলিজন্...'Religion and Society'—৫৫৭, ৫৭৫-৭৬, ৫৮১-৮২, ৫৮৯-৯০, ৬০৫

রীডার্স্...(Readers' Digest)—৪০,

রুদ্রযামল—৩০০

রুমী, জালালুদ্দিন—৬২৯

রুশো (Rousseau)—৪৫৪, ভূমিকা — ড), অনু (২)—(৩৮)

রূপসনাতন—২৯৩

রেভোলিউশনিষ্টস্...(Revolutionists' HandBook, A)—Shaw দ্রষ্টব্য।

রেজারস্...(Razor's Edge, The)—৪১৬-১৭

র‍্যাংক্ (Rank, O)—৬২

লক্ষ্মণ—২৭০, ৩৬৬

লক্ষ্মণসেন—৩৭৭

লরেন্স... (Lawrence, D. H,)—৪১৩-১৪, ৪২৯

লাইফ...'Life and Work of Sigmund Freud, The', Ernest Jones—৪৫১, ৪৬৫, ৪৮১, ৫৪৯, ৮০২
লাইফ... 'Life of Tolstoy, The', Aylmer Maude—৪১২-১৩, ৪৩০, ৪৬১
লাউ চে(Lao Tse)—৩৫০, ৪৬৬
লা'এত্রে ... L'Etre et Le Ne'-ant—`০৩
লিউক (Luke, St.)—৩২৪
লিটারারি... 'Literary Criticism', W. Wimstatt Jr. and C. Brooks—৪১৩
লিটারারি... 'Literary Essays of Ezra Pound'—৪৩২
লিড়ক ..(লিড়ক, ভায়োলেট)—৪৫৬
লিনকন...(Lincoln, Abraham)—৬৬৪
লেডি চ্যাটার্লিজ্‌ লাভার—৪১৩
লেনিন (Lenin)— ৬০০-০১, ৬৫০, ৬৬৫, ভূমিকা—(চ) অনু (২ —১০
'লোলিটা' ('Lolita')—৪৩৪ ৩৫
ল্যানকাষ্টার (Lankaster, Ray)—৪৭৮
'ল্যাবরেটারি'—৫৮৯
ল্যাস্কি— (Laski, Harold, Introduction to Politics)—৬৭১-৭৩, ৬৭৬
শ'...(Shaw, Bernard)—৪৩০, ৪৩৩, ৫৭১, ৬০৭, ৬২৬, অনু (২)—২০-২১
শকুন্তলা'—৮৩, ৩৫৩, ৩৭০, ৪১০
শঙ্করাচার্য—১২০, ২৮২, ২৮৭-৮৮, ২৯১
শরৎচন্দ্র—৪০১, ৫৮২, ৫৮৯
শান্তনু—৩৬১
'শান্তিনিকেতন'—৩৪৯, ৩৭৫
শার্প, অ্যালান—৪৩৫-৩৬
'শিক্ষার মিলন'—৪০৭
শুকদেব—৩৬৪-৬৫
শূদ্রক—৩৬৯, ৩৭৭
শেলী (Shelley)—৪৬৭, ৫১৯
শ্রীঅরবিন্দ—১০৭, ১৪৬, ২০২, ৩২৩, ৪৫৭, অনু (১)—/০ অনু (২)—৩৬

কৃষ্ণ—৮২, ২৬৯, ২৮০, ৩৬০-৬১,
বলরাম—৩৬০
'রাধার ক্রমবিকাশ'—৩৮২
রামকৃষ্ণ—৩১৯, ৫৭৬
'শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ উপদেশ'—৩২২
'শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ-সঙ্গ'—২৭৬
শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' (শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী)—১৭৪, ৩২৩, ৫৬৬, ৫৭৬
হর্ষ—৩৬৯, ৩৭৭
ক্রটীজ্ (Socrates)—৩৩৬
স্ববাণী' (আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ) —৩২২, ৪৮৮, ৫১৪
গবতী—২৭০, ৩৫৫, ৩৬২
ক্তিকর্ণামৃত'—৩৮১
কলন'—২৩২-৩৩
দপনী, মুনি—২৮০
রতী, দয়ানন্দ—৩১৩
রাকিন্ (Sorokin Dr.)—
অনু (২)—৬
ইফিক্...(Psychic Life of icro-organisms, A Binet) —৩০, ৪৭৬
সার্ত্রে (Sartre)—৪০৩, ৪১১-২২, ৪৮৪
সাবিত্রী (সত্যবান্)—১৭৪
'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে', (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)—৩৯৪-৯৫, ৪০২, ৪১০
সিংহ, কালীপ্রসন্ন—১৬০, ১৮৯-৯১, ১৯৫-৯৭, ৩৬১
সিংহ...(Sinha, Jadunath, Dr.) —২৭৯, ২৮১-৮২, ৫০৩, ৫৫৩
সিংহ (সেনাপতি)—১০, ১১১
সীতা—১৬০, ১৬৩, ১৭২-৭৩, ২৭০, ৫৬৯
সুভদ্রা—৩৫৯-৬০
সুভাষচন্দ্র (নেতাজী)—১৪৬, ৩২৪
সেকসপীয়ার—৩৬৩, ৪৩০
সেক্স... 'Sex and Culture', Unwin, J. D.—৬০৫
সেক্স...'Sex and Marriage', H. Ellis—৫০৬-০৭, ৫০৯, ৫৭৩, ৫৭৬ ৮১, ৫৮৭, ৫৯৪, ৬০৭-০৯, ৬১৪-১৬, ৬২০, ৬২২, ৬২৮